ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

১৪০৮:৯

ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশে নীল চাষ
উনিশ শতকে মুসলিম বাংলায় উপযোগবাদের প্রভাব
ম্যাকবেথ নাটকের বাংলা অনুবাদ
চর্যাপদের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে লোকজীবন
বাইবেল-কথার নবরূপায়ণ: সত্যেন সেনের উপন্যাস
চল্লিশের দশকে রচিত বাংলাদেশের ছোটগল্পে সমাজবাস্তবতা
বাংলাদেশের নকশি কাঁথা
বাংলাদেশের প্রাচীন পোড়ামাটি-ফলকে গল্প চিত্রণ
বাংলার দৃশ্যশিল্পে উপনিবেশবাদ ১৮৩৯-১৯৪৭
শিবগঞ্জ থানার হাট-বাজারের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও বিস্তারণের ধরন
সাঁওতালদের চিরায়ত রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থা
খুলনা মহানগরীর মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস প্রদানে নগরবাসীর অংশগ্রহণ
সংবাদপত্রে জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদ
বাংলাদেশে অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইন প্রণয়নের প্রবণতা
বরেন্দ্র এলাকায় কৃষি আধুনিকীকরণ ও পরিবেশের উপর এর প্রভাব
বিশ্বায়ন ও নয়া তথ্য প্রযুক্তির অতিকথন ও বাস্তবতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল

ISSN 1561-798X
৯ম সংখ্যা ১৪০৮

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

নির্বাহী সম্পাদক
প্রীতি কুমার মিত্র

সহযোগী সম্পাদক
স্বরোচিষ সরকার
জাকির হোসেন

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল, ৯ম সংখ্যা ১৪০৮
প্রকাশকাল : জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ ॥ জুন ২০০২

© ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ

প্রকাশক
জাইদুর রহমান
সচিব, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
ফোন : (০৭২১) ৭৫০৭৫৩, ৭৫০৯৮৫ ॥ ফ্যাক্স : (০৭২১) ৭৫০০৬৪
E-mail : ibs@rajbd.com

কভার ডিজাইন
ড. আবু তাহের বাবু

সম্পাদনা সহকারী
এস.এম.গোলাম নবী

মুদ্রক
সোনালী প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং লিমিটেড
রাজশাহী

মূল্য
টাকা ৫০.০০

সম্পাদকমণ্ডলী

নির্বাহী সম্পাদক

প্রীতি কুমার মিত্র
প্রফেসর ও পরিচালক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সহযোগী সম্পাদক

স্বরোচিষ সরকার
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জাকির হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সদস্য

এম. আবদুর রাজ্জাক
প্রফেসর, পরিসংখ্যান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

অভিনয় চন্দ্র সাহা
প্রফেসর, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. জয়নুল আবেদীন
প্রফেসর, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

দিলীপ কুমার নাথ
প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শহিদুল ইসলাম
প্রফেসর ও পরিচালক, আইইআর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সুলতানা মোস্তফা খানম
প্রফেসর, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সফিকুন্নবী সামাদী
প্রফেসর, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আবু তাহের
সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. মোস্তফা কামাল
সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধের বক্তব্য, তথ্য ও অভিমতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী বা আইবিএস দায়ী নয়

যোগাযোগের ঠিকানা
নির্বাহী সম্পাদক
আইবিএস জার্নাল
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের বাংলা ও ইংরেজি জার্নালে বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রাবন্ধিক বাংলাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, ফোকলোর, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব, আইন, পরিবেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে-কোনো বিষয়ের উপর বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশের জন্য দাখিল করা প্রবন্ধ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের যেসব বৈশিষ্ট্য জার্নালের সম্পাদকমণ্ডলী প্রত্যাশা করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ :

- প্রবন্ধে মৌলিকত্ব থাকতে হবে।
- প্রবন্ধটি স্বীকৃত গবেষণা-পদ্ধতি অনুযায়ী রচিত হতে হবে।
- বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় রচিত অনূর্ধ্ব ১০০ শব্দের একটি সারসংক্ষেপ থাকতে হবে।
- বাংলা প্রবন্ধের বানান হবে বাংলা একাডেমী প্রমিত বানান অনুযায়ী। তবে উদ্ধৃতির বেলায় মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।
- গ্রন্থপঞ্জি, টীকা ও তথ্যনির্দেশের যতিচিহ্ন ও সংকেত প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য রীতি অনুসরণ করতে হবে।
- প্রবন্ধের পরিসর অনূর্ধ্ব কুড়ি হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধের দুই কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার-ডিস্কেটসহ জমা দিতে হবে। বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বাংলা "বিজয়" সফ্‌টওয়্যারের "সুতন্বী-এমজে" ফন্টে কম্পোজ করলে ভালো হয়। প্রবন্ধের সঙ্গে প্রবন্ধকারের প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাসহ যোগাযোগের ঠিকানা থাকতে হবে।

সূচিপত্র

ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশে নীল চাষ: নীলকর ও নীল চাষির সম্পর্ক
মো. রেজাউল করিম ১

উনিশ শতকের মুসলিম বাংলায় উপযোগবাদের প্রভাব: একটি দার্শনিক সমীক্ষা
এম শফিকুল আলম ১৭

ম্যাকবেথ নাটকের বাংলা অনুবাদ : তুলনামূলক আলোচনা
আব্দুল্লাহ আল মামুন ২৭

চর্যাপদের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য
কৃষ্ণপদ মণ্ডল ৪৫

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে লোকজীবন
শহীদ ইকবাল ৬৩

বাইবেল-কথার নবরূপায়ণ: সত্যেন সেনের উপন্যাস
সৌমিত্র শেখর ৭৩

চল্লিশের দশকে রচিত বাংলাদেশের ছোটগল্পে সমাজবাস্তবতা
শরীফা সালোয়া ডিনা ৮৯

বাংলাদেশের নকশি কাঁথা
আবু তাহের ১০৭

বাংলাদেশের প্রাচীন পোড়ামাটি-ফলকে গল্পচিত্রণ: ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রতিফলন
আবদুল মতিন তালুকদার ১১৭

বাংলার দৃশ্যশিল্পে উপনিবেশবাদ ১৮৩৯-১৯৪৭
মোঃ আমিরুল মোমেনীন চৌধুরী ১২১

শিবগঞ্জ থানার হাট-বাজারের উৎপত্তি ক্রমবিকাশ ও বিস্তারণের ধরন
মোঃ কামরুজ্জামান
মোঃ একরামুল হক
মোঃ আবু হানিফ শেখ ১৩৩

সাঁওতালদের চিরায়ত রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থা
মোঃ আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী ১৪৫

খুলনা মহানগরীর মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস প্রদানে নগরবাসীর অংশগ্রহণ
মোঃ গোলাম মরতুজা ১৫৩

সংবাদপত্রে জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদ: রাজশাহীর সংবাদপত্রের উপর একটি সমীক্ষা.
মোঃ খাদেমুল ইসলাম ১৫৯

বাংলাদেশে অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইন প্রণয়নের প্রবণতা: একটি পর্যালোচনা
মোঃ রুহুল আমিন ১৬৯

বরেন্দ্র এলাকায় কৃষি আধুনিকীকরণ ও পরিবেশের উপর এর প্রভাব
মোঃ মাসুদ পারভেজ রানা
সৈয়দ রফিকুল আলম রুমী ১৮১

বিশ্বায়ন ও নয়া তথ্য প্রযুক্তির অতিকথন ও বাস্তবতা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ
তানভীর আহমদ
আকতার জাহান ১৯১

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ৯ম সংখ্যা ১৪০৮

ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশে নীল চাষ : নীলকর ও নীল চাষির সম্পর্ক

মো. রেজাউল করিম*

Abstract: The indigo movement occupies a unique position in the history of colonial Bengal. The European indigo planters who wanted to maximise their profit, began to exploit the poor peasants of Bengal. They forced them to cultivate indigo even though it was not profitable for them. The poor peasants, failing in their efforts to secure government protection, started a well-coordinated movement all over the indigo producing districts of Bengal.

ভূমিকা

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজুদ্দৌলাহ পরাজিত হবার পর বাংলায় কোম্পানি শাসনের সূত্রপাত ঘটে। বাংলার শিল্প-বাণিজ্য এবং কৃষি ক্ষেত্রে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এবং নিয়ন্ত্রণ আরোপের মাধ্যমে কোম্পানি তার উদ্দেশ্য হাসিল করে। শুরু হয় আর্থিক শোষণ ও প্রবঞ্চনা। এই প্রবঞ্চনার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ বাংলার নীল চাষ ব্যবস্থা। বাংলার চাষিদের যে কোনো ফসল চাষের স্বাধীনতা ছিল। নীলকররা তাদের উপর জোর করে নীল চাষ চাপিয়ে দেয়। সরকার ও প্রশাসনের মদদপুষ্ট হয়ে তারা চাষিদের উপর শোষণ ও অত্যাচারের রাজত্ব কায়েম করে। অন্যদিকে চাষিরা এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নীলকরদের প্রতিরোধে অগ্রসর হয়। শুরু হয় নীল আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল চাষিদের সঙ্গে নীলকরের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে। তাই নীল আন্দোলনের কারণ ও প্রেক্ষাপট অনুধাবনের জন্য নীলকর-নীল চাষি সম্পর্ক মূল্যায়ন অপরিহার্য। তবে, এ বিষয়ে আলোচনার আগে বাংলায় কখন, কিভাবে নীল চাষ আরম্ভ হয়েছিল; নীলকর ও নীল চাষি কারা ছিল; চাষিদের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে নীলকরদের আইনানুগ অবস্থান কেমন ছিল- সে বিষয়ে সংক্ষেপে বলে নেওয়া দরকার।

বাংলায় নীল চাষ

আঠারো শতকের শেষ নাগাদ ইউরোপে নীল আমদানির সকল উৎস অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।[১] ইউরোপে নীল আমদানি হ্রাস পায়। এ সময়ে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়। এরপর বস্ত্র শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ

---

* ড. মো. রেজাউল করিম, কর্মকর্তা, এসিডি, রাজশাহী।

১ আঠারো শতক পর্যন্ত ব্রিটেন নীলের জন্য পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উপর নির্ভরশীল ছিল। শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই অঞ্চল থেকে নীল আমদানি হ্রাস পেতে থাকে। সেখানকার নীলকরদের সম্মুখে নীল চাষ অপেক্ষা কফি ও চিনি চাষ অধিক লাভজনক প্রতিপন্ন হয়। ফলে, তারা নীল চাষে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। এর পর থেকে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ব্রিটিশ বস্ত্র শিল্পকে নীলের জন্য ফরাসি সান্তো ডোমিনিগো, স্পেনীয় গুয়াতেমালা ও দক্ষিণ ক্যারোলাইনার উপর নির্ভরশীল হতে হয়। কিন্তু, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৭৬-১৭৮৩ খ্রিঃ) এবং ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রিঃ) কারণে নীলের সকল উৎস ব্রিটেনের হাতছাড়া হয়ে পড়ে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আমেরিকার ৯টি ব্রিটিশ উপনিবেশ স্বাধীন হয়ে যায়। এতে উত্তর আমেরিকার নীলের সকল উৎস ব্রিটেনের হস্তচ্যুত হয়। অন্যদিকে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার আদর্শ নিয়ে ফরাসি বিপ্লব সংগঠিত হয়। ফলে ফরাসি উপনিবেশসমূহে দাস শ্রমিকরা মুক্ত হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে সেখানে দাস শ্রমিক নির্ভর নীল চাষ পদ্ধতিও পরিত্যক্ত হয়। D.H. Buchanan, *Development of Capitalistic Enterprise in India* (London: Frank Cass & Co., 1966), First Pub.1934, p. 36; Blair B. Kling, *The Blue Mutiny: The Indigo Disturbances in Bengal, 1859-1862* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1966), pp. 15-17; B.

ঘটে। স্বভাবতই কাপড় রং করার জন্য নীলের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ফরাসি বিপ্লবের পর এর আদর্শ সমগ্র ইউরোপকে নাড়া দেয়। বিভিন্ন দেশে রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ফ্রান্স ইউরোপের বৃহদংশ অধিকার করে নেয়। ইউরোপের রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এতে অনেক সৈন্যের প্রয়োজন হয়। মিত্র শক্তির (ফ্রান্সবিরোধী জোট) সৈন্যদের পোশাক ছিল নীল রঙের।[২] ফলে নীলের চাহিদা আরো বৃদ্ধি পায়।[৩]

ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের পূর্ব থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিভিন্ন পণ্য-সামগ্রী রপ্তানির মাধ্যমে ব্রিটেনে টাকা পাঠাতো। এসব পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বাংলার বস্ত্র। শিল্প বিপ্লবের ফলে ব্রিটিশ বস্ত্র শিল্প সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে। এর পর কোম্পানি ব্রিটেনে বাংলার বস্ত্র আমদানি অনুৎসাহিত করে। বাংলার বস্ত্র রপ্তানি হ্রাস পেতে থাকে।[৪] কিন্তু ব্রিটেনে টাকা পাঠানো কোম্পানির জন্য একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় কোম্পানি কাপড়ের একটি বিকল্প হিসেবে নীলকে বেছে নেয়। এদেশে উৎপাদিত নীলের মাধ্যমে ব্রিটেনে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ফলে বাংলায় নীল চাষকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সমসাময়িক কালের একজন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেন:

> The manufacture of Indigo, ...is of all forms of enterprise now known in India that which was first taken up by Europeans, who still retain the monopoly of the manufacture of this article, at any rate so far as concerns the better kinds exported to foreign market.[৫]

এ সময়ে কোম্পানি বাংলাকে নীল চাষের ক্ষেত্র হিসেবে নির্ধারণ করে এবং বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে এদেশে নীল চাষ প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চালায়।

ইউরোপীয় নাগরিকদের মধ্যে বাংলায় প্রথম নীল চাষ আরম্ভ করেন লুই বোনার্ড নামক একজন ফরাসি বণিক।[৬] ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে তিনি ভারতে আসেন। হুগলী জেলার তালডাঙ্গা নামক স্থানে একটি কুঠি নির্মাণ করে তিনি নীল চাষ আরম্ভ করেন।[৭] স্থানটি নীল চাষের জন্য তেমন উপযোগী ছিল না। এখানে নীল চাষের জন্য পর্যাপ্ত জমি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া কাছে কোনো নদী না থাকায় নীল প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পানিও পাওয়া যায়নি।[৮] ফলে বোনার্ড চন্দন নগরের নিকট গোন্দল পাড়ায়

Chowdhury, *Growth of Commercial Agriculture in Bengal*, Vol. I (Calcutta: Indian Studies; Past & Present, 1964), p. 74.

Ibid.

১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনে মোট নীল আমদানির পরিমাণ ছিল ১৮,৪০,৮১৫ পাউন্ড। এর মাত্র পাঁচ বছর পর, ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে শুধুমাত্র বাংলা থেকেই ব্রিটেনে নীল রপ্তানি করা হয়েছিল ২৯,৫৫,৮৬২ পাউন্ড। দেখুন, প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, *নীল বিদ্রোহ ও বাঙ্গালী* সমাজ (কলিকাতা: রাডিক্যাল বুক ক্লাব, ১৯৭৮, দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ৭।

১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে আমদানিকৃত বস্ত্রের পরিমাণ ছিল ১২,২০,০০০ থান। এ পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে এসে তা ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) থানে নেমে আসে। অধিকন্তু ঐ বছরই ইংল্যান্ড থেকে বাংলায় ১,১৪,০০,০০০ টাকার কাপড় আমদানি করা হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬০; এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শিরিন মুসভী। দেখুন, S. Musvi, "De-Industrialization, Population Change and Migration in Nineteenth Century India", *The Indian Historical Review*, Vol. X, No. I-II (July 1789 & January 1990).

J.E. Coron, *Review of the Trade of British India with other Countries for 1878-8*, উদ্ধৃত, L. Leotard, *Memorandum On Dyes of Indian Growth and Production* (Calcutta: Home, Revenue and Agriculture Department Press, 1881), p. 97.

সুপ্রকাশ রায়, *ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক* সংগ্রাম (কলিকাতা: বুকওয়ার্ল্ড, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৯৬), পৃ. ৮৬; সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর-খুলনার ইতিহাস*, ২ খণ্ড (কলিকাতা: শিব শঙ্কর মিত্র, ১৯৬৫, ২য় সংস্করণ), পৃ. ৭৬৭; প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫; কুমুদনাথ মল্লিক, *নদিয়া* কাহিনী (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৬, তৃতীয় সং), পৃ. ৩৯২।

চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, *বঙ্গ-প্রসঙ্গ* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি), ১৯৮৭, পৃ. ৬১।

ঐ।

নীল কুঠি স্থানান্তর করেন। কুঠি স্থানান্তরের অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। হুগলী ছাড়াও তিনি বাংলার বিভিন্ন জেলায় নীল চাষ করেন। অবশ্য সব জায়গায় তার নিজস্ব কুঠি ছিল না। অনেক স্থানে তিনি অন্য কুঠির অংশীদার হিসেবে নীল চাষে ভূমিকা রাখেন।[৯]

ইংরেজদের মধ্যে বাংলায় সর্বপ্রথম নীলচাষ আরম্ভ করেন ক্যারেল ব্লুম। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি নীল কুঠি নির্মাণ করেন। তিনি দাবি করেন যে, তিনিই সর্বপ্রথম বাংলায় এই লাভজনক ব্যবসার পত্তন ঘটান এবং নীল চাষের উন্নতি বিধানের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন।[১০] অবশ্য তার দাবির যৌক্তিকতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত নন। যাহোক, ব্লুম ছাড়া পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে আগত বাংলার অন্যান্য নীলকরদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রবার্ট হেভেন, জে.পি. স্কট প্রমুখ।[১১] এরা বাংলার বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন করে নীল চাষ করে। বাংলায় আগত এই নীলকর গোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিল দাস মালিক। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এরা দাসদের দিয়ে নীল চাষ করাতো। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা তাদের চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্যসহ বাংলায় অবতরণ করে।[১২] ফলে বাংলার নিরীহ চাষিরা প্রথম থেকেই তাদের শোষণ ও অত্যাচারের শিকার হয়।

বাংলায় 'নীল শিল্প' প্রতিষ্ঠার জন্য কোম্পানি বাজারে বাংলার নীলকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করে। ভারতের গভর্নর জেনারেল জন শোর আগ্রা ও অযোধ্যার নীলের উপর শতকরা ১৫ রুপি কর আরোপ করেন।[১৩] মনে রাখা দরকার, এ সময় পর্যন্ত ভারতের প্রায় চার-পঞ্চমাংশ (প্রায় ৮০%) নীল এই দুই প্রদেশে উৎপন্ন হতো। শোরের এই ব্যবস্থায় বাংলার নীল বাজারে বিশেষ সুবিধা লাভ করে এবং আঠারো শতক শেষ হবার আগেই তা প্রতিষ্ঠিত শিল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

নীলকর ও নীলচাষির পরিচয়

নীলকর ও নীল চাষির সম্পর্ক আলোচনার আগে নীলকর ও নীল চাষি কারা ছিল সে বিষয়ে সংক্ষেপে বলে নেওয়া দরকার। আঠারো শতকের শেষের দিকে বাংলায় নীল চাষ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ইউরোপীয় নাগরিক এই ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়ে। কোম্পানির অধীনে চাকরি করার জন্য অনেক ইউরোপীয় এদেশে এসেছিল। নীলকর ক্যারেল ব্লুম অত্যল্প সময়ে বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়ায় অন্যান্য ইউরোপীয় নীল চাষে এগিয়ে আসে। প্রথম দিকে নীল চাষ বা অন্য কোনো ব্যক্তিগত ব্যবসা করার অধিকার কোম্পানির কর্মচারীদের ছিল না। নীল চাষ তাদের এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল যে অনেক কর্মচারী চাকরি ত্যাগ করে এই ব্যবসা আরম্ভ করে। অবশ্য পরবর্তী কালে কোম্পানি কর্মচারীদের নীলের ব্যবসা করার অনুমতি দেয়। এতে তারা উৎসাহিত হয়ে নীল চাষে এগিয়ে এলে নীলকরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে নীল চাষে কোম্পানি কর্মচারীর সংখ্যাও বাড়ে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার বেশির ভাগ নীল কুঠির মালিক ছিল কোম্পানির কর্মচারী।[১৪]

ঔপনিবেশিক সরকার ভারতে ইংরেজদের বসতি স্থাপনে উৎসাহী ছিল। ভারতীয় উপনিবেশে ইংরেজদের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ করা ছিল এর উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে বাংলার নীল চাষ ব্যবস্থা। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত নীলের ব্যবসা ছিল কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকারের বাইরের একমাত্র ব্যবসা।[১৫] ফলে এ ব্যবসাকে কেন্দ্র করে এদেশে ইংরেজ বসতি স্থাপনকারীদের আগমন ঘটে। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি ৮/১০ জন নীলকরকে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে এনে বাংলার বিভিন্ন জেলায় বসিয়ে

---

[৯] ঐ, পৃ. ৬২।

[১০] N.K. Sinha, *Economic History of Bengal*, Vol. I (Calcutta: Firma KL Mukhupadhyay, 1967), p. 206.

[১১] *Ibid*, p. 207.

[১২] D.H. Buchanan, *op.cit.*, pp. 37-38.

[১৩] *Ibid*.

[১৪] *Calcutta Review*, December 1858, Vol. XXXI, p. 337.

[১৫] *Ibid*.

দেয়।[১৬] এভাবে নীল চাষে কোম্পানি কর্মচারীদের পাশাপাশি নতুন বসতি স্থাপনকারী ইংরেজদের অনুপ্রবেশ ঘটে। এর ফলে বাংলায় ইরেজ নীলকরের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বস্তুত বাংলার বেশির ভাগ নীলকরই ছিল ইংরেজ। অবশ্য দেশীয় জমিদাররাও নীল ব্যবসায় এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু, প্রশাসন ও সরকারের সহযোগিতা না পাওয়ায় তারা তেমন সুবিধা করতে পারেনি। ফলে কিছু দেশীয় জমিদারের অস্তিত্ব বর্তমান থাকলেও নীলকরদের বেশির ভাগই ছিল ইংরেজ।

অন্যদিকে বাংলার সাধারণ কৃষক নীল চাষ করতো। এ সময়ে এদের রায়ত বলা হতো। শতকরা ৮৫ ভাগ নীল উৎপন্ন করতো এই রায়তরা। এদের উপরে ছিল জমিদার, পত্তনিদার, ইজারাদার প্রভৃতি মধ্য-স্বত্বভোগী। রায়তদের উপর এদের ব্যাপক প্রভাব ছিল।[১৭] তবে, রায়ত জমিতে ভোগ-দখলের অধিকার ভোগ করতো। তারা জমিতে ইচ্ছামতো যে কোনো ফসল চাষ করতে পারতো। এটি বাংলার বহু দিনের ঐতিহ্য। ইতঃপূর্বে তাদের এই অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করেনি। নীল চাষ আরম্ভ হবার পর তাদের এ অধিকার খর্ব হয়। নীলকররা তাদেরকে নীল চাষ করতে বাধ্য করে।

নীল চাষের ধরন

বাংলার নীল চাষাধীন জমিসমূহের স্বত্বাধিকারের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দুই ধরনের জমিতে নীল চাষ হতো। তা হলো নীল কুঠির স্বত্বাধিকারের জমি ও অন্যের স্বত্বাধিকারের জমি। এই সমস্ত জমিকে যথাক্রমে 'এলাকা' এবং 'বে-এলাকা' বলা হতো। এই দুই ধরনের জমিতেই দুটি স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে নীল চাষ হতো। এই দুটি পদ্ধতিকে বলা হতো 'দাদনি' এবং 'নিজ'।[১৮] নীলকর নিজের মজুর ও লাঙল দিয়ে নিজেই নীল চাষ করলে তাকে বলা হতো 'নিজ' আবাদ।[১৯] 'রায়তি' চাষ পদ্ধতি ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এই পদ্ধতিতে নীলকর চাষিদের বিঘা প্রতি ২ রুপি আগাম বা দাদন দিয়ে নীল চাষ করিয়ে নিতো।[২০] দাদনের বিনিময়ে চাষিকে তার জমিতে নীল চাষ করতে হতো। উৎপাদিত সমস্ত নীলগাছ নীলকর ক্রয় করতো। যে কোনো রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা প্রতিকূলতায় ঝুঁকি নিতে হতো চাষিকে।[২১] 'নিজ' চাষ সাধারণত 'এলাকা' জমিতে করা হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'নিজ' পদ্ধতিতে নীল চাষ করা হতো চরে। 'দাদনি' চাষ করা হতো 'এলাকা' এবং 'বে-এলাকা' উভয় জমিতেই।

বাংলায় 'নিজ' আবাদ পদ্ধতিতে নীল চাষ হয়েছিল খুবই স্বল্প পরিসরে। আগেই বলা হয়েছে, এই পদ্ধতিতে নীলকর নীল চাষ করতো নিজের তত্ত্বাবধানে। নীল চাষের জন্য সে মজুর হিসেবে বুনা কুলিদের নিয়ে আসতো বীরভূম, মানভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি এলাকা থেকে।[২২] বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা এখানে আসতো সপরিবারে।

---

[১৬] H. Furber, *John Company at Work: A Study of European Expansion in India in the Late Eighteenth* Century (Cambridge: Harvard University Press, 1951), pp. 291-292; D.H. Buchanan, *op.cit.*, pp. 37-38.

[১৭] বি,বি, ক্লিং, 'নীল বিদ্রোহ' সিরাজুল ইসলাম (সম্পাঃ), *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ১৭০৪-১৯৭১, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: এসিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩), পৃ. ২৫২।

[১৮] *Calcutta Review*, January-June 1847, Vol. VII, p. 206.

[১৯] B. Chowdhury, *op.cit.*, pp. 124-125; সুনীল সেন, *ভারতের কৃষক আন্দোলন, ১৮৫৫-১৯৭৫* (কলকাতা: সত্য চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯০), পৃ. ১৮।

[২০] *Report of the Indigo Commission Appointed under Act XI of 1860: Minute of Evidence 1860.* Question No.[এরপর থেকে RIC Q হিসেবে উল্লেখ করা হবে] 3832; *Calcutta Review*, March 1861, No. LXXI, Vol. XXXVI, p. 34.

[২১] B. Chowdhury, *op.cit.*, pp. 124.

[২২] RIC Q 1940; সতীশচন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭৮; C. Grant, *Rural Life in Bengal* (London: 1860), pp. 114-115 উদ্ধৃত, B.B. Kling, *op.cit.*, p. 29

নীলকর তাদের বসবাসের জায়গা দিতো। কুঠির পার্শ্ববর্তী স্থানে বসবাস করে এরা নীল কুঠির কাজ করতো।[২৩] পরবর্তী কালে এদের একাংশ আর স্বদেশে ফিরে যায়নি। নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষের আশেপাশে এখনো এদের বসবাস করতে দেখা যায়।[২৪] জমি কর্ষণের জন্য কুঠিতে লাঙল ও বলদ রাখা হতো।[২৫] 'নিজ' আবাদ পরিচালনায় পর্যাপ্ত বুনাকুলি সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। বস্তুত নীল উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্যেই কুঠির নিয়মিত মজুরদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকতো। নীলকর 'নিজ' চাষের জন্য অস্থায়ী মজুর ও লাঙলের উপর নির্ভর করতো। বুনা কুলিদের এদেশে চাষাবাদে অদক্ষতা এর অন্যতম কারণ ছিল। এছাড়া তাদের আনাও ছিল ব্যয়-সাপেক্ষ। আর্থিকভাবে প্রতারণা করা হলে পরবর্তী মৌসুমে তারা আর আসতো না। অন্যদিকে, স্থানীয় চাষিদের ঠকানো সহজ ছিল। নীল কমিশনের তদন্তে এটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, নীলকররা প্রচলিত হারের চেয়ে অনেক কম মজুরি দিতো।[২৬] একইভাবে নীলকরদের নিজের লাঙলও ছিল অপর্যাপ্ত। তারা চাষাবাদের জন্য চাষিদের কাছ থেকে লাঙল নিতো এবং এক্ষেত্রেও চাষিদের ঠকাতো।[২৭] প্রচলিত বাজার দর মোতাবেক ১ রুপিতে ৮টি লাঙল পাওয়া যেতো। নীলকররা ১৬টি লাঙলের দাম দিতো ১ রুপি।[২৮] নীলকরদের ক্ষেতে মজুর ও লাঙল দেবার বিষয়ে চাষিদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না।[২৯] নীলকর মজুর ও লাঙল দিতে চাষিকে বাধ্য করতো। এক্ষেত্রে নীলকর লাঠিয়ালের মাধ্যমে বল প্রয়োগ করতো।

বাংলায় 'নিজ' আবাদের তুলনায় 'রায়তি' জমির পরিমাণ ছিল অনেক বেশি।[৩০] বিভিন্ন কারণে 'নিজ' আবাদের তুলনায় 'রায়তি' চাষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রথমত, 'নিজ' চাষ শুধুমাত্র 'এলাকা' জমিতে হওয়ায় এই ব্যবস্থাটি তেমন বিস্তৃত হতে পারেনি। কারণ বিশাল পরিমাণ জমির স্বত্বাধিকার লাভ করা নীলকরের পক্ষে সম্ভব হয়নি।[৩১] দ্বিতীয়ত একজন নীলকরের পক্ষে এ রকম বিশালায়তনের খামার তদারক করা ছিল একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, ১০০০ বিঘা জমি চাষের জন্য ২০০০ লাঙল দরকার ছিল, যা জোগাড় বা তত্ত্বাবধান করা সম্ভব ছিল না।[৩২] তৃতীয়ত, 'নিজ' আবাদের তুলনায় 'রায়তি' চাষ ছিল অনেক লাভজনক।[৩৩] স্বভাবতই নীলকর 'রায়তি' চাষ বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগী ছিল। ফলে 'রায়তি' চাষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে নীল কমিশনের সামনে সাক্ষ্যদানকারী নীলকরদের প্রায় সবারই 'নিজ' আবাদের চেয়ে 'দাদনি' চাষ বেশি ছিল। তাদের কারো কারো তিন-চতুর্থাংশ এবং কারো কারো সম্পূর্ণ নীলই 'দাদনি' চাষে উৎপন্ন হতো।[৩৪]

নীলকর ও চাষির লাভ-ক্ষতি

নীল চাষে নীলকর ও চাষির লাভ-লোকসান কেমন হতো তা একবার খতিয়ে দেখা দরকার। এক বিঘা জমিতে নীল চাষ করতে কত খরচ হতো, সে বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। নীলকরের ভাষ্য মোতাবেক, এক বিঘা জমিতে

---

[২৩] সতীশচন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ.৭৭৮.।

[২৪] *ঐ*।

[২৫] RIC Appendix I.

[২৬] RIC Q 870; *Calcutta Review*, March 1861, No LXXI., Vol. XXXVI, p. 35; *Calcutta Review*, January-December 1847, Vol. VII, p. 206.

[২৭] *Calcutta Review*, March 1861, No. LXXI, Vol. XXXVI, p. 35.

[২৮] RIC Q 156.

[২৯] *Calcutta Review*, March 1861, No. LXXI, Vol. XXXVI, p. 36.

[৩০] *Calcutta Review*, March 1861, No LXXI, Vol. XXXVI, pp. 33-34; সুনীল সেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮।

[৩১] B. Chowdhury, *op.cit.*, pp. 126.

[৩২] *Ibid.* p. 128; N.H. Choudhury, *Peasant Radicalism in Nineteenth Century Bengal; The Faraizi, Indigo and Pabna* Movements (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2001), p. 85; RIC Q 544.

[৩৩] B. Chowdhury, *op.cit.*, pp. 126.

[৩৪] RIC Appendix 1; *Calcutta Review*, March 1861, No. LXXI, Vol. XXXVI, pp. 33-34.

নীল চাষ করতে খরচ হতো ৩ রুপির মতো।[৩৫] সমসাময়িক কালের অন্যান্য দলিলেও এই বক্তব্যের সপক্ষে প্রমাণ মেলে।[৩৬] মনে রাখা দরকার যে, এখানে 'নিজ' আবাদে নীলকরের খরচ প্রদর্শিত হয়েছে। রায়তি চাষের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে খাজনা, কুঠিতে পৌছানোর জন্য গাড়ি বা নৌকা ভাড়া এবং বীজের দাম যোগ হতো। সেই সঙ্গে আরো যোগ হতো চুক্তিপত্রের স্ট্যাম্পের দাম ও আমলাদের ঘুষ।[৩৭] এছাড়া ছিল গবাদি পশু ছাড়ানোর দস্তুরি, যা কোনো হিসেবে আসতো না। নীলক্ষেতে প্রবেশকারী গরু কুঠিতে নিয়ে যাবার পর তা শুধুমাত্র নগদ জরিমানার ভিত্তিতে ফেরত দেওয়া হতো। চাষির হিসেবের খাতায় তা উঠতো না।[৩৮] তাই বলা চলে, নীল চাষে চাষির খরচ হতো আরো বেশি। একটি হিসেবে দেখা গেছে যে, সবসহ প্রতি বিঘায় নীল চাষে খরচ হতো ৪ টাকা ১১ আনা ৯ পাইয়ের মতো।[৩৯] ১ বিঘা জমিতে গড়ে ৮ থেকে ১০ বান্ডিল নীলগাছ জন্মাতো।[৪০] খুব ভালো ফলন হলে হতো ১২ বান্ডিল। রুপিতে ৪ বান্ডিল ছিল সর্বোচ্চ দাম।[৪১] সেই হিসেবে নীলের দাম বাবদ চাষির বিঘা প্রতি ৩ রুপি মতো পাবার কথা।[৪২] কিন্তু বাস্তবে চাষির প্রাপ্তি ২ রুপি বা তারও কম হতো। ফলে নীল চাষ করে চাষির সরাসরি ক্ষতি হতো বিঘা প্রতি ২ বা ৩ রুপি। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো ভাবে নীলের ক্ষতি হলে তার দায়ভারও সরাসরি চাষিকেই বহন করতে হতো।[৪৩] সেই কারণে যশোর জেলার ডাকাতি বিষয়ক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (প্রাক্তন নীলকর) জে. ককবার্ন স্বীকার করেছেন, "No ryot, I am certain (by honest means), yet made a profit by cultivating indigo under the present system."[৪৪]

নীল চাষ করে চাষিদের শুধুমাত্র এই ক্ষতিটুকু যে হতো, তা নয়। এটুকু ছিল তার প্রত্যক্ষ ক্ষতি। পরোক্ষভাবে তার ক্ষতি হতো অনেক বেশি। নীলকররা নীল চাষের জন্য চাষির ভালো জমিগুলো নির্বাচন করতো। চাষি ধান বা অন্য ফসল ফলানোর জন্য যে জমি প্রস্তুত করতো, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নীলকর সেই জমিটি কেড়ে নিতো। ধান ও অন্য ফসল চাষ করতে পারলে চাষি ১২ রুপি আয় করতে পারতো। ধান চাষ

---

[৩৫] W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. II (Delhi: D.K. Publishing House, 1978), p. 253.

[৩৬] Colonel J.E. Gastrell, *Geographical and Statistical Report of the Districts of Jessore, Fureedpore and Backergunge* (Calcutta: Superintendent of Government Printing, 1868), p. 18.

[৩৭] চাষিদের প্রদত্ত অর্থ থেকে কুঠির আমলারা ঘুষ নিতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রতি রুপিতে ২ আনা করে ঘুষ নেওয়া হতো। দেখুন, Letter From J. Cockburn, Esq. to Lord H.U. Brown, Esq., Under-Secretary to the Government of Bengal (dated the 31st December 1859), *Selections from the Records of the Government of Bengal, No. XXXIII, Papers Relating to the Cultivation of Indigo in Bengal*. [এরপর থেকে SRGB *Indigo* হিসেবে উল্লেখ করা হবে] Pt. 1 (Calcutta: Bengal Secretariat Office, 1860), p. 234; *Calcutta Review*, January-December 1847, Vol. VII, p.210.

[৩৮] B.B. Kling, *op.cit.*, p.36.

[৩৯] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, মোঃ রেজাউল করিম,"যশোর জেলায় নীল আন্দোলন, ১৮৫৯-৬২ : একটি সমীক্ষা" অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১, পৃ. ১১৮।

[৪০] Letter From J. Cockburn, Esq. to Lord H.U. Brown, Esq., Under-Secretary to the Government of Bengal (dated the 31st December 1859), SRGB *Indigo*, Pt. I, p. 235; *Calcutta Review*, January-December 1847, Vol. VII, p. 210.

[৪১] *Calcutta Review*, January-December 1847, Vol. VII, p. 206.

[৪২] R. Sen, *Report on the Agricultural Statistics of Jessore* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1873), p. 15.

[৪৩] *Calcutta Review*, January-December 1847, Vol. VII, p. 206.

[৪৪] Letter From J. Cockburn, Esq. to Lord H.U. Brown, Esq., Under-Secretary to the Government of Bengal (dated the 31st December 1859), SRGB *Indigo*, Pt. I, p. 236.

করতে তার খরচ হতো ৬ রুপির মতো। ফলে তার ৬ রুপির মতো লাভ হতো। তাই নীল চাষ করায় একজন চাষির বিঘা প্রতি ক্ষতি হতো ৮ থেকে ৯ রুপি।[৪৫]

নীল চাষ চাষির ক্ষতির কারণ হলেও নীলকরের জন্য ছিল অত্যন্ত লাভজনক। এ সময়ে কলকাতার বাজারে ১ মণ নীলের দাম ছিল ২৩০ রুপি। অবশ্য এটা ছিল ইউরোপীয়দের তৈরি নীলের দাম। ইউরোপীয়দের তৈরি নীল ছিল উৎকৃষ্ট মানের। দেশীয়দের তৈরি নীল ততো ভালো ছিল না। এই নীলের দাম ছিল প্রতি মণ ১০৯ রুপি।[৪৬] আমরা ইউরোপীয়দের তৈরি নীলের কথাই আলোচনা করছি। তাই এখানে প্রথম দামটি বিবেচনা করাই যৌক্তিক হবে। ১ বিঘা জমিতে ১০ থেকে ১২ বান্ডিল নীলগাছ উৎপন্ন হতো। এই পরিমাণ নীলগাছের দাম ছিল ২ রুপি ৮ আনা থেকে ৩ রুপি। কারণ ৪ বান্ডিল নীলের দাম দেওয়া হতো ১ রুপি।[৪৭] ১০০০ বান্ডিল নীলগাছ থেকে নীল পাওয়া যেতো ৫ থেকে ৭ মণ।[৪৮] যদিও বেশির ভাগ নীলকর দাবি করেন যে, বিঘা প্রতি ৪ সের নীল উৎপন্ন হতো।[৪৯] কিন্তু ১০ বা ১২ বান্ডিল নীলগাছ থেকে ২ সেরের মত নীল পাবার কথা। মনে করা চলে, চাষিকে লাভবান দেখিয়ে নীল চাষের বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছায় নীলকররা উৎপন্ন নীল গাছ এবং নীলের পরিমাণ বাড়িয়ে বলে। যাহোক, ২ সের নীলের জন্য নীলকর চাষিকে দিতো ২ রুপি ৮ আনা । উৎপাদন ব্যয় বাবদ খরচ হতো ১ রুপিরও কম।[৫০] অর্থাৎ ২ সের নীল উৎপাদন করতে একজন নীলকরের ৩ রুপি ৮ আনার বেশি খরচ হতো না। উপরোক্ত হিসেব মোতাবেক ২ সের নীলের দাম ছিল ১১ রুপি ৮ আনা। ফলে ৩ রুপি ৮ আনা খাটিয়ে নীলকরের লাভ হতো ৮ রুপি। এতো বেশি লাভ হতো বলেই অত্যল্প সময়ে নীলকররা ঐশ্বর্যের অধিকারী হতে পারতো। অধিকাংশ ঐতিহাসিকই এ বিষয়ে একমত যে, নীলের কারবার ছিল অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা।[৫১]

নীলকরদের আইনানুগ সুবিধাসমূহ

বাংলায় অবস্থানকারী নীলকরদের বেশ কিছু আইনানুগ সুবিধা ছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও রাজা, ভারতের গভর্নর জেনারেল এবং বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর বিভিন্ন আইন ও আদেশের মাধ্যমে তাদেরকে এই সমস্ত সুবিধা প্রদান করে। ইউরোপীয় নীলকররা আইনানুগ সুবিধাসমূহ পেয়েছিল তাদের বিচার এবং চাষিদের সঙ্গে চুক্তি সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে। বিভিন্ন সময়ে আইন প্রবর্তন করে এই দুই ক্ষেত্রে তাদের সুবিধাজনক অবস্থান নিশ্চিত করা হয়েছিল।

১৭৭৭ সালে বাংলায় নীল চাষ আরম্ভ হয়। এর অব্যবহিত আগে (১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে) রেগুলেটিং আইন প্রবর্তন করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতে অবস্থানকারী ইউরোপীয়দের বিচার কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্যস্ত করে।[৫২] মনে রাখা দরকার, সুপ্রিম কোর্ট ছিল ইংল্যান্ডের রাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আদালত। পার্লামেন্টের এই পদক্ষেপের ফলে আইনের দৃষ্টিতে একজন নীলকর এদেশের একজন স্থানীয় নাগরিক থেকে আলাদা মর্যাদা লাভ করে। কারণ ইউরোপীয় নাগরিকরা মফস্বল আদালতের এখতিয়ারের বাইরে থাকে। ব্যবস্থাটি নীলকর কর্তৃক কৃষক নিপীড়নে সহায়ক হয়। জেলা বা মহকুমায় প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি আদালতে নীলকরদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যেতো না। তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে হতো কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে। সেখানে গিয়ে মামলা করা ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। সাধারণ চাষির পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। নীলকররা এই অবস্থার সুযোগ পুরাপুরি

---

[৪৫] দেখুন, মোঃ রেজাউল করিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২০।

[৪৬] R. Sen, *op.cit.*, p.13.

[৪৭] কৃষ্ণনগরে (নদীয়ায়) রুপিতে ৬ বান্ডিল এবং যশোরে রুপিতে ৪ বান্ডিল হিসেবে নীলগাছের দাম দেওয়া রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। দেখুন, RIC Q 3391; *Calcutta Review*, January-December 1847, Vol. VII, p. 206.

[৪৮] RIC Appendix I.

[৪৯] *Ibid.*

[৫০] প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, *পূর্বোক্ত*., পৃ. ৪৩।

[৫১] G. Watt, *Dictionary of the Economic Products of India*, Vol. IV (Calcutta: 1883), p. 428.

[৫২] B.B. Kling, *op.cit.*, p. 39.

গ্রহণ করে।

গভর্নর জেনারেল কর্নওয়ালিস নীলকরদের উদারভাবে লাইসেন্স প্রদান করেন।[৫৩] ফলে, বাংলায় অনেক নতুন নীলকরের আগমন ঘটে। এতে মফস্বল এলাকায় ইউরোপীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় কোম্পানির সামনে তাদের নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য কর্নওয়ালিস জেলা জজদের সুপ্রিম কোর্টের কর্তৃত্বাধীনে 'জাস্টিস অব পিস'-এর ক্ষমতা প্রদান করেন।[৫৪] এভাবে রেগুলেটিং আইনকে (১৭৭৩) কৌশলে পাশ কাটিয়ে তিনি ইউরেপীয়দেরকে মফস্বল দেওয়ানি আদালতের অধীনে আনেন। এ সময়ে থেকে মফস্বল দেওয়ানি আদালতসমূহ ইউরোপীয়দের অনূর্ধ্ব ৫০০ রুপির মামলা গ্রহণ করতে পারতো।[৫৫] এর পর ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপীয়দেরকে মফস্বল দেওয়ানি আদালতের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। অবশ্য এ সময়েও তারা মফস্বল ফৌজদারি আদালতের এখতিয়ারের বাইরে থাকে। চাষিরা নীলকরের বিরুদ্ধে ছোট-খাট বিচারের জন্য দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করতে পারলেও বিচারকদের পক্ষপাতিত্বের কারণে তাদের পক্ষে সফল হওয়া সম্ভব হতো না।[৫৬] ফলে, নীলকররা চাষিদের উপর নির্যাতন চালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। ১৮৫৯ সালে নীল আন্দোলন আরম্ভ হবার পূর্ব পর্যন্ত এই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে।

চাষিদের সঙ্গে নীলকরের চুক্তি বিষয়ক প্রথম আইন প্রবর্তিত হয় ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে। ২০নং আইন নামে পরিচিত এই আইনের ৩নং সেকশনে নীলের চুক্তি রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হয়।[৫৭] এই ব্যবস্থা দাদনি প্রথাকে উৎসাহিত করে। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে (৬নং আইন) অন্য একটি আইনে দাদন প্রদান ব্যবস্থা অনুমোদন লাভ করে এবং দাদনগ্রাহী চাষির ফসলের উপর নীলকরকে বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়।[৫৮] এ আইনে নীলকররা দাদন আদায়ের জন্য বিচারের সুযোগ পায়।[৫৯] দাদন আদায়ের জন্য নীলকরকে দেওয়ানি আদালতে মামলা করার অধিকার দেওয়া হয়। আইনটিতে আরো বিধান রাখা হয় যে, দাদন দেওয়া জমিতে নীলকর চাষিদের দিয়ে অন্য ফসলও চাষ করাতে পারবে। নীল গাছ ক্রয় ও সরবরাহে জমিদাররা যেন কোনো রকম হস্ত ক্ষেপ করতে না পারে, সে ব্যবস্থাও নিশ্চিত করা হয়।[৬০] ফলে চাষিরা নীল চাষে কিছুটা বাধ্য হয়ে পড়ে।

গভর্নর জেনারেল বেন্টিংক নীলকরদের একটি অভূতপূর্ব সুবিধা প্রদান করেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ৫ নং আইন প্রবর্তন করে তিনি এই সুবিধাটি দেন। এই আইনে দাদন আদায়ের জন্য সংক্ষিপ্ত ফৌজদারি বিচারের ব্যবস্থা করা হয় এবং বিধান রাখা হয় যে, দাদনগ্রাহী চাষি চুক্তি মোতাবেক নীল চাষ না করলে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।[৬১] এই আইন মোতাবেক চাষিরা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া এবং দাদন পরিশোধের বিষয়ের বাইরে আদালতে কোনো কথা বলতে পারতো না। চাষির বক্তব্য নীলকরের নিকট গ্রহণযোগ্য না হলে তা নিষ্পত্তির জন্য দেওয়ানি আদালতে মামলা করা যেতো। আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করা দুর্বল চাষিদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আইনটি কার্যকরী হওয়ায় নীলকরদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায় এবং চাষিরা নীল চাষের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে।[৬২]

উপরোক্ত আইনটি প্রবর্তনের পক্ষে বেন্টিংক যুক্তি দেখান যে, নীলকরদের অসুবিধাগুলো দূর করা হলে

---

[৫৩] *Ibid.*

[৫৪] *Ibid.*

[৫৫] *Ibid.*

[৫৬] প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৭।

[৫৭] Letter from A. Grote, Esq., Commission of Nuddea Division, to the Secretary to the Government of Bengal (No. 141Ct., dated the 7th November 1859), SRGB *Indigo*, Pt. I, p. 204.

[৫৮] *Ibid.*

[৫৯] প্রমোদ রঞ্জন সেনগুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬।

[৬০] B.B. Kling, *op.cit.*, p. 41; B. Chowdhury, *op.cit.*, p. 171.

[৬১] *British Parliamentary Papers* [এরপর থেকে BPP হিসেবে উল্লেখ করা হবে], 1831-32, Vol. VIII, pp. 374-77

[৬২] *Ibid.* **উদ্ধৃত,** B.B. Kling, *op.cit.*, p. 42.

তারা বাংলা তথা ভারতের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠবে। তার মতে,

> Fundamentally ... the presence of Europeans in the *mufassal* would help 'Civilize' the Indians by deffusing European arts and sciences among them.[৬৩]

বেন্টিংক নীলকরদের অত্যাচারের বিষয়টি যে অবগত ছিলেন না, তা নয়। বিষয়টিকে তিনি তেমন গুরুত্ব দেননি। এক্ষেত্রে তার বক্তব্য ছিল,

> The occasional misconduct of the planters was more than offset by the benefits they brought to the countryside. In spite of the fact that the planters had laboured under several legal handicaps. every factory was "a circle of improvement."[৬৪]

বেন্টিংকের এই ধরনের মন্তব্য সত্ত্বেও পরবর্তী সময়ে কোম্পানির 'কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স' আইনটি বাতিল করে। কিন্তু ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে অন্য একটি আইন পাশ করে নীলকরদের বিশেষ সুবিধা দেয়। ১১নং আইন নামে পরিচিত এই আইনে বলা হয় যে, দাদনগ্রাহী চাষি নীল চাষে বিলম্ব করলে অথবা বিরত থাকলে নীলকর বা তার প্রতিনিধির অভিযোগের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে আদালতে উপস্থিত হবার জন্য সমন জারি করতে পারবেন।[৬৫] অভিযোগ প্রমাণিত হলে উক্ত চাষি অর্থদণ্ড বা কারাদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।[৬৬] অর্থদণ্ড প্রদানে ব্যর্থ হলে চাষির ফসল ক্রোক করার ক্ষমতা ম্যাজিস্ট্রেটের থাকবে। চুক্তির শর্ত যথাযথভাবে পালনের নির্দেশ দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম জারি করতে পারবেন।[৬৭] এই আইন মোতাবেক চুক্তিভঙ্গের পরামর্শ দান বা অনুরূপ কোনো ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।[৬৮] নীলের ক্ষেত ধ্বংস বা ক্ষতিকরণকেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হবে।[৬৯] এই আইনে দেওয়া ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে না।[৭০] অবশ্য আইনটি মাত্র ছয় মাসের জন্য কার্যকরী হয়। এতে 'নীল কমিশন' গঠনের সিদ্ধান্তও অন্তর্ভুক্ত ছিল। আইনটি নীলকরদের সুবিধার্থে প্রবর্তিত হয়েছিল। ফলে চাষিদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন বৃদ্ধি পায়।

নীলকর ও নীল চাষির সম্পর্ক

আমরা আগেই দেখেছি যে, ক্ষতিকর হওয়ায় চাষিরা নীল চাষে অনীহ হয়ে পড়েছিল। সুবিধাজনক আইনানুগ অবস্থান এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের মদত থাকায় নীলকররা জোর করে চাষিদের দিয়ে নীল চাষ করিয়ে নিতো। তাদের এই পদক্ষেপ নীলকর-চাষি সম্পর্ক নির্ধারণে নিয়ামক হিসেবে ক্রিয়াশীল হয়। বস্তুত এই প্রেক্ষাপটেই চাষিদের সঙ্গে নীলকরের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়েছিল।

চাষির সঙ্গে নীলকরের প্রাথমিক সম্পর্ক স্থাপিত হতো দাদন প্রদানের মাধ্যমে। বিঘা প্রতি ২ রুপি দাদন দিয়ে নীলকর চাষির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে সম্পর্কিত হতো। নীল চাষ ক্ষতিকর হওয়ায় যে চাষি একবার দাদন গ্রহণ করতো, সেই কুঠির ঋণের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়তো। এ সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

> দাদনের অর্থ কৃষকদিগকে অগ্রিম অর্থ দেওয়া। দরিদ্র কৃষকগণ অগ্রিম অর্থ পাইলে আরও অনেক কাজে লাগাইতে পারিবে বলিয়া দাদন লইত; ...তৎপরে তাহারা নীলকরের দাসরূপে পরিণত হইত। নীলকরগণ জোর করিয়া উৎকৃষ্ট জমিতে নীল বুনাইয়া লইতেন; তাহাদের আদেশানুসারে

---

[৬৩] B. Chowdhury, *op.cit.*, p. 171, B.B. Kling , *op.cit.* p. 42.

[৬৪] BPP, 1831-32, Vol. VIII, pp. 273-84; B.B. Kling, *op.cit.*, p. 43.

[৬৫] B.B. Kling, *op.cit.*, p. 131.

[৬৬] *Ibid.*

[৬৭] *Ibid.*, p. 133.

[৬৮] *Ibid.*, pp. 132-33.

[৬৯] *Ibid.*, p. 132.

[৭০] *Ibid.*

> কার্য্য করিতে না চাহিলে প্রহার, কয়েদ, গৃহদাহ প্রভৃতি নৃশংস অত্যাচার করিতেন; এবং অনেক স্থলে জমিদার হইয়া বসিয়া অবাধ্য প্রজাদিগকে একেবারে ধনেপ্রাণে সারা করিতেন।[৭১]

মনে রাখা দরকার, এক্ষেত্রে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রামে বসার সময়ে নীলকররা চাষিদের আস্থা অর্জনে নিষ্ঠাবান ছিল। এ সময়ে তারা চাষিদের নিষ্কর ও পতিত জমিতে নীল চাষের প্রস্তাব দিতো এবং এক্ষেত্রে অগ্রিম অর্থ দিয়ে তাদের সহায়তা করতো।[৭২] এভাবে নীল চাষে দাদনি ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। অবশ্য এর আগেও বাংলায় দাদনি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। অনেক আগে থেকেই কোম্পানি এ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁতিদের নিকট থেকে কাপড় কিনতো। বাংলার বিভিন্ন অংশে ইউরোপীয় রেসিডেন্টরা অবস্থান করতো। তারা তাঁতিদেরকে দাদন দিয়ে বাজারদর থেকে অনেক কম দামে কাপড় কিনতো। কোম্পানি এই কাপড় ইংল্যান্ডে রপ্তানি করতো।[৭৩] বাংলায় আগত ইউরোপীয় নীলকররা এই ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিল। সম্ভবত সেকারণেই তারা দাদনি ব্যবস্থায় নীল চাষে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

দাদন প্রদানের পর চাষির নিকট থেকে কবুলিয়তে (চুক্তিপত্র) সই করে নেওয়া হতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাদা (অলিখিত) স্ট্যাম্পে তাদের টিপসই (বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ) নেওয়া হতো।[৭৪] চুক্তির মেয়াদ ছিল ৩, ৫ বা ১০ বছর।[৭৫] মনে রাখা দরকার, চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে চাষিদের মতামতের কোনো মূল্য ছিল না। প্রায় সবক্ষেত্রেই নীলকররা চাষির উপর জোর করে চুক্তিটি চাপিয়ে দিতো। সমসাময়িক একটি দরখাস্তে চাষিরা বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এতে বলা হয়:

> It (Indigo cultivtion) is a sort of trade, and a transaction between creditors and debtors, which must be done with the consent of both parties ... there is no such agreement that they [Indigo cultivators], during their life time, and their heirs would forsake their other professions and be exclusively employed in cultivating Indigo.[৭৬]

শুধুমাত্র চাষিরাই নয়, ঔপনিবেশিক ভারতের বিচারকগণও এ সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করেন। সদর দেওয়ানি আদালতের একজন জজ বলেন:

> The contract formed with the ryot is sometimes not in writing, is frequently insufficiently defined, and is generally extremely unfavourable to the ryot, rendering him, in fact, a slave to the establishment with which he has once engaged, and thereby preventing an open and fair competition to all, which could afford the only true and effectual remedy.[৭৭]

---

[৭১] শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনুলাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ* (কলিকাতা: নিউ এ'জ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৩), চতুর্থ মুদ্রণ, পৃ. ১৯৯।

[৭২] প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪।

[৭৩] সতীশচন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫৪।

[৭৪] Letter From J. Cockburn, Esq. to Lord H.U. Brown, Esq., Under-Secretary to the Government of Bengal (dated the 31st December 1859), SRGB *Indigo*, pt. I, p. 233.

[৭৫] RIC Appendix 1; *Calcutta Review*, March 1861, No. LXXI, Vol. XXXVI, p. 34.

[৭৬] *Proceeding of the Hon'ble Lt-Governor of Bengal: Judicial Department* [এরপর থেকে PLGB *Judicial* হিসেবে উল্লেখ করা হবে], May 1860, No. 345.

[৭৭] *Papers Relating to the Settlement of Europeans in India* (1854), p. 117, উদ্ধৃত, M.M. Ali, *History of the Muslims of Bengal*, Vol. II A (Riyadh: Imam Muhammad Ibn Sa'ud Islamic University, 1988), p. 127.

জোরপূর্বক দাদন দিয়ে চুক্তি করা হতো বলে চাষিরা অনিচ্ছার সাথে তা গ্রহণ করতো। ফলে, এই চুক্তির স্বাভাবিক বাস্তবায়ন সম্ভব হতো না। নীলকররা বিভিন্ন অত্যাচারের মাধ্যমে চুক্তি মোতাবেক চাষিদেরকে নীল চাষে বাধ্য করতো।[৭৮]

নীল চাষের পর চাষি নীলগাছের যে দাম পেতো তাতে কখনই দাদন শোধ হতো না।[৭৯] এছাড়া কোনো চাষি বকেয়া শোধ দিতে চাইলেও তাকে শোধ দিতে দেওয়া হতো না।[৮০] নীল কমিশনের সামনে একজন নীলকর একথাটি স্বীকার করে বলেন, "... that the ryot is not permitted to clean his account when he finds he cannot work to his own advantage."[৮১] ফলে চাষিরা কুঠির নিকট চিরঋণী হয়ে থাকতো। যতোই দিন যেতো এই ঋণ আরো বৃদ্ধি পেতে থাকতো এবং এক সময়ে তা অপরিশোধযোগ্য ঋণে পরিণত হতো। ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে,

> Like Sysiphus he [engaged cultivator] succeeds in rolling the stone up the hill, only to see it roll down again. Like Ixion he is chained to a wheel which rolls and rolls and never drops. Like Tantalus he always seems to be within reach of his object and yet never secures it.[৮২]

একই ভাবে চুক্তিটিও স্থায়ী রূপ লাভ করতো। দাদনগ্রাহী চাষির মৃত্যুর পর এই ঋণ তার উত্তরসূরিদের উপর বর্তাতো। অর্থাৎ নীলকররা চুক্তিটিকে বংশানুক্রমিক চুক্তিতে পরিণত করেছিল।[৮৩] ফলে, পৌত্রকে পিতামহের, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রপৌত্রকে প্রপিতামহের চুক্তি মোতাবেক নীল চাষ অব্যাহত রাখতে হয়েছিল।[৮৪] সমসাময়িক কালের প্রখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ এ প্রসঙ্গে বলেন:

> An unfortunate oldman in his dotage had fingered an indigo advance. Probably he was in distress and his mind wandered from cultivation. Probably the advance had been forced upon him by factory Gomasta not troubled with a peculiarly sensitive conscience. That oldman was thenceforward a doomed man. The brand of the vats was on his forehead and not death even could release him from the fatal mark. It descended to his generation from father to son.[৮৫]

জোরপূর্বক ভূমি অধিগ্রহণ ছিল নীলকরদের অত্যাচারের আর একটি দিক। দাদন প্রদানের পর নীলকর বল প্রয়োগ করে চাষিদের উৎকৃষ্ট জমি অধিগ্রহণ করতে থাকে।[৮৬] প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্তের ভাষায়, "নানা প্রলোভন দেখিয়ে নীলকর কৃষককে দাদনের চুক্তিতে বেঁধে ফেলত, এবং দু'চার বছর পরে, যখন কৃষক নীলকরদের দাদনের ফাঁদে একবার পা দিয়ে ফেলেছে, তখন সে তার উৎকৃষ্ট জমিতেও নীল চাষ করতে বাধ্য হতে লাগল।"[৮৭] এই ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষাবধি অব্যাহত থাকায় নীল চাষ বৃদ্ধি পায়। বাংলার কোনো কোনো

---

[৭৮] RIC Q 582; Letter From J. Cockburn, Esq. to Lord H.U. Brown, Esq., Under-Secretary to the Government of Bengal (dated the 31st December 1859), SRGB *Indigo*, Pt. I, p. 231.

[৭৯] *Calcutta Review*, January- December 1847, Vol. VII, p. 210.

[৮০] *Calcutta Review*, June 1860, No LXVII, Vol. XXXIV, p. 241.

[৮১] RIC Q 674.

[৮২] *Calcutta Review*, June 1860, No LXVIII, Vol. XXXIV, p. 241.

[৮৩] RIC Q 303.

[৮৪] B.B. Kling, *op.cit.*, p.128.

[৮৫] G.C. Ghose, 'The Smash in the Indigo Districts' *Mukerjee's Magazine*, March 1861; M. Ghose, *Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose* (Calcutta: R. Cambray & Co., 1911), p. 75.

[৮৬] RIC Q 2542 .

[৮৭] প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

জেলার এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত জমি নীল চাষের অধীনে আসে। এ সময়ে নিম্ন-বাংলায় নীল চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ ছিল ৬৯,২৬,৭৩৩ বিঘা।[৮৮]

নীলকররা জমির মাপ নিয়েও চাষিদের সঙ্গে প্রতারণা করতো।[৮৯] বাংলার অন্যান্য জেলার মতো যশোর জেলায়ও ১ বিঘা জমির মাপ ছিল ১৪,০০০ বর্গফুট। নীলকররা এই মাপ মেনে চলতো না। তারা চাষিদের নিকট ২১,৫১১ বর্গফুট সমান ১ বিঘা হিসেবে মেপে নিতো। অর্থাৎ নীলকরের ১ বিঘা সাধারণ দেড় বিঘারও বেশি ছিল।[৯০] এছাড়া নীলগাছ কাটার পর কুঠিতে নিয়ে গেলে তা মাপের ক্ষেত্রেও কারচুপি করা হতো। সাধারণত ৬ হাত লম্বা চেইন দিয়ে নীলগাছ মাপা হতো। যতোগুলো নীলগাছ এই চেইনটি দিয়ে জড়ানো যেতো তা ছিল ১ বান্ডিল।[৯১] অনেক সময়ে এই চেইনের মাপ ঠিক থাকতো না। এছাড়া কুঠির কর্মচারীরা ওজন করার সময় নীলগাছের ডগার দিকে সরিয়ে চেইন জড়িয়ে দিতো।[৯২] ফলে চেইনে দ্বিগুণ বা তিনগুণ বেশি গাছ ধরতো। এ রকম কারচুপির ফলে ২/৩ বান্ডিল নীলগাছ ১ বান্ডিল হয়ে যেতো।[৯৩] এতো কিছুর পরও নীলগাছ বিক্রি করে চাষি সামান্য কিছু পেলে, কুঠির কর্মচারীরা তাতে ভাগ বসাতো।[৯৪] কুঠির কর্মচারীদের ঘুষ গ্রহণ এ সময়ে একটি রীতিতে পরিণত হয়েছিল। এই ঘুষের পরিমাণ ছিল রুপি প্রতি ২ আনা।[৯৫] কুঠির কর্মচারীরা ঘুষ গ্রহণ করায় তাদের বেতন দ্বিগুণ, এমনকি তিনগুণ পর্যন্ত হয়ে যেতো।[৯৬] এমতাবস্থায় নীল চাষ করে চাষির ভাগ্যে শুধুমাত্র লোকসানই জুটতো।

তাহলে চাষিরা কেন নীল চাষ করতো? উত্তরে বলা চলে নীলকরদের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা পাবার জন্য। নীল চাষ না করলে তাদের অমানবিক অত্যাচারের শিকার হতে হতো। এ সম্পর্কে একজন ঐতিহাসিক লেখেন, "এই অত্যাচার যে কত প্রকারের ছিল তাহা বলিবার নহে। রাইয়তের খেজুর বন কাটিয়া উপড়াইয়া তাহাতে নীলের ক্ষেত করা হইত, পলাইত প্রজার ঘর ভাঙ্গিয়া ভিটার উপর নীলের চাষ করা হইত; এমনকি ঘর জ্বালাইয়া দিয়া উৎপাৎ করিয়া অবাধ্য রাইয়তকে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। ... কুঠিতে কুঠিতে কয়েদ ঘর ছিল, চুক্তি (নীলের চুক্তি) ভঙ্গ করিলে রাইয়তদিগকে কুঠিতে ধরিয়া লইয়া নানা নবোদ্ভাবিত কৌশলে পীড়ন করিবার পর, কয়েদ করিয়া রাখা হইত।"[৯৭] ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে নীল কমিশনের নিকট সাক্ষ্য প্রদান কালে একজন নীলকর এই অত্যাচারের কথা স্বীকার করেন। তার মতে, গবাদি পশু হরণ করে, এমনকি ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে চাষিদের নীল চাষে বাধ্য করা হতো।[৯৮] এছাড়া চাষিকে আটক করে বিভিন্ন অত্যাচারের মাধ্যমে তাকে নীল চাষে বাধ্য করা হতো। যশোরের একটি ঘটনা এর সপক্ষে প্রমাণ দেয়। জেলার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট একদিন একটি নীল কুঠির গুদামে কয়েকজন চাষিকে অবরুদ্ধ অবস্থায় দেখতে পান। পুলিশের সহায়তায় তিনি তাদের মুক্ত করেন। এ সংক্রান্ত মামলায় কুঠির লোকদের সামান্য শাস্তি হয়েছিল।[৯৯]

---

[৮৮] *Calcutta Review*, March 1860, No. LXVII, Vol. XXXIV, p. 117.

[৮৯] *Calcutta Review*, March 1860, No. LXVII, Vol. XXXIV, p. 127.

[৯০] RIC Q 2053.

[৯১] RIC Appendix 1; *Calcutta Review*, March 1861, No. LXXI, Vol. XXXVI, p. 37.

[৯২] *Calcutta Review*, March 1861, No. LXXI, Vol. XXXVI, p. 37.

[৯৩] RIC Q 2543.

[৯৪] *Calcutta Review*, January-June 1847, Vol. VII, p. 210.

[৯৫] Letter From J. Cockburn, Esq. to Lord H.U. Brown, Esq., Under-Secretary to the Government of Bengal (dated the 31st December 1859), SRGB *Indigo*, Pt. I, p. 234.

[৯৬] RIC Q 548.

[৯৭] সতীশচন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮২-২৮৩।

[৯৮] RIC Q 670-672.

[৯৯] C.E. Buckland, *Bengal Under Lieutenant-Governors*. Vol. I (Delhi: Deep Publications, 1976, reprint), pp. 245-246.

নীলকররা শুধুমাত্র অত্যাচারী ছিল তাই নয়, তাদের নৈতিক অবক্ষয়ও দেখা দিয়েছিল। তারা চাষির স্ত্রী-কন্যাদের উপর অত্যাচার এবং তাদের সম্ভ্রম হানি করতো। ক্রমাগত ক্ষতির মুখে নীল চাষ করা চাষিদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তারা এক্ষেত্রে অনীহা প্রদর্শন করতো। ব্যাপক অত্যাচার করেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের দিয়ে নীল চাষ করানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ রকম অবস্থায় নীলকররা চাষিদের ধর্মীয়, সামাজিক ও মানসিক দিক থেকে সন্ত্রস্ত করে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। চাষির স্ত্রী-কন্যাদের ধরে এনে সম্ভ্রম হানির মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া ক্ষমতা বৃদ্ধির পর নীলকর ও তাদের কর্মচারীরা চাষিদের স্ত্রী-কন্যাদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। গ্রামাঞ্চলে প্রতীয়মান একমাত্র কর্তৃপক্ষ হিসেবে যেকোনো রকমের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা নীলকর বা কুঠির কর্মচারীদের পক্ষে সম্ভব ছিল। স্বীয় ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য তারা চাষিদের স্ত্রী-কন্যাকে ধরে এনে সম্ভ্রম হানি করে। নীল কমিশনের কাছে সাক্ষ্য প্রদান কালে পাদরি রেভারেন্ড সি. বমভেট্স নীলকরদের এ রকম চারিত্রিক ত্রুটির কথা উল্লেখ করেন। তাঁর সাক্ষ্য মোতাবেক কাঁচিকাটা কনসার্নের নীলকর আর্চিবল্ড হিল্‌স হারামণি নামক এক সুন্দরী কৃষক-কন্যাকে জোর করে কুঠিতে ধরে আনেন। তিনি তাকে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কুঠিতে আটক রাখেন। সমসাময়িক সংবাদপত্র এর সপক্ষে প্রমাণ দেয়। এতে উল্লেখ লেখা হয়, "The story was told by Rev. C. Bomwetsch before the Indigo Commission. The Magistrate (Herschel) said in his reply that the abduction seemed very clearly proved."[১০০] নীলকররা স্বামীদের অনুপস্থিতিতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি সমাজের উচ্চ শ্রেণির মহিলাদের ধরে নীল ক্ষেত্রে কাজ করিয়ে নিতো। তারা মেয়েদের গুদামে আটক রেখে তাদের উপর অত্যাচার চালাতো।[১০১] যশোরের বিজলিয়া কুঠির নীলকর ওম্যান গ্রামের মেয়েদের ধরে কুঠিতে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করতো।[১০২] হাজরাপুর কুঠির নীলকর ওয়েটস্ রামতনু অধিকারী নামক একজন চাষির বাড়ি আক্রমণ করে। লাঠিয়ালদের আক্রমণের আগেই বাড়ির পুরুষেরা ভয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু মহিলারা পালাতে পারেনি। প্রথমে লাঠিয়ালরা বাড়িটি ধ্বংস করে দেয়। এর পর তারা বাড়ির মেয়েদের উঠানে নিয়ে এসে জনসমক্ষে বিবস্ত্র করে ফেলে। রামতনু ম্যজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন জানিয়েও কোনো ফল পায়নি।[১০৩] শুধুমাত্র নীলকররা নয় প্রশাসনও চাষিদের স্ত্রী-কন্যার প্রতি একইভাবে অত্যাচার আরম্ভ করে। নীলকরদের প্ররোচনায় পুলিশ একাজে লিপ্ত হয়। একটি দলিলে এর সপক্ষে প্রমাণ মেলে। এতে উল্লেখ করা হয় যে, "The Darogahs who are deputed to the *mofussil* on false pretences, enter their (cultivators) houses, carry away their females, and subject them to great dishonor and hardship."[১০৪]

প্রশাসনের নিকট থেকে চাষিরা স্ত্রী-কন্যার মানসম্মান রক্ষার নিশ্চয়তা তো পায়ই নি, বরং দারোগো পুলিশরা নীলকরদের সঙ্গে এই অত্যাচারে মেতে ওঠে। ফলে চাষিরা প্রতিরোধ ভিন্ন পরিত্রাণের আর কোনো পথ দেখতে পায়নি। নীলকরদের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা ও অসহনীয় অত্যাচারের কারণে চাষিরা তাদের প্রতি ভীত সন্ত্রস্ত ছিল, সন্দেহ নাই। তবে স্ত্রী-কন্যাদের প্রতি এ রকম আচরণে তারা অস্থির হয়ে পড়ে। রেভারেন্ড জেম্‌স লঙ এ বিষয়ে মন্তব্য করেন, "The violation of their (caltivators) daughters will teach ryots how they complain of the Indigo Shaheb."[১০৫] এই অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারা যে কোনো ব্যবস্থা নিতে রাজি ছিল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নীলকরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতো। সেই কারণে চাষিরা লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নরের নিকট আবেদন করে বলে, "If the Mofussil Authorities are determined to get Indigo cultivated for the Planters, they can do so in the Petitioners lands which are

---

[১০০] সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৪, পাদটিকা।

[১০১] *Hindoo Patriot*, August 22, 1860.

[১০২] *Ibid.*

[১০৩] *Ibid.*

[১০৪] 'Abstract Translation of a Petition from Certain Inhabitants of Zillas Nuddea and Jessore' PLGB *Judicial*, May 1860.

[১০৫] সতীশচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৪, পাদটিকা।

sown with paddy; but they should be prevented from destroying the religion and life of the Petitioners."[১০৬] অবশ্য কমিশন তদন্তকালে নীলকর কর্তৃক চাষির স্ত্রী-কন্যাদের প্রতি উৎপীড়নের বিষয়ে তেমন কোনো প্রমাণ পায়নি। মান-সম্মানের দায়ে এ সময়ে কোনো চাষি স্ত্রী বা কন্যার এ রকম পরিণতির কথা স্বীকার করেনি। সমকালীন বাংলার সামাজিক অবস্থা এই সত্য স্বীকার করার বা মেনে নেবার পক্ষে মোটেও অনুকূল ছিল না। এক্ষেত্রে নিপীড়িত মহিলাদের সমাজে অস্পৃশ্য হওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। তার অভিভাবককেও বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হতে হতো। সতীশচন্দ্র মিত্র লেখেছেন, "কিন্তু এদেশীয় প্রজা মান ইজ্জতের ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। চরিত্রহীন কুঠিয়ালেরা নিম্নতম শ্রেণী হইতে যে স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিত, তাহার প্রমাণাভব [sic.] ছিল না।"[১০৭]

ঔপনিবেশিক বাংলায় নীলকরদের অত্যাচারের বিষয় সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় লেখা হয়, "ইংরেজ নীলকরদিগের অত্যাচারের বিষয় আর কি লিখিব, যাঁহাদিগের অত্যাচারে উত্তর পূর্বাঞ্চলের কত কত ভদ্র সন্তান আপনারদিগকে পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং যাঁহাদিগের উপদ্রবে কত কত দীন দরিদ্র ব্যক্তি স্বাভাবিক হীনবল প্রযুক্ত অগত্যা অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ মনের দুঃখে কাল হরণ করিতেছে।"[১০৮] দেশের প্রশাসন ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারা নীলকরদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। পত্রিকাটিতে উল্লেখ আছে, "নীলকরেরাই রাজ্য [sic.] এবং হর্তাকর্তা যাহা মনে করেন তাহাই করিতে পারেন। তাঁহাদিগের অহিতাচার প্রতিকার হইবার কোন প্রকার সদুপায় হওয়া দূরে থাকুক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদিগের সমীপে তাহার বিচারও হয় না।"[১০৯] এমতাবস্থায় অনন্যোপায় হয়ে চাষিরা নীল চাষ করে। অবশ্য চাষিরা যে নির্বিকারে এসমস্ত অত্যাচার ও শোষণের শিকার হয়েছে তা নয়, বরং বিভিন্ন সময়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

নীলকররা শুধুমাত্র অত্যাচার করতো তা নয়, তারা কিছু উন্নয়নমূলক কাজও করেছিল।[১১০] তারা রাস্তা ও সাঁকো নির্মাণ করে যা পল্লি এলাকায় মানুষের উপকারে আসে। এছাড়া তারা বিভিন্ন স্থানে স্কুল ও হাসপাতাল নির্মাণ এবং বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ করে।[১১১] উদাহরণস্বরূপ ঝিকরগাছা কনসার্নের নীলকর হেনরি ম্যাকেঞ্জির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ১০০ ছাত্রের উপযোগী স্কুল স্থাপন করেছিলেন।[১১২] এছাড়া তিনি চাষিদের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করতেন। মনে রাখা দরকার, ম্যাকেঞ্জি ছিলেন বাংলার অন্যতম অত্যাচারী নীলকর। অন্য অনেক নীলকরও চাষিদের বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করতো। মাগুরার (যশোর) নীলকররা হাসপাতাল নির্মাণ করেছিল। সমকালীন একটি উৎসে উল্লেখ আছে,

> The charity hospital was erected about 1853-54, chiefly by subscription among the Indigo planters of the vicinity.[১১৩]

জমিদার হয়ে বসার পর অনেক নীলকর চাষির অভিভাবকের আসনে অধিষ্ঠিত হয়। চাষিরা বিভিন্ন গোলযোগ ও বিবাদ নিরসনের জন্য তাদের কাছে যেতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মিরগঞ্জ (ফরিদপুর) কুঠির নীলকর ডানলপের নিকট অনেক চাষি বিচারের জন্য আসতো।[১১৪] বলা বাহুল্য, নীল আন্দোলনের

---

[১০৬] 'Abstract Translation of a Petition from Certain Inhabitants of Zillas Nuddea and Jessore' PLGB *Judicial*, May 1860.

[১০৭] সতীশচন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮৪, পাদটিকা।

[১০৮] প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, *বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্য সাহিত্য* (কলিকাতা: সাহিত্যশ্রী, ১৯৭৬), পৃ. ২৬৬-২৬৭।

[১০৯] *ঐ*, পৃ. ২৬৭.

[১১০] সতীশচন্দ্র মিত্র, *পূর্বোক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮২.

[১১১] *Calcutta Review*, January- June 1847, Vol. VII, p. 215.

[১১২] RIC Q 870.

[১১৩] J. Westland, *A Report on the District of Jessore: Its Antiquities, Its History and Its Commerce* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 2nd ed, 1874), p. 211.

[১১৪] RIC Q 2545.

ইতিহাসে ডানলপ অন্যতম অত্যাচারী নীলকর। এ সময়ে ইউরোপীয়দের মাধ্যমে প্রশাসন পরিচালিত হতো। ফলে, প্রশাসনিক কাজে চাষিরা প্রথমেই তাদের পাশে অবস্থানকারী একজন ইউরোপীয় নীলকরের কাছে যেতো। অনেক নীলকর এক্ষেত্রে তাদের সহায়তা দেয় । খুলনার অত্যাচারী নীলকর রেনিও চাষিদের এক্ষেত্রে সহায়তা দিতেন।[১১৫] এছাড়া চাষিদের আরো একটি সুবিধা ছিল। নীল চাষ করায় তাদের অন্য কোনো মহাজনের নিকট যেতে হতো না। নীলকররাই চাষিদের ঋণ দিতো। ফলে তারা মহাজন ও জমিদারদের ঋণ-জাল থেকে রেহাই পেতো।[১১৬] নীল কমিশনে সাক্ষ্য প্রদান কালে একজন ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করেন,

> The benefit which I ascribe to Englishmen living in the district still ofcourse remains, but of late years the ryot has become richer and is less dependent on adventitious assistance.[১১৭]

এবার দেখা যাক এসব জনকল্যাণমূলক কাজের পেছনে নীলকরের অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল কি না। নীলের কারবার পরিচালনার জন্য এক কুঠির সঙ্গে অন্য কুঠির যোগাযোগ রক্ষা করা ছিল অত্যাবশ্যক। এজন্য নীলকরের রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজন ছিল। এছাড়া মাঠে উৎপাদিত নীলগাছ কুঠিতে আনার জন্যও রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে নীলকররা রাস্তা নির্মাণে এগিয়ে আসে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কুঠির সংযোগ স্থাপন করার জন্য এসব রাস্তা নির্মাণ করা হয়। বিভিন্ন গ্রামে কুঠির অবস্থানের কারণে এগুলো গ্রামের সংযোগ স্থাপনকারী রাস্তায় পরিণত হয়। তবে নীলকররা এর জন্য চাষিদের কাছ থেকে চাঁদা নেয়।[১১৮] এক কথায় নীলকররা চাষিদের সহযোগিতায় নীল চাষের সুবিধার্থে এসব রাস্তা নির্মাণ করে। অন্যদিকে মহানুভবতা বশত নীলকররা হাসপাতাল স্থাপন করেছিল, তাও বলা যাবে না। ঔপনিবেশিক বাংলায় নীলকরদেরকে জমিদার শ্রেণির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচনা করা চলে। সামাজিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারের অভিপ্রায়ে তারা এসব কাজে লিপ্ত হয়। হাসপাতাল নির্মাণে অর্থ দান এবং চাষিদের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ সমাজ ও সরকারের সামনে নীলকর শ্রেণির ভাবমূর্তি সমুন্নত করে। একই কারণে তারা চাষিদের শালিসি ব্যবস্থায় অভিভাবকের আসনে অধিষ্ঠিত হয়। নীল চাষ আরম্ভের পর থেকে বিভিন্ন সময় চাষিরা এর অত্যাচার ও শোষণমূলক ব্যবস্থাদি প্রতিহত করার প্রয়াস পায়। মনে রাখা দরকার, নীলকরদের সামনে এ অবস্থাটি অভিপ্রেত ছিল না। চাষিরা তাদের এই অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে যেন সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারে, সেই জন্য বিভিন্ন গঠনমূলক কাজ করে এবং বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করে তাদের সান্ত্বনা দেওয়া হয়। এছাড়া চাষিরা অসুস্থ হয়ে পড়লে নীল চাষ ব্যাহত হবার সম্ভাবনা ছিল। তাই নিজের স্বার্থ রক্ষার খাতিরেই নীলকর চাষিদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করে। চাষিদের ঋণ দিয়ে সহায়তা করার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্নতর। নীলকররা চাষিদের ঋণ দিয়ে মহাজনের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে। মহাজনের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করতে দেওয়া হলে চাষিরা নীলকরের দাদন শোধ দিয়ে নীল চাষ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করবে। এই ব্যবস্থাটিকে প্রতিহত করার জন্যই নীলকররা চাষিদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করে। নীল চাষিদের নীলকর ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়া নীলকরদের সুদের হার মহাজনদের প্রচলিত সুদের হারের চেয়ে বেশি ছিল। ফলে এ ব্যবস্থা চাষিদের আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে।

অবশ্য নীল চাষের ফলে কিছু সুবিধাও হয়েছিল। নীল কুঠিতে অনেক কর্মচারীর দরকার হতো। স্থানীয় মানুষ কুঠিতে চাকরি পেতো।[১১৯] ফলে কিছু মানুষের অর্থ উপার্জন ও জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা হয়। নীল চাষ চাষিদের জমিদারদের খাজনা দেবার চিন্তা থেকে মুক্ত করে। কারণ এলাকা চাষিদের খাজনা দিতে হতো না।[১২০] অবশ্য পরবর্তীতে প্রায় সব নীলকর খাজনা আদায় আরম্ভ করলে এই অবস্থাটি আর টিকে থাকেনি। এ সময়ে

---

[১১৫] RIC Q 2588.
[১১৬] RIC Q 1578.
[১১৭] RIC Q 267.
[১১৮] RIC Q 1394.
[১১৯] RIC Q 2591.
[১২০] RIC Q 2545.

কোনো কোনো নীলকর প্রচলিত হারের চেয়ে অধিক হারে খাজনা আদায় করতো।[১২১] ফলে চাষিরা বেশি দরিদ্র হয়ে পড়ে। পার্শ্ববর্তী বাকেরগঞ্জ জেলার তুলনায় যশোরের চাষিদের বাড়ি-ঘর অনেক খারাপ ছিল।[১২২] মনে রাখা দরকার, যশোরে ব্যাপকহারে নীল চাষ হয়েছিল। কিন্তু বাকেরগঞ্জে তেমন নীল চাষ হয়নি।

নীল চাষের ফলে সরকারের সুবিধা হয়েছিল। অতিরিক্ত লাভ হওয়ায় নীলকররা নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করতো। ফলে অনাদায়ী রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পায়। সরকার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ করে। এছাড়া নীল চাষে আবাদি জমির পরিমাণ বাড়ে।[১২৩] ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা গিয়েছিল। আবাদি জমির পরিমাণও হ্রাস পেয়েছিল আশঙ্কাজনকভাবে। এ সময়ে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদি হয়ে পড়েছিল।[১২৪] পরবর্তী দুই দশক পর্যন্ত এই অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। কাজেই নীলকরদের আগমনের সময়ে বাংলায় পরিত্যক্ত জমির অভাব ছিল না। সম্ভবত পতিত জমির প্রাচুর্য তাদের এদেশে নীল চাষে আকৃষ্ট করেছিল। এসমস্ত পতিত জমিতে নীল চাষ করা হলে আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।[১২৫] নীল কমিশনের নিকট সাক্ষ্য প্রদানকালে সুন্দরবনের কমিশনার জে.এইচ. রেলির মন্তব্য করেন, "Great quantities of waste land... have been brought into cultivation by Planters, ... much land has been rendered fit for cultivation."[১২৬] নীলকররা বিতাড়িত হবার পর এদেশের চাষিরা এ সমস্ত আবাদি জমিতে চাষাবাদের সুযোগ লাভ করে।

উপসংহার

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে দাস মালিকের মানসিকতা নিয়ে নীলকররা বাংলায় আসে। অন্যান্য পেশা থেকে আগত নীলকররাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এদেশে নীল চাষ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঔপনিবেশিক সরকার নীলকরদের সমর্থন ও সহযোগিতা দেয়। সরকার তাদের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে আইনও প্রবর্তন করে। প্রশাসন এবং বিচার বিভাগ নীলকরদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখায়। সরকার ও প্রশাসনের মদদ পেয়ে বর্বর মানসিকতা সম্পন্ন নীলকর গোষ্ঠী বাংলার চাষিদের সঙ্গে প্রভু-দাসের এক অভূতপূর্ব সম্পর্ক স্থাপন করে। তারা চাষিদের শোষণ, নির্যাতন এমনকি সামাজিক মর্যাদা হানি এবং আদর্শবোধকে আঘাত করে বসে। নিগৃহীত চাষিরা যে নির্বিকারে এসমস্ত অত্যাচার সহ্য করে, তা নয়। তারা ক্রমান্বয়ে সংগঠিত হয়ে এদেশ থেকে নীলকরদের উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর হয়। ফলে শুরু হয় নীল আন্দোলন। বাংলা থেকে নীলকররা বিতাড়িত হয়। সেই সঙ্গে শেষ হয় বাংলার অত্যাচার বিজড়িত নীল চাষের ইতিহাস।

---

[১২১] বর্ধিত হারে খাজনা শোধ করতে না পারলে চাষিকে জমি থেকে বিতাড়িত করা হতো। দেখুন, RIC Q 2722.

[১২২] RIC Q 2591.

[১২৩] A. Rao And B. G. Rao, *The Blue Devil: Indigo and Colonial* Bengal (Delhi: OUP, 1992), p. 17.

[১২৪] *Ibid.*; ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে ১ কোটি মানুষ মারা যায় এবং সমগ্র বাংলা বনভূমিতে পরিণত হয়। দেখুন, *বঙ্গদর্শন*, ৮ম বর্ষ, আশ্বিন ১৩১৫, N.K. Sinha, *The Economic History of Bengal*. Vol. II (Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyay, 1968), p. 65.

[১২৫] RIC Q 3024.

[১২৬] RIC Q 2587.

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ৯ম সংখ্যা ১৪০৮

উনিশ শতকের মুসলিম বাংলায় উপযোগবাদের প্রভাব: একটি দার্শনিক সমীক্ষা

এম শফিকুল আলম*

Abstract: Towards the end of the eighteenth century utilitarianism was flourished in Europe and America. This influenced the intellectuals of Bengal during 19th century through British colonial rule in India. Utilitarianism, although, first reflected in the writings of Hindu intellectuals subsequently had a bearing in the writings of Muslim intellectuals. In this article utilitarianism in the writings of Abdul Latif and Delwar Hussain, the two famous thinkers of the 19th century, has been analysed.

১. সূচনা

উনিশ শতকের বাংলায় উপযোগবাদের (Utilitarianism) প্রভাব পড়েছিল। বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই এ দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁদের সামাজিক চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে এ প্রভাব সহজেই পরিলক্ষিত হবে। যেসব বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদের উপর উপযোগবাদ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাঁরা হলেন রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রমুখ। এঁরা সবাই উপযোগবাদী নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ধর্মশাস্ত্রে অন্ধবিশ্বাস পরিহার করে যুগোপযোগী চিন্তা-ভাবনা ও সমাজ সংস্কারের কাজ করেছিলেন। ডিরোজিও এবং 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের সদস্যরাও এই মতবাদ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।[১] তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলিম সমাজেও এর ঢেউ এসে লেগেছিল।[২] মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় সমাজ সংস্কারক নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আহমেদ খান, দেলোয়ার হোসেন আহমেদ, আমির হোসেন[৩] প্রমুখ উপযোগবাদের দার্শনিক, সামাজিক ও নৈতিক তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজ সমাজের উন্নয়নে ব্রতী হয়েছিলেন। বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর

---

* ড. এম শফিকুল আলম, সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

১ দেখুন, Susobhan Sarkar, *Bengal Renaissance and Other Essays* (New Delhi: People's Publishing House, 2nd print, 1981), পৃ. ১৯-২০।

২ Sultan Jahan Salik ed., *Muslim Modernism in Bengal: Selected Writings of Delwar Hossain Ahmed Meerza 1840-1913* (Dhaka: Centre for Social Studies, University of Dhaka, 1980), পৃ. ii।

৩ জন্মগ্রহণ করেছেন বিহারে, জীবন কাটিয়েছেন কলকাতায়। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেকটর হিসাবে ১৮৬৪-১৯০১ সাল পর্যন্ত সরকারি চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হচ্ছে *A Pamphlet on Mohammedan Education in Bengal.* দেখুন, খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য সমাজ: সমাজ চিন্তা ও সাহিত্যকর্ম* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ২৯-৩০।

গোড়াতে ঢাকায় সংগঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এবং এর সদস্যবৃন্দের সাহিত্যকর্মে উপযোগবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। উপযোগবাদের প্রভাবেই মুসলিম সাহিত্য সমাজ কর্তৃক আহূত বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন বেগবান হয়েছিল এবং এ আন্দোলন বাংলাদেশে স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তাধারা বিকাশের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এ প্রবন্ধে উল্লিখিত মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে কেবলমাত্র আবদুল লতিফ ও দেলোয়ার হোসেন আহমেদের শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারের মূল্যায়নের চেষ্টা করা হলো। প্রসঙ্গত মুসলিম বাংলায় উপযোগবাদের প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে উপযোগবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হবে।

উনিশ শতকের মুসলিম বাংলায় উপযোগবাদের প্রভাব পড়েছিল কিনা এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।[৪] তাছাড়া মুসলিম বাংলার বাস্তব অবস্থান আছে কিনা এ বিষয়েও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে।[৫] এ দুটো প্রশ্নই এ নিবন্ধে আলোচনা করা হবে। আলোচনার সুবিধার্থে পুরো বিষয়টিকে ৭টি পর্বেবিভক্ত করা হয়েছে: ১. সূচনা, ২. উপযোগবাদ ও বাংলায় এর প্রভাব, ৩. উনিশ শতকের মুসলিম বাংলার চিত্র, ৪. নবাব আবদুল লতিফ ও তাঁর উপযোগবাদী সমাজ সংস্কার, ৫. দোলোয়ার হোসেন আহমদ ও তাঁর উপযোগবাদী চিন্তাধারা, ৬. আবদুল লতিফ ও দেলোয়ার হোসেনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা, ৭. উপসংহার।

২. উপযোগবাদ ও বাংলায় উপযোগবাদের প্রভাব

উপযোগবাদের উৎপত্তি ইংল্যান্ডে। আঠারো শতাব্দীর শেষ দিকে এ মতবাদ ফ্রান্স ও আমেরিকায় প্রসার লাভ করেছিল।[৬] ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মধ্য দিয়ে এ মতবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকুরির সূত্রে কয়েকজন ব্রিটিশ দার্শনিকের ভারতে আগমন ঘটে। উপযোগবাদের যাত্রারাম্ভ হয় ব্রিটিশ দার্শনিক জেরেমি বেন্থামকে দিয়ে। পরবর্তীকালে জেমস মিল এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের হাতে এই মতবাদ পূর্ণতা লাভ করে। এ তিন দার্শনিক ব্রিটিশ-ভারতে চাকুরির মধ্য দিয়ে বাংলায় উপযোগবাদের প্রসার ঘটিয়েছেন। তাঁরা অফিসিয়াল কাজের মাধ্যমে তাঁদের উপরিস্থ ও অধীনস্থদের প্রভাবিত করেছেন। এ তিনজন ছাড়াও উইলিয়াম ব্যান্টেনিক, লর্ড ম্যাকেলে, এডওয়ার্ড স্ট্রাচি'র নাম উল্লেখযোগ্য।[৭] এঁদের সম্মেলিত প্রচেষ্টায় উপযোগবাদী দর্শন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।[৮]

নৈতিক ও সামাজিক মতবাদ হিসেবে উপযোগবাদ সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখ তথা সর্বাধিক কল্যাণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সর্বাধিক মঙ্গল বা কল্যাণের ধারণার সূত্রটি সর্বপ্রথম ১৬৭২ সালে রিচার্ড কাম্বারল্যান্ডের *ডি*

---

[৪] 'মুসলিম বেঙ্গল' বলতে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত বর্ধমান, ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী বিভাগে যেখানে মুসলিম সংখ্যাধিক্য কেবল সেসব অঞ্চলকে বোঝায়। দেখুন, Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal 1884-1912* (Dhaka: Oxford University Press, 1974), পৃ. মুখবন্ধ।

[৫] 'মুসলিম বেঙ্গল' বলতে ইতিহাসে কোনো বাস্তব বেঙ্গলের অস্তিত্ব নেই বটে, কিন্তু তার একটি মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার্য।

[৬] Robert N. Beck, *Handbook in Social Philosophy* (New York: Macmillan Publishing Co. Inc., 979), পৃ. ৬৭।

[৭] John Stuart Mill, *Autobiography* ed. by H. J. Laski (London: Oxford University Press, 1924), পৃ. যত্রতত্র ।

[৮] Shafiqul Alam, "Bentham's Social and Political Thoughts: A Brief Survey", *Indian Philosophical Quarterly*, University of Poona, India, 22/1 (supplementary), January 1995, পৃ. ৫- ১৫। আরো দেখুন, David Lyons, *In the Interest of the Governed: A study in Bentham's Philosophy of Utility and Law* (Oxford: Clarendon Press, 1973), পৃ. ৫- ৬।

ল্যাজিবাস ন্যাচার (*De Legibus Naturae*) নামক গ্রন্থে উল্লেখিত হয়।[৯] লেখক তাঁর এ পুস্তকে উল্লেখ করেন যে, সর্বাধিক মঙ্গলের বা কল্যাণের সর্বময় কর্তা হচ্ছেন মহান স্রষ্টা নিজেই। উপযোগবাদ নীতির উপর লেখা কোনো পাশ্চাত্যের লেখকের এটাই প্রথম বই। জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) কাম্বারল্যান্ডের এ বই দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়ে থাকে। তাঁকেই উপযোগবাদের প্রবক্তা হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি ১৭৭৯ সালে লিখিত তাঁর *অ্যান ইন্ট্রডাকশন টু দি প্রিন্সিপালস অব মর‍্যালস অ্যান্ড লেজিসলেশন* গ্রন্থে এ মতবাদকে সামাজিক সংস্কারের হাতিয়ার হিসাবে উল্লেখ করেন।[১০] তিনিই ইউটিলিটারিয়ানিজম বা উপযোগবাদ শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁর পূর্বে এ শব্দটি আর কেউ ব্যবহার করেননি। তাঁর চিন্তাধারা ব্রিটেনবাসীকে জাগিয়ে তুলেছিল।[১১] তিনি ভারতবর্ষেও সমাজ সংস্কারের কাজ করে গিয়েছেন। বেন্থামের দর্শন উপযোগিতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। উপযোগিতার নীতি বলতে তিনি বুঝিয়েছেন যে, 'এটি এরূপ একটি নীতি যা যে কোনোরূপ কাজের অনুমোদন অথবা অননুমোদন করে থাকে'।[১২]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে বেন্থামের অবস্থানের দিকে লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, তাঁর পূর্বে বিচার বিভাগকে এভাবে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা অন্য কেউ করেননি।[১৩] বেন্থামের পরেই জেমস মিলের নাম উল্লেখযোগ্য। জেমস মিল তাঁর *হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া* পুস্তকের[১৪] মাধ্যমে ভারতে তাঁর এবং তাঁর পুত্র জন স্টুয়ার্ট মিলের অবস্থান সুদৃঢ় করেছিলেন। স্টুয়ার্ট মিল প্রশাসনিক কাজকর্মের অবসরেই তাঁর বিখ্যাত *ইউটিলিটারিয়্যানিজম* পুস্তক রচনা করেছিলেন।[১৫] তিনিও বাংলায় উপযোগবাদ প্রসারে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর সঙ্গে উইলিয়াম ব্যান্টেনিক, লর্ড ম্যাকেলে, এডওয়ার্ড স্ট্রাচিও সহযোগী হিসেবে কাজ করে গিয়েছেন।[১৬] ম্যাকেলে সর্বোচ্চ আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে ১৯৩৪ সালে ভারতবর্ষে আসেন। সাধারণ সভার সভাপতিত্বের দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তেছিল।[১৭]

---

[৯] জার্মান ভাষায় লিখিত উক্ত পুস্তিকাটির নাম ছিল *De Legibus Nature* (*The Law of Nature*), দেখুন, Earnest Albee, *A History Of English Utilitarianism* (New York: Collier Books, 1962), পৃ. ৩০।

[১০] Shafiqul Alam, "British Utilitarianism: A Brief Survey", *Darshan International*, vol.xxxiii 1993, Moradabad, India, পৃ. ৩৮।

[১১] Shafiqul Alam,"Benthamite Ethical Doctrine: A Utilitarian Movement", *Philosophy and Progress*, Dev Centre for Philosophical Studies, Dhaka University, Vols. xvi-xvii, June-December, 1994, পৃ. ১।

[১২] D. Klemke, A. David Kline and Robert Hollinger et al., ed., *Philosophy: The Basic Issues* (New York: St. Martin's Press, 2nd ed., 1986), পৃ. ৩৯৪।

[১৩] Abdul Hai Dhali, "British Utilitarianism and its Diffusion in the Nineteenth Century Bengal", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, vol. 35, no. 2, Dhaka, December 1990, পৃ. ২৭।

[১৪] Eric Stokes, *The English Utilitarians and India*, Oxford: The Clarendon Press, 1963, পৃ. যত্রতত্র।

[১৫] John Stuart Mill, *Utilitarianism, Liberty and representative Government* (London: J.M. Dent and Sons Ltd., 1929), পৃ. vii।

[১৬] K.K. Aziz, *The British in India* (Islamabad: National Commission on Historical and Cultural Research, 1976), পৃ. ২৩১-৩২।

[১৭] Priya Ranjan Sen, "Indian Association for the Cultivation of Science", *Studies in the Bengal Renaissance*, edited by Atulchandra Gupta (Calcutta: National Council of Education, Bengal, Jadavpur, 1977), পৃ. ৪০৩।

ম্যাকেলে পশ্চাৎপদ ভারতীয়দের জন্য ইংরেজি শিক্ষাকে জরুরি মনে করতেন।[১৮] তিনি ১৯৩৫ সালে তাঁর বিখ্যাত 'এডুকেশন মিনিটে' ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[১৯]

উপযোগবাদে প্রভাবিত হয়ে বিশেষত বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে বহুবিবাহ প্রথা, তালাক প্রথা, দাসপ্রথা, রক্ষিতা প্রথা ও বাল্যবিবাহ প্রথা ইত্যাদির বিলোপ এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল।

৩. উনিশ শতকের মুসলিম বাংলার চিত্র

উনিশ শতকের মুসলিম বাংলায় উপযোগবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। পাশ্চাত্যের প্রভাবে এখানে তিনটি ধারার সৃষ্টি হয়। প্রথমত, মৌলবাদী ধারা। এ ধারা প্রাচীন ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিবিধান সমূহকে আঁকড়ে ধরেছিল। এ পন্থার অনুসারীরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকে যথাযথ বলে গ্রহণ করেছিল। ইংরেজি শিক্ষাকে তাঁরা সময়োপযোগী মনে করেছে। এ দলের নেতা ছিলেন নবাব আবদুল লতিফ।[২০] **দ্বিতীয়ত**, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার আলোকে সমাজকে বিন্যস্ত করার পক্ষের দল। এ দলের নেতা ছিলেন সৈয়দ আহমেদ খান। **তৃতীয়ত**, উগ্র আধুনিকতাবাদী দল। এ দল সমাজের প্রচলিত রীতি নীতির সম্পূর্ণ বিপক্ষে। এঁরা সমাজে র‍্যাডিক্যালস বা ইয়ং বেঙ্গল হিসেবে পরিচিত। ইয়ং বেঙ্গলদের প্রভাব মুসলিম চিন্তাধারায়ও পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে দেলোয়ার হোসেন আহমেদের লেখনীতে এটা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।[২১]

উনিশ শতকে মুসলিম সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় পিছিয়ে ছিল। শিলা সেনের একটা উদ্ধৃতি থেকেই এটা মূর্ত হয়ে উঠবে। তিনি লিখেছেন: "উনিশ শতকে বাংলার মুসলমানেরা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক বেশি পশ্চাৎপদ ছিল। এ পিছিয়ে-পড়া তাঁদের মধ্যে বোধের সৃষ্টি করেছিল যে, তাঁরা বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক অর্থনৈতিকভাবে প্রতারিত, সাংস্কৃতিকভাবে পরাভূত এবং রাজনৈতিকভাবে অবদলিত"।[২২]

মুসলিম সমাজের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার প্রতিচ্ছবি আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে যদি আমরা দেলোয়ার হোসেনের নিজস্ব লেখার প্রতি দৃষ্টি দেই। তিনি পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের সঙ্গে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের তুলনা করে লিখেছেন: "খ্রিস্টানদের দেশসমূহে প্রতি বছর নূতন জ্ঞানের উৎকর্ষ হচ্ছে, অথচ ইসলামের অনুসারী দেশসমূহে হারুন-অর-রশীদ অথবা মামুনের সময়ের চেয়েও জ্ঞানার্জনে অধিক অনগ্রসরমাণ"।[২৩]

মুসলিম বাংলার মুসলমানদের সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে দেলোয়ার হোসেন লিখেছেন: "আমরা আমাদের সামাজিক মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছি যার ফলে এখন আমরা সংস্কারমুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছিনে; আমরা

---

[১৮] Abdul Hai Dhali, "British Utilitarianism and its influence in the Nineteenth Century Bengal", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, vol. 35, no. 2, Dhaka, December 1990, প. ২৭।

[১৯] নরহরি কবিরাজ, *উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ তর্ক বিতর্ক* (কলিকাতা: কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৩), পৃ. ১৩৬।

[২০] *Muslim Modernism in Bengal*, পৃ. i-viii।

[২১] তদেব, পৃ. ii।

[২২] Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal 1937-1947* (New Delhi: Impex India, 1976), পৃ. ১।

[২৩] তাঁরা দুজনে যথাক্রমে ৭৮৬-৮০৯ এবং ৮১৩-৮৩৩ পর্যন্ত বাগদাদ (ইরাক) শাসন করেন। বাগদাদের ইতিহাসে এই দুই শাসকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *Muslim Modernism in Bengal*, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩১। আরো দেখুন, শহিদুল ইসলাম, "আধুনিক বিশ্ব ও ইসলাম" *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা, ১ এপ্রিল ১৯৮৪ পৃ, ৬।

আমাদের সামাজিক অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছি যার ফলে এখন আমরা মর্যাদা রক্ষা করতে পারছিনে। এখন একমাত্র উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারলেই আমরা সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারব"।[২৪]

৪. নবাব আবদুল লতিফ ও তাঁর উপযোগবাদী সমাজ সংস্কার

উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলিম সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে উপযোগবাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এঁদের মধ্যে নবাব আবদুল লতিফ ও দেলোয়ার হোসেন আহমেদ উল্লেখযোগ্য। এ নিবন্ধে আমরা মূলত এ দুজনকে নিয়েই আলোচনা করব। উপযোগবাদের শিক্ষা দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আবদুল লতিফ মুসলমানদের মধ্যে জাগরণ ঘটানোর চেষ্টা করেন।[২৫] এখন আবদুল লতিফ সম্পর্কে যে সকল প্রশ্ন এখানে উত্থাপিত হতে পারে সেগুলো হলো: (ক) আবদুল লতিফ কি উপযোগবাদী? (খ) আবদুল লতিফ এবং প্রকৃত উপযোগবাদীদের মধ্যে পার্থক্য কি? (গ) আবদুল লতিফের কার্যাবলিকে কিভাবে গণ্য করা হবে? (ঘ) তিনি কি মুসলিম সমাজের জন্য দীর্ঘস্থায়ী কোনো অবদান রেখে গেছেন? (ঙ) তাঁর জীবনের লক্ষ্য কি ছিল? (চ) উনিশ শতকের মুসলিম বাংলা কি তাঁর সমাজ সংস্কারে উপকৃত বা আলোকিত হয়েছিল? এবং সর্বোপরি (ছ) নবাব আবদুল লতিফ কি ব্রিটিশ রাজ শাসনের প্রতি অনুগত ছিলেন? এ সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা আবদুল লতিফের কাজকর্মকে উপযোগবাদী ধ্যান-ধারণার নিরিখে বিচার বিশ্লেষণ করব।

এ পর্যায়ে আপাত দৃষ্টিতে বলা যেতে পারে যে, আবদুল লতিফকে কিছুতেই একজন যথার্থ উপযোগবাদী বলা যায় না। তবে সমাজ সংস্কারক হিসেবে তাকে একজন উপযোগবাদী বলা চলে। কেননা উপযোগবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের এবং তার সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ করা। উপযোগবাদ হলো এমন এক নৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক মতবাদ যা সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক কল্যাণে নিয়োজিত হবার কথা বলে। আবদুল লতিফ নিঃসন্দেহে একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন এবং তিনি মুসলিম সমাজের জন্য সর্বাধিক কল্যাণের চেষ্টাও করেছেন। তাঁর সামাজিক ও শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন উপযোগবাদী নৈতিক দর্শনের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। তাই তাঁকে প্রকৃতপক্ষে একজন উপযোগবাদী বলা না গেলেও তিনি যে উপযোগবাদী ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। অন্তত এ দৃষ্টিকোণ থেকে আবদুল লতিফকে একজন উপযোগবাদী বলা যায়।[২৬]

আবদুল লতিফ এবং উপযোগবাদীদের মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে: **প্রথমত**, উপযোগবাদীরা মানুষের সর্বাধিক কল্যাণের কথা বলেছেন, অপরপক্ষে আবদুল লতিফ তাঁর সমাজ ও সমাজে বসবাসরত মানুষের সর্বাধিক কল্যাণের জন্য কাজ করে গিয়েছেন। **দ্বিতীয়ত**, উপযোগবাদী দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম, জেমস মিল এবং জন স্টুয়ার্ট মিল উনিশ শতকের মুসলিম সমাজের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারেননি। কিন্তু আবদুল লতিফ মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন–যা পরবর্তীকালে সরকারের সাথে একটা সহযোগিতার দর্শন গড়ে তুলেছিল।

একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে যে, আবদুল লতিফ কি ব্রিটিশ রাজ শাসনের প্রতি অনুগত ছিলেন? যদি বলা হয় যে, তিনি তা ছিলেন না, তাহলে তা বিশ্বাস করার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। এটা সত্য যে, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত তিনি অনেক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেছেন, খেতাব-উপাধিও পেয়েছেন। পাশাপাশি এটাও সত্য যে, তিনি নীরবে এবং কৌশলে সরকারের অনেক কাজের বিরোধিতা করেছেন। বিশেষ করে নীলকর কর্তৃক নীলচাষীদের উপর যে অত্যাচার হয়েছিল, তিনি তার বিরোধিতা করেছিলেন। ১৮৬০ সালে গঠিত 'ইন্ডিগো কমিশন' গঠনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল।[২৭] তাছাড়া ১৮৮২ সালে ন্যাশনাল মোহমেডান

---

[২৪] তদেব, পৃ, ১।

[২৫] F. H. Bradley-Birt, *Eminent Bengalis in the Nineteenth Century* (New Delhi: Inter-India Publications, rept., 1985), পৃ, ১১১।

[২৬] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Shafiqul Alam,"British Utilitarianism and its influence on Nineteenth Century Muslim Bengal: A study on Nawab Abdul Latif and Delwar Hossain Ahmed", an unpublished Ph. D. thesis, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1994, পৃ. যত্রতত্র ।

[২৭] সৈয়দ মকসুদ আলী, *রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ৬৫। আরো দেখুন, *Eminent Bengalis in the Nineteenth Century*, তদেব, পৃ. ১১৯।

এসোসিয়েশন কর্তৃক আনীত স্মারকনামার সঙ্গে তিনি একাত্মতা প্রকাশ করেছিলেন। এসোসিয়েশনের অনেকগুলি দাবি দাওয়া পরবর্তীকালে সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। এর ফলে মুসলমানদের দৈন্যদশা লাঘব হয়েছিল।[২৮]

তাছাড়া ১৮৬০ দশকের প্রথমার্ধে তিনি মুসলমানদেরকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা চালান। বিশেষ করে শিক্ষা আন্দোলনকে কার্যকর করে তোলার লক্ষ্যে তিনি কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' স্থাপন করেন। সমাজ সংস্কার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ সৃষ্টিতে এই সোসাইটি অত্যন্ত মূল্যবান অবদান রাখে। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আবদুল লতিফ বলেন: "কুসংস্কার ও বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত করে মুসলিম সমাজকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত করা এবং ইংরেজ ও হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাদের মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে আমি মোহমেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করি"।[২৯]

আবদুল লতিফ যে তাঁর অবদানের জন্য মুসলিম সমাজে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সমাজের অগ্রগতি, আধুনিক শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর সকল কর্মের পেছনে একটি উদ্দেশ্য মূর্ত হয়ে ওঠে, তা হলো সমাজে মুসলিম সম্প্রদায়ের অগ্রগতি। প্রকৃতপক্ষে, আবদুল লতিফ চেয়েছিলেন ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে মুসলমান সমাজের অগ্রগতি।[৩০] তিনি তাঁর *Autobiography*-তে গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি একাধারে ৩২ বছর মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।[৩১] এটা সঠিক যে মুসলমান সমাজ তাঁর সংস্কার কর্ম দ্বারা উপকৃত হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে কেউ যদি আবদুল লতিফকে কেবল মুসলিম সমাজের সংস্কারক হিসেবে চিহ্নিত করেন, তবে তা বোধ করি যথার্থ হবে না। কেননা মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নানান সম্প্রদায়ের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ অন্তত তা প্রমাণ করে। আবদুল লতিফের জীবদ্দশায় কলকাতা পৌরসভায় এমন কোনো অনুষ্ঠান হতো না যেখানে তাঁর উপস্থিতি থাকত না।[৩২] তাঁর সঙ্গে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের একটা সুসম্পর্ক ছিল।[৩৩] কাজেই তাঁকে নিদিষ্ট কোনো এক সম্প্রদায়ের লোক হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না।[৩৪] তাছাড়া তিনি দল-মত-বর্ণ নির্বিশেষে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে সমাদৃত ছিলেন।

৫. দেলোয়ার হোসেন আহমদ ও তাঁর উপযোগবাদী চিন্তাধারা

দেলোয়ার হোসেন আহমদ মির্জা[৩৫] ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম বাঙালি মুসলিম গ্র্যাজুয়েট। ডিগ্রি লাভের পর তিনি সরকারি চাকুরিতে যোগ দেন। পেশাগত দায়িত্বের বাইরে তিনি তাঁর সমাজের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে

---

[২৮] Rafiuddin Ahmed, *The Bengali Muslims 1871-1906: A Quest for Identity* (Delhi: Oxford University Press, 1988), পৃ: ১৫৫। আরো দেখুন *The Moslem Chronicle*, April 11,1896, তদেব, পৃ. ১১৬৫।

[২৯] নবাব আবদুল লতিফ খান সি আই ই, *মুসলিম বাংলা আমার যুগে* (আবু জাফর শামসুদ্দীন অনুদিত) (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮), পৃ: ৭০।

[৩০] Amelendu De, *Roots of Separatism in the Nineteenth Century Bengal* (Calcutta: Ratna Prakasha,1974),পৃ. ১১।

[৩১] Enamul Hoque ed., *Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings and Related Documents* (Dhaka: Samudra Prakashani, 1968), পৃ. যত্রতত্র। আরো দেখুন *The Bengali Muslims*, পৃ. ১৪।

[৩২] *Eminent Bengalis in the Nineteenth Century Bengal*, পৃ. ১২৩।

[৩৩] Muin-ud-Din Ahmad Khan, *Muslim Struggle for Freedom inBengal* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2nd ed., 1982), পৃ. ৬৭।

[৩৪] এনামুল হক, "স্যার সৈয়দ আহমেদ খান এবং আবদুল লতিফ: একটি পর্যালোচনা", *ইতিহাস সমিতির কার্যবিবরণী*, চাখার, বরিশাল, ২০-২২ মাঘ, ১৩৭৪,পৃ. ৬২।

[৩৫] তিনি হুগলী জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৮৪০ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি আরশা গরগনার দাদপুর থানার বাবনাম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দেলোয়ার হোসেন আহমদ ১৯৬১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর পারিবারিক পদবি 'মির্জা' থেকে বোঝা যায় যে তিনি ও তাঁর পূর্ব পুরুষগণ মোগল বংশীয় ছিলেন। তাঁর পিতার নাম গোলাম কাদির। তিনি বি এ পাশ করার পর একই বছর ২৭ শে ফেব্রুয়ারিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন। তিনি ১৮৯৪ সন পর্যন্ত এই চাকুরিতে বহাল ছিলেন। সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নেওয়ার পরে তিনি 'ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন' পদে এক্সটেনশন পেয়েছিলেন। এই পদে তিনি ১৮৯৮

চিন্তাভাবনা করেছেন। তৎকালীন মুসলিম সমাজে উপযোগবাদী চিন্তাধারার প্রায়োগিক সংস্কার সাধনকল্পে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।[৩৬] যেসব বিষয় দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অপরিহার্য সেসব বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।[৩৭] চিন্তাধারার ক্ষেত্রে দেলোয়ার হোসেন আহমদ ও আবদুল লতিফ নিঃসন্দেহে প্রগতিবাদী ছিলেন।[৩৮] কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যক্তি ছিলেন সর্বাধুনিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী। উভয়েই যদিও আলাদাভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের কল্যাণে কাজ করেছেন, সামগ্রিকভাবে তাঁদের লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন। মুসলমান সমাজের কল্যাণ, উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জনই ছিল তাঁদের স্বপ্ন। উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতার মূলে কি কি কারণ দায়ী ছিল, তা চিহ্নিত করে তার আশু সুরাহার পথ নির্দেশনাই ছিল দেলোয়ার হোসেন আহমদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে বিদ্যমান সমস্যাবলির প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন ।[৩৯] তিনি 'মুতাজিলা', 'ইজমাহু আহমদ', 'সৈয়দ' বিভিন্ন ছদ্মনামে লেখালেখি করেন।[৪০] কলকাতা থেকে প্রকাশিত *'দি মুসলিম ক্রনিকল', 'দি মুসলমান', 'মোহমেডান অবজার্ভার'* ইত্যাদি সাপ্তাহিক সাময়িকীতে তাঁর লেখালেখির প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪১]

দেলোয়ার হোসেনের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে অমর দত্ত লিখেছেন: 'য়ুরোপের যুক্তিবাদ ও উদারনীতিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেলোয়ার হোসেন বিশ্বাস করতেন যে অতীত ইতিহাসের ভার, আইন-অনুশাসন এবং পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে মুসলমান সমাজের অবনতির কারণসমূহ নিহিত রয়েছে'।[৪২] দেলোয়ার হোসেনকে অনন্য রেনেসাঁ ব্যক্তিত্ব এবং আধুনিকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক বলে অভিহিত করে সালাহউদ্দীন আহমদ মন্তব্য করেছেন:

পর্যন্ত কাজ করেন। তাঁর এই বাড়তি পদমর্যাদা তাঁর যোগ্যতার স্বাক্ষর বহন করে। ১৮৯৪ সালে দেলোয়ার হোসেন 'খান বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি 'ইজমাও আহমদ', 'মুতাজিলা' এবং 'সৈয়দ' ইত্যাদি ছদ্মনামে লেখালেখি করতেন। মুসলমানদের সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। কলকাতা থেকে ১৮৮৯ সনে দুই খণ্ডে প্রকাশিত *এসেজ অন মোহমেডান সোসাইল রিফরমস* তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেলোয়ার হোসেন বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডেও জড়িত ছিলেন। ১৯১১ সালে তিনি সেন্ট্রাল মোহমেডান এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। দেখুন, Salik, *Muslim Modernism in Bengal*, প্রাগুক্ত, পৃ. iii।

[৩৬] শফিকুল আলম, "দেলোয়ার হোসেনের দার্শনিক চিন্তাভাবনা: প্রসঙ্গ উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ", *ইতিহাস অনুসন্ধান* (কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ১৪শ সংখ্যা, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০), পৃ. ৫৫৯।

[৩৭] দেলোয়ার হোসেন আহমদ উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজের একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ও মুখপাত্র। তিনি অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশের প্রথম ডিগ্রিধারী বাঙালি মুসলমান। তাঁর শৈশব ও কিশোর বয়সেই ভারতে সিপাহি বিদ্রোহসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল। এইসব আন্দোলনের দায়ভার বহুলাংশে মুসলমানদের উপর বর্তেছিল। সমাজে মুসলমানেরা ছিল নিতান্ত অসহায়ের মতো। মুসলমানদের এ রকম অবস্থা হয়তো দেলোয়ার হোসেন আহমদকে বিচলিত করেছিল। তিনি মুসলমান সমাজের সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় অন্বেষণ করেছিলেন। মুসলমান সমাজের ধর্মীয় বাধাগুলোকে তিনি চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে সমাজকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে তিনি আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছেন। মুসলমান সমাজ তাঁর আবেদনে সাড়া না দিলেও তাঁর দার্শনিক চিন্তাভাবনার মূল্য একেবারে শেষ হয়ে যায়নি।

[৩৮] হুমায়ুন আবদুল হাই, *মুসলিম সংস্কারক ও সাধক* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬), পৃ. ১৬৫।

[৩৯] Delwar Hossain Ahmed, *Essays on Mohammedan Social Reforms* in 2 vols. (Calcutta: Thacker, Spink & Co., 1889), পৃ. যত্রতত্র।

[৪০] Mohar Ali ed., *Abdul Latif Khan Bahadur: Autobiography and Other Writings* (Chittagong: Mehrub Publications, 1968), পৃ. ii-vii।

[৪১] ইসলাম, "আধুনিক বিশ্ব ও ইসলাম", পৃ. ৬।

[৪২] অমর দত্ত, *উনিশ শতকের মুসলিম মানস ও বঙ্গভঙ্গ* (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৫), পৃ. ১৮।

> বস্তুত আধুনিক যুগের মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে দেলোয়ার হোসেনই সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইসলামের এমন কতকগুলি আইন-অনুশাসন, যেগুলি মূল ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নয়, যুগের প্রয়োজনে সেগুলিকে পরিবর্তন করার, এমনকি বিসর্জন দেওয়ার উপর জোর দিয়েছিলেন। ... যেসব বিধান সমাজের অগ্রগতির অন্তরায় বলে মনে হয় সেগুলি হয় বদলানো অন্যথায় তুলে দেওয়া। ...ধর্ম প্রসঙ্গে তাঁর কতিপয় দৃঢ় ধারণা ছিল। ...অবনত মুসলমানদের উন্নতির জন্যই তাদের দৈনন্দিন জীবনের জাগতিক আইনকে ধর্মের আওতামুক্ত করা দরকার -- পরিবর্তনশীল সমাজের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় বস্তুগত চাহিদাকে কোন চিরন্তন ধর্মীয় বিধান দ্বারা মেটানো সম্ভব নয়; মুসলমানদের অধঃপতনের মূল কারণগুলির মধ্যে রয়েছে তাদের ধর্মাচারের অন্ধ গোঁড়ামী এবং সহনশীলতার অভাব; রাষ্ট্রীয় জীবন ও আইন থেকে ধর্মের ক্ষেত্রকে পৃথক করা দরকার, ইত্যাদি...।[৪৩]

দেলোয়ার হোসেন চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ উপযোগবাদী দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল ও অন্যান্যদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি নিজেই লিখেছেন যে জন স্টুয়ার্ট মিলের লিবার্টি ও ইকোনমিক্যাল সাইন্স-এর উপর লেখা অভিসন্দর্ভ, ব্যাকালের *আউটলাইন অব দি হিস্ট্রি অব সিভিলাইজেশন* এবং হার্বার্ট স্পেন্সারের রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বের উপর লেখা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এইসব বই অধ্যয়ন করেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কেন কোনো জাতির বা সম্রাটের পতন ঘটে। তিনি এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে মুসলমানদের অধঃপতনের মূলে রয়েছে সামাজিক অবক্ষয়। আর এ অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে অন্ধ ধর্মীয় ও সামাজিক বিধিবিধান। তিনি প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়মনীতির পরিবর্তন চেয়েছিলেন।[৪৪] তিনি মুসলিম সমাজে প্রচলিত উত্তরাধিকার আইন, বিবাহ এবং বিচ্ছেদ প্রথা, নারীর পর্দা ও বোরকা প্রথা, দাসপ্রথা ও রক্ষিতা প্রথা, মিতব্যয়িতা, অবাস্তব ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ম এবং কোরআনিক নিয়ম কানুনের পরিবর্তনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।[৪৫]

দেলোয়ার হোসেন মনে করতেন যে, মুসলমান সমাজে প্রচলিত সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ ইসলাম ধর্মের অনুভূতি ও বিশ্বাসের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। অথচ মুসলমানগণ সেইসব সামাজিক প্রথাসমূহ মেনে চলছে বিধায় তাদের অবস্থা এত শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেলোয়ার হোসেন বিশ্বাস করতেন যে, বিশ্বের কোনো কিছুই প্রাকৃতির নিয়মের উর্ধ্বে নয়। কাজেই কোনো কিছুই বিবর্তনেরও উর্ধ্বে নয়। জগতের সবকিছুই পরিবর্তনশীল। অতএব, মুসলমানদের অবস্থারও এক সময়ে পরিবর্তন হবে।[৪৬] তবে এ পরিবর্তন আনয়ন ও অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে মুসলমানদেরকে একাগ্রচিত্তে কাজ করে যেতে হবে।[৪৭] তিনি মনে করতেন যে, মুসলমানদের বিশেষ করে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন অবশ্যই ঘটাতে হবে। দেলোয়ার হোসেনের মতে, ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক সম্প্রদায় রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ কিংবা শিক্ষা অর্জন কোনোটাতেই মনোযোগী হননি যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে না পেরেছিল। সেখানকার মধ্যবিত্ত শ্রেণী সাধারণ সভায় কিংবা স্কুল কলেজে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রবেশ করেননি যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সম্পদ বৃদ্ধি না করতে পেরেছিল। এমনকি নিম্নশ্রেণীভুক্ত ব্রিটেনবাসী ভোটাধিকার অথবা নির্বাচনের অধিকার লাভ করেননি যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা নিজেদের সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে না পেরেছিল। কাজেই বাংলার মুসলমানদেরকে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধিশালী হতে হবে যদি তাঁরা জাগতিক উন্নতি লাভ করতে চায়। মুসলমানদের উন্নতির লক্ষ্যে এটাই ছিল দেলোয়ার হোসেন আহমদের দৃঢ় প্রত্যয়। এ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তনে অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিলেন এটা স্বাভাবিকভাবেই ধারণা করা যায়।

---

[৪৩] তদেব, পৃ. ১৮-১৯।

[৪৪] *Muslim Modernism in Bengal,* পৃ. ১।

[৪৫] *Essays on Mohammedan Social Reforms,* প্রাগুক্ত, পৃ: যত্রতত্র। আরো দেখুন, *Muslim Modernism in Bengal,* পৃ. x।

[৪৬] ইসলাম, "আধুনিক বিশ্ব ও ইসলাম", পৃ. ৬।

দেলোয়ার হোসেন ইংরেজি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরো কলেজ খোলার পক্ষপাতী ছিলেন। চিন্তাধারার ক্ষেত্রে তিনি হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর (১৮০৯-১৮৩১)[৪৭] ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে অনেকে মনে করে থাকেন। দেলোয়ার হোসেনের লেখালেখির মধ্যে এই দিকটি প্রচ্ছন্নভাবে লক্ষণীয়।[৪৮] একই সময়ে ডিরোজিওর প্রভাব ইয়ং বেঙ্গলদের উপরও পড়েছিল। এরই প্রভাবে ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্ট বা বেঙ্গল রেনেসাঁ সংঘটিত হয়েছিল বলে কেউ কেউ মনে করে থাকেন। অবশ্য এ আন্দোলন সম্পর্কে মতবিরোধ আছে।[৪৯] ডিরোজিওর চিন্তাভাবনার মধ্যে অগতানুগতিকতার বৈশিষ্ট্য পরিষ্কারভাবে পরিলক্ষিত হয়।[৫০]

দেলোয়ার হোসেন মুসলমান সমাজে প্রচলিত অন্ধ ধর্মীয় বিধিবিধান, বিশ্বাস ও অনুশাসনের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, সময়ের পরিবর্তনের ফলে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের সংস্কার অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। দেলোয়ার হোসেনের মতে, মুসলমানদের জন্য ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ যেমনি জরুরি তেমনি বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জনও জরুরি। যেহেতু সমাজের অধিকাংশই মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা সেহেতু মাতৃভাষায় লেখাপড়া করা তাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। সুতরাং পাঠ্যশিক্ষা কার্যক্রমে বাংলা ভাষায় পাঠদান অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।[৫১] তিনি বলেন যে, বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা মুসলমানদের জন্য দূরদর্শিতার অভাব ছাড়া কিছু নহে। সমগ্র বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে মুসলমানেরা বাসা বাড়িতে স্বভাবতই বাংলায় কথা বলে। তাঁরা হিন্দুস্থানি ভাষা সেক্ষেত্রে ব্যবহার করে না। অথচ শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা ভাষা অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে এখনও কোনো জাগরণ দেখা দেয়নি। দেলোয়ার হোসেনের মতে এটা খুবই দুঃখের বিষয়। মুসলমান সমাজের পরিবর্তনের জন্য তাঁর পূর্বে এমন জোরালো ও শক্তিশালী বক্তব্য অন্য কেউ প্রদান করেননি বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না। দোলোয়ার হোসেন যথার্থই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, মুসলমানদেরকে জাগতিক উন্নতি সাধন করতে হলে প্রথমেই ধর্মীয় গোঁড়ামি মুক্ত হতে হবে। তাঁর মতে, কেবল শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি কিংবা রক্ষণশীল রাজনীতি ও ধর্মীয় কোনো জাগরণ মুসলমানদের সমস্যার সমাধান নয়। দেলোয়ার হোসেনের চিন্তাভাবনার সাথে আবদুল লতিফের চিন্তাচেতনার এখানেই গরমিল। দেলোয়ার হোসেন ইংরেজি ও বাংলা শিক্ষার উপর সমধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। মাদ্রসা শিক্ষা বন্ধ করতে বলেছেন। পক্ষান্তরে, আবদুল লতিফ ইংরেজি ও ফারসি তথা আরবি শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেছেন প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতি ও বিশ্বাসকে অটুট রেখেই। কাজেই দেলোয়ার হোসেনকে প্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও বাংলা ভাষায় শিক্ষার প্রথম পুরোধা হিসাবে আখ্যায়িত করা চলে।[৫২]

৬. আবদুল লতিফ ও দেলোয়ার হোসেনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

দেলোয়ার হোসেন ও আবদুল লতিফের চিন্তাধারার মধ্যে বেশ পার্থক্য ছিল। প্রথমত, আবদুল লতিফ পৌর অভিজাত শ্রেণী ও গ্রাম্য সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভাজন করেন এবং তাদের জন্য আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থার

---

[৪৭] কলকাতার যুবসমাজের মধ্যে তিনি সচেতনতাবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন -- যা পরবর্তীকালে ইয়ং বেঙ্গল মুভমেন্টে এ রূপ লাভ করেছিল। তাঁর একজন অনুসারীর (রাধাকৃষ্ণ মল্লিক) মতে, "তিনিই (দেলোয়ার হোসেন আহমদ) প্রথম ব্যক্তি যিনি মানুষের মধ্যে জ্ঞান সম্পর্কে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন...নিজেদের সম্পর্কে ভাবতে শিখিয়েছিলেন।" দেখুন, A. F. Salahuddin Ahmed, *Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1836* (Calcutta: The Technical and General Press, 2nd ed., 1976), পৃ. ৪৮।

[৪৮] *Muslim Modernism in Bengal,* পৃ. iii।

[৪৯] Nemai Sadhan Bose, *The Indian Awakening Bengal* (Calcutta: Firma K L Mukhapaddaya, 1960), পৃ. ৪৮।

[৫০] ড: জ্যোতির্ময় ঘোষ (প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), বিগত ১১.১২.১৯৯৮ তারিখে চট্টগ্রাম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্রে 'নজরুলের মুল্যায়ন' শীর্ষক বক্তৃতার সময়ে এ মন্তব্য করেন।

[৫১] *Muslim Modernism in Bengal*, পৃ. vii-viii যত্রতত্র ।

[৫২] তদেব ।

পরামর্শ দেন।[৫৩] কিন্তু দেলোয়ার হোসেন উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। **দ্বিতীয়ত**, আবদুল লতিফ যেখানে ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন সেই ক্ষেত্রে দেলোয়ার হোসেন মাদ্রাসা শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। দেলোয়ার হোসেনের মতে 'মাদ্রাসা শিক্ষা সময়ের সাথে অনুপযোগী, মূল্যহীন এবং ভবিষ্যতেও কোনো কাজে আসবে না'।[৫৪] **তৃতীয়ত**, আবদুল লতিফের লক্ষ্য ছিল মুসলমানদেরকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা, তবে ধর্মীয় অনুশীলন ঠিক রেখে।[৫৫] কিন্তু দেলোয়ার হোসেন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় অনুশীলনকে যুগোপযোগী করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে, মুসলমানদের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনবোধে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও আচার অনুষ্ঠানসমূহে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন আনতে হবে। **চতুর্থত**, আবদুল লতিফের চিন্তাভাবনা গোড়া মুসলমানদের জন্য খুবই গ্রহণীয় ছিল। পক্ষান্তরে দেলোয়ার হোসেনের চিন্তাভাবনা তাঁদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছিল। **পঞ্চমত**, আবদুল লতিফের চিন্তাভাবনাকে খানিকটা গোঁড়া ধর্মীয় বলা চলে। অপরপক্ষে দেলোয়ার হোসেনের চিন্তা-ভাবনাকে বিপ্লবী বলা চলে।[৫৬] লক্ষণীয় যে, দেলোয়ার হোসেন চিন্তা-চেতনার দিক থেকে আবদুল লতিফের চেয়েও অনেক বেশি প্রগতিবাদী, বাস্তববাদী ও যুক্তিবাদী ছিলেন। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর লিখিত 'দি ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন্স অব দি মুসলিমস' নিবন্ধে।[৫৭] এই নিবন্ধে দেলোয়ার হোসেন সমাজের সার্বিক পরিবর্তনের উপর অত্যাধিক জোর দিয়েছেন[৫৮] এবং যুক্তিনির্ভর আলোচনাই এখানে স্থান লাভ করেছে ।

৭. উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, উনিশ শতকের বাংলায় উপযোগবাদের বেশ প্রভাব পড়েছিল। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অনেকে এ দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। উপযোগবাদী চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম সমাজ সংস্কারকেরা নিজ সমাজের জন্য হিতকর অনেক কাজ করে গিয়েছেন। বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল উপযোগবাদী চিন্তা-ভাবনার উৎকৃষ্ট ফসল। মুসলিম সমাজের নেতৃস্থানীয় সমাজ সংস্কারক নবাব আবদুল লতিফ ও দেলোয়ার হোসেন আহমেদ প্রমুখ জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতেই উপযোগবাদের দার্শনিক, সামাজিক ও নৈতিক তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজ সমাজের উন্নয়নে ব্রতী হয়েছিলেন। বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে ঢাকায় সংগঠিত মুসলিম সাহিত্য সমাজ এবং এর সদস্যবৃন্দের সাহিত্যকর্মে উপযোগবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। উপযোগবাদের প্রভাবেই মুসলিম সাহিত্য সমাজ কর্তৃক আহূত বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন বেগবান হয়েছিল এবং এ আন্দোলন বাংলাদেশে স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তাধারা বিকাশের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

---

[৫৩] Enamul Huque, *Nawab Abdul Latif: His Writings and Related Documents* (Dhaka: Samudra Prakashani, 1968), পৃ. ৬৮।

[৫৪] *Muslim Modernism in Bengal*, পৃ. ১১০।

[৫৫] Mohar Ali ed., *Nawab Abdul Latif Khan Bahadur: Autobiography and Other Writings* (Chittagong: The Mehar Publications, 1968), পৃ. ১।

[৫৬] Shafiqul Alam, "Delwar Hossain Ahmed Meerza and His Utilitarian Reforms of the then Muslim Society: A Brief Survey", *Journal of the Institute of Bangladesh Studies* (Rajshahi: Rajshahi University, vol. 18, 1985), পৃ. ১৩৮।

[৫৭] *Muslim Modernism in Bengal*, পৃ. ৭।

[৫৮] তদেব, পৃ. ৫৩।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ৯ম সংখ্যা ১৪০৮

ম্যাকবেথ নাটকের বাংলা অনুবাদ : তুলনামূলক আলোচনা

আব্দুল্লাহ আল মামুন*

Abstract: The translation and reading of Shakespeare plays in Bangla began in the second half of the nineteenth century. Several translations and adaptations of Macbeth, specially, came out at this time. Among them, Girishchandra Ghosh's Macbeth attained the status a classic in translation. Macbeth continued to be translated throughout the next century. Nirendranath Roy's in the West Bengal and Sayeed Shamsul Haque's in Bangladesh are well known and popular among these latter. This paper makes a comparative and critical study of these three translations and shows how far these translations represent Shakespeare's Macbeth. Finally, this paper recommends Nirendranath Roy's version as the more authentic and better translation so far.

এক

'অনুবাদ' শব্দটির অর্থ ব্যাপক ও বহুধা। তবে সংকীর্ণ অর্থে অনুবাদ হচ্ছে একটি ভাষায় লিখিত পাঠযোগ্য কোনোকিছুকে অন্য আর একটি ভাষায় লিখিতরূপে পাঠযোগ্যতা প্রদান। আরো সংকীর্ণতর অর্থে (সাহিত্য যখন মানববিদ্যার একটি বিষয় হিসেবে বিবেচিত এবং 'অনুবাদ', ক্রিয়া ও কর্ম উভয় অর্থেই, যখন সাহিত্যের একটি অন্যতম শাখা হিসেবে গৃহীত), 'অনুবাদ' হচ্ছে একটি ভাষায় সাহিত্যপদবাচ্য কোনো লিখিত পাঠকে (text) আর একটি ভাষায় লিখিতভাবে উপস্থাপন।[১] এই সংকীর্ণতর অর্থে ইংরেজি ভাষায় লিখিত *ম্যাকবেথ* নাটকের যে অনুবাদগুলো বাংলা ভাষায় হয়েছে সেগুলোর মধ্য থেকে তিনটি অনুবাদ এই প্রবন্ধের আলোচ্য।

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১ 'অনুবাদ' শব্দের এই প্রাথমিক সংজ্ঞায়ন বা 'কাজ চালানো ব্যাখ্যা'র শুরুতেই কিছু সমস্যা উঠে আসে। 'অনুবাদ' শব্দের সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সংজ্ঞা না থাকলেও বাংলায় তথা ভারতবর্ষের ভাষাসমূহে 'অনুবাদ' একই রূপে ও অর্থে গৃহীত। ফলত দীর্ঘকালের ঐতিহ্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রচলনে শব্দটি আমাদের কাছে পরিচিত ও অস্পষ্টভাবে বোধগম্য। সেদিক থেকে 'অনুবাদ' বলতে আমরা বুঝি 'অনু-বাদ', যে 'বাদ' 'অনু' বা অনুসরণ করে। অর্থাৎ, যে বাদ বা ভাষা বা উচ্চারণ বা বাক অন্য কোনো বাদ বা ভাষা বা বাক বা উচ্চারণকে অনুসরণ করে, পরে আসে। এ ধারণার মধ্যে বা বোধের মধ্যে এক কালিক বা সময় প্রবাহ-চিত্রের পরিচয় মেলে যা পাশ্চাত্যের সমার্থবোধক শব্দ 'translation' বা '*traducere*' থেকে আলাদা। কারণ ইংরেজি 'translation' (translation)-এর মধ্যে কোনো কালিক অনুষঙ্গ নেই, আছে 'স্থানিক' অনুষঙ্গ। অর্থাৎ, 'স্থানান্তরের' অনুষঙ্গ। সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী 'চিত্রাভাসের' উপস্থিতি সত্ত্বেও বাংলা তথা ভারতীয় ও ইংরেজি তথা ইউরোপীয় উভয় পরিভাষাতেই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা আছে যা থেকে সাহিত্যক্রিয়া ও কর্ম হিসেবে 'অনুবাদের' অবস্থান, কৌলীন্য ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের মূল পরিচয় মেলে। 'অনুবাদ' এমন কিছু যা 'মূল' পাঠকে অনুসরণ বা স্থানান্তর করে। অর্থাৎ অনুবাদের অবস্থান ও ভূমিকা অনেকটা পরজীবীর ভূমিকা। মূলকে আঁকড়িয়ে এটা বেড়ে ওঠে, তাই এর অবস্থান দ্বিতীয় স্তরের:

> Translation has been perceived as a secondary activity, as a 'mechanical' rather than a 'creative' process, ... a low status occupation. (Bassnett-McGuire, Susan, *Translation Studies*, (London: Methuen, 1980), p. 2.

উনবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে আজ অব্দি দুই বাংলায় অনেকেই *ম্যাকবেথ* নাটকের অনুবাদ, রূপান্তর, ভাবানুবাদ প্রভৃতি করেছেন। এ নাটকের এই বিভিন্ন রকম অনুবাদ প্রচেষ্টা থেকে আমরা বুঝতে পারি এ নাটক এ দেশে জনপ্রিয় এবং এর আবেদন নিবিড়। এমনকি এ নাটকের কাব্যকলা রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকেও উজ্জীবিত করেছিল এবং তিনি এর প্রথম কয়েকটি দৃশ্যের অনুবাদ করেছিলেন। আমাদের দেশে *ম্যাকবেথের* কোনো কোনো অনুবাদ মৌলিক নাটকের মতোই সমাদৃত। বিশেষ করে গিরিশচন্দ্রের *ম্যাকবেথ* বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে অন্যতম সফল ক্লাসিক। পরবর্তীতে নীরেন্দ্রনাথ রায়ের অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে সৈয়দ শামসুল হকের অনুবাদ পরিচিত ও জনপ্রিয়। এ অনুবাদগুলোর কোনো কোনোটি বিশেষ করে গিরিশ বাবুর *ম্যাকবেথ* বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠ্য। আমাদের দেশে ইংরেজি ভাষার ব্যাপক চর্চা হলেও ইংরেজি সাহিত্য সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছেও যথেষ্ট আয়াসসাধ্য। তাই অনেকেই ইংরেজি সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যের সাথে পরিচিত হতে অনুবাদের উপর নির্ভরশীল। শেক্সপিয়র আমাদের কাছে খুব পরিচিত নাম হলেও এবং তাঁকে আমরা আমাদের সাহিত্যচর্চার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করলেও আমাদের শেক্সপিয়র-অবহিতি অনেকাংশেই অনুবাদনির্ভর। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই অনুবাদগুলোর কতটুকু শেক্সপিয়র? অনুবাদকগণ কতটুকু মূলানুগ হবার চেষ্টা করেছেন? সেই চেষ্টা কোন পর্যায়ের? একটি সাহিত্যগ্রন্থের শব্দপর্যায়ে ধ্বনিবৈশিষ্ট্য থেকে শুরু করে বাক্যাংশ (phrase), বাক্য, অর্থব্যঞ্জনা, বয়ান (discourse) প্রভৃতি হয়ে তার যে সামগ্রিক শৈল্পিক আবেদন ও দ্যোতনা তার কতটুকু অনুবাদে ধরবার চেষ্টা হয়েছে? বিশেষ করে শেক্সপিয়র-এর *ম্যাকবেথ* নাটকের মতো নিবিড় কাব্যগুণসম্পন্ন গ্রন্থের অনুবাদে কাব্যকলার কোন কোন দিকগুলো সফলভাবে সম্পন্ন বা প্রতিফলিত?

অনুবাদ কর্মকাণ্ডের মধ্যে সাহিত্য পদবাচ্য গ্রন্থাদির অনুবাদ সবচেয়ে জটিল ও কষ্টসাধ্য। বিশেষ করে কাব্যানুবাদ। সাহিত্যের ভাষার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্যই এমন হয়। বিজ্ঞানের বা ব্যবসাবাণিজ্যের বা আইনের ভাষার মূল কাজ একটা মাধ্যমের কাজ। বাক্যের অর্থই এখানে প্রধান বিবেচ্য। কিন্তু সাহিত্যের ভাষা শুধু একটা মাধ্যম নয়। এ ভাষার অর্থ থাকে, কিন্তু সে অর্থ অভিধানের অর্থের সমতুল্য বা সমান্তরাল নয়। সাহিত্যের অন্যতম কাজই হচ্ছে প্রচলিত সাধারণে গণ্য শব্দ বা পদ বা বাক্যকে বিশ্লিষ্ট করা, বিকৃত করা, প্রতিবিম্বিত করা, যেন প্রচলিত শব্দগুলোয় নতুন নতুন অর্থসিক্ত হয়ে ওঠে, এমন কিছু ধারণ ও প্রকাশ করে যা অভূতপূর্ব কিন্তু অনিবার্য। সাহিত্যের ভাষা তাই শিল্প; অর্থের চেয়ে শরীরটাই ('মাধ্যম') তাই হয়ে ওঠে গুরুত্বের কিংবা কখনো কখনো অর্থটাই হয়ে ওঠে 'মাধ্যম'। সাহিত্যের ভাষা এভাবে সৃষ্টি করে রসের, আমরা রসসিক্ত ভাষায় অবগাহন করি; পাই রসানন্দ, নান্দনিক সন্তুষ্টি। সাহিত্যের সবকটি বিভাগের মধ্যে কাব্যকলার ভাষার এই স্ব-সমাচ্ছন্নতা ও তার নিগূঢ় নিসৃত রস সর্বাধিক পরিস্ফুট। কাব্যকলায় এই রসনির্মাণ ও রসচর্চা, কবির কাব্যপ্রতিভা ও তার সমাজ-সংস্কৃতিতে কাব্যচর্চার ধারা এই দুটি প্রতিস্পর্ধী কিন্তু অবিচ্ছেদ্য উপাদানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। সেজন্য কাব্যানুবাদ শুধু শব্দ বা বাক্যের অনুবাদ নয়; এ অনুবাদ একই সঙ্গে একজন অনন্য শিল্পীর

(অনুবাদকে দেখা হয়েছে দ্বিতীয় স্তরের কাজ হিসেবে, 'সৃষ্টিশীল' হিসেবে না দেখে এটাকে দেখা হয়েছে 'যান্ত্রিক' প্রক্রিয়া হিসেবে... এটাকে মনে করা হয়েছে নিচুশ্রেণীর জীবিকা।)

মূল লেখা ও অনুবাদ তথা মূললেখক ও অনুবাদকের এই প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের পেছনে হরেকরকম ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক কারণ রয়েছে যার মধ্যে অন্তত দুটি কারণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: (১) মূল-অনুবাদ সম্পর্কের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের উৎপ্রেক্ষিক দ্যোতনা সমাজের বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোর প্রেক্ষিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। শত শত বৎসরের শ্রেণীবিভাজিত স্তরীকৃত চেতনায় যা প্রথম, যা মূল, যা উৎস তাই শ্রেষ্ঠতর, অগ্রগণ্য। (২) এর সাথে শৈল্পিক বিচারবোধপ্রযুক্ত ধারণায় অনুসৃত সংস্কার হচ্ছে অনুবাদ কখনোই মূলকে সামগ্রিকরূপে হুবহু ধারণ করতে পারে না। আর এসব কারণেই হয়ত আমাদের দেশে অনুবাদ তথা অনুবাদ কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা সমালোচনা খুব বেশি হয়নি এবং অনুবাদ সাহিত্যের একটি শক্তিশালী শাখা হিসেবেও সেইভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি, যদিও কোনো কোনো অনুবাদ বিচ্ছিন্নভাবে জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

ব্যক্তিমানসের অভূতপূর্ব কিন্তু অনিবার্য অন্তর্দৃষ্টির অনুবাদ; আর সে সাথে একটি ভাষা-সংস্কৃতির ধারার অনুবাদ—আর সে ভাষা-সংস্কৃতির উপাদানসমূহ নিজস্ব নিয়ম ও কাঠামোয় সন্নিবেশিত। সেইজন্য কাব্যে ও কাব্যানুবাদে ধ্বনিতল থেকে বাক্যতল তথা সামগ্রিক শিল্প-কাঠামোতল পর্যন্ত সবকিছুই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্যরূপে সম্পর্কিত ও সমন্বিত।

শেক্সপিয়রের *ম্যাকবেথ* বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম মহৎ কাব্য। উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিভাবে একজন মহৎ ব্যক্তির পতন ঘটায় তাই এ নাটকের প্রধান বিষয়— বললে নাটকের শিশুপাঠ হলো বটে কিন্তু *ম্যাকবেথ* সম্পর্কে কিছুই বলা হলো না। কারণ, যা কিছু নিয়ে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে— ধ্বনি-ব্যঞ্জনা, বাগ্‌ধারা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, ছন্দ-অলঙ্কার, বাক্য-প্রয়োগ প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছুই বলা হলো না। *ম্যাকবেথ* নাটক তাই ম্যাকবেথের পতন নয়, এ নাটক এই সমস্ত উপাদানের শৈল্পিক সমষ্টি বা পূর্ণতা। *ম্যাকবেথ* নাটকের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত সমালোচক হ্যাজলিট তাই বলেন, "Shakespeare's genius here took its full swing, and trod upon the farthest bounds of nature and passion."[২] শ্লেজেল বলেন, "Since *The Furies* of Aeschylus, nothing so grand and terrible has ever been composed."[৩] তাই *ম্যাকবেথ*-এর অনুবাদ অত্যন্ত কঠিন।

অনুবাদগুলো পাঠ করতে করতে অনেক প্রশ্ন মনে জেগেছে; বিশেষ করে মূল নাটকের সাথে মিলিয়ে পড়তে গিয়ে অনেক অসঙ্গতি অনেক সমস্যা উঠে এসেছে। এ সব অসঙ্গতি ও সমস্যা সামনে রেখে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ রায় ও সৈয়দ শামসুল হকের অনুবাদগুলোকে মূলের সাথে মিলিয়ে পড়বার এবং অনুবাদ হিসেবে এদের তুলনামূলক বিচার করবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু একটি প্রবন্ধ কাঠামোয় সমগ্র অনুবাদ বিবেচনা করা যায় না, এর জন্য আরো দীর্ঘতর পরিসর প্রয়োজন। তাই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রতিনিধিত্বমূলক কিছু সংলাপের তুলনামূলক পাঠের মধ্য দিয়ে এ অনুবাদগুলোর সার্বিক অনুবাদ-মান, প্রক্রিয়া, কৌশল ও সার্থকতা বিচারের চেষ্টা করা হলো।

দুই

ম্যাকবেথ নাটক শুরু হয়েছে একটা ছোট্ট 'ডাকিনী দৃশ্য' দিয়ে। শুরুতেই দুটি প্রশ্নসূচক বাক্য দিয়ে শুরু করে ১ম ডাকিনী:

> When shall we three meet again?
> In thunder, lightning, or in rain? [৪]

লাইন দুটোর মূলানুগ অনুবাদ করেন নীরেন্দ্রনাথ রায়:

> আবার কবে মিলব মোরা তিনজনে
> বিষ্টি বাদল বাজ-বিজুলির ঝনঝনে?[৫]

মূলে প্রতিটি লাইনে সাতটি করে 'স্বর-একক' বা অক্ষর (syllable) রয়েছে, অনুবাদে তা হয়ে গেছে মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষর মিলিয়ে এগারটি। তবে ইংরেজি সাতটি স্বর-এককের যে সময়-লয় বাংলায় এগারটি স্বর-

---

[২] (শেক্সপিয়রের সৃজনীপ্রতিভা এখানে সর্বোচ্চ মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রকৃতি ও আবেগের শেষ সীমাকে স্পর্শ করেছে।) As quoted in John Russell Brown's *Shakespeare: The Tragedy of Macbeth*, (London: Edward Arnold, 1963; reprint 1967), p. 9.

[৩] (ইসকাইলাসের *দ্য ফিউরিস্* এর পরে এ রকম মহৎ ও ভয়াবহ আর কোনো কিছু লেখা হয়নি।) Ibid. p.9.

[৪] এই উদ্ধৃতি *Macbeth*, ed. John Dover Wilson, (London: Cambridge University Press, 1963), p. 3 থেকে। এর পরের মূলের সমস্ত উদ্ধৃতি এই গ্রন্থ থেকে দেওয়া হয়েছে।

[৫] নীরেন্দ্রনাথ রায়, *ম্যাকবেথ* (শেকসপীয়র পরিষদ গ্রন্থমালা), (কলিকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৫৭), পৃ. ১। রায়ের অনুবাদের পরবর্তী সমস্ত উদ্ধৃতি এই গ্রন্থ থেকে দেওয়া হয়েছে।

একক তার কাছাকাছি। বৃষ্টি, বজ্র ও বিদ্যুৎ ঝলকানির যে চিত্রকল্প তৈরি হয়েছে মূলে, অনুবাদে তার মোটামুটি সার্থক রূপান্তর ঘটেছে। সে সাথে অন্তমিলকে অনুসরণ করায় (যা অনুবাদে প্রায়শ অসম্ভব) এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য। অনেকটা একই পর্যায়ের সন্তোষজনক অনুবাদ করেন সৈয়দ শামসুল হক:

আবার কখন একসাথে হব তিনজন?
বৃষ্টি, অথবা বজ্র ঝলক গর্জন?[৬]

হকের অনুবাদ গদ্য-কবিতায়; তবে এ অনুবাদের একটা বিশেষ ভালো দিক হচ্ছে তিনি এ অনুবাদে মূলের যে ছন্দ-কাঠামো তাকে ধরতে চেয়েছেন। বিশেষ করে দ্বিতীয় লাইনে thunder, lightning এবং rain শব্দত্রয়ের মাঝে যে ছোট্ট ছোট্ট 'বিরতি-গতি' রয়েছে তাকে ধরতে চেয়েছেন তিনি।

দুইজন অনুবাদকই তাঁদের অনুবাদে মূল থেকে একই রকমের ছোট্ট একটি পরিবর্তন এনেছেন। মূলে thunder, lightning ও rain তিনটি আলাদা উপাদান, আলাদা চিত্র। Thunder ও lightning মিলেমিশে হকের অনুবাদে হয়েছে 'বজ্র ঝলক গর্জন', রায়ের অনুবাদে 'বাজ-বিজুলির ঝনঝনে'।

তবে এই দুটো লাইন থেকেই অনুবাদকদ্বয়ের মূল নাটকের পাঠ ও তার রূপান্তর প্রক্রিয়ায় ভিন্নতর অবস্থান ফুটে ওঠে। 'বিষ্টি', 'বাজ-বিজুলি' 'ঝনঝনে' প্রভৃতি শব্দাবলির দ্বারা রায় এমন একটি আবহ তৈরির চেষ্টা করেছেন যা হকের 'বৃষ্টি' 'বজ্র ঝলক' আর 'গর্জনের' আবহ থেকে আলাদা। রায়ের আবহে আছে স্বল্পশিক্ষিত 'নারীসুলভ' পেলবভাব, অন্যদিকে হকের আবহে সংস্কৃতজ 'পুরুষালি' ঋজুভাব। মূল নাটকে এই দুটো আবহই অনুপস্থিত। তবে মূল নাটকে এ দৃশ্যের সামগ্রিক যে আবহ thunder, lightning, battle ইত্যাদি দ্বারা সৃষ্ট তা হকের অনুবাদের সাথে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ।

দুই অনুবাদকই, অন্তত এ দুটো লাইনে, চেষ্টা করেছেন মূলানুগ হতে, মূলের শব্দচয়ন, ছন্দ-মাত্রা ও চিত্রকল্পকে হুবহু রূপান্তরের। এর ঠিক উল্টোটি পাই গিরিশচন্দ্র ঘোষের অনুবাদে। তাঁর *ম্যাকবেথ* নাটকের শিরোনামের নিচেই বন্ধনীতে তিনি উল্লেখ করেছেন এটি 'মহাকবি শেক্সপিয়র [*sic*] প্রণীত *ম্যাকবেথ* নাটকের বঙ্গানুবাদ', অথচ তিনি নাটক শুরু করেন এক মধ্য-দীর্ঘ দৈর্ঘ্যের 'প্রস্তাবনা' দিয়ে যা মূল নাটকে নেই। চব্বিশ লাইনের প্রস্তাবনার পরে ১ম দৃশ্যের ১ম দুটো লাইনের অনুবাদ এ রকম:

দিদি লো, বল্‌না আবার
মিল্‌ব কবে তিন বোনে?
যখন ঝর্‌বে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর,
চক্ চকাচক্ হানবে চিকুর,
কড়ু কড়াকড়ু কড়াৎ কড়াৎ
ডাক্‌বে যখন ঝন্‌ঝনে?[৭]

দুলাইন হয়ে গেল ছয় লাইন। অনুবাদে তা অনেক সময় হতেই পারে। কিন্তু তিনি 'দিদি লো' 'তিন বোনে' কোথায় পেলেন? আর কোথায় পেলেন ধ্বন্যাত্মক, অনুকার ও দ্বিরুক্তিসূচক শব্দাবলির বাহুল্য? ঘোষের এ ছয় লাইনে আছে চমৎকার সৃষ্টিশীলতা যা প্রমাণ করে যে তিনি কবি, কিন্তু তা গিরিশীয়, শেক্সপিয়রীয় নয়। মূলের কিছুই নেই এতে। শেক্সপিয়রীয় প্রতিভার বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে 'পরিমিতিবোধ' তার সামান্যও অবশিষ্ট নেই ঘোষের অনুবাদে।[৮]

---

[৬] সৈয়দ শামসুল হক, *ম্যাকবেথ*, *থিয়েটার* পত্রিকা, (ত্রয়োদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪), পৃ. ২। হকের অনুবাদের পরবর্তী সমস্ত উদ্ধৃতি এই গ্রন্থ থেকে দেওয়া হয়েছে।

[৭] গিরিশচন্দ্র ঘোষ, *গিরিশ রচনাবলী*, ৪র্থ খণ্ড, ড. দেবীপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৪), পৃ. ৪৫১। ঘোষের অনুবাদের পরবর্তী সমস্ত উদ্ধৃতি এই গ্রন্থ থেকে দেওয়া হয়েছে।

[৮] অনুবাদে পুনর্লিখন বা রূপান্তর বা পুনঃসৃষ্টির অনেক শৈল্পিক, রাজনৈতিক, সামাজিক কারণ থাকতে পারে। তেমনটি হলে অনুবাদকের দায়িত্ব ভূমিকা বা পরিশিষ্টে তাঁর অনুবাদের বিশেষ লক্ষ্য ও ভঙ্গিকে তুলে ধরা। তিনটি অনুবাদের কোনোটিতেই তেমন কোনো ভূমিকা বা পরিশিষ্ট নেই। বর্তমানে অনুবাদের সাথে জড়িত এসব বিষয়গুলোকে নিয়ে

এই প্রথম লাইন থেকে শুরু করে পুরো দৃশ্যে, এমনকি পুরো নাটকে, গিরিশ ঘোষের অনুবাদ একই প্রকৃতির। মূলকে তাঁর নিজের মতো করে আত্তীকরণ ও পুনঃসৃষ্টি— যার মধ্যে শেক্সপিয়রকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এ দৃশ্যেরই একটু পরে এ দুটো প্রশ্নের উত্তরে ২য় ডাকিনী বলে:

Upon the heath.

এর অনুবাদ হকে:

প্রান্তরে। (পৃ. ২)

রায়ে:

সেই মাঠেতে। (পৃ. ১)

ঘোষে:

দুষনো রাঁড়ীর মাঠে যাব। (পৃ. ৪৫২)

'heath' শব্দের আভিধানিক অর্থ '(প্রধানত গুল্মাদিতে আচ্ছাদিত) উষর প্রান্তর', যাকে আমরা বলি আবাদ-অযোগ্য জংলা মাঠ। ঘোষের অনুবাদ অন্য দুজনের চেয়ে অনেক বেশি কাব্যিক, এমনকি 'দুষনো রাঁড়ী' ইত্যকার ব্যবহারে হয়ে উঠেছে চিত্রময় যার মধ্যে 'উষরতার' চমৎকার অনুষঙ্গ আছে; কিন্তু এ তো অনুবাদ নয়। এখানে আবারো লজ্জিত হয়েছে 'পরিমিতিবোধ'। 'heath' শব্দের সাথে জড়িয়ে থাকা অনুষঙ্গকে ব্যাখ্যা বা বর্ণনা করে কাব্যিক দ্যোতনাকে করে ফেললেন জলো।

এ দৃশ্যের শেষ দুটো লাইন –

Fair is foul, and foul is fair:
Hover through the fog and filthy air. (p. 3)

এ নাটকের কেন্দ্রীয় উচ্চারণ, যাকে আমরা বিভিন্নভাবে বলি মূলপাঠ, essence, সারবস্তু, central concern, নির্যাস ইত্যাদি। লাইনদুটো আপাত খুবই সাধারণ, কিন্তু এর কাব্যিক দ্যোতনা, বোধ, সমগ্র নাটকে এর অনুরণন ও উদ্ভাসন গভীর ও সুদূরপ্রসারী, তাই এর অনুবাদও কঠিন, প্রায় অসম্ভব। তিনটি অনুবাদের মধ্যে ১ম লাইনটির হকের অনুবাদ

'শুভ যা অশুভ, অশুভই শুভ।', (পৃ. ২)

রায়ের

'ভালোটাই মন্দ আর মন্দটাই ভাল।' (পৃ. ১)

কিংবা ঘোষের

'ভাল মোদের কালো, মন্দ মোদের ভাল।' (পৃ. ৪৫২)

অনুবাদ থেকে বেশি সার্থক। 'Fair' শব্দের অনেক রকম অর্থ হয় প্রেক্ষিত অনুযায়ী। এই প্রেক্ষিতে 'foul' শব্দের বিরুদ্ধ শব্দ হিসেবে এর অর্থ দাঁড়ায় 'শুভ' 'মঙ্গল' 'ভালো' 'ন্যায়' 'সুন্দর' ইত্যাদি। এই তাৎক্ষণিক প্রেক্ষিতের সাথে পুরো নাটকের প্রেক্ষিতে 'শুভ' বা 'মঙ্গল' শব্দই বেশি গ্রহণযোগ্য। 'শুভ' বা 'মঙ্গল' শব্দের যে গভীরতা, যে অনুষঙ্গ, এমনকি এদের উচ্চারণে যে ধ্বনিব্যঞ্জনা তা 'ভালো' শব্দে অনুপস্থিত। তবে 'শুভ-অশুভ' বা ভালো মন্দ যেটাই বেছে নেওয়া হোক না কেন, 'foul'এর জন্যে ঘোষ যে ব্যবহার করেছেন দুটি শব্দ 'কালো' ও 'মন্দ' তা কোনো ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আগের দুটো উদাহরণের মতো এখানেও তাঁর শব্দবাহুল্য; যা নষ্ট করেছে কাব্যিক পরিমিতিবোধ; একই শব্দের পুনরুক্তি ও সাতটি শব্দের মধ্যে চারটিতেই 'f' ধ্বনির ব্যবহারে মূলে যে ধ্বনিব্যঞ্জনা তৈরি হয় তার কিছুই থাকে না এ অনুবাদে।

বিস্তর আলোচনা হচ্ছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক 'উত্তর-উপনিবেশবাদ' কিংবা 'উত্তর-আধুনিকতাবাদের' কারণে এ বিষয়গুলো মুখ্য হয়ে উঠেছে। আগ্রহী পাঠকগণ দেখতে পারেন: (১) Bassnett, Susan & Harish Trivedi, *Post-Colonial Translation*, (London: Routledge, 1999), কিংবা (২) Niranjana, Tejaswini, *Siting Translation*, (Berkeley: University of California Press, 1992).

পরের লাইনটিতে ঘোষ একইভাবে নিজস্ব ঢঙে দ্বিরুক্তি-অনুকার শব্দের বাহুল্য আনেন:

আঁদাড় পাঁদাড় আনাচ কানাচ
ঘুরে বেড়াই চল। (পৃ. ৪৫২)

হকের অনুবাদও এখানে সফল নয়:

কুয়াশা -- ধোঁয়াশা -- চললাম। (পৃ. ২)

'চললাম'এর কোনো শব্দ বা ইঙ্গিত মূলে নেই।

রায়ের এ লাইনটির অনুবাদ অনেকটা ভালো:

কুয়াশা আর নোংরা হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় চলো। (পৃ. ১)

মূলের 'fog' 'filthy air' শব্দ দুটির যথাযথ অনুবাদ হয়েছে।

তবে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে তিনটি অনুবাদেই। তিনজন অনুবাদকই 'hover' (যার অর্থ অনেকটা 'উড়তে থাকা' 'ভাসতে থাকা' 'ঝুলতে থাকা' এরকম) শব্দটিকে 'আমরা' (তিন ডাকিনী) কর্তৃপদের কর্মপদ হিসেবে বিবেচনা করেছেন, যার কোনো স্পষ্ট নির্দেশ মূলে নেই। তিন ডাকিনী কি 'কুয়াশা আর নোংরা হাওয়ায়' উড়ে বেড়ায়, চলে, ঘুরে বেড়ায়, নাকি এই উচ্চারণ 'Fair is foul, and foul is fair' ভেসে থাকে, ঝুলে থাকে, ভেসে বেড়ায়, উড়ে বেড়ায় 'fog and filthy air'-এর মধ্যে? এর কোনো স্পষ্ট নির্দেশ অনুক্ত রেখে শেক্সপিয়র মূলে এনেছেন এক অস্পষ্টতা, অনিশ্চয়তা ও অনন্বয়ের আভাস ও দ্যোতনা যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এ নাটকের মূল সুরকে। একপেশে বা ভুল ব্যাখ্যার ফলে তিনটি অনুবাদেই তা হয়ে গেছে স্পষ্ট, নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ।

এই ছোট্ট দৃশ্যের অনুবাদের মতোই পরবর্তী দৃশ্যতেও, যেখানে নাটকের মূল চরিত্রগুলোর সাক্ষাৎ পাই, আমরা একই সমস্যাসমূহের মুখোমুখি হই। তবে এখানে আরো জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা উঠে আসে। শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডিগুলোর মধ্যে 'ম্যাকবেথ' সবচেয়ে বেশি কাব্যিক/কাব্যময়। যে সমস্ত উপাদান দিয়ে এই কাব্যাবহ তৈরি হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিত্রকল্পের ব্যবহার। এক অর্থে এই চিত্রকল্পগুলোই নাটকের প্রাণ, তার কেন্দ্রীয় দ্যোতনা, আবহ, যা একে দেয় গভীরতা, গতি, শক্তি ও সৌন্দর্য। ঘটনাবলির চাইতে এই চিত্রকল্পসমূহ তথা ভাষার ব্যবহার এ নাটকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ফলে চিত্রকল্পগুলোর যথাযথ অনুবাদ না হলে অনুবাদের শ্রীহানি ঘটে, অনুবাদ হিসেবে ব্যর্থ হয়। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে ম্যালকম যুদ্ধে আহত রক্তাক্ত (bloody man) সার্জনকে যুদ্ধক্ষেত্রের বিবরণ দিতে বলে, সার্জন যে দীর্ঘ সংলাপ[৯] আওড়ায় তা

---

[৯] Doubtful it stood,
As two swimmers that do cling together
And choke their art. The merciless Macdonwald
(Worthy to be a rebel, for to that
The multiplying villainies of nature
Do swarm upon him) from the Western Isles
Of Kerns and gallowglasses is supplied;
And Fortune, on his demand quarrel smiling,
Show'd like a rebel's whore: but all's too weak:
For brave Macbeth (well he deserves that name),
Disdaining Fortune, with his brandished steel,
Which smoked with bloody execution,
Like Valour's minion, carved out his passage,
Till he faced the slave;
Which ne'er shook hands, nor bade farewell to him,
Till he unseamed him from the nave to th' chops,
And fixed his head upon our battlements. (I:ii) (p. 4)

বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনায় একের পর এক তুলনা-প্রতি তুলনার আশ্রয় নেয় সে। যুদ্ধক্ষেত্র নয় আমাদের সামনে উঠে আসে অন্য সব দৃশ্য: 'spent swimmers' 'choke their art'; 'multiplying villainies of nature/[d]o swarm upon him'; 'Fortune' '[s]how'd like a rebel's whore'; 'his brandish'd steel/[w]hich smok'd with bloody execution'. একের পর এক চিত্রকল্প বিস্মিত-মোহিত করে আমাদের; কিন্তু একই সঙ্গে, বিশেষ করে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য উদ্বিগ্ন রাজা-রাজপরিষদবর্গের প্রেক্ষিতে, এগুলো বাড়িয়ে তোলে কৌতূহল, ফুটে ওঠে চিত্রকল্পগুলোর অসহনীয় সৌন্দর্য। আর এ সবের পরেই আসে ম্যাকবেথের বীর্যমত্তার কথা, ততক্ষণে আমরা কাব্যের যাদুমন্ত্রে আচ্ছন্ন, ম্যাকবেথ হয়ে উঠেছে আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র। আর সে জন্যই নগণ্য এক চরিত্রের সংলাপ এত গুরুত্বপূর্ণ। গিরিশচন্দ্রের অনুবাদে মূলের সতের লাইন হয়েছে চব্বিশ লাইন[১০]। "Doubtful it stood" হয়েছে 'জয় পরাজয়, বহুক্ষণ না হ'ল নির্ণয়'। আর এই ছোট্ট অনুবাদেও মূলের চিত্রকল্প গেল হারিয়ে। রায়ের অনুবাদ 'অনিশ্চিত ছিল তা তখন' শ্রেয়তর কিন্তু এখানেও চিত্রকল্পটি অনুপস্থিত। আর হক তো পুরো জিনিসটাকেই করলেন নষ্ট 'সমূহ সমান সব'। এটা শুধু ভুল অনুবাদ নয় অর্থহীন অনুবাদ। পরবর্তী 'spent swimmers'-এর চিত্রকল্পটি ঘোষে এসেছে 'সন্তরিত দুইজনে ক্লান্ত পরিশ্রমে'— অর্থ ঠিক থাকল, কিন্তু 'spent' শব্দের ব্যাখ্যা হলো 'ক্লান্ত পরিশ্রমে' যা হওয়া উচিত ছিল 'নিঃশেষ' বা 'ব্যয়িত'। রায়ের অনুবাদে 'যেন দুই ক্লান্ত সন্তরিক করি জড়াজড়ি|ব্যর্থ করে শিক্ষা নিজেদের।' 'দুই ক্লান্ত সন্তরিক' অনেকখানি সফল। হকে 'যেন দুই ব্যয়িত নিঃশ্বাস সাঁতারু' মূলানুগ, কিন্তু তাঁর 'ব্যয়িত নিঃশ্বাস' শব্দবন্ধ বাংলাতেই বেঢপ। মূলে এই নিঃশেষ সাঁতারুদ্বয় 'cling together', যা ঘোষে অনুবাদ হয়েছে 'ধরে পরস্পরে'। 'cling' তো 'ধরা' নয়, এটা 'আঁকড়িয়ে ধরা', 'জড়িয়ে ধরা' বা 'জড়াজড়ি করে ধরা বা থাকা'। রায়ের 'করি জড়াজড়ি' গ্রহণযোগ্য, হকের 'আঁকড়ে আছে পরস্পর'ও সার্থক। এই সাঁতারুদ্বয় পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে 'choke their

---

১০ যেন সন্তরিত দুইজনে ক্লান্ত পরিশ্রমে,
ধরে পরস্পরে,
যাহে হয় বিফল কৌশল দোঁহে।
দয়াহীন ম্যাক্‌ডোনাল বিদ্রোহী-প্রধান --
বিদ্রোহী নামের বটে যোগ্য দুরাচার!
পশ্চিম দ্বীপের যত পাপাশয়গণে,
পদাতিক ভল্লধারী,
আর আর বর্ম্মাবৃত যতেক দুর্জ্জন,
মক্ষিকার সম লিপ্ত হ'ল সে আধারে।
সৌভাগ্য সহায় তার হ'ল ক্ষণকাল,
বারনারী সম হাসিল প্রসন্ন মুখে,
কিন্তু বিফল সকলি!
মহামতি ম্যাক্‌বেথ অসীম সাহস--
বীর নামে যোগ্য সে ধীমান্,
উপেক্ষিয়া বিপক্ষের সৌভাগ্যের হাসি,
করে ধরি সুশাণিত অসি--
উষ্ণ শোণিতের ধুম খেলিছে ফলকে
রণদেব-বরপুত্র সম,
শ্রেণী ভেদি পশিল সমরে,
ভেটিল সে ক্রীতদাসে;
না করিল বাক্যব্যয় মিষ্ট সম্ভাষণ
স্কন্ধ হ'তে নাভিদেশ দ্বিখণ্ড করিয়ে,
দুর্গের প্রাচীরে মুণ্ড করিল স্থাপন। (১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য) (পৃ. ৪৫২)

art'। 'Choke' শব্দের অর্থ 'শ্বাস রোধ করা' বা 'গলা টিপে ধরা'। 'Choke their art' বাক্যাংশের অর্থ 'তাদের শিল্পের গলা টিপে ধরেছে', 'তাদের শিল্পকৌশল বা কসরত স্বাভাবিক থাকছে না বা হচ্ছে না' ইত্যাদি। ঘোষ অনুবাদ করেছেন 'যাহে হয় বিফল কৌশল দোঁহে'। এ অনুবাদ গ্রহণযোগ্য কিন্তু মূলের চিত্রকল্প পুরোপুরি অনুপস্থিত। রায় করেছেন, 'ব্যর্থ করে শিক্ষা নিজেদের'। এখানেও চিত্রকল্প অবহেলিত। হকের 'ভুলেছে সাতাঁর' একই সমস্যাক্রান্ত। এভাবে তিনটি অনুবাদই মূলের প্রাণবন্ত চিত্রময়তাকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। একইভাবে কয়েক লাইন পরে ম্যাকবেথের বীরত্বগাঁথা বর্ণনায় যে অত্যুজ্জ্বল চিত্রকল্পের ব্যবহার হয়েছে তা অনুবাদ করতে তিনজনই ব্যর্থ হয়েছেন। ঘোষের অনুবাদঃ

> মহামতি ম্যাকবেথ অসীম সাহস --
> বীর নামে যোগ্য সে ধীমান,
> উপেক্ষিয়া বিপক্ষের সৌভাগ্যের হাসি,
> করে ধরি সুশাণিত অসি--
> উষ্ণ শোণিতের ধুম খেলিছে ফলকে
> রণদেব-বরপুত্র সম, ...(পৃ. ৪৫২)

মূলের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বাক্যাংশ 'brandish'd steel', 'smok'd with bloody execution' ও 'valour's minion' ঘোষে হয়েছে 'সুশাণিত অসি', 'উষ্ণ শোণিতের ধুম খেলিছে ফলকে' ও 'রণদের-বরপুত্র সম'। রায়ে হয়েছে 'আস্ফালিয়া অসি', 'উষ্ণ শোণিতের বাষ্পে যা ছিল ধূমায়িত' ও 'বীরত্বের বরপুত্রসম'। হক 'brandish'd steel' ও 'smok'd with bloody execution' একসঙ্গে করেছেন 'উত্তপ্ত রক্তাক্ত তাঁর তরবারী' আর 'valour's minion' কে করেছেন 'মহাবল শৌর্যের কুমার'। শেক্সপিয়র 'sharp or bright sword' না বলে বলেছেন 'brandish'd steel' যার আক্ষরিক অর্থ 'আস্ফালিত বা আন্দোলিত সুশাণিত ইস্পাত'। শেক্সপিয়র 'sword'এর পরিবর্তে 'steel' ব্যবহার করলেন, কিন্তু অনুবাদকরা আবার অসি বা তরবারিতে ফিরে আসলেন। 'Smok'd with bloody execution'-এর আক্ষরিক অর্থ দাঁড়ায় অনেকটা এ রকমঃ রক্তাক্ত হত্যাযজ্ঞে বা হত্যাযজ্ঞের দ্বারা ধূমায়িত বা আবরিত বা বেষ্টিত। রায় চেষ্টা করেছেন মূলের চিত্রকল্পটি ধরতে; কিন্তু ঘোষের অনুবাদ ভালো হওয়া সত্ত্বেও মূলের চিত্রকল্পটি আবারো অনুপস্থিত। আর হকের অনুবাদে মূলের চিত্রকল্প ও ভাষা দুটোকেই করা হয়েছে অবহেলা। অন্যদিকে 'valour's minion'[১১] (যার আক্ষরিক অর্থ 'শৌর্যের বা বীর্যের বরপুত্র বা প্রিয়পাত্র' এবং যেখানে বিমূর্ত ধারণাকে মূর্ত করা হয়েছে) অনুবাদে ঘোষ টেনে এনেছেন 'রণদেব'কে। রায়ের অনুবাদ 'বীরত্বের বরপুত্রসম' গ্রহণযোগ্য। তবে এ অংশটির সার্থক অনুবাদ এসেছে হকে 'মহাবল শৌর্যের কুমার'। এভাবে অংশবিশেষের গ্রহণযোগ্য বা সার্থক অনুবাদ হলেও পুরো চিত্রকল্পটির সমগ্র-সার্থক অনুবাদ হয়নি কোথাও।

সমগ্র *ম্যাকবেথে* রয়েছে এ ধরনের ছোট্ট ছোট্ট চিত্রকল্পের বুনন। আর এগুলোই হচ্ছে এ নাটকের প্রাণ। চিত্রকল্পগুলো উন্নত নাট্য ও কাব্যমানসম্পন্ন। সব প্রধান-অপ্রধান চরিত্রের সংলাপেই আছে এদের সুকৌশল ব্যবহার, বিস্তৃতি। আর এ সমস্তটা মিলে এ নাটককে করেছে এক অতুলনীয় কাব্য। এদের সম্যক উপলব্ধি ও সার্থক অনুবাদ এ নাটকের যে কোনো অনুবাদ-বিচারের ক্ষেত্রেই তাই মুখ্য ও অগ্রগণ্য।

অপ্রধান চরিত্র ছেড়ে আমরা যদি প্রধান চরিত্রগুলোর গুরুত্বপূর্ণ দু-একটি সংলাপের অনুবাদ লক্ষ করি, তাহলে আলোচ্য অনুবাদত্রয়ের অনুবাদ-মান ও সার্থকতা আমাদের নিকট আরো পরিষ্কার হবে।

ম্যাকবেথ নাটকের সবচেয়ে বিখ্যাত সংলাপগুলোর একটি হচ্ছে ম্যাকবেথের পত্র পড়বার পরে লেডি ম্যাকবেথের মানসিক রূপান্তর, তার অন্ধকারের শক্তির কাছে প্রার্থনা-উচ্চারণ ও স্বামীর উচ্চাশা পূরণের জন্য

---

[১১] minion: 'darling, favourite', C T Onion, *A Shakespeare Glossary*, 1911; (London: Oxford, revised 1966), p. 141.

নিজের সামর্থ্যের অতিরিক্ত অমানবিক শপথ গ্রহণ।[১২] এ সংলাপ ও পরবর্তীতে লেডি ম্যাকবেথের অতিমানবীয় উত্থান আমাদের মনে 'শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের' উদ্রেক করে, আমাদের কল্পনাশক্তিকে নাড়া দেয় ভীষণভাবে।[১৩] এ সংলাপের ঔজ্জ্বল্য, এর গভীরতা, এর নাটকীয় অব্যবহিতি, এর কাব্যিক তীব্রতা ও ঘনত্ব, আর সর্বোপরি ও সবকিছুর মধ্যে জারিত একের পর এক চিত্রকল্পের ব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই এর অনুবাদকে করে তোলে অসম্ভব না হলেও ভীষণ কঠিন। লেডি ম্যাকবেথ সেই সব প্রেতাত্মাকে (spirits) ডাকছে যারা প্রাণঘাতী চিন্তাভাবনাকে (mortal thoughts) পরিচর্যা করে (tend on), যেন তারা তার নারীত্ব বা নারীসুলভ গুণাবলিকে হরণ করতে পারে (unsex me)। ঘোষ এর অনুবাদ করেছেন এভাবে:

আয় আয় আয়রে নরক-বাসি পিশাচ নিচয়!
ডাকিছে জিঘাংসা তোরে আয় ত্বরা করি,
হর নারী-কোমলতা হৃদি হ'তে মম;... (পৃ. ৪৫৮)

'Come, spirits' হয়ে গেল 'আয় আয় আয়রে নরক-বাসি পিশাচ নিচয়!' নষ্ট হলো পরিমিতিবোধ, শব্দবাহুল্য দোষে দুষ্ট হলো লেডি ম্যাকবেথের ঋজু-কঠিন স্বভাব। 'mortal thoughts' হলো 'জিঘাংসা' যা গ্রহণযোগ্য, কিন্তু 'unsex' কে 'নারী-কোমলতা' হিসেবে ব্যাখ্যা করলেন, আর তার সাথে জুড়ে দিলেন অতিরিক্ত ও বাহুল্য 'হৃদি' 'আয় ত্বরা করি' ইত্যাদি। রায়ের অনুবাদ--

হত্যার ভাবনা-সাথী
পিশাচেরা এসো, করো মোরে অ-রমণী... (পৃ. ১৬-১৭)

'unsex' শব্দের প্রতিশব্দ বাংলায় নেই, তাই দুই অনুবাদকই ব্যাখ্যাধর্মী শব্দগুচ্ছের সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু ঘোষের 'হর নারী-কোমলতা' বা রায়ের 'করো মোরে অ-রমণী' কোনোটিই আমাদের সন্তুষ্ট করে না। হকের অনুবাদ 'প্রেতযোনি এসো তবে আমার এ প্রস্তুত অন্তরে, নারীত্ব নিধন করো,...(পৃ. ১৩)'-তে 'spirits|That tend on mortal thoughts'-কে 'প্রেতযোনি' হিসেবে একটি শব্দে অনুবাদ করা হয়েছে। তাঁর এ অনুবাদ সুন্দর ও কাব্যিক, কিন্তু মূলের চিত্রকল্পটি অনুপস্থিত ফলে অস্পষ্ট। 'Unsex me'-এর জন্য 'নারীত্ব নিধন করো' অনেক বেশি সার্থক। তবে 'আমাকে অযৌন করো' সম্ভবত আরো বেশি মূলানুগ।

পরবর্তী বাক্যে 'Make thick my blood'-এর অনুবাদ ঘোষে 'কর ঘন শোণিত প্রবাহ' আবারো মূলানুগ, কিন্তু 'blood'-এর জায়গায় 'শোণিত প্রবাহ' আবারো ব্যাখ্যাধর্মী। রায়ের অনুবাদ 'রক্ত মোর ঘন

---

১২ Come, you spirits
That tend on mortal thoughts, unsex me here,
And fill me, from the crown to the toe, top-full
Of direst cruelty! Make thick my blood,
Stop up th' access and passage to remorse,
That no compunctious visitings of nature
Shake my fell purpose, nor keep peace between
Th' effect and it! Come to my woman's breasts,
And take my milk for gall, you murd'ring ministers,
Wherever in your sightless substances
You wait on nature's mischief! Come, thick night,
And pall thee in the dunnest smoke of hell,
That my keen knife se not the wound it makes,
Nor heaven peep through the blanket of the dark
To cry, "Hold, hold." (I.v) (p. 15-16)

১৩ "Lady Macbeth is the most commanding and perhaps the most awe-inspiring figure that Shakespeare drew." A C Bradley, *Shakespearean Tragedy*, 1904; (London: Macmillan, 1958), p. 307.

করো' অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু হকের 'দাও রক্তস্রোতে এমন প্রবাহ' কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ 'thick' শব্দটি এ সংলাপে গুরুত্বপূর্ণ। তিনটি ভিন্ন শব্দগুচ্ছের পারস্পারিক সম্মার্জন, সংঘাত ও সারাৎসারে পুরো সংলাপে যে ব্যঞ্জনা ও ব্যপ্তি তৈরি হয়েছে তার অন্যতম শব্দগুচ্ছ হচ্ছে 'thick', 'sightless', 'pall', 'dunnest', 'see not', 'blanket' ও 'dark'। অন্য শব্দগুচ্ছদুটির একটি হচ্ছে 'blood', 'milk', 'gall', ও 'wound' এবং অন্যটি 'mortal thoughts', 'direst cruelty', 'compunctious visitings', ও 'murd'ring ministers'। 'Thick' শব্দটি দ্বিতীয়বার ব্যবহার হয়েছে এই বাক্যে 'Come, thick night, And pall thee in the dunnest smoke of hell...'। ঘোষ এর অনুবাদ করেছেন:

> আয় আয় ঘোর রূপা তামসী ত্রিযামা!
> ভীষণ নরক ধূমে আবরিয়া কায়; (পৃ. ৪৫৯)

এখানে 'thick night'-এর অনুবাদ হয়েছে 'ঘোর রূপা তামসী ত্রিযামা'। রায়ের অনুবাদ:

> আয় ঘোর রাত,
> নরকের কৃষ্ণতম ধূম্রজালে নিজেকে আবরি' (পৃ. ১৭)

অনুবাদ হিসেবে অনেক বেশি সংযমী ও সংহত। হকের অনুবাদে ('এসো ঘোর নিশিথীনি নরকের বিষবাষ্পে সব ঢেকে দাও'(পৃ.১৪)) 'thick night' ঠিকভাবে অনূদিত, কিন্তু 'Pall thee in the dunnest smoke of hell'-এর কিছুই অনুবাদ হয়নি। প্রথমত, 'বিষবাষ্প' হতেই পারে না; দ্বিতীয়ত, 'pall thee' অর্থ 'সব ঢেকে দাও' করে তিনি ক্রিয়া পদটির ব্যবহারটাই দিলেন উল্টে। মূলে লেডি ম্যাকবেথ 'ঘন বা গাঢ় বা ঘোর রাতকে' আসতে বলছে 'নরকের গাঢ়তম ধূম্রজালে *নিজেকে* আবৃত করে'। এর আগের বাক্যটির অনুবাদেও হক ব্যর্থ। মূলে আছে:

> Come to my woman's breasts,
> And take my milk for gall, you murd'ring ministers....(p. 15-16)

হক করেছেন:

> এসো তবে রক্তপায়ী প্রেতযোনী,... আমার বক্ষের সুধা বিষ করে দাও। (পৃ.১৪)

বাক্যটির ছন্দ (rhythm) সার্থক, কিন্তু অংশটিই অনুবাদে অনুপস্থিত, 'my woman's breasts' হয়েছে 'রক্তপায়ী প্রেতযোনী', অথচ এর আগে তিনি 'spirits that tend on mortal thoughts' অংশটির অনুবাদও 'রক্তপায়ী প্রেতযোনী' করেছেন। তবে 'take my milk for gall'-এর অনুবাদ 'বক্ষের সুধা বিষ করে দাও' গ্রহণযোগ্য। এ অংশটির সবচেয়ে ব্যর্থ অনুবাদ হয়েছে ঘোষে:

> এস হত্যা-উত্তেজনাকারী!
> ভ্রম যারা অদৃশ্য শরীরে,
> মানব-স্বভাবে পাপ-উত্তেজনা হেতু,
> এস এস নারীর হৃদয়ে,
> পয়ঃ পরিবর্ত্তে বিষ দেহ পয়োধরে! (পৃ. ৪৫৯)

'murd'ring ministers' হলো 'হত্যা-উত্তেজনাকারী' যা একেবারেই অসফল। 'woman's breasts' কোনোভাবেই 'নারীর হৃদয়' নয়। লেডি ম্যাকবেথ এখানে তার দেহজ স্তনের উল্লেখ করছে, আর সেই 'স্তনের দুধকেই বিষে পরিণত করতে বলছে বা দুধ নিয়ে বিষ দিতে বলছে', যার অনুবাদ 'পয়ঃ পরিবর্ত্তে বিষ দেহ পয়োধরে' গ্রহণযোগ্য। রায়ে এ অংশটির অনুবাদ এরকম:

> এসো মোর স্তনদ্বয়ে,
> আমার দুগ্ধকে করো বিষে পরিণত, হে হত্যা-সাথীরা,... (পৃ. ১৭)

রায়ের এ অনুবাদ মূলানুগ, আক্ষরিক, কিছুটা কল্পনা-সীমিত; কিন্তু এ তিনের মধ্যে সবচেয়ে সার্থক। এখানে 'murd'ring ministers' হয়েছে 'হত্যা-সাথীরা', এর আগে 'spirits that tend on mortal thoughts'কে করেছেন 'হত্যার ভাবনা-সাথী পিশাচেরা'— আর এই দুয়ে মিলে তৈরি হয়েছে তাঁর নিজস্ব কিন্তু মূলাশ্রয়ী এক প্যাটার্ন।

এ নাটকের গুরুত্বপূর্ণ সংলাপগুলোর একটি হচ্ছে রাজা ডানকানকে হত্যার আগে ম্যাকবেথের দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সংশয়, সমূহ ভবিষ্যৎ আশঙ্কা ও অলীক প্রতিভাস দর্শন সংবলিত সংলাপটি (I:vii)[১৪]। সংলাপটি শুরু হয় একের পর এক শর্তসাপেক্ষ বাক্যাংশ (conditional clause) দিয়ে যা প্রকাশ করে ম্যাকবেথের মনের আশঙ্কা-সংশয়, কল্পনাপ্রবণ মনের এক জটিল সম্ভাবনার ঘূর্ণাবর্ত। এ সংলাপ অত্যন্ত কাব্যিক, চিত্রকল্পময় কিন্তু একই সাথে অস্বচ্ছ ও জড়ানো। প্রথম বাক্যে একই কাঠামোর চারটি বাক্যাংশ আছে যার প্রত্যেকটিই শুরু হয়েছে 'it' দিয়ে। বাক্যটির গঠন আপাত যৌক্তিক, ম্যাকবেথ নিজের সঙ্গে নিজে যুক্তিপ্রমাণের চেষ্টা করছে। কিন্তু বাক্যটির সমস্তটা জুড়ে আছে 'if' বা 'যদি'র অনিশ্চয়তা, যা এ সম্ভাবনার অসম্ভবপরতাকেই নির্দেশ করে। ঘোষ এর অনুবাদ করেছেন:

> এ কঠিন ব্রত যদি উদ্যাপনে হ'ত উদ্যাপন,
> শ্রেয়ঃ তবে শীঘ্র সমাধান;... (পৃ. ৪৬০)

এ অনুবাদ সুন্দর, কাব্যগুণসম্পন্ন; কিন্তু ঘোষীয় ঢঙে শব্দবাহুল্য-আক্রান্ত: মূলে 'কঠিন' ও 'ব্রত' শব্দ দুটি নেই। রায়ের অনুবাদে:

> শেষের সহিত যদি এ কাজের হয়ে যেত শেষ, যতশীঘ্র
> শেষ তত ভাল; (পৃ.২০)

কাব্যিক অঙ্গহানি ঘটেছে; অর্থ্যাৎ না এটা কাব্যিক না কথন ঢঙের। হকের অনুবাদ 'যদি তাই হয়ে যায় এইই হয়ে গেলে, তবে এইই যত দ্রুত হয়ে যায় ততই উত্তম' শব্দ নিয়ে খেলা কিংবা বড়জোর বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর মতো শব্দ ধরে অনুবাদের চেষ্টা মাত্র। এটা না হয়েছে অনুবাদ না এটাতে আছে ভীষণ এক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংশয়বিদ্ধ মনের গভীর অনুরণন। ঘোষের অনুবাদ এ তিনের মধ্যে শ্রেয়তর তবে সার্থক নয়। বরং রায়ের অনুবাদটিকে সম্পাদনা করে মূলানুগ ও সন্তোষজনক করা যেতে পারে:

> শেষ হলেই যদি এর শেষ হত; তবে শ্রেয়ঃ
> শীঘ্র সমাপণ (বা সমাধান)।

পরের বাক্যটিও একইভাবে শর্ত ও সম্ভাবনার অনিশ্চয়তার সরণ। কিন্তু এর অনুবাদ আরো জটিল, কারণ এর ভাষা জটিলতর চিত্রকল্পময়তায় গ্রন্থিত। এখানে বলা হচ্ছে, হত্যা (assassination) যদি পরিণতিকে বা ফলাফলকে জালে জড়াতে পারত বা আটকে দিতে পারত (trammel up[১৫]), অর্থ্যাৎ হত্যা যদি তার পরিণতিকে নির্দিষ্ট করে দিতে পারত বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারত এবং স্বনিবৃত্তি বা নিজ-সমাপ্তির (surcease) মধ্যে দিয়ে সাফল্যকে বা উদ্দেশ্যকে (success) ধরতে বা হাসিল করতে (catch) পারত; যদি এটা হত যে এই আঘাত বা এক আঘাতই (blow) সবকিছু (be-all) এবং সবকিছুর পরিণতি (end-all); তাহলে এখানে

---

[১৪] If it were done, when 'tis done, then 'twere well
It were done quickly: if th' assassination
Could trammel up the consequence, and catch,
With his surcease, success; that but this blow
Might be the be-all and the end-all ... here,
But here, upon this bank and shoal of time,
We'd jump the life to come. (I:vii) (p.18)

[১৫] আক্ষরিকভাবে এর অর্থ: 'to entangle in a net'. নাটকের এই বিশেষ প্রেক্ষিতে রূপকার্থ: 'to prevent'. C T Onions, *A Shakespeare Glossary*, 1911; (London: Oxford, revised 1966), p. 230.

এই সময়ের ধারে বা তীরে ও জলমগ্ন চড়ায় (bank and shoal[১৬] of time) দাঁড়িয়ে আসন্ন ভবিষ্যৎ বা জীবন বা পরলোককে অবজ্ঞা করতে পারতাম বা সাহস করে ঝুঁকি নিতে পারতাম। এরকম জটিল ও পাকানো এবং একই সাথে অত্যুঙ্গ মানের কাব্যিক ইমেজসমৃদ্ধ ভাষার গদ্যানুবাদই ভীষণ কঠিন। আর এর সার্থক বা গ্রহণযোগ্য সাহিত্যমানসম্পন্ন ও নাট্যগুণপুষ্ট অনুবাদ তো কঠিন হবেই। ঘোষ এর অনুবাদ করেছেন এভাবে:

> লুব্ধকাম হত্যা যদি বারিতে পারিত পরিণাম,
> অস্ত্রাঘাতে ফুরা'ত সকলি,
> ভুঞ্জিতে না হ'ত ফলাফল ইহকালে।
> সংকীর্ণ এ ভব-কুলে দাঁড়ায়ে নির্ভয়ে,
> করিতাম অবহেলা পরকালে। (পৃ.৪৬০)

প্রথম লাইন দুটি সুন্দর। কিন্তু এখানেও 'assassination' হয়েছে 'লুব্ধকাম হত্যা', 'blow' হয়েছে 'অস্ত্রাঘাত'; 'be-all' ও 'end-all' হয়েছে 'ফুরা'ত সকলি'। তৃতীয় লাইনটি ঘোষীয় ঢঙে প্রক্ষেপণ। চতুর্থ লাইনটিতে 'bank and shoal of time' হয়েছে 'ভব-কুলে', আর তার সাথে 'সংকীর্ণ' ও 'নির্ভয়' শব্দ দুটি অতিরিক্ত। রায়ের অনুবাদ:

> যদি এই হত্যাকাণ্ড
> পারিত গুটাতে জালে সব ফলাফল, ও সাথে সাথে
> দিত সফলতা: যদি এই একটি আঘাত
> হোত এই ধরাতলে প্রচেষ্টার আরম্ভ ও শেষ,
> মাত্র এই ধরাতলে, কাল-পারাবার মাঝে অগভীর কূলে;
> পরকাল এক লাফে হয়ে যাব পার। (পৃ. ২০)

এ অনুবাদ আক্ষরিক, কিন্তু খুব সফল নয়। বিশেষ করে 'the be-all and the end-all here'-এর অনুবাদ 'এই ধরাতলে প্রচেষ্টার আরম্ভ ও শেষ' ভাল নয়, একেবারেই অকাব্যিক; আর শেষ লাইনটি 'we'd jump[১৭] the life to come'-এর অনুবাদ 'পরকাল এক লাফে হয়ে যাব পার' একেবারে ব্যর্থ ও হাস্যকর। এ ব্যর্থতার কারণ সম্ভবত রায় তাঁর অনুবাদে চিত্রকল্পটিকে যথাযথ আনবার জন্য 'jump' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'লাফ দেওয়া'-কে রাখতে চেয়েছেন। এর অনুবাদ হক করেছেন এভাবে:

> তবে, এই তবে, সময়ের এই তটে ঝাঁপ দেয়া -- ভুলে গিয়ে আগামী সময়। (পৃ. ১৬)

কোনোভাবেই এটি অনুবাদ নয়, বড়জোর এটা পুনর্লিখন এবং তাও খুব সার্থকভাবে নয়। মূলের 'but this blow|Might be the be-all and the end-all here' অংশটি অবহেলিত। এর সাথে 'But here, upon this bank and shoal of time'-এর অনুবাদ 'এই তবে, সময়ের এই তটে ঝাঁপ দেয়া' একেবারেই অগ্রহণযোগ্য; আর 'We'd jump the life to come'-এর অনুবাদ 'ভুলে গিয়ে আগামী সময়' খুবই দুর্বল।

কর্মের ভবিষ্যৎ ফলাফল নিয়ে শঙ্কিত হওয়ার পাশাপাশি ম্যাকবেথ তার দায়িত্ব নিয়েও বিচলিত হয়। রাজা ডানকান ম্যাকবেথের শুভাকাঙ্ক্ষী, আত্মীয় ও প্রভু; অধিকন্তু তিনি ম্যাকবেথের অতিথি। তাই 'He's here in

---

[১৬] এই বাক্যাংশটি নিয়ে অনেক মতবিরোধ চলেছে। 'bank and shoal' হবে, নাকি হবে 'bank and school' – এ নিয়ে বিরোধ (এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য: M M Mahood, selection from *Shakespeare's Wordplay*, in *Shakespeare: Macbeth* (Casebook Series), ed. John Wain, London: Macmillan, 1978, p. 202-220)। তবে এখন 'bank and shoal' গ্রহণযোগ্য এবং 'shoal'এর অর্থ: 'a narrow strip of land between water', as in *Macbeth* (New Swan Shakespeare series), ed. Bernard Lott, London: Longmans, 1958, p. 42. 'Shoal' শব্দের অর্থ 'shallow'ও হয়, C T Onions, *A Shakespeare Glossary*, London: Oxford, 1966, p. 197.

[১৭] যেখানে 'jump' অর্থ 'to hazard, risk', C T Onions, *A Shakespeare Glossary*, p. 121.

double trust'। ঘোষ এর অনুবাদ করেছেন 'দ্বিগুণ বিশ্বাসভঙ্গ বধিলে ভূপালে'। রায়ে অনুবাদ 'আজ সে হেথায় আছে দ্বিগুণ নির্ভরে'। আর হক করেছেন 'সে অবধ্য উভয়তঃ'। রায়ের অনুবাদ মূলানুগ, কিন্তু ঘোষ ও হকের অনুবাদ ব্যাখ্যামূলক। মূলে 'অবধ্য' বা 'বধিলে' নেই। তবে এ সংলাপের সবচেয়ে কল্পনাঋদ্ধ আর অননুবাদযোগ্য অংশটি আসে এর পরে যখন ম্যাকবেথ ডানকানের গুণাবলির কথা ভেবে কল্পনা করতে থাকে তাঁকে হত্যা করলে তার ফলাফল কি দাঁড়াবে।[১৮] এ অংশটিতে পর পর তিনটি চিত্রকল্পের জটিল বুনন চলেছে। ডানকানকে হত্যা করা হলে তাঁর সদ্‌গুণসমূহ (virtues) তূর্য/শিঙ্গা-জিহ্বাসম্পন্ন (trumpet-tongued) দেবদূতের (angels) মতো তাঁকে হত্যার এই ঘৃণ্য পাপের নিন্দায় (deep damnation) আহাজারি করবে/পঞ্চমুখ হবে (plead)। আর করুণা/দয়া/অনুকম্পা (pity) নগ্ন সদ্যজাত শিশুর মতো (like a naked new-born babe) ঝড়ে/ঝড়ে ভর করে (striding the blast), কিংবা স্বর্গীয় দেবশিশুর (heaven's cherubin) মতো অদৃশ্য বাতাসের ঘোড়ায় চেপে (horsed upon the sightless couriers of the air) সবার চোখে আঘাত করবে ভয়ংকর এ ঘটনার কথা/অপঘাতের কথা (shall blow the horrid deed in every eye), যাতে করে অশ্রুজল/চোখের পানি এ ঝড়কে ডুবিয়ে/থামিয়ে দিতে পারে (that tears shall drown the wind)। শেক্সপিয়রের এ অতুলনীয় লাইনগুলোতে ঘটেছে অভূতপূর্ব বিপ্রতীপের কাব্যিক সমাবেশ। অনুকম্পাকে তুলনা করা হয়েছে সদ্যজাত মানবশিশু ও স্বর্গীয় দেবশিশুর সঙ্গে যারা উভয়েই খুব দুর্বল; কিন্তু তাদের বাহন ঝড় ও অশ্ব, অর্থ্যাৎ এই দুর্বল অনুকম্পা প্রচণ্ড শক্তিকে বাগ মানাতে/আয়ত্তে রাখতে সমর্থ। ঘোষের এ অংশের অনুবাদ একেবারেই অসফল।[১৯] প্রথমত, এটি অনুবাদ নয়, পুনর্লিখন। দ্বিতীয়ত, পুনর্লিখন বলেই এতে মূলের চিত্রকল্পগুলো অবহেলিত, ভুলভাবে ব্যাখ্যাত। ঘোষ 'ধর্ম্মের ভেরী' 'পবন বাহন' 'প্রাণনাশ-উপন্যাস' 'জন-মন দ্রবিবে' 'দেবক্রোধ তুষ্টি' ইত্যাদি কোথায় পেলেন জানি না। পুনর্লিখনের এসব উদাহরণের চেয়েও বড় সমস্যা বা ব্যর্থতা মূলের ভুল পাঠ। তাঁর –

---

১৮ Besides, this Duncan
Hath borne his faculties so meek, hath been
So clear in his great office, that his virtues
Will plead like angels, trumpet-tongued, against
The deep damnation of his taking-off:
And pity, like a naked new-born babe,
Striding the blast, or heaven's cherubin, horsed
Upon the sightless couriers of the air,
Shall blow the horrid deed in every eye,
That tears shall drown the wind. (I:vii) (p. 19)

১৯ বিশেষ এ নরপতি মাৎসর্য্য বিহীন,
সদাশয় অতি, রাজ-কার্য্য অমল তাঁহার;
গুণগ্রাম তাঁর,
বাজায়ে ধর্ম্মের ভেরী নিদারুণ রোলে,
কহিবে সকলে নিদারুণ হত্যাকাণ্ড,
দয়া, পবন বাহনে --
প্রাণনাশ-উপন্যাস ক'বে ঘরে ঘরে,--
জন-মন দ্রবিবে শুনিয়া,
নবশিশু নিরাশ্রয় হেরি যথা দেবদূতগণ,
অশরীরি অশ্বপৃষ্ঠে করি আরোহণ, করিবে ভ্রমণ,
উঠিবে তুমুল ঝড় তাহে।
খর বালুকা সমান, নর-চক্ষে বাজিবে সংবাদ
আঁখিজল বহিবে প্রবল, নিবিড় নীরদধারা সম,
দেবক্রোধ তুষ্টি হেতু। (পৃ. ৪৬০)

নবশিশু নিরাশ্রয় হেরি যথা দেবদূতগণ,
অশরীরি অশ্বপৃষ্ঠে করি আরোহণ, করিবে ভ্রমণ,
উঠিবে তুমুল ঝড় তাহে।

শুধু ভুল পাঠ নয়, এতে মূলের উল্টো চিত্র উপস্থাপিত। মূলের 'সদ্যজাত নগ্ন শিশু' নিরাশ্রয় বা দুর্বল নয়; এর আছে অমিত শক্তিকে শাসন/নিয়ন্ত্রণ করবার অমিত ক্ষমতা। অন্যদিকে, হকের এ অংশটির অনুবাদ কোনো অনুবাদ নয়।[২০] এ অনুবাদ নিয়ে কোনো কথা বলা মুশকিল। তাঁর 'তার হত্যায় চিৎকার করে উঠবে এ মহাপাপ দেখে পবিত্রতা শতকণ্ঠে ঈশ্বরের স্বর্গীয় সোপানে' কোনো অনুবাদ নয়, একটি নতুন সৃষ্টি; কারণ মূলে 'পবিত্রতা' 'শতকণ্ঠ' 'ঈশ্বর' 'স্বর্গীয় সোপান' কোনো কিছুই নেই। আর দ্বিতীয় বাক্যের 'চীৎকার' কি করে 'বাতাসের দুরন্ত ঘোড়ার পিঠে' ছুটবে তাও পরিষ্কার নয়। শেক্সপিয়রীয় চিত্র, ভাষা, ছান্দিক ব্যঞ্জনা সবকিছুকে অবহেলা করে হকের যে পুনঃসৃষ্টির প্রচেষ্টা তাও খুব সফল বলা যায় না। শুধুমাত্র রায়ে এ অংশটির অনুবাদ চেষ্টা হয়েছে মূলের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে।[২১] ছোটখাটো ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর অনুবাদ 'অনুবাদ' হিসেবে গ্রহণযোগ্য (অনেক ত্রুটির একটি, রায় 'angel' 'cherubin' শব্দগুলোকে বাংলা অনুবাদে হুবহু রেখেছেন, যদিও বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার সম্ভব ছিল)।

এ পর্যন্ত যতটুকু আমরা দেখেছি তা থেকেই এ তিনটি অনুবাদের মূল্যায়ন সম্ভব। একটি পুরো দৃশ্য, একটি গৌণ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের একটি দীর্ঘ সংলাপ, আর প্রধান দুটি চরিত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি একক সংলাপ বিচার করবার চেষ্টা করেছি। তবুও পুরো নাটকের অনুবাদ প্রচেষ্টা, প্রক্রিয়া ও মান অনুধাবনের স্বার্থে নাটকের পরের দুএকটি জায়গা থেকে অনুবাদ বিশ্লেষণের চেষ্টা করব।

তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে ব্যাঙ্কোকে হত্যার পর ম্যাকবেথ ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মার মুখোমুখি হয় এবং তার ভিতরের একদিকে শঙ্কা, অনিশ্চয়তা ও বাতিকগ্রস্ততা, অন্যদিকে ক্রমশ দৃঢ়, নির্ভয় ও কৃতসংকল্প হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া প্রকাশ পায়। সে বুঝতে পারে হত্যা ও রক্তপাতের এখনো শেষ হয়নি। সে রক্তের/রক্তপথের/রক্তনদীর মাঝপথে (I am in blood), এখন ফিরে যাওয়া কিংবা সামনে এগিয়ে যাওয়া তার কাছে সমান।[২২]

---

[২০] অধিকন্তু, সুশীল নৃপতি বটে এই ডানকান, পুণ্যবান, ব্রত তার প্রজার পালন, তাই তার হত্যায় চিৎকার করে উঠবে এ মহাপাপ দেখে পবিত্রতা শতকণ্ঠে ঈশ্বরের স্বর্গীয় সোপানে। আর সে চিৎকার, বাতাসের দুরন্ত ঘোড়ার পিঠে সারা বিশ্বে নিমেষে পৌছুবে। আর বিশ্বকে কাঁদাবে। অবিরাম ক্রন্দনে করুণ হবে বিক্ষুব্ধ বাতাস। (পৃ. ১৬-১৭)

[২১] তাছাড়া, এই ডানকান

এত শান্তভাবে করেছে সে রাজ-আচরণ,
এমন কলঙ্কশূন্য তাহার শাসন, যে তার গুনাবলী
ঘোষিবে এঞ্জেলসম তূর্য-জিহ্ব হয়ে
তাহার হত্যার ঘৃণ্য পাপের নিন্দায়;
তার লাগি অনুকম্পা, নবজাত নগ্নদেহ শিশুর মতন,
ঝড়ে ভর করি, অথবা স্বর্গীয় চেরাব,
পবনের অশরীরি অশ্বে আরোহিয়া,
হানিবে সকল চক্ষে এই অপঘাত, যেন
অশ্রুর তরঙ্গ মাঝে ঝড় যাবে থামি। (পৃ. ২১)

[২২]
For mine own good
All causes shall give way: I am in blood
Stepped in so far that, should I wade no more,
Returning were as tedious as go o'er:
Strange things I have in head, that will to hand,
Which must be acted, ere they may be scanned. (III:iv) (p. 49)

ম্যাকবেথের এই সংলাপ তার চরিত্রের বিকাশ ও কাহিনী কাঠামো উভয়ের জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে যেমন এই সংলাপের মধ্য দিয়ে ম্যাকবেথের ট্র্যাজিক সংকট (tragic predicament) ফুটে ওঠে, অন্যদিকে তার চরিত্রের একটি বিশেষ বাঁক, বিকাশকে আমরা লক্ষ করি। নাটকের শুরুর দ্বিধাদ্বন্দ্বগ্রস্ত ভীত ম্যাকবেথ অপরাধী হিসেবে এখানে অনেক বেশি পরিপক্ব হয়ে উঠেছে, রক্ত দেখে সে আর ভয় পায় না। হত্যাকর্মের ফলাফলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ম্যাকবেথের এ শক্ত, সাহসী উচ্চারণ একদিকে যেমন তার চরিত্রের ক্রমশ দৃঢ়তা ও ঋজুতাকে তুলে ধরে, অন্যদিকে তার চরিত্রের এই বিকাশ তার ট্র্যাজিক পরিণতিকে অনিবার্য করে তোলে। সংলাপের এ অংশের ঘোষ যে অনুবাদ করেছেন তার সমস্যায় ভরপুর।[২৩] 'For mine own good|All causes shall give way' তাঁর অনুবাদে হয়েছে 'পথের কণ্টক যত করিয়া মোচন|নিজ কার্য্য করিব সাধন'। এটা অনুবাদ নয় তবে সার্থক পুনর্লিখন। কিন্তু পরবর্তী অংশের অনুবাদ 'এতদূর চলিয়াছি রুধির-আপ্লুত পথে--|অগ্রসর যদি নাহি হয় সে কর্দ্দমে|সম ক্লেশ পুনরাগমনে' সন্তোষজনক নয়। তবে মূল সমস্যা পরবর্তী লাইনগুলোতে। পরবর্তী দুই লাইন 'বিভীষিকা কল্পনা ক'রেছি যত--|করে তাহা করিব সাধন' আড়ষ্ট অনুবাদ এবং শেষের দুই লাইন 'মন্তব্য, করিব অগ্রে কার্য্যে পরিণত,--|অভিপ্রায় কেহ না হইতে অবগত' অর্থহীন।

স্বভাবসুলভভাবেই রায় এ অংশটির অনুবাদে মূলের প্রতি বিশ্বস্ত।[২৪] 'For mine own good|All causes shall give way' তাঁর অনুবাদে হয়েছে 'আমার হিতের লাগি|সব কিছুকেই ছেড়ে দিতে হবে পথ' আক্ষরিকভাবে মূলানুগ ও সার্থক। কিন্তু পরের বাক্যের অনুবাদটি মূলানুগ হলেও কিছুটা আড়ষ্ট। শেষ দুটো লাইন ভালো অনুবাদ, কিন্তু যতিচিহ্নের সমস্যার কারণে সম্ভবত কিছুটা গোলমেলে। লাইনদুটি

> অদ্ভুত অনেক চিন্তা আমার মাথায়, যা আসিবে হাতে;
> আগে তারে করে ফেলা, ভেবে দেখা তাহার পশ্চাতে।

এর পরিবর্তে:

> অদ্ভুত অনেক চিন্তা আমার মাথায়। যা আসিবে হাতে
> আগে তারে করে ফেলা; ভেবে দেখা তাহার পশ্চাতে।

এভাবে লিখলে অর্থপূর্ণ হয়। ঠিক এর উল্টোভাবে হকের অনুবাদ না মূলানুগ অনুবাদ না সার্থক পুনর্লিখন।[২৫] 'For mine own good|All causes shall give way'-এর অনুবাদ 'আর কোন কিছুই এখন আমার

---

২৩ পথের কণ্টক যত করিয়া মোচন
নিজ কার্য্য করিব সাধন,
এতদূর চলিয়াছি রুধির-আপ্লুত পথে--
অগ্রসর যদি নাহি হই সে কর্দ্দমে
সম ক্লেশ পুনরাগমনে।
বিভীষিকা কল্পনা ক'রেছি যত--
করে তাহা করিব সাধন;
মন্তব্য, করিব অগ্রে কার্য্যে পরিণত,--
অভিপ্রায় কেহ না হইতে অবগত। (পৃ. ৪৭৫)
আমার হিতের লাগি
সব কিছুকেই ছেড়ে দিতে হবে পথ। রক্ত ঠেলি
এতদূর এগিয়েছি যদি আমি নাহি হই আর অগ্রসর,
ফিরে আসা হবে নাক' তার চেয়ে কম ক্লেশকর।
অদ্ভুত অনেক চিন্তা আমার মাথায়, যা আসিবে হাতে;
আগে তারে করে ফেলা, ভেবে দেখা তাহার পশ্চাতে। (পৃ. ৫৮)

২৫ আর কোন কিছুই এখন আমার সমুখে নেই। এতদূর রক্তের নদীতে নেমে যদি ছেড়ে দি সাঁতার আমি, ফেরাও তো বড় কষ্টকর। নতুন পরিকল্পনা মাথার ভেতরে, অবিলম্বে আগে সেটা করা চাই, চিন্তা তারপরে। (পৃ. ৪২)

সমুখে নেই' কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। 'I am in blood' হল 'রক্তের নদীতে', এভাবে নতুন চিত্রকল্প তৈরি গ্রহণযোগ্য, কিন্তু এর সাথে সাঁতারের চিত্র জুড়ে মূল থেকে অনেক দূরে সরে যাওয়াটা ঠিক নয়। 'Strange things I've in head'-এর অনুবাদ 'নতুন পরিকল্পনা মাথার ভেতরে' অদ্ভুত শোনালেও শেষ বাক্যটির অনুবাদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।

এ আলোচনার শেষ সংলাপটি নাটকের প্রধান চরিত্রের শেষ একক/স্বগত সংলাপ।[২৬] এ সংলাপ জীবনের ভীষণ এক ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে এক ট্র্যাজিক চরিত্রের বিষাদঘন যন্ত্রণাদগ্ধ উচ্চারণ। ম্যাকবেথ যখন তার জীবনের শেষ ও কঠিনতম সময়ের/যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়াতে যাচ্ছে, তখন খবর আসে তার প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যুর, যে কিনা তাকে সাফল্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে দিতে বিলিয়ে দিয়েছে সবকিছু। স্ত্রীর মৃত্যুর খবরে ম্যাকবেথ সাড়া দেয় ছোট্ট দুটি লাইনে; কিন্তু তার পরেই পাই তার দীর্ঘ এক সংলাপ যা প্রকাশ করে তার জীবনবোধ; তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অপরাধ, নারকীয় হত্যাকাণ্ড ও ততধিক নারকীয় যন্ত্রণাঋদ্ধ ট্র্যাজিক বোধ যেখানে জীবন হয়ে ওঠে এক অর্থহীন বাজে গালগল্প। এ উচ্চারণ একদিকে যেমন বোধের দিক থেকে অত্যন্ত গভীর ও মর্মস্পর্শী, অন্যদিকে ভাষাগত দিক থেকে পুরোপুরি চিত্রকল্পময়, ভীষণরকম কাব্যিক। আর স্বাভাবিকভাবেই এর অনুবাদ অসম্ভবরকমের কষ্টসাধ্য; কিন্তু একই সঙ্গে 'ম্যাকবেথ' অনুবাদের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে এ অংশের সফল অনুবাদের উপর। ঘোষে এ অংশটির অনুবাদ বিভিন্ন দিক থেকে অপ্রতুল।[২৭] তাঁর অনুবাদে

---

২৬ She should have died hereafter;
There would have been a time for such a word.
Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life's but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more: it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing. (V:v) (p. 79-80)

২৭ মরণ আছিল শ্রেয়ঃ পরে।
রাজ্ঞী মৃত —
হেন কথার সময় সঙ্গত হইত কোন দিন।
কল্য – কল্য – কল্য
চলে ধীর পদে দিন দিন,
হয় লয় নির্ণীত সময়ে
প্রারব্ধ লিপির শেষাক্ষরে;
গত কল্য একত্র হইয়ে,
ল'য়ে যায় পথ দেখাইয়ে,
মিশাইতে শ্মশান ধুলায়।
নিভে যা, নিভে যা, ওরে ক্ষণস্থায়ী দীপ!
চলচ্ছায়া মাত্র এ জীবন;
ক্ষুদ্র অভিনেতা, নিজ অভিনয় সময়ে যেমন,
মদগর্ব্বে চলে রঙ্গস্থলে,
হস্ত-পদ সঞ্চালিয়ে গর্জ্জন করিয়ে;
পরে তার তত্ত্ব নাহি জানে কেহ।
বাতুলের গল্প এ জীবন, —
অর্থহীন মাত্র – বহু বাক্য আড়ম্বর। (পৃ. ৪৯১)

সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত রয়েছে মূলের কাব্য-ছন্দ। যুক্তাক্ষর ও সংস্কৃতজ শব্দ ব্যবহার করা সত্ত্বেও তাঁর অনুবাদে মূলের ঘন, কিছুটা ধীর লয়ের ছন্দ হয়ে উঠেছে অনেকটা গীতল, আলগা। দ্বিতীয়ত, ঘোষীয় ঢঙে এখানেও হয়েছে মূলের পরিমিতিবোধের লঙ্ঘন; মূলের ১২ লাইন ঘোষে ঠেকেছে ১৮ লাইনে। তৃতীয়ত, চিত্রকল্পগুলি অবহেলিত, কোথাও কোথাও অসঙ্গত ও অস্পষ্ট। 'To the last syllable of recorded time' হয়েছে 'হয় লয় নির্ণীত সময়ে|প্রারম্ভ লিপির শেষাক্ষরে'। 'And all our yesterdays have lighted fools|The way to dusty death' হয়েছে 'গত কল্য একত্র হইয়ে,|ল'য়ে যায় পথ দেখাইয়ে,|মিশাইতে শ্মশান ধূলায়'। '[D]usty death' হয়ে গেল 'শ্মশান ধূলা', আর 'light' ক্রিয়ার কর্মপদ 'fools' পড়ল বাদ। পরের অংশটুকুর অনুবাদ ভালো, কিন্তু সেখানেও চিত্রকল্পের অনুবাদ যথার্থ নয়। রায়ে এ সংলাপের অনুবাদ আরো অসফল, কিন্তু অনেক বেশি মূলানুগ।[২৮] রায়ে সবচেয়ে ব্যর্থ অনুবাদ প্রথম দুটি লাইনের। 'She should have died hereafter:|There would have been a time for such a word'-কে তিনি অনুবাদ করেছেন 'একদিন তাকে মরিতেই হোত;|এ কথার হইত সময় কোন একদিন।' এটা শুধু অসফল অনুবাদ নয়, ভুল অনুবাদ। 'She should have died hereafter' কোনোভাবেই 'একদিন তাকে মরিতেই হোত' হতে পারে না। বাক্যটির গদ্যার্থ এ রকম: 'তার/তাকে অন্য সময় মরতে হোত' বা 'তার উচিত ছিল অন্য সময় মারা যাওয়া'। পরের বাক্যটির অনুবাদ আক্ষরিক। যদিও আমাদের সন্তুষ্ট করে না তবুও ঘোষের অনুবাদ থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু সমস্তটা মিলে তাঁর অনুবাদের ছন্দে, বোধে, কাব্যিক ব্যাপ্তিতে যে আবহ গড়ে তোলে তা মূলকে তুলে ধরতে সফল হয় না। এ অংশটির হকের অনুবাদের[২৯] প্রথম সমস্যা তাঁর গদ্য-ছন্দ বা গদ্য-কাব্যের ছন্দ। মূলের ব্ল্যাঙ্ক ভার্সের সঙ্গে চিত্রকল্প ও বিষাদঘন স্বর মিলিয়ে যে আবহ তৈরি হয় তার কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না হকের এই অনুবাদে। তবে এ সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে যদি শুধু বাক্য ও চিত্রকল্প বিবেচনা করা হয়, তাহলে তাঁর অনুবাদ, ছোটখাটো কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও, অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য। ত্রুটিগুলির মধ্যে চোখে পড়ে দ্বিতীয় লাইনের অনুবাদ। 'There would have been a time for such a word'-কে তিনি করেছেন 'তেমন সময় যদি হতো এই উচ্চারণ যাতে'। এটা অগ্রহণযোগ্য। লাইনটির গদ্যানুবাদ: 'সে/তেমন সময় হয়তো এমন কথা বলা যেত/শোনবার সময় থাকত' বা 'এ ধরনের কথার জন্য তখন হয়তো সময় থাকত'।

---

২৮ একদিন তাকে মরিতেই হোত;
এ কথার হইত সময় কোন একদিন।
আজিকার পরে কাল, তারপরে কাল, আর কাল,
শম্বুকগতিতে চলে দিন অনুদিন,
লিপিবদ্ধ সময়ের শেষ অক্ষরাবধি;
মোদের বিগত-কাল আলো জ্বালি মূঢ় আমাদের
দেখায়েছে মৃত্যুমুখে পথ ধূলিময়। নিভে যাক্, নিভে যাক্, ক্ষণস্থায়ী দীপ!
জীবন ত শুধু চলমান ছায়া, তুচ্ছ অভিনেতা
রঙ্গমঞ্চ পরে যেবা করে অভিনয় আপনার নগণ্য ভূমিকা সদম্ভ গর্জনে,
পরে আর শোনা নাহি যায়; এ এক কাহিনী
যার কথক নির্বোধ, শব্দ-আড়ম্বরে পূর্ণ,
যার অর্থমাত্র নাই। (পৃ. ৯৭)

২৯ তাঁর মৃত্যু অন্য কোনো কালে হয় হতো। তেমন সময় যদি হতো এই উচ্চারণ যাতে। সমুখের দিন পরে দিন, পায়ে পায়ে বড় দীন মিছিলের অগ্রসর দিন থেকে দিনে বহমান সময়ের শেষ বিন্দু বিপলের দিকে; আর আমাদের পেছনের দিনগুলো আলো ধোরে ধূসর মৃত্যুর দিকে বোকাদের পথ দেখিয়েছে। যাও, নিভে যাও, নিভু নিভু দীপ, জীবন নিতান্ত এক চলমান ছায়া, হতভাগ্য এক অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে কিছুকাল লাফায় ঝাঁপায়, তারপর আর শোনা যায় না সংবাদ। এ হলো কাহিনী এক নির্বোধ কথিত, অলংকারে অনুপ্রাসে ঠাসা ইতি তাৎপর্যবিহীন। (পৃ. ৬১-৬২)

তিন

তিনটি অনুবাদের এই তুলনামূলক আলোচনায় তাদের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। গিরিশ ঘোষ ছিলেন শেক্সপিয়র অনুবাদের পথিকৃৎ। তিনি নিজে ছিলেন তাঁর সময়ের একজন প্রধান কবি-নাট্যকার। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর অনুবাদে সন্নিবেশ ঘটেছে তার নিজস্ব ঢঙের কাব্যকলার, নাট্যশৈলীর। তাই তাঁর অনুবাদ কাব্যগুণসম্পন্ন এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে মূল্যবান হলেও তাকে *ম্যাকবেথের* বিশ্বস্ত অনুবাদ হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না। রায়ের অনুবাদ ঘোষ-প্রভাবিত, কিন্তু একই সাথে ঘোষের সমস্যা থেকে উত্তরণ-চেষ্টা। কিন্তু ঘোষের পরিমিতিবোধের লঙ্ঘন, অনুবাদের ক্ষেত্রে যথেচ্ছ স্বাধীনতা, প্রক্ষেপণ ইত্যাকার সত্ত্বেও তাঁর অনুবাদ অনেক বেশি সাবলীল, কারণ তিনি শ্রেয়তর অনুবাদ-কবি। হকের অনুবাদ গদ্যছন্দে এবং এক অর্থে আধুনিকীকরণ প্রচেষ্টা। তাঁর অনুবাদে বেশ কিছু উপমা, চিত্রকল্প সার্থকভাবে অনূদিত, কিন্তু মূলের কাব্যকলার আর সবকিছুই অবহেলিত। এমনকি এটি তাঁর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদও নয়।[৩০] রায়ের অনুবাদ সবচেয়ে বেশি মূলানুগ, অনেকটা আক্ষরিক, ফলে কখনো কখনো যান্ত্রিক, ঘোষের অনুবাদের চেয়ে অনেক কম আবেদন-সঞ্চারী; কিন্তু সবটা মিলিয়ে রায়ের অনুবাদ অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।[৩১] আরো সফল, আরো বেশি গ্রহণযোগ্য অনুবাদ যতদিন না হচ্ছে ততদিন রায়ের অনুবাদই প্রতিনিধিত্বশীল অনুবাদ।

গ্রন্থপঞ্জি

ঘোষ, গিরিশচন্দ্র। *গিরিশ রচনাবলী*, ৪র্থ খণ্ড, দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৪।

রায়, নীরেন্দ্রনাথ। *ম্যাকবেথ*। কলিকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৫৭।

হক, সৈয়দ শামসুল। "*ম্যাকবেথ*"। ঢাকা: *থিয়েটার* পত্রিকা, ত্রয়োদশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪।

Shakespeare, William. *Macbeth*. ed. John Dover Wilson. London: Cambridge, 1963.

Shakespeare, William. *Macbeth* (New Swan Shakespeare series). ed. Bernard Lott. London: Longmans, 1958.

The Living Shakespeare. ed. Oscar James Campbell. New York: Macmillan, 1949; reprint 1958.

Bassnett-McGuire, Susan. *Translation Studies*. London: Methuen, 1980.

Bassnett, Susan & Harish Trivedi. *Post-Colonial Translation*. London: Routledge, 1999.

Bradley, A C. *Shakespearean Tragedy*. 1904; London: Macmillan, 1958.

Brown, John Russell. *Shakespeare: The Tragedy of Macbeth*. London: Edward Arnold, 1963; reprint 1967.

Niranjana, Tejaswini. *Siting Translation*. Berkeley: University of California Press, 1992.

Onions, C T. *A Shakespeare Glossary*. 1911; London: Oxford, revised edition 1966.

Steiner, George. *After Babel*. New York: Oxford, 1975; 3rd edition 1998.

Wain, John ed. *Macbeth* (Casebook Series). London: Macmillan, 1978.

---

[৩০] তিনি নিজেই তাঁর 'চরিত্রলিপি' পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'বৃটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে নাগরিক-থিয়েটার যৌথ প্রযোজনার জন্য ঈষৎ *সংক্ষেপিত* পাঠ।' পৃ. ১।

[৩১] সাহিত্যানুবাদের মান, প্রকার ও সার্থকতা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্যে এটি সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আমার এ মতামত মূলত জর্জ স্টাইনারের *After Babel*, (1975; New York: Oxford, 3rd edition, 1998) নামক গ্রন্থের ৫ম অধ্যায় 'The Hermeneutic Motion'-এ আলোচিত তাঁর মতামতের উপর নির্ভরশীল।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ৯ম সংখ্যা ১৪০৮

চর্যাপদের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য

কৃষ্ণপদ মণ্ডল*

Abstract: *Caryapada* (songs from 10th–12th century) may be considered as the oldest evidence in Bangla literature and music. Bangali musicians originally created some ragas of *Caryapada*. Its musical characteristics (ragas) occupy an important position in Indian classical music and they are still in use to some extent. Regarding *Caryapada* many critics have focused on its religious doctrines, linguistic components, philosophy of life, etc., but so far no one has discussed in detail its musical aspects, specially the ragas. This paper attempts to make a detailed discussion on the ragas mentioned in *Caryapada*. A special focus is given on those ragas that are still in use in South Indian classsical tradition. This paper also recommends that the ragas of *Caryapada* could be published in audio-record form with apropriate notations.

ভূমিকা

সাধারণত ধর্মগ্রন্থ এবং বাংলা ভাষাতত্ত্বের উপাদান হিসেবে চর্যাপদ অধিক আলোচিত। চর্যাপদকে বাংলা গীতিকাব্যের আদিরূপ হিসেবেও অনেক সমলোচক উল্লেখ করেছেন। তবে চর্যার শিরোনামে রাগের নাম থেকে এটা খুবই স্পষ্ট যে, মূলত গান হিসেবে এগুলো রচিত হয়েছিল। গানের শ্রেণী বা শৈলীর দিক থেকে চর্যাপদকে প্রবন্ধ শ্রেণীর গান মানা হয়ে থাকে যা আধুনিক কালের দৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গসংগীত বা শাস্ত্রীয়সংগীত অথবা রাগসংগীত ধারার অন্তর্গত। প্রায় সকল চর্যাগীতির শিরোনামে রাগের নামটি আধুনিক কালের বিভিন্ন শৈলীর বন্দিশের (composition বা গানের বাণী) মতো উল্লেখ করা থাকলেও অধিকাংশ সমালোচক সংগীতের এই বৈশিষ্ট্যকে গভীরভাবে আলোচনায় আনেননি। বাংলা গানে রাগ-সম্পৃক্ততার পটভূমিতে চর্যাপদ, চর্যাপদে ব্যবহৃত রাগের বিশুদ্ধতা ও ব্যবহারিক অনুবৃত্তি, বাণী ও ভাবের সাথে রাগের ব্যঞ্জনা, চর্যাপদে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় রাগের সমাবর্তন, ইত্যাদি বিষয় বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য ।

বাংলা গানের রাগ-বৈশিষ্ট্য

বাংলা গানে ঐতিহ্যগতভাবে রাগের আত্মিক যোগাযোগ হয়তো চর্যার আগেই ঘটেছিল, যা তৎকালীন সর্বভারতীয় মূল ধারার মার্গ সংগীতের (নিবদ্ধগান) সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু সেই সময়ের বাংলা গানের রূপ সম্পর্কে আমরা স্পষ্টত কিছুই জানতে পারছি না বা এর স্বরূপ আদৌ আবিস্কৃত হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। "কেননা চর্যার যে প্রবন্ধরূপ তা সাংগীতিক বিকাশের প্রাথমিক স্তর হতে পারে না। আর চর্যা বিশেষ করে বাংলার কোন আঞ্চলিক সংগীতপ্রবন্ধ ছিল না। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধের সংগীতশাস্ত্রী শার্ঙ্গদেব থেকে শুরু করে ষোড়শ শতকের বেঙ্কটমখী পর্যন্ত অনেক সংগীতালোচক চর্যা প্রবন্ধগীতির বিবরণ দিয়েছেন। তাতে খুব সহজেই ধরে নেয়া যায় এই গান ছিল এক ধরনের শাস্ত্রীয় সংগীত এবং এর রূপটি ছিল সর্বভারতীয়।"[১] এছাড়া চর্যায় ধর্মতত্ত্ব বা সমাজচিত্রের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, রাগসংগীতের ভাবগম্ভীর বিষয় ও বাণী হিসেবে তা

* ড. কৃষ্ণপদ মণ্ডল, প্রভাষক, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। অর্থ্যাৎ প্রতিটি রাগের স্বরবৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্বের সাথে বাণীর সঠিক ব্যবহার হিসেবে তা যথেষ্ট উন্নত মানের বলে বিবেচনা করা যায়। চর্যার সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় রাগকে তাই কোনোক্রমেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কেননা চর্যাগুলি রচনার সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত ধারার গুরু শিষ্য পরম্পরায় রাগের চর্চা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। আধুনিক কালেও রাগের বন্দিশ হিসেবে চর্যাগুলির উপস্থাপনা বা গীত-স্বরূপ বেশ মনোরঞ্জক হতে পারে।

পণ্ডিত মাতঙ্গের সময়কাল (আনুমানিক খ্রিস্টীয় ৫ম শতক) থেকে ভারতীয় সংগীতে রাগের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাগের স্বরূপকে মনে রাখার জন্য এ সময়ে বিভিন্নভাবে এগুলিকে বর্গীকরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর ফলস্বরূপ রাগ-রাগিণী বর্গীকরণ, রাগ-রাগাঙ্গ বর্গীকরণ, মেল-রাগ বর্গীকরণ ইত্যাদি পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে প্রচলনের চেষ্টা করা হয়। চর্যায় কোনো রাগিণীর নাম বা রাগিণী শব্দের উল্লেখ না থাকায় ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, চর্যাগুলো রাগ-রাগিণী বর্গীকরণে পরবর্তী সময়ের রচনা এবং চর্যাগুলি রচনার সময়ে রাগের স্বরূপ বেশ সুনিশ্চিত ও প্রসার লাভ করেছিল।

চর্যার বিষয় ও প্রকরণ

চর্যাপদ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯১১-৬৪) কয়েকটি চর্যার অডিও রেকর্ড সংগ্রহ করেছেন, যা বর্তমানেও গীত হতে শোনা যায়। তিনি এগুলি (২০টির মতো) লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আর্নল্ড বাকের কাছে থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, যা ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যকে লেখা একটি চিঠির বিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে [অতীন্দ্র মজুদার, চর্যাপদ, কলকাতা, নয়া প্রকাশন, ৮ম মুদ্রণ ১৯৯৯, পৃ : ১৩]। এই রেকর্ডগুলি চর্যার সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ও রাগের তুলনামূলক আলোচনায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। প্রচলিত রাগ, সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন গীতশৈলীর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট স্বরূপে প্রসার লাভ করেছে। সকল শৈলীতেই একটি রাগের স্বরূপ বা সংগঠিত স্বরবৈশিষ্ট্য শৈলীগত বৈচিত্র্যের মাঝে অভিন্ন থাকে। যেমন বর্তমান কালের ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী, তারানা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ ইত্যাদি যে কোনো রাগসংগীতের শৈলীতে কোনো একটি রাগ পরিবেশন করা হলে এর স্বর-স্বরূপের কোনো পরিবর্তন হয় না। তেমনি চর্যায় উল্লেখিত রাগগুলি প্রবন্ধ শ্রেণীর শৈলীর কারণে বিশুদ্ধ স্বরূপ হিসেবে আধুনিক কালে এসেও একই রকম আছে এমন ভাবা যায়। কেননা সংগীত গুরুমুখী বিদ্যা এবং যতই তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে একে সাজানো হোক না কেন, গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মৌখিকভাবেই কেবল কারো পক্ষে একটি রাগকে আয়ত্তে আনা বা পরিবেশনার উপযোগী করা সম্ভব। কখনো কোনো শিষ্য কোনো জানা বা অজানা রাগের বিষয়ে ধৃষ্টতা বা রাগটির স্বর-স্বরূপের বিচ্যুতি ঘটাতে পারেন না। রাগসংগীতের গুরু-শিষ্য পরম্পরা হাজার বৎসর ধরে শ্রুত-স্মৃতি মাধ্যমে প্রচলিত হয়ে আসছে। বর্তমানে উত্তর ভারতীয় (হিন্দুস্থানি) এবং দক্ষিণ ভারতীয় (কর্ণাটকি) রাগসংগীত যে কোনো স্থানে, যে কোনো ভাষাতে পরিবেশন করা হোক না কেন, এর স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে একই রকম ভাবাবেশের সৃষ্টি করে। চর্যায় উল্লেখিত রাগগুলি আজকালকার ধর্মীয় উপাসকদের মধ্যে কিভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে, তা গবেষণার বিষয় কিন্তু রাগসংগীতের শিল্পীদের মধ্যে রাগগুলি অভিন্ন স্বরূপে এবং বিশুদ্ধভাবে চর্চিত হচ্ছে, এমন ভাবা বা বলা অযৌক্তিক নয়। বাংলা চর্যাপদ বৌদ্ধদের সাধনতন্ত্রের গান। এগুলির মর্মার্থ সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। রাগসংগীতে প্রশিক্ষিত হওয়ার মতোই চর্যায় বর্ণিত সাধনতন্ত্রের গূঢ় রহস্য বা অর্থ গুরু-শিষ্য পরম্পরায় নিহিত। গানগুলি সাধারণ অর্থে লৌকিক জীবনের কাহিনী বা ঘটনা দিয়ে উপমা-অলংকারে বর্ণিত, তাই সাধারণ মানুষ এই সকল গানের বাণী থেকে মনোরঞ্জনের সুযোগ পেত এমন ধারণা করা যায়। একইভাবে মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা পদাবলী সংগীতের মধ্য দিয়ে বাঙালিরা আধ্যাত্মিক প্রেম-ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে বা ভাবে আপ্লুত হয়েছে। চর্যার পরে রচিত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' প্রবন্ধ শ্রেণীর সংগীত এবং বিশুদ্ধ রাগের চর্চায় পরবর্তীকালে কয়েক শতক পর্যন্ত (ধ্রুপদ শৈলীর জনপ্রিয়তার পূর্ব পর্যন্ত) ভারতের সর্বত্রই চর্চিত ও প্রচলিত হয়েছে। আধুনিক কালে এসে রাগের বিশুদ্ধ ভাবনায় বাঙালিরা সজাগ হয়েছে নিঃসন্দেহে। ধ্রুপদ শৈলী ঘরানাগতভাবে বাংলায় চর্চা হয়েছে এবং হচ্ছে। আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে বাঙালি সঙ্গীত

সাধকগণ রাগের বিশুদ্ধতা পুরোপুরি রক্ষা করেও খেয়াল, টপ্‌পা শৈলীতেও বাংলা ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়ে আসছেন।

চর্যার জীবনচিত্র বাংলার। এর রচনাকাল নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতবিরোধ আছে; কিন্তু চর্যায় উল্লিখিত রাগের নাম বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে ঐতিহ্য তথা গৌরবের বিষয়। শার্ঙ্গদেব বা অন্যান্য সংগীতজ্ঞদের চর্যার বিবরণে যে সমাজ চিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায় বাংলা চর্যা গানে তার পার্থক্য লক্ষণীয়। অন্যান্যদের বর্ণনায় উচ্চ শ্রেণীর মানুষের গান হিসেবে চর্যা বর্ণিত হয়েছে। বাংলার চর্যাগুলি সাহিত্য, জীবন, ধর্মতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্বের বিষয়ে যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, রাগসংগীতের বিষয়ে তার চেয়েও অনেক বেশি স্মরণীয়। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় রাগসংগীত যত সুষ্ঠুভাবে কঠোর সাধনা বা অনুশাসনের মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হয়, সেদিক থেকে এর বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। অন্যদিকে ভাষার পরিবর্তনকে রাগসংগীত সহজেই গ্রহণ করতে পারে। যেমন সংগীত কল্পদ্রুম গ্রন্থের হাজার হাজার ধ্রুপদ বন্দিশ (composition) সংস্কৃত ভাষায় রচিত, কিন্তু স্বরলিপি না থাকায় এবং এই ভাষার গুরুত্ব কমে যাওয়ায় আজ আর তা প্রচলনে নেই। তবে ধ্রুপদ শৈলীর প্রচলিত অন্যান্য ভাষার বন্দিশের কোনো অভাব নেই এবং অদ্যাবধি বিভিন্ন ভাষায় বন্দিশ রচিত হচ্ছে; আর উল্লেখ্য যে, এতে রাগ-স্বরূপেরও কোনো পরিবর্তন হয়নি। চর্যার শিরোনামে উল্লিখিত দুই একটি রাগ ছাড়া প্রায় সবগুলি রাগ-ই আধুনিক কালে প্রচলিত আছে এবং কোনো কোনো রাগ বেশ জনপ্রিয়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত চর্যাপদে ২৩ জন পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। পদ রচয়িতাগণ সকলেই সংগীত বিশেষজ্ঞ ছিলেন কিনা, তা আমরা জানতে পারছি না। তবে একই রাগের ব্যবহার একাধিক পদরচয়িতার চর্যায় পাওয়া যাচ্ছে বা একজন পদকর্তার ভণিতাযুক্ত একাধিক রাগে পদ রচনা থেকে স্পষ্টতই প্রমাণ হয় যে, রচয়িতাগণ সকলেই কমবেশি রাগসংগীতে অভিজ্ঞ ছিলেন। রাগসংগীতের ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্‌পার বন্দিশে আধুনিক কালেও এ ধরনের ভণিতাযুক্ত বন্দিশ পাওয়া যায় বা রচিত হচ্ছে। তানসেন, সদারঙ্গের (নিয়ামৎ খাঁ) মতো সংগীতজ্ঞদের ভণিতাযুক্ত বন্দিশ প্রাচীন ধারাকে অনুসরণ করেই রচিত হয়ে থাকবে। আর লঘুসংগীত ধারায় সংগীতজ্ঞদের ভণিতাযুক্ত গান তো অহরহই পাওয়া যায়। চর্যাগীতির একটি মাত্র গ্রন্থে ২৩ জন সংগীতজ্ঞের ভণিতাযুক্ত গান থেকে আরো অনুমান করা যায় যে, সেই সময়ে আরো অনেক রাগে পদ রচিত ও গীত হয়ে থাকবে, যেগুলি সংগৃহীত হয়নি বা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে এবং কোনো সংগীতানুরাগী ভক্ত, পৃষ্ঠপোষক, সংগীতজ্ঞ বা সংগঠনের সহযোগিতায় এগুলি সংগৃহীত হয়েছে। আধুনিক কালে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে একইভাবে অনেক প্রচলিত ও অল্পপ্রচলিত রাগের বন্দিশ সংগ্রহ করে ক্রমিক পুস্তক মালিকায় (১-৬ ভাগ হিন্দী) প্রকাশ করেছেন এবং তিনি নিজেও একজন সংগীতজ্ঞ। ভরতনাট্যশাস্ত্র, বৃহদ্দেশী, সংগীত রত্নাকরের মতোই ভাতখণ্ডের ক্রমিক পুস্তক মালিকা (১-৬ খণ্ড) এবং ভাতখণ্ডে সংগীতশাস্ত্র (১-৪ খণ্ড) গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

চর্যার রাগ-বিশ্লেষণ

চর্যায় প্রচলিত রাগ সেই সময়ে কিভাবে গাওয়া হতো, তা আমরা জানি না। তবে প্রবোধচন্দ্র সেন সংগৃহীত চর্যার তিব্বতি অনুবাদে ২৪ সংখ্যক গানের শিরোনামে ইন্দ্রতালের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, অন্যান্য গানেও রাগের নামের সাথে তালের নাম উল্লেখ ছিল, কিন্তু সংকলন প্রস্তুত করার সময়ে যে কারণেই হোক তালের নাম বাদ পড়েছে। সেজন্য কি কি রাগে চর্যা গাওয়া হতো তা জানা গেলেও কোন কোন তালের ব্যবহার হতো তা জানা যাচ্ছে না। যেসব রাগে চর্যা রচিত হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে পটমঞ্জরী, গবড়া, গউড়া, গবুড়া, অরু, গুজঁরী, গুঞ্জরী, দেবক্রী, দ্বেশাখ, ভৈরবী, ভৈরব, কামোদ, ধনসী, রামক্রী, বড়ারী, বরাড়ী, বলাডিড, শীবরী, মল্লারী, মালসী, মালশী, কাহ্ন-গুংজরী, শবরী, বঙ্গাল, ও মালসীগবুড়া।

নিচে ২৩ জন রচয়িতার নাম, রাগের নাম, পদসংখ্যাসহ চর্যার প্রথম লাইনের একটি তালিকা তুলে ধরছি। চর্যাপদের প্রথম পঙ্‌ক্তির পাঠ অতীন্দ্র মজুমদারের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

রচয়িতার নাম	রাগের নাম[২]	চর্যাসংখ্যা	প্রথম পঙ্‌ক্তি
১. লুইপাদ	পটমঞ্জরী	চর্যা ১	কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
	পটমঞ্জরী	চর্যা ২৯	ভাব ন হোই অভাব ণ জাই।
২. কুক্কুরীপাদ	গবড়া (গউড়া)	চর্যা ২	দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
	পটমঞ্জরী	চর্যা ২০	হাঁউ নিরাসী খমণ সাঈ।
	পটমঞ্জরী	চর্যা ৪৮	(মূল চর্যাপদটি পাওয়া যায়নি)
৩. বিরুআ	গবড়া (গউরা)	চর্যা ৩	এক সে শুণ্ডিনী দুই ঘরে সান্ধঅ।
৪. গুণ্ডরীপাদ	অরু	চর্যা ৪	তিঅড়া চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।
৫. চাটিলপাদ	গুর্জরী (গুঞ্জরী)	চর্যা ৫	ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
৬. ভুসুকুপাদ	পটমঞ্জরী	চর্যা ৬	কাহেরে ঘিণি মেলি আচ্ছহু কীস।
	বরাড়ী	চর্যা ২১	নিসি অন্ধারী মুসার চারা।
	বরাড়ী	চর্যা ২৩	জই তুহ্মে ভুসুকু অহেরি জাইবেঁ মারিহসি পঞ্চজণা।
	কামোদ	চর্যা ২৭	অধরাতি ভর কমল বিকসিউ।
	মল্লারী	চর্যা ৩০	করুণা মেহ্ নিরন্তর ফরিআ।
	কাহ্নগুঞ্জরী	চর্যা ৪১	আই অণুঅনা এ জগ রে ভাংতিএঁ সো পড়িহাই।
	বঙ্গাল	চর্যা ৪৩	সহজ মহাতরু ফড়িঅএ তৈলোএ।
	মল্লারী	চর্যা ৪৯	বাজ ণাব পাড়া পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
৭. কাহ্নুপাদ	পটমঞ্জরী	চর্যা ৭	আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।
	পটমঞ্জরী	চর্যা ৯	এবংকার দৃঢ় বাখোড় মোড়িঅ।
	দেশাখ	চর্যা ১০	নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
	পটমঞ্জরী	চর্যা ১১	নাড়ি শক্তি দিট ধরিঅ খট্টে।
	ভৈরবী	চর্যা ১২	করুণা পিড়ি খেলহুঁ নঅবল।
	কামোদ	চর্যা ১৩	তিশরণ ণাবী কিঅ অঠকমারী।
	গউরা	চর্যা ১৮	তিনি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ।
	ভৈরব	চর্যা ১৯	ভবনির্বাণে পড়হ মাদলা।
	ইন্দ্রতাল*	চর্যা ২৪	[তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে আধুনিক বাংলায় রূপান্তর]
কাহ্নিলা (কাহ্নুপাদ)	পটমঞ্জরী	চর্যা ৩৬	সুন বাহ তথতা পহারী।
	মালসী গবুড়া	চর্যা ৪০	জো মণ গোএর আলা জালা ।
	কামোদ	চর্যা ৪২	চিঅ সহজে শূণ সংপুন্না।
	মল্লারী	চর্যা ৪৫	মণ তরু পাঞ্চ ইন্দি তসু সাহা।
৮.কামলি (কম্বলাম্বরপাদ)	দেবক্রী	চর্যা ৮	সোনে ভরিলী করুণা নাবী ।
৯. ডোম্বীপাদ	ধনসী	চর্যা ১৪	গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাঈ।
১০. শান্তিপাদ	রামক্রী	চর্যা ১৫	সঅ সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁতে অলক্খ লক্খণ ন জাই।
	শবরী	চর্যা ২৬	তুলা ধুণি ধুণি আসু রে আঁসু।
১১. মহিণ্ডাপাদ	ভৈরব	চর্যা ১৬	তিনিএঁ পাটেঁ লাগেলি রে অনহ কসণ ঘণ গাজই।
১২. বীণাপাদ	পটমঞ্জরী	চর্যা ১৭	সূজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
১৩. সরহপাদ	গুঞ্জরী	চর্যা ২২	অপণে রচি রচি ভবনির্বাণা।
	দেশাখ	চর্যা ৩২	নাদ ন বিন্দু ন রবি ন শশিমণ্ডল।
	ভৈরব	চর্যা ৩৮	কাঅ ণাবড়ি খাণ্ডি মণ কেড়ুআল।
	মালসী	চর্যা ৩৯	সুইণেঁ হ অবিদারঅ রে নিঅমন তোহোরেঁ দোসে।

১৪. তান্তিপাদ	রাগ লেখা নেই*	চর্যা ২৫	[তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে বাংলায় রূপান্তর]
১৫. শবরপাদ	বলাডিড (বলাড়ি বা বরাড়ি)	চর্যা ২৮	উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
	রামক্রী	চর্যা ৫০	গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হিএঁ কুরাড়ী।
১৬. আজদেব	পটমঞ্জরী	চর্যা ৩১	জহি মন ইন্দিঅরণ হো ণঠা।
১৭. ঢেন্ঢণপাদ	পটমঞ্জরী	চর্যা ৩৩	টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
১৮. দারিকপাদ	বরাড়ী	চর্যা ৩৪	সুনকরুণুরি অভিন চারে কাঅবাকচিঅ।
১৯. ভাদেপাদ	মল্লারী	চর্যা ৩৫	এতকাল হাঁউ অচ্ছিলেঁসু মোহে।
২০. তাড়কপাদ	কামোদ	চর্যা ৩৭	অপণে নাহিঁ মো কাহেরি শঙ্কা।
২১. কঙ্কণপাদ	মল্লারী	চর্যা ৪৪	সুণে সুণে মিলিআ জবেঁ।
২২. জয়নন্দী	শবরী	চর্যা ৪৬	পেখই সুঅণে অদশ জইসা।
২৩. ধামপাদ	গুঞ্জরী	চর্যা ৪৭	কমল কুলিশ মাঝে ভই ম মিঅলী।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত চর্যাপদের ২৬ নং চর্যায় শীবরী; ১৬, ১৯, ৩৮ নং চর্যায় ভৈরবী; ২৩ নং চর্যায় বড়ারী; ৩২ নং চর্যায় দেশাখ; ৩৯ নং চর্যায় মালশী বানান যুক্ত রাগের নাম পাওয়া যাচ্ছে।[৩]

এবারে চর্যায় বর্ণিত প্রতিটি রাগের বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো। প্রথমেই উল্লেখনীয় যে কোনো কোনো চর্যার রাগের নাম 'টীকা' থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থের সম্পাদনায় চর্যায় কোনো কোনো রাগের নামের বানানে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। রাগের নামের বানানের দিকটি সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ বানানে সূক্ষ্মতম পার্থক্য থেকে রাগ-ভ্রমের সৃষ্টি হতে পারে, যেমন আধুনিক কালের প্রচলিত দুটি রাগ 'বাগেশ্রী' এবং 'রাগেশ্রী'। রাগ দুটির বানানের প্রথম অক্ষরে 'ব' এবং 'র' এর পার্থক্য থেকে মনে হতে পারে কোনো একটির বানানে ভুলক্রমে পৃথক দেখানো হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে দুটিই পৃথক রাগ এবং বিশেষ জনপ্রিয়। চর্যার এ ধরনের পাশাপাশি বানানে এক বা একাধিক রাগের বিষয়ে সে দিক থেকে আলোচনা করার চেষ্টা করবো। আবার একই রাগের একাধিক স্বরূপের বিষয়েও প্রচলিত মতকে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। চর্যার রচয়িতাগণ সকলেই সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় সকলেরই জীবনী "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা" নামে প্রথমে যে বইটি প্রকাশ করেছেন সেখানে লিপিবদ্ধ করেছেন। গুরু-শিষ্যের পরম্পরায় রাগসংগীতের ধারায় সকলেই অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় এবং হতে পারে বর্ণিত রাগের কোনো কোনোটি চর্যা রচয়িতাদের কারো নিজের সৃষ্ট রাগ।

১. রাগ পটমঞ্জরী

পটমঞ্জরী নামে দুটি রাগ প্রচলনে আছে। একটি বিলাবল ঠাটের এবং অপরটি কাফি ঠাটের অন্তর্গত। চর্যাপদে পটমঞ্জরী রাগটি সর্বাধিক (১২টি চর্যায়) ব্যবহার হয়েছে এবং ৭ জন পদরচয়িতা রাগটি ব্যবহার করেছেন। আধুনিক কালে রাগটি কম শোনা গেলেও চর্যায় অধিক ব্যবহারের জন্য ধারণা করা যায়, রাগটি সেই সময়ে বেশ জনপ্রিয় ছিল। রাগ দুটি সম্পর্কে পৃথক আলোচনা করা হবে।

ক. পটমঞ্জরী (বিলাবল ঠাট)

বিলাবল ঠাটের পটমঞ্জরী রাগকে কোনো কোনো সংগীতজ্ঞ 'বঙ্গাল বিলাবল'-ও বলে থাকেন।[৪] রাগটি পরিবেশনের সময় মন্দ্রসপ্তকের পঞ্চম (প) স্বর থেকে মধ্যসপ্তকের ঋষভ (রে) স্বরের ব্যবহারে জয়জয়ন্তী রাগের আভাস আসতে পারে। তবে জয়জয়ন্তীতে উভয় গান্ধার (গ ঁগ) এবং উভয় নিষাদ (নি নি) ব্যবহার হয়; আর পটমঞ্জরীতে সকল স্বর শুদ্ধ ব্যবহার হওয়ায় রাগটি জয়জয়ন্তী থেকে পৃথক স্বরূপের হয়ে থাকে। এই রাগ সম্পর্কে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের 'ক্রমিক পুস্তক মালিকা'র (৫ম ভাগ) উদ্ধৃতি—

মেলে শুদ্ধস্বরাণাং তাং কেচিদন্যে বিদো বিদুঃ।
ন তদ্বিসংগতং ভাতি মতং লক্ষ্যানুসারতঃ ॥ ৬৯ (শ্রীমল্লক্ষ্যাসংগীতে, পৃ. ১৫৪)

সগৌ মগৌ রিসৌ রিশ্চ সনী ধপৌ রিগৌ সপৌ।
মগৌ রিসৌ ভবেদন্যা শুদ্ধমেলোত্থমথরী ॥ ১৫২ (অভিনবরাগমঞ্জর্য়াম)[৫]

চলন: সা গ, রে গ ম, গ রেসা রে সা, নি় নি় ধ় সা,
নি় ধ় নি় প় রে, রে রে সা, প প সাঁ, সাঁ রেঁ সাঁ,
নি ধ ধ সাঁ, রেঁ সাঁ, নি ধ নি প, প রে রে গ ম,
গ ম গ রে রে গ সা।

খ. পটমঞ্জরী (কাফি ঠাট):

কাফি ঠাটের পটমঞ্জরী রাগ অত্যন্ত মনোরঞ্জক। এই রাগের আরোহে গান্ধার (কোমল গ) এবং ধৈবত (ধ) দুর্বল হওয়ার কারণে সারং অঙ্গের আভাস আসতে পারে। এর বাদী সা, সমবাদী প। 'সা রে ম প' এই সারং অঙ্গের তিরোভাবের জন্য ধ এবং গ এর দক্ষতাপূর্ণ ব্যবহার করতে হয়। তবে কাফি ঠাটের পটমঞ্জরী রাগটি অল্প প্রচলিত হওয়ার কারণে এর স্বরূপ সম্পর্কে মতবিরোধ হতে পারে। পণ্ডিত ভাতখন্ডে ক্রমিক পুস্তক মালিকায় (৬ষ্ঠ ভাগ হিন্দী) এই রাগের ২টি বন্দিশের স্বরলিপি এবং চলনসহ দুইটি শ্লোক উদ্ধৃতি করেছেন।

নিসৌ রিসৌ নিধৌ পশ্চ সরী মপৌ ধগৌ রিগৌ।
মগৌ রিসৌ ভবেত্পটমঞ্জরী ষড়জবাদিনী ॥ অভিনবরাগমঞ্জর্য়াম ॥ ১৫১

কোমল গমনী সুর জহাঁ চঢ়তে ধগ ন লগাই।
স প বাদী সংবাদিতেং পটমঞ্জরী গুনি গাই। রাগচন্দ্রিকাসার ॥ ৪৪[৬]

পণ্ডিত বিনায়ক রাও পটবর্ধন রাগবিজ্ঞান (৬ষ্ঠ ভাগ পৃ. ৪১)[৭] গ্রন্থে এই রাগের ৩টি বন্দিশ স্বরলিপিসহ উল্লেখ করেছেন।

চলন: সা, রে নি় ধ় প় সা, সা রে ম প, প ধ গ
রে গ ম গ রে সা, ম প প সাঁ, রেঁ সাঁ, গঁ রেঁ সাঁ,
নি সাঁ প, রে মপ নি ধ প, ম প ধ গ , ম গ রে সা।

বিলাবল ঠাটের পটমঞ্জরী রাগের নামের সাথে জড়িয়ে আছে বাংলা অঞ্চলের (বঙ্গাল বিলাবল) বৈশিষ্ট্য। সেদিক থেকে চর্যাপদে হয়তো এই অঙ্গের পটমঞ্জরী (বিলাবল থাট) অধিক ব্যবহার হয়ে থাকবে। কাফি ঠাটের পটমঞ্জরী ব্যবহার হয়নি এমনও বলা যাবে না। কেননা এই রাগটি (পটমঞ্জরী) অধিক সংখ্যক পদে এবং ৭ জন পদকর্তার চর্যায় পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া আধুনিক কালেও উভয় অঙ্গের রাগের বন্দিশ থেকে ধারণা করা যায় দুটি প্রকারই সেই সময়ে ব্যবহৃত হয়েছে। নজরুলের "আমি পথমঞ্জরী ফুটেছি আঁধার রাতে" অথবা "আসিবে তুমি জানি প্রিয়" গান দুটিতে পটমঞ্জরী রাগের নাম ব্যবহার করা হয়েছে।[৮]

২. রাগ গবড়া (গউড়া), গবড়া (গউরা), গউরা

কুক্কুরীপাদ, বিরুআ এবং কাহ্নুপাদের চর্যায় উল্লেখিত গবড়া (গউড়া), গবড়া (গউরা), গউরা এই সকল বানানের রাগগুলি একই কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। উপরন্তু কাহ্নুপাদের একটি চর্যায় মালসীগবুড়া রাগের নাম থেকে উল্লিখিত রাগগুলির সাথে গবুড়া উচ্চারণও এসে যাচ্ছে। যদিও নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে মালসী গবুড়া রাগটি মালসী এবং গবুড়া রাগের মিশ্রিত স্বরূপ [মালসী গবুড়া সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে], তথাপি উচ্চারণের দিক থেকে গবড়া, গউড়া, গউরা-এর সাথে গবুড়া এই চারটি শব্দই বানানের ভিন্নতার জন্য উল্লেখনীয়। এই রাগগুলির নামের উচ্চারণের মতো আধুনিক কালের প্রচলিত উচ্চারণে দুটি রাগের নাম পাওয়া যায়, যথা: (ক) গারা এবং (খ) গৌড়। কিন্তু চর্যাপদের প্রায় সকল সমালোচকগণ এ গুলির একটি-ই নামকরণ

করেছেন সেটি হচ্ছে গারা। গউরা শব্দ আস্তে আস্তে গারা উচ্চারণে পরিণত হতেই পারে, কিন্তু গউড়া বা গবুড়া উচ্চারণ থেকে আরো একটি প্রচলিত রাগের নাম এসে যায় সেটি হলো রাগ গৌড়। হিন্দীতে 'গৌড' রাগটিকে গৌডা বলা বা লেখার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। এবারে (ক) গারা এবং (খ) গৌড় রাগের বিষয়ে আলোচনা করবো।

ক. রাগ গারা

গারা খাম্বাজ ঠাটের রাগ। এই রাগে উভয় গান্ধার (গ, গ), উভয় নিষাদ (নি, নি) ব্যবহার হয় এবং অন্যান্য স্বরগুলি শুদ্ধ। জাতি সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ। বাদী গান্ধার (গ), সমবাদী ধৈবত (ধ)। এটি রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরের রাগ। আধুনিক কালে এই রাগে ঠুমরী অধিক শোনা যায়। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে ক্রমিক পুস্তক মালিকায় (১০ম খণ্ড বাংলা অনুবাদ ২৭৮-২৯০)[৯] মধ্যলয় ও বিলম্বিত লয়ের খেয়াল, ধ্রুপদ, ধামারসহ মোট ৯টি বন্দিশের স্বরলিপি দিয়েছেন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে এই রাগটি কোনো সময়ে গম্ভীর প্রকৃতির স্বরূপ হিসেবেই বিবেচিত হতো। এই রাগের চলন মন্দ্র এবং মধ্যসপ্তকের পূর্বাঙ্গেই প্রায় সম্পন্ন হয়ে যায়। এ কারণে গায়ক/বাদকগণ নিজ নিজ স্কেলের মধ্যম (ম) কে সা হিসেবে ব্যবহার করে রাগটি পরিবেশন করে থাকেন। আধুনিক কালে চলচিত্র সংগীতে এই রাগটি বহুল ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

চলন: সা, নি সা ধ নি সা নিসা, গ ম গ রে সা, রে গ রে সা,
নি সা নি ধ নি প, মপ ধ নি সা রে নিসা ধ নি গ,
গ, ম গ, সা গ মপ ম, রে গ রে সা , প মপ গম,
রে গ রে সা, রে নি সা, নি সা ধ নি সা নি সা

খ. রাগ গৌড়

গৌড় কাফি ঠাটের অপ্রসিদ্ধ রাগের মধ্যে একটি। তবে এর স্বরূপ অত্যন্ত মনোরঞ্জক। পূর্বাঙ্গে কানাড়া অঙ্গ এবং উত্তরাঙ্গে মল্হার অঙ্গের সহযোগে রাগের স্বরূপ প্রকাশ পায়। জাতি সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ। রাগতরঙ্গিণী (কবি লোচনের লেখা ১৫ শতকের প্রথমার্ধে) গ্রন্থে এই রাগের বর্ণনায় কর্ণাট ঠাট বলা হয়েছে এবং বানান লেখা হয়েছে গৌর।[১০] তবে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে এই রাগটির স্বরূপ গারা হবে এমন মত প্রকাশ করেছেন। তিনি ক্রমিক পুস্তক মালিকা ৬ষ্ঠ খণ্ডে (পৃ. ৩৪০) অপ্রসিদ্ধ গৌড রাগের চলন ও একটি বন্দিশের স্বরলিপি দিয়েছেন।

চলন: সা, ম রে সা, নি সা, গ ম রে পা
ধপ, প গ, ম প ধ রেঁ সাঁ, ধ নি প, ম প গ, ম রে সা,
ম প নি ধ সাঁ, নি রেঁ সাঁ, রেঁ নি সাঁ ধ নি ম প, ধ সাঁ নি প,
মপ গ, ম রে সা (ক্রমিক পুস্তক মালিকা ভাগ-৬, পৃ. ৩৭৯)

উল্লেখ্য যে 'গৌড় মল্হার' রাগসহ আরো অনেক রাগে গৌড় অঙ্গের স্বরূপ প্রচলন আছে যেমন সরপরদা, জয়জয়ন্তী ইত্যাদি। এখানে গৌড় অঙ্গ সম্পর্কে বলা হচ্ছে– রে গ রে ম গ রে সা, রে রে প ম,–এই স্বরগুচ্ছ থেকেই গৌড় রাগের স্বরূপ এসে যায়। গৌড় মল্হার রাগকে শংকরাভরণ ঠাটের মানা হয়। চর্যাপদে বর্ণিত গৌড় রাগ কিভাবে গাওয়া হতো আমরা জানতে পারছি না, দক্ষিণ ভারতে গৌড় শব্দ সহযোগে অনেক রাগের নাম পাওয়া যায়, যেমন– কর্ণাটগৌড়, কেদারগৌড়, সালগগৌড়, দেশগৌড়, মালব গৌড়, ইত্যাদি। তবে উত্তর ভারতীয় সংগীতে বিলাবল ঠাটের গৌড় রাগের সম্ভাবনা এসে যাচ্ছে, যা প্রচলিত রয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। গৌড় মল্হারের সাথে গৌড় অঙ্গের বিষয়টি থেকেই এ ধরনের চিন্তা করা যায়। প্রচলিত গৌড়সারং রাগ কল্যাণের একটি প্রকার, যা আধুনিক কালের রাগ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। হতে পারে গৌড় মল্হারকেই গৌড় বলা হতো অথবা দক্ষিণ ভারতীয় কোনো সমপ্রাকৃতিক রাগ থেকে এর স্বরূপ আবিষ্কার সম্ভব।

৩. রাগ শীবরী

শিবরী রাগের প্রচলিত নাম হচ্ছে 'শ্রী'। উচ্চারণগত সাম্য ও প্রচলিত রাগের মধ্য থেকে শ্রী রাগের নামটি নির্বাচন করা যায়। এই রাগ ৬ আদি রাগের মধ্যে একটি এবং বলা হয়ে থাকে শিবের পঞ্চম ঈশান-মুখ থেকে এই রাগের সৃষ্টি হয়েছে। তাই উচ্চারণগত দিক থেকেই হোক অথবা শিব শব্দের সাথে সৃষ্টি রহস্য সংযুক্ত রাখতেই হোক, ধারণা করা যেতে পারে এভাবেই প্রচলিত শ্রী রাগটি শিবরী নামে লেখা হয়ে থাকবে। সংগীত রত্নাকরসহ প্রাচীন অনেক গ্রন্থে এই রাগের নামোল্লেখ রয়েছে। শ্রী রাগ পূর্বী ঠাট থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর আরোহে গান্ধার এবং ধৈবত বর্জিত স্বর এবং অবরোহ সম্পূর্ণ, অর্থাৎ এর জাতি ঔড়ব-সম্পূর্ণ। এই রাগে কোমল রে কোমল ধা এবং তীব্র মধ্যম (র্ম) ব্যবহার হয়, অন্যান্য সব স্বর শুদ্ধ । বাদী কোমল রে এবং সমবাদী পঞ্চম (প), সূর্যাস্তের সময় এই রাগ গাওয়া হয়। 'শ্রী' অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির রাগ এবং বেশ সাধনা সাপেক্ষে গাওয়া সম্ভব। কোমল রে -এর সাথে প -এর স্বর-সংগতি এক ধরনের ব্যতিক্রমী বাতাবরণ সৃষ্টি করে। 'শ্রী' কে সান্ধ্যকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগও বলা হয়। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে ক্রমিক পুস্তক মালিকায় (৫ম ভাগ বাংলা অনুবাদ)[১২] ২৯টি বন্দিশের স্বরলিপি দিয়েছেন। 'শ্রী' মূলত ধ্রুপদ অঙ্গের রাগ কিন্তু এই রাগে খেয়াল গানও বেশ চমৎকার লাগে।

চলন: সা, রে, ^গরে সা, ^গরে ^গরে প, প রে, গ
রে, সা, রে র্ম র্ম প. র্ম প ধ র্ম গ রে ^গরে র্ম
প নি র্সা, র্সা নি ধ প প রে, গ রে, সা,

৪. রাগ রামক্রী

ভৈরব রাগাঙ্গের রাগ হিসেবে রামক্রী রাগ বেশ জনপ্রিয়। এই রাগটিকে রামকলি, রামকিরী, রামকরী, রামগিরি, রামক্রিয়া, রামকৃতি ইত্যাদি উচ্চারণ বা বানানে প্রাচীন ও আধুনিক সংগীত গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে সবগুলি নাম একই রাগ অর্থে ব্যবহার হয়। এই রাগে ভৈরবের তুলনায় কোমল রে ধ কম আন্দোলিত হয় এবং ভৈরবের সাথে পৃথক দেখানোর জন্য "র্ম প ধ নি ধ প," অঙ্গের ব্যবহার অবরোহের ঢঙে করা হয়। তীব্র মধ্যম (র্ম) এবং কোমল নি এর ব্যবহার কেবল উপরোক্ত ঢঙেই ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এই রাগটি মধ্য ও তার সপ্তকের দিকে বেশি গাওয়া বা বাজানো হয়। বাদী পা, সমবাদী সা,

চলন: সা, নি়সা রে সা, নি় সা গ ম প, র্ম প ধ নি ধ পা,
মপ, ^পগ ^পম রে সা, সা গ মপ, প ধ ম প, ম প ধ ধ প,
গ ম ধ ^নির্সা নি র্সা, র্সা নি ধ প, র্ম প ধ নি ধ প প গ ম ^পরে সা,

৫. রাগ ভৈরব

ভৈরব আদি রাগের একটি এবং আধুনিক কালের অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং প্রচলিত রাগ। ভৈরব রাগকে কখনো কখনো ভাঁয়রো, ভৈরোঁ ইত্যাদি বানানে বা উচ্চারণে লেখা হয়। ভৈরব রাগাঙ্গের প্রায় ৮৫টি প্রকার রাগের নাম পাওয়া যায়। কোমল রে ও কোমল ধ যথাক্রমে শুদ্ধ গা এবং নি এর স্পর্শ নিয়ে আন্দোলিত হয়। অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির রাগ। গ ম রে সা, ভৈরব রাগাঙ্গ বাচক।

চলন: সা গ রে গ রে সা, সা নি ধ নি ধ সা, নি সা গ, গ ম রে
রে সা, নিসা গ ম প ম, গম ধ ধ প, মপ প গ ম গ রে রে সা, গ ম ধ নি ধ নি
সা, গ রে রে সা, গ ম রে রে সা, সা নি ধ প, মপ ম, গ ম গ রে গ রে সা

৬. রাগ বঙ্গাল

'বঙ্গাল' নাম থেকে বাংলা অঞ্চল বা দেশের কথা আমাদের মনে আসে। স্পষ্টত বঙ্গাল রাগ বাংলা অঞ্চলেই প্রসিদ্ধ ছিল এবং বর্তমানে একটি অল্প প্রচলিত রাগ। বঙ্গাল রাগের বর্ণনা গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রকম পাওয়া যায়। তবে ভৈরব ঠাটের রাগ হিসেবে পরিচিত 'বঙ্গাল ভৈরব' রাগের সাথে 'বঙ্গাল' রাগের পার্থক্য আছে। 'বঙ্গাল ভৈরব' ষাড়ব জাতির রাগ। এই রাগে প্রচলিত 'ভৈরব' থেকে নি কে বর্জিত স্বর হিসেবে মানা হয়। তবে মন্দ্র সপ্তকে শুদ্ধ নি ব্যবহার না করে কেবল মধ্যসপ্তকে বিবাদী স্বরের মতো কখনো কখনো নি কুশলতার সাথে ব্যবহার হতেও পারে। সংগীত রত্নাকর গ্রন্থে 'বঙ্গাল নামে এবং ভাষাঙ্গ রাগ হিসেবে 'কর্ণাট বঙ্গাল' নাম পাওয়া যায়। পণ্ডিত রামামাত্য 'স্বরমেল কলানিধি' গ্রন্থের 'কন্নডবঙ্গালী' রাগের নাম উল্লেখ করেছেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বঙ্গাল ভৈরবকে দক্ষিণ ভারতীয় রাগ 'কর্ণাট বঙ্গাল'-এর সমপ্রাকৃতিক মানার পক্ষে মত দেন।[১৩] গুণক্রী, জোগীয়া এবং সাবেরী রাগের স্বর স্বরূপ প্রায় একই হওয়া সত্ত্বেও যেমন প্রত্যেক রাগ পৃথক ব্যক্তিত্বের তেমনি শুদ্ধবঙ্গাল, বঙ্গালী এবং বঙ্গাল ভৈরব অনুরূপ পৃথক ব্যক্তিত্বের। উল্লেখ্য যে, পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল রাগমালা গ্রন্থে শুদ্ধবঙ্গাল'[১৪] প্রকারের কথাও বলেছেন।

বঙ্গাল এবং বঙ্গাল ভৈরব দুটি রাগ পৃথক মানা হলে আধুনিক কালের দৃষ্টিতে বঙ্গালকে অপ্রচলিত রাগ বলতে হয়। আমার ধারণা শার্ঙ্গদেবের সংগীত রাত্নাকর গ্রন্থের বঙ্গাল এবং কর্ণাটি বঙ্গাল সমপ্রাকৃতিক রাগ। যেমন শবরী এবং সাবেরী রাগ দুটি যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় রাগ প্রকরণে সমান মানা যায়।

৭. রাগ গুঞ্জরী, গুঞ্জরী, গুর্জরী (গুঞ্জরী) এবং কাহ্নুগুংজরী

আধুনিক কালের অতি পরিচিত রাগ গুর্জরী, টোরি রাগাঙ্গের একটি প্রকার এবং টোরি অঙ্গের রাগের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। আঞ্চলিকতা ভেদে এর বিভিন্ন রকম উচ্চারণ শোনা যায়। চর্যাপদে গুর্জরী রাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত আরো একটি রাগ পাওয়া যাচ্ছে সেটি হলো কাহ্নুগুংজরী। হতে পারে গুর্জরী রাগটি কাহ্নুপাদের সৃষ্টি। চর্যাপদের অনেক পদ (১৩টি) কাহ্নুপাদ রচনা করেছেন। আধুনিক কালে টোরি রাগ বলতে মিয়াঁ কি টোরি রাগকেই বোঝানো হয়ে থাকে, যা তানসেন সৃষ্ট রাগ হিসেবে সমধিক জনপ্রিয় ও পরিচিত। টোরিসহ আরো অনেক রাগ আছে, যে গুলির সাথে রাগস্রষ্টার নাম সংযুক্ত হয়ে আছে। যেমন বিলাস খাঁ সৃষ্ট বিলাসখানী টোরি, তানসেন সৃষ্ট মিয়াঁকী সারং, মিয়াঁকী মল্‌হার, সুরদাস সৃষ্ট সুর মল্‌হার, রামদাস সৃষ্ট রামদাসী মল্‌হার, মীরা বাঈ সৃষ্ট মীরা বাঈকি মল্‌হার ইত্যাদি রাগ বেশ জনপ্রিয় হয়ে আছে।

গুর্জরী টোরিতে পঞ্চম (প) বর্জিত স্বর। এই রাগে ঋষভ গান্ধার ও ধৈবত (রে গ ধ) কোমল এবং মধ্যম তীব্র (ম) ও শুদ্ধ নি ব্যবহার হয়। গুর্জরী টোরিতে পঞ্চম (প) ব্যবহার করলে মিয়াঁকী টোরি রাগ হয়ে যায়। জাতি ষাড়ব-ষাড়ব, বাদী কোমল ধা, সমবাদী কোমল গ, দিনের দ্বিতীয় প্রহরের রাগ।

চলন: সা, রেসা নিসা ধা নি সা, সারে গ রে গ রে সা,
সা রে গ ম ধ, ম ধ ম গ, রে গ রে সা, গ রে গ ম ধ,
ম ধ নি ধ, ম ধ নি সাঁ, ধ নি সাঁ রেঁ গঁ, রেঁ গঁ রেঁ সাঁ,
সাঁ নি ধ ম ধ ম গ, রে গ ম রে গ রে সা।

৮. রাগ বড়ারী, বরাড়ী, বলাডিড (বলাড়ি বা বরাড়ি)

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বরাড়ী অথবা বরারী নামে যে অপ্রসিদ্ধ রাগের প্রকার পাওয়া যায় তা বরাটী নামে প্রচলিত আছে।[১৫] দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে বরালী নামের রাগ পাওয়া যায়, তবে বরালী বা পন্তুবরালীকে উত্তর ভারতীয় সংগীতে টোরি বলা হয় যা ঠাট রাগ হিসেবে পরিচিত। চর্যায় বিভিন্ন বানানের এই রাগটি বরাটি নামেই প্রচলিত আছে এবং খুব কম শুনতে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে বরাড়ি রাগের তিব্বতি অনুলিখনে 'বরাটি' নাম পাওয়া যায়; এছাড়া বরাড়ি বানানও কোথাও কোথাও দেখা যায়।[১৬] তবে বরাটীর অনেক প্রকার আছে; পণ্ডিত অহোবেল ৮ প্রকার বরাটী রাগের কথা উল্লেখ করেছেন।

যেমন- ১. শুদ্ধ বরাটী: সা রে রে ম প ধ নি সাঁ
২. টোড়ি বরাটী: সা রে গ ম প ধ নি সাঁ
৩. নাগরবরাটী: সা রে গ ম প ধ নি সাঁ
৪. পুন্নাগ বরাটী: সা রে গ ম প ধ নি সাঁ
৫. প্রতাপবরাটী: সা রে গ ম প ধ নি সাঁ
৬. শোক বরাটী: সা রে রে ম প ধ নি সাঁ
৭. কল্যাণবরাটী: সা রে গ ম প ধ নি সাঁ
৮. বরাটী: সা রে গ ম প ধ নি সাঁ।

[উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত প্রকারগুলিতে কেবল স্বর বর্ণনা করা হয়েছে চলন বা আরোহ ক্রম অনুসারে নয়][১৭]

পণ্ডিত শার্ঙ্গদেব উপাঙ্গ রাগের বর্ণনায় বরাটীর কয়েকটি প্রকারের নাম উল্লেখসহ স্বরূপ বর্ণনা করেছেন, যেমন: (১) কুন্তলবরাটী, (২) দ্রাবিড়ী বরাটী (৩) সৈন্ধবী বরাটী (৪) অপস্থান বরাটী (৫) হস্তস্বর বরাটী (৬) প্রতাপ বরাটী এবং (৭) শুদ্ধ বরাটী।

প্রচলিত বরাটী রাগটি বরাড়ী বা বড়ারী নামে অভিহিত করা হতো। এই রাগ হিন্দুস্থানী সংগীতের মারবা ঠাটের অন্তর্গত মানা হয়। এর বাদী গ, সমাবাদী ধ। সান্ধ্যকালীন রাগ। এটি মারবা অঙ্গের এবং এর (মারবা) সমপ্রাকৃতিক রাগ। কিন্তু বরাটী রাগে প স্বরের ব্যবহার এবং বক্রচলনের জন্য মারবা থেকে সহজেই পৃথক হয়ে যায়। সা প, গপ, পধগ, ইত্যাদি স্বর সংগতি বরাটি রাগে গুরুত্বপূ। টোড়ি, দেশকার এবং ত্রিবেণী রাগের সংযোগে এই রাগের সৃষ্টি। পূর্বীঠাটের বরাটীতে কোমল ধা ব্যবহার করা হয় এমন মত প্রচলিত আছে। এখানে মারবা ঠাটের বরাটী রাগের চলন বর্ণনা করা হলো।

চলন: সা, গ রে গ, রে সা, রে সা, সা প, প প ধ গ,
প ধ ম গ, গ রে রে গ, ধ ম গ, রে সা, প ধ প, সাঁ,
সাঁরেঁ সাঁ, সাঁ রেঁ নি প, প ধগ, পমধ ম গ, রে গা রে সা,
প ধ গ, প ধ, ম গ, প গ রে সা। এই রাগে নি দুর্বল স্বর।

৯. রাগ মল্লারী

রাগবিবোধ গ্রন্থে বলা হয়েছে–
মল্লারিনটয়ূগপি স ধাংশাংতাদিরগনিশ্চ সংগবভাঃ ॥

এর টীকা: "মল্লারিঃ" অগনিঃ গান্ধার নিষাদ রহিতঃ ধাংশাংতাদিঃ ধৈবতগ্রহাংশন্যাসঃ সংগবভাঃ সংগবে শোভিতগানঃ"।[১৮] এই বর্ণনা অনুসারে মল্লারি শুদ্ধ অর্থাৎ বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত। 'স্বরমেল কলানিধি' গ্রন্থে 'মলহরী' নামের একটি রাগের বর্ণনা পাওয়া যায়, কিন্তু তা ভৈরব ঠাটের অন্তর্গত এমন বলা হয়েছে। মল্লারি, মল্হার, মলহরী ইত্যাদি অনেক পাশাপাশি উচ্চারণে মল্হার রাগের স্বরূপ প্রচলনে আছে। রাগবিবোধ গ্রন্থের আলোকে যে মল্হার রাগের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে তা শুদ্ধ মল্হার নামে পরিচিত। এর স্বরগুলি হচ্ছে সা রে ম প ধ সা -যা প্রচলিত দুর্গা রাগের স্বর। আরো একটি শুদ্ধ মল্হার নামের রাগ স্বরূপ প্রচলনে আছে, এর স্বরগুলি

হচ্ছে সা রে ম প নি নি সাঁ। মল্‌হারের প্রায় ৩০টিরও অধিক প্রকার এই দুটি শুদ্ধ মল্‌হারের অন্তত কোনো একটির অঙ্গ সহযোগে গাওয়া হয়ে থাকে বা স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে থাকে। এবারে প্রচলিত দুটি শুদ্ধ মল্‌হার সম্পর্কে একটু বিস্তৃত বর্ণনা তুলে ধরা হচ্ছে।

ক. রাগ শুদ্ধ মল্‌হার (গ নি বর্জিত)

শুদ্ধ মল্‌হারের এই প্রকারে গ নি বর্জিত স্বর। এই রাগে মল্‌হার অঙ্গ হচ্ছে - রে, রে প ম, রে ম রে ম,

আরোহ: সা ম রে রে প ম, ম প ধ সাঁ
অবরোহ: সাঁ ধপ ম, রে রে প ম রে রে সা।

উল্লেখ্য যে, মল্‌হার অঙ্গের সঠিক প্রয়োগেই শুদ্ধ মল্‌হারের এই প্রকার বিলাবল ঠাটের দুর্গা রাগ থেকে পৃথক থাকে। এই রাগের ঢং অনুসারেই মল্‌হারের অন্যান্য প্রকারের পূর্বাঙ্গে স্বরের ব্যবহার হয়। (সা রে ম প -এমন সরাসরি ব্যবহারে সারং রাগের স্বরূপ এসে যায়)।

চলন: সা রে রে প ম, ম ম রে রে সা, ধ্ প্ সা রে ম,
রে ম, সা ম রে প, মপ ধসাঁ ধপ ম, রে প ম, মপ সাঁ,
রেঁ রেঁ মঁ রেঁ পঁ মঁ রেঁ সাঁ, সাঁপ ধ প ম, রে রে প ম, মমম রেরেরে সা,

উল্লেখ্য যে, মল্‌হারের প্রায় সকল প্রকারেই গমক ব্যবহার হয়।

খ. রাগ শুদ্ধ মল্‌হার (গ ধ বর্জিত)

শুদ্ধ মল্‌হারের এই প্রকারে গ ও ধ স্বর দুটি বর্জিত থাকে। অনেকটা প্রচলিত মেঘ বা মধমাদ সারঙের মতো স্বর বৈশিষ্ট্য হলেও চলনে উভয় নিষাদের (নি নি) ব্যবহার থেকে শুদ্ধ মলহার স্পষ্ট হয়ে থাকে। ম প নি নি সা - এই স্বরাংশ থেকে উত্তরাঙ্গে মল্‌হারের সকল প্রকার স্পষ্ট হয় আর এই স্বরাংশটি শুদ্ধ মল্‌হারের এই প্রকারে গুরুত্বপূর্ণ। মল্‌হারের সকল প্রকারে সা রে রে প, অথবা সা ম রে প: এবং ম প নি নি সাঁ এই স্বরাংশের কোনো একটি অংশ অবশ্যই থাকতে হবে।

চলন: সা ম রে রে প, মপ নি নি প, মপ নি নি সাঁ,
সাঁ নি প, রে রে প মম রে রে সা নি় সা ম রে প,
প সাঁ, নিসাঁ রেঁ রেঁ মঁ রেঁ সাঁ নি নি প, মপ রে রে ম রে সা।

১০. রাগ মালসী, মালশী

রাগ দুটির উচ্চারণ ও বানানে সামান্য পার্থক্য থাকলেও প্রচলিত রাগ স্বরূপ এবং নাম হচ্ছে 'মালশ্রী'। প্রচলিত মালবী, মালবশ্রী এবং মালশ্রী প্রত্যেকটি রাগই পৃথক স্বরূপের। মালশ্রী প্রাচীন প্রকারের একটি ব্যতিক্রমধর্মী রাগ। রাগ কল্পদ্রুমাঙ্কর, অভিনবরাগমঞ্জুর্যাম, রাগ চন্দ্রিকাসার ইত্যাদি গ্রন্থে মালশ্রী রাগের বর্ণনা পাওয়া যায়। মালশ্রী কল্যাণ ঠাট থেকে উদ্ভূত রাগ। এই রাগে রে এবং ধ স্বর বর্জিত। জাতি ঔড়ব-ঔড়ব। বাদী প, সমবাদী সা, সান্ধ্যকালীন রাগ। কেউ কেউ বলে থাকেন সা গ এবং প এই তিন স্বরের ভিত্তিতেই মালশ্রী গাওয়া চাই। কিন্তু রাগের জন্য অন্তত পাঁচটি স্বর থাকতে হয়, তাই তীব্র মঁ ও শুদ্ধ নি স্বর ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তীব্র মঁ ও নি স্বর দুটি এই রাগে দুর্বল। এই রাগে তার সা থেকে পঞ্চমের (প) উপর অবরোহণ অত্যন্ত মধুর হয়ে থাকে। দক্ষিণ ভারতীয় রাগ অমৃতবর্ষিণী মালশ্রীর সমপ্রাকৃতিক। অত্যন্ত মীড় প্রধান হওয়ার কারণে এই রাগে ধ্রুপদ অঙ্গের গান অধিক শোনা যায়। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে ক্রমিক পুস্তক মালিকায় (দশম খণ্ড বাংলা অনুবাদ) ১৫টি বন্দিশের স্বরলিপি দিয়েছেন।[১৯]

চলন: সা, গপ, মঁগ, প, নি, সাঁ, নি প, মঁ গ, পগ, সা,
প, প, প গসা, সা সা গ গ প, প, পমঁগ, প গসা, সা প় নি় সা,
গ পগ, মঁগ, নি় সা গ পমঁ গ, পগ সা, গ পসাঁ,
নি সাঁ গঁ নি সাঁ, নি মঁ প গ, প গ সা।

১১. রাগ দেবক্রী

কাংবোজিমেলে তীব্রতররিরংতরকতীব্রতর ধৌ চ।
কাকলিকা শুচিসমপা অতশ্চ কাংবোজদেবক্রী।।
অপরাহ্ণে দেবক্রীঃ সাংশন্যসগ্রহাsরপাবা।
রাগবিবোধ।[২০]

ক. রাগ দেবগিরি বিলাবল (প্রথম প্রকার)

প্রাচীন বিভিন্ন গ্রন্থে দেবক্রী রাগের নাম দেবক্রিয়া, দেবকী, দেবগিরি দেবকৃতি ইত্যাদি পাওয়া যায়। কোনো কোনো সংগীতজ্ঞ দেবক্রী রাগের উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় ঠাটের বিভিন্ন নামের কারণে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ মানতে আগ্রহী হলেও প্রচারে কেবল দুই প্রকার দেবক্রী রাগ সম্পর্কে জানতে পারা যায়। প্রথম প্রকার শুদ্ধ মধ্যম সহযোগে আর দ্বিতীয় প্রকার তীব্র মধ্যম সহযোগে।[২১] বাস্তবে তীব্র মধ্যম (র্ম) ছাড়াও কল্যাণ অঙ্গে সহযোগে দেবগিরি বিলাবল গাওয়া হয়।[২২] বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত শুদ্ধ মধ্যম যুক্ত দেবক্রীঃ আর তীব্রমধ্যম যুক্ত দেবক্রীতে পূর্বাঙ্গে কল্যাণ এবং উত্তরাঙ্গে অল্হৈয়া বিলাবলের স্বর ব্যবহার হয়। দেবক্রী নামের সাথে বিলাবল নাম যোগ হয়ে দেবগিরি বিলাবল হিসেবে প্রচলিত নাম আধুনিক কালের। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মতে শুদ্ধ মধ্যম যুক্ত দেবক্রী অধিক প্রচলিত। এর বাদী স্বর সা, কেউ কেউ ধ -কে বাদী স্বর মানেন। তবে প্রচলিত মতে সা বাদী, প সমবাদী।

এই রাগে শুদ্ধকল্যাণ এবং বিলাবলের সুন্দর মিশ্রণ ঘটতে দেখা যায়। অবরোহে ধ এবং গ স্বর দুর্বল আর আরোহে মধ্যম (ম) দুর্বল। কখনো কখনো বিবাদী স্বরের দৃষ্টিতে শুদ্ধ ধ এর সাথে কোমল নি স্পর্শ স্বর হিসেবে ব্যবহার হতে দেখা যায়। এই রাগের বিস্তার বা আলাপ মন্দ্র এবং মধ্য সপ্তকে সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। দিনের প্রথম প্রহরের রাগ হিসেবে দেবগিরি বিলাবল পরিচিত।

চলন: সা, নি ধ সা, রে গ, গ ম রে, সা, রে সা নি ধ নি প, সা,
রে ম রে সা, গ ম রে স, সা ধ সা রে গ, গ রে গ,
গ প ধ নি ধ, সাঁ, নি ধ নি প, গ ম গ, প গ, ম রে সা,
প প, সাঁ ধ, নি সাঁ, সাঁ রেঁ সাঁনি ধ নি প, গ ম ধ ধ,
ধ নি ধ প, প ধ সাঁ নি ধ প ধ ম গ, গরে গ, ম রে সা।

খ. রাগ দেবগিরি বিলাবল (দ্বিতীয় প্রকার)

দেবগিরি বিলাবলের এই প্রকার কল্যাণ অঙ্গে গাওয়া হলেও তীব্র মধ্যম (র্ম) ব্যবহার হতে দেখা যায় না। গ রে নি রে সা, নি রে গ, নি ধ নি সা, নি রে রে সা -এভাবে কল্যাণ রাগের ঢঙে স্বরগুলি ব্যবহার হয়। মম গ রে গ ম গ রে, গ প ম গ রে এভাবে বিলাবলের অঙ্গ ব্যবহারের সাথে সাথে কল্যাণ স্বরাংশ প্রযুক্ত করা হয়। শুদ্ধ ধ -এর সাথে কোমল নি -এর স্পর্শ স্বর কখনো কখনো ব্যবহার হয়। বাদী সা, সমবাদী প, রাগটি দিনের প্রথম প্রহরে গাওয়া হয়।

আরোহঃ সা গরে পগ নিপধ নি সাঁ
অবরোহঃ সাঁ নি নিধ প, ধপ ম গ রে, রেনি রে গ ম গ রে, গ রে সা
চলন: সা ধ প, প ধ নি সা, নি রে নি, গ গ রে নি সা নি রে গা,
গ রে গ প, প ধ পমগ রে, নি রে নি গগ রে নি সা, প প ধ নি সাঁ,
নি ধ প ম গরে গ প, সাঁ রেঁ সাঁ গঁ গঁ রেঁ নি রেঁ সাঁ
নি ধ ধনি ধ প, প ম গ রে, নি রে নি গ গ রে নি সা।

১২. রাগ দেশাখ

নিসৌ মরী পমৌ নিপৌ সনী পমৌ পগৌ মরী।
স ইত্যুক্তী দেবসাগঃ সংগবে পঞ্চমাংশকঃ।
অভিনবরাগমঞ্জর্য়াম॥ ১৬২

হর প্রিয়মেল সমুদ্রবোऽয়ং দেশাখ্যরাগো ধগদুর্বলঃস্যাত্।
বাদ্যত্র ষড়্জঃ সহচারিমধ্যমঃ সারংগভংগ্যা কুতুপেऽভিগীয়তে॥
রাগকল্পদ্রুমাঙ্করে॥ ৩৭[২৩]

এই রাগের নাম দেশাখ্য, দেবশাখ, দেবসাগ, দেশাখ ইত্যাদি বানান ও উচ্চারণে পাওয়া গেলেও মূলত সবগুলি একই রাগ হিসেবে পরিচিত। এটি কাফি ঠাটের অল্পপ্রচলিত রাগের মধ্যে একটি। বাদী প, সমবাদী সা, এই রাগে ধৈবত (ধ) বর্জিত স্বর মানা হলেও কোনো কোনো সঙ্গীতজ্ঞ কোমল ধ এবং কোমল গ দুর্বল করে রাগটি গেয়ে থাকেন। দেশাখ কানাড়া অঙ্গের রাগ, সুতরাং এতে কোমল গ আন্দোলিত হতে দেখা যায়। গ প স্বর-সংগতি রাগবাচক। পুরাতন সংগীত গ্রন্থে উভয় গান্ধার (গ গ) এবং উভয় নিষাদ (নি নি) সহযোগে এবং ঋষভ (রে) বর্জিত স্বর হিসেবে এই রাগের স্বরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু রে বর্জিত কোনো প্রকার দেশাখ হয়তো প্রচলনে নেই। আর উভয় গান্ধার যুক্ত দেশাখ আধুনিক কালে হয়তো শুনতে পাওয়া যাবে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে গ নি কোমল যুক্ত ২টি বন্দিশের মধ্যে ধ বর্জিত (দেশাখ রাগের) স্বরলিপি এবং শুদ্ধ ধ ও উভয় নিষাদ যুক্ত ২টি বন্দিশের স্বরলিপি ক্রমিক পুস্তক মালিকায় (৬ষ্ঠ ভাগ, পৃ. ২৬০-৬৫) দিয়েছেন।

চলন: সা নিসা ম রে প ম, নি প, সাঁ নি প, ম প গ ম রে সা,
সা সাঁ মরে সা, নি সা গ গ প, নি প, গ ম রে সা,
সানি সা, মপ, পনিপ, সাঁ সাঁ, রেঁ সাঁ, নি সাঁ,
সাঁ নি প, গ গ মঁ রেঁ সাঁ, নি প, গ গ ম, রে সা।[১৩]

১৩. রাগ ধনসী

ধনসী, ধনাসিরী, ধনীশ্রী, ধনেশ্রী, ধনাশ্রী, –এগুলি প্রচলিত একই নামের দুইটি রাগ। একটি কাফি ঠাটের ধনাশ্রী অপরটি ভৈরবী ঠাটের ধনাশ্রী। কাফি থাটের ধনাশ্রী অধিক শুনতে পাওয়া যায়।

ক. রাগ ধনাশ্রী (কাফি ঠাট)

কাফি ঠাট থেকে সৃষ্ট সমস্ত রাগকে ৫টি বিশিষ্ট রাগাঙ্গে ভাগ করা যায়, যথা– ধনাশ্রী, কাফি, সারং, কানড়া এবং মল্‌হার। ধনাশ্রী অঙ্গে রে ধ দুর্বল; সা, প, সহ কোনো কোনো সময়ে ম প্রবল হয় এবং প গ স্বর সংগতি দেখা যায়। বাদী প, সমবাদী সা। দিনের তৃতীয় প্রহরের রাগ। অবরোহে প গ স্বরসংগতি অত্যন্ত মনোরঞ্জক এবং গুরুত্বপূর্ণ। ভীমপলাসী (ভীমপলশ্রী) রাগের সাথে ধনাশ্রী রাগের অনেক মিল আছে। পার্থক্য কেবল ভীমপলশ্রীর বাদী মা আর ধনাশ্রীর বাদী প। উভয় রাগে গ নি কোমল।

চলন: সা, নি সা গমপ, ধপ, নিধপ, গ, পগ, রে সা,
ধ, পগ, পগ রে, সা, নিসা, গ, মপ প, ধপ, মগ, মপগ,
গ, রে সা, নিসা, পনি সা, রে, সা, গ রেসা, নি সাগমপ,
নিধপ, সাঁ, নি ধ, পগ, মপগ, রে সা।

খ. রাগ ধনাশ্রী (ভৈরবী ঠাট)

ভৈরবী অঙ্গের ধনাশ্রী, কাফি ঠাটের ধনাশ্রীর তুলনায় কঠিন। এই রাগে ভৈরবীর মতোই রে গ ধ নি কোমল স্বর গুলি ব্যবহৃত হয়। বাদী সমবাদী যথাক্রমে প ও সা। এই রাগের চলনে ভীমপলশ্রী অঙ্গের ধনাশ্রীর মতো রে ধ দুর্বল আবার ভৈরবী থেকে পৃথক রাখতে হয়। প গ স্বর সংগতি মনোরঞ্জক এবং গুরুত্বপূর্ণ।

চলন: নি সাগমগ প, ধ প মপমগ ম, প নি ধ প, ধ পম,
মপ গ, সা গ মপ গ, রে সা, সাম, গ প, মপ নি,
ধ প, মপ নি নি সাঁ সাঁ নি ধ প, ম পনি ধ প, ধ মপ গ,
সা গমপ গমনি প গ, সা গ ম গ রে সা

১৪. রাগ কামোদ

রিপৌ মপৌ ধপৌ গমৌ পগৌ মরৌ তথা চ সঃ।
কমোদঃ পঞ্চমাগঃর্য়াত্ প্রথমেয়ামকে নিশি ॥
অভিনবরাগমঞ্জর্য়াম্।

দ্বৈ মধ্যম তীখে সবহি উতরে বক্র গ হোই।
প-রি বাদী-সংবাদী জহাঁ কামোদ কহো সেই ॥
চন্দ্রিকাসার[২৫]

কামোদ কল্যাণ ঠাটের রাগ। এই রাগে উভয় মধ্যম (ম ম) ব্যবহার হয়। তীব্র মধ্যমের প্রয়োগ কেবল আরোহের ঢঙ্গে ব্যবহার হয় (যেমন পমধপ সাঁ, অথবা পধমপ সাঁ, ইত্যাদি) বাদী প, সমবাদী রে, সময় রাত্রির প্রথম প্রহর। জাতি বক্র-সম্পূর্ণ। রে প স্বর সংগতিতে কামোদ রাগের স্বরূপ প্রথমেই স্পষ্ট হয়ে যায়। এই রাগে গান্ধার (গ) এবং নিষাদ স্বর দুর্বল। অবরোহে কখনো কখনো কোমল নি বিবাদী স্বরের ঢঙে শুধু ধ এর সাথে ব্যবহৃত হয়।

চলন: সা, ধ্ প্, সা, সা রে রে সা, ম রে প, পম ধপ, ধমপ,
রে প, গ ম প গ ম রে সা, সা রে প, প ধ ম প সাঁ,
সাঁ রেঁ সাঁ, সাঁ নি রেঁসাঁ ধ প, রে প, গ ম প গ ম রে সা,
ম প প সাঁ রেঁসাঁ, সাঁ রেঁ সাঁ, ধ নি প, ম প ধ প, গ ম প, গ ম রে সা।

১৫. রাগ ভৈরবী

যত্র মধ্যঃস্বরো বাদী সমবাদী ষড়জ ঈরিতঃ।
স্বৈরিণী গীয়তে প্রাতর্ভৈরবী সব কোমলা ।।
চন্দ্রিকার্য়াম

সব কোমল সুর ভৈরবী সম্পূরণ সুর হোই।
ম-স বাদী সমবাদী হৈঁ, সব জো চাহে কোঈ ॥
চন্দ্রিকাসার।

নিসৌ গমৌ পধৌ নিশ সনিধপা মগৌ রি সৌ।
সম্পূর্ণা ভৈরবী প্রোক্তা ধৈবতাংশা প্রভাতগা ॥
অভিনবরাগমঞ্জর্য়াম।[২৬]

আধুনিক কালে ভৈরবী রাগ সবচেয়ে বেশি প্রচলিত এমনও বলা যায়। এতে মধ্যম শুদ্ধ এবং রে গ ধ নি কোমল ব্যবহার হয়। বাদী ম মতান্তরে প, এবং সমবাদী সা। কোনো কোনো গুণীজন ধ বাদী এবং গ সমবাদী মানেন। এই রাগ গাওয়ার সময় সকাল বেলা, কিন্তু প্রচারে সকল সময়েই বিশেষ করে মঞ্চে শাস্ত্রীয় সংগীত অনুষ্ঠানের শেষে প্রায় সকল গায়ক বাদকগণই ভৈরবী পরিবেশন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানেন। এই রাগে বিবাদী স্বরের মতো শুদ্ধ রে এবং তীব্র মধ্যম (ম) ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত। সা, গ, প, ধ, এই স্বর গুলিতে ন্যাস করলে এর বৈশিষ্ট্য মধুরতম হয়ে ওঠে। মধ্যমের উপর ন্যাস করতে গিয়ে কোনো কোনো গায়ক/বাদক প্রকারন্ত রে কোমল গ এর মহত্ত্বকে বেশি করে প্রকাশ করে থাকেন।

চলন: সা, রে গ ম, গ রে সা, সা ধ, ধ নি সা,
রে, রে সা নি নি ধ ধ নি সা, সা ধ ধ নি সা,
রে রে সা নিঁ নিঁ ধ, ধ নিঁ সা রে গ, গ গ রে সা,
ম প ধ, নি ধ পা ধ পম গ, গ রে সা নি ধ নি সা,
প ধ নি সাঁ, নি সাঁ রে সাঁ নি সাঁ নি ধ পা,
মা প ধ নি প, ম প ম গ রে গ ম গ রে সা।

১৬. রাগ শবরী

চর্যাপদের শবরী রাগ সম্পর্কে সমালোচকগণ যে ধরনের আলোচনা করেছেন তা সর্বাধিক বিতর্কিত। তবে উল্লেখ্য যে সমালোচকগণ প্রায় সবাই সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের বিশারদ। শবরী রাগটি সৌরি/শৌরী হয়ে পরবর্তীতে গৌরি নামকরণ হয়েছে এমন ধারণা সংগীতজ্ঞ সুলভ বিবেচনা হতে পারে না। কেবল নামের উল্লেখ থেকে রাগস্বরূপ আবিষ্কার করাও কঠিন। যেমন নারদমতে দীপক রাগের রাগিণী হিসেবে শবরী নামের উল্লেখ পাওয়া যায় (ভারতীয় সংগীত প্রসঙ্গ, পৃ. ১৩১)। আবার সংগীতসারসংগ্রহে শাবিরী নামের যে রাগের পরিচয় পাওয়া যায় সেটি মেঘ রাগের রাগিণী হিসেবে মানা হয়েছে। এর স্বর কেমন হতো তা জানা যায় না।

শাবিরী ধৈবতাংতাচগাতব্যা মন্দ্রমধ্যমা।
মগ্রহাংমাল্লষড়জা চ পহীনা করুণে মত ॥[২৮]

শবরী রাগ শবর জাতির মানুষের মধ্যে প্রচলন ছিল কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। তবে সবরপাদ যাঁর নাম শবরীশ্বর হিসেবে উল্লেখ করেছেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা গ্রন্থে), তিনি এই রাগের স্রষ্টা হতেও পারেন। যেমন গুর্জরী আর কাহ্নুগুর্জরী রাগের বিষয়ে ইতিপূর্বে রাগস্রষ্টা হিসেবে গুর্জরী রাগের আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া রাগ রাগিণী বর্গীকরণের সাথে উল্লিখিত বিচার থেকে এই রাগটি অন্যান্য রাগের তুলনায় প্রাচীন এটা নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে।

এবার 'শবরী' রাগটি দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত রাগ 'সাবেরী' হতে পারে কিনা, সে বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো। দক্ষিণ ভারতের প্রচলিত সাবেরী রাগটি হিন্দুস্থানী সংগীতের (উত্তর ভারতীয়) 'জোগীয়া' রাগের সাথে তুলনীয়। জোগীয়া এবং সাবেরী প্রায় একই স্বরূপের রাগ। সাবেরী রাগের ঠাট মালবগৌড় যা হিন্দুস্থানী সংগীতের ভৈরবের সাথে তুলনীয় আর জোগীয়া ভৈরব ঠাটের রাগ। জোগীয়া এবং সাবেরী রাগের আরোহে গ ও নি বর্জিত স্বর। তবে দক্ষিণ ভারতে জোগীয়া এবং সাবেরী পৃথক পৃথক গাওয়ার নিয়ম এখনও প্রচলনে আছে। হিন্দুস্থানী সংগীতে যেমন গুনকলী (গুনক্রী) এবং জোগীয়া রাগের প্রচলন আছে। গুনকলী ভৈরব অঙ্গের গম্ভীর প্রকৃতির রাগ আর জোগীয়ায় সেই তুলনায় সাঁ রে ম প ধ সা স্বরের অতিরিক্ত গ নি স্বর দুটি অবরোহে অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হতে পারে। তেমনি দক্ষিণ ভারতের সাবেরী রাগকে হিন্দুস্থানী সংগীতের জোগীয়ার মতোই মনে হতে পারে। তবে দক্ষিণ ভারতে জোগীয়া এবং সাবেরীর সূক্ষ্মতম পার্থক্য হচ্ছেঃ যেমন সা রে ম, ম প ধ সাঁ, সাঁ রে সাঁ নি ধ প, ম প, ধ মগ রে সা-এই অংশ সাবেরী রাগের (হিন্দুস্থানী সংগীতের জোগীয়ার মতোই)। ম ম প ধ সাঁ রে সাঁ এই অংশ জোগীয়া এবং সাবেরী রাগে সমানভাবে ব্যবহৃত হয়। ধ ম রে সা-এই অংশ জোগীয়ার আর ধ প, ম গ রে সা-এই অংশ সাবেরী রাগের। দক্ষিণ ভারতে জোগীয়া এবং সাবেরীর পার্থক্য আরো স্পষ্ট হয় এভাবেঃ সাবেরী লোকজ ঢঙের রাগ। তাছাড়া হিন্দুস্থানী সংগীতের দৃষ্টিতে জোগীয়া এবং সাবেরী রাগের মধ্যে বাদী-সমবাদীর পার্থক্য রয়েছে।

ধারণা করা যেতে পারে, হিন্দুস্থানী সংগীতে (উত্তর ভারতে) সাবেরী রাগের স্থানে জোগীয়া রাগ বহুল প্রচলিত হওয়ায় সাবেরী বা শবরী রাগটি লুপ্ত মনে হচ্ছে। আর ইতিপূর্বে চর্যার আলোচনায় সাবেরী রাগের বিষয়টি না আসায় রাগটি শবর জাতির মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল এমন ধারণা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে রাগটি বর্তমানে লুপ্ত। ঠিক একই ভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোড়া রাগটি সম্পর্কে যেমন বলা হয় রাগটি বর্তমানে লুপ্ত। কিন্তু বাস্তবে কোড়া রাগটি আধুনিক কালেও প্রচলিত আছে, যার পুরা নাম কৌশিকানাড়া। কৌশিকানাড়া নামের মালকৌশ ও বাগেশ্রী অঙ্গের দুটি রাগ প্রচলনে আছে। এখানে রাগের স্বরূপ সংক্ষিপ্ত উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন মালবকৌশিক রাগ বর্তমানে মালকৌশ বা মালকোশ নামে পরিচিত। কৌশিকানড়া শব্দের প্রথম ও শেষ অক্ষর উচ্চারণ করে কোড়া নামে অভিহিত হতো। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ৩৪টি পদের সাথে রাগটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ধারণা করা যেতে পারে চর্যাপদের শবরী রাগটি দক্ষিণ ভারতীয় রাগ সাবেরী-ই হবে এবং এর স্থানটি বর্তমানে দখল করে আছে হিন্দুস্থানী সংগীত ধারার রাগ জোগীয়া। কেননা উত্তর ভারতীয় সংগীতের জোগীয়া এবং দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের সাবেরী সমপ্রাকৃতিক রাগ।

১৭. রাগ অরু

'অরু' একটি অপ্রচলিত রাগস্বরূপ যা আধুনিক কালে অরুণ নামে পরিচিত। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে এই অপ্রচলিত রাগটির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেননি। প্রচলিত অরুণ রাগকে ভৈরব রাগাঙ্গের রাগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে খেয়াল বা ধ্রুপদ গায়কদের কণ্ঠে রাগটি শোনা যায় না। আধুনিক কালে কাজী নজরুল ইসলামের অরুণ ভৈরব রাগে 'জাগো অরুণ ভৈরব' একটি গান বেশ জনপ্রিয়। এই গানটির আলোকে রাগ স্বরূপ হয়তো আবিষ্কার করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু তা প্রাচীন স্বরূপের মতো হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে।

১৮. রাগ মালসী গুবুড়া

মালসী গবুড়া রাগটি বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে চর্যায় একটু ব্যতিক্রমী সংযোজন। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে রাগটি মালসী এবং গবুড়া রাগের মিশ্রণে সৃষ্ট। মালসী এবং গবুড়া রাগ দুটি সম্পর্কে ইতিপূর্বে পৃথক আলোচনা করা হয়েছে। তবে প্রশ্ন থেকে যায় রাগ দুটির মিশ্রণে স্বরূপটি কেমন হবে। চর্যায় এই রাগটি কাহ্নুপাদ ব্যবহার করেছেন। কাহ্নুপাদ নিঃসন্দেহে অন্যান্যদের তুলনায় বেশ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। এ ধরনের মিশ্রণ ক্রিয়ায় যে অনেক রাগ হতে পারে তার সূত্রপাত চর্যাপদে একটি মাত্র রাগেই (মালসী গবুড়া) লক্ষ করা যাচ্ছে। আধুনিক কালে এ ধরনের মিশ্রিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনেক অনেক রাগ প্রচলিত আছে, যেমন শুভকল্যাণ (কলাবতী + কল্যাণ), কলাশ্রী (কলাবতী + রাগেশ্রী), মালগুঞ্জী (বাগেশ্রী + রাগেশ্রী), পুরিয়া কল্যাণ (পুরিয়া + কল্যাণ), ভৈরব বাহার (ভৈরব + বাহার), নটভৈরব (নট + ভৈরব), জয়ন্ত মল্হার (জয়জয়বন্তী + মল্হার) ইত্যাদি।

মালসী এবং গবুড়ার মিশ্রিত স্বরূপটি বেশ জটিল হবে এমন ধারণা করা অযৌক্তিক নয়। প্রথমত, মালসী বা মালশ্রী একটি অল্পপ্রচলিত রাগ, দ্বিতীয়ত, গবুড়া যদি গৌড় হয় সেক্ষেত্রে গৌড় রাগটিও একটি অল্পপ্রচলিত রাগ। তৃতীয়ত, মালশ্রী কল্যাণ ঠাটের রাগ এবং গৌড় কাফি ঠাটের রাগ। উল্লেখ্য যেদুটি রাগের মিশ্রণ-ক্রিয়া সহজ হয় যখন রাগদুটির মধ্যে স্বর বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কিছু সামঞ্জস্য থাকে। এখানে মালশ্রীর স্বরগুলি হচ্ছে সা গ ম প নি সা আর গৌড় রাগের স্বরগুলি (কাফি থাট) হচ্ছে স রে গ ম প ধ নি সা (এখানে শুধু স্বরের উল্লেখ করা হলো, চলন নয়)। এই দুই রাগের মিশ্রিত স্বরূপটি বেশ জটিল হবে এবং এ ধরনের প্রচলিত কোনো রাগ হয়তো শোনা যাবে না। তবে দুটি রাগের স্বরগুচ্ছকে ঘিরে অবশ্যই একটি রাগ স্বরূপ সৃষ্টি সম্ভব। এ ক্ষেত্রে রাগটি কেমন মনোরঞ্জক হবে তা বলা মুশকিল। মিশ্রিত রাগ হিসেবে একটি রাগের মধ্যে ৫/৬টি পর্যন্ত রাগ থাকতে পারে, যেমন- খট্ রাগে ৬টি রাগের মিশ্রণ আছে। তবে মালশ্রী এবং গবুড়া রাগের স্বরূপকে আধুনিক কালের দৃষ্টিতে বন্দিশ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রচারে আনা সম্ভব।

মালশ্রী গবুড়া রাগটি নিয়ে একটু অন্যভাবে যদি ভাবা যায়, তাহলে মালশ্রী এবং গারা রাগের মিশ্রিত স্বরূপকে কল্পনা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে মিশ্রিত স্বভাবটি তেমন যুক্তিযুক্ত হয় না। কেননা মালশ্রী যেমন গম্ভীর প্রকৃতির রাগ আর গারা সেই তুলনা অত্যন্ত হালকা প্রকৃতির রাগ। তাছাড়া স্বর বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মালশ্রী এবং গারার (কাফি ঠাট) মিশ্রণের চেয়ে মালশ্রী এবং গৌড় এর মিশ্রণই অধিক গ্রহণ যোগ্য হতে পারে।

চর্যাগীতিতে রাগের নামের বানান বিভিন্ন সম্পাদনা গ্রন্থে বিভিন্ন রকম পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধের রাগের আলোচনায় রাগের বানানের বিষয়টি যেমন বিবেচনা করা হয়েছে পাশাপাশি প্রচলিত রাগরূপের বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। মধ্য এবং আধুনিক যুগের অনেক গুণী শিল্পী রাগ সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের সৃষ্ট রাগের নামকরণ করেছেন বিভিন্নভাবে। তবে রাগের স্বরূপ টিকে থাকবে প্রচলনের মধ্য দিয়ে এবং জনপ্রিয়তার মাধ্যমে। উপযুক্ত শিষ্য বা প্রচারের মধ্য দিয়ে প্রাচীন পদ্ধতির রাগরূপ যেমন আধুনিক কাল পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছে, তেমনি এর উচ্চারণগত তারতম্যও এসেছে ভাষা ব্যবহারের সাথে সাথে। তবে অনেক রাগ প্রাচীন এবং আধুনিক কাল পর্যন্ত একই নামে প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ভাষায় রাগের নাম বিভিন্নভাবে লেখার কারণে আর যাই হোক আধুনিক কালে রাগরূপের পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই, কেননা রাগের অডিও রেকর্ডের মাধ্যমে আজকে যে কোনো রাগের স্বরূপ ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় রাগের সমাবর্তন

চর্যার উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতীয় রাগের বিষয়টি বিবেচনা করে বলা যেতে পারে, সেই সময়ের সংগীতজ্ঞগণ বা চর্যার রচয়িতাগণ সবাই কমবেশি উভয় ধারার রাগসংগীতে অভিজ্ঞ ছিলেন। আমরা জানি, পণ্ডিত শার্ঙ্গদেবের সংগীত রত্নাকর গ্রন্থটি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। মোটামুটি ১২শ শতাব্দীর পরে থেকেই দুটি ধারা আস্তে আস্তে শৈলীগত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে পৃথক হতে থাকে। তবে রাগস্বরূপের তেমন কোনো পার্থক্য হয়নি। তাছাড়া আধুনিক কালেও উত্তর ভারতীয় এবং দক্ষিণ ভারতীয় অনেক রাগের মিল আছে। এই মিল হয়তো রাগের স্বরবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এক অথবা নামের দিক

থেকে এক। তবে কখনো কখনো নাম এক হলেও দেখা যায় স্বরবৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন। আবার স্বর বৈশিষ্ট্য একই থাকলেও নাম ভিন্ন ভিন্ন। আবার অনেক রাগ আছে যা সরাসরি নাম ও স্বরে একইভাবে ভারতীয় সংগীতে সমান ভাবে প্রচলিত আছে এবং হচ্ছে।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় রাগের বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনায় যে বিষয়ে সর্বপ্রথমে নিশ্চিত হতে হয় সেটি হলো স্বর। দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের কোনো রাগের স্বরসমূহের বিবরণ থেকে উত্তর ভারতীয় সংগীতে তা একই হলেও অন্য কোনো রাগ হতে পারে। তাছাড়া কোনো কোনো স্বরের frequency (স্বরের কম্পন) একটু কমবেশি আছে যা এই প্রবন্ধের আলোচনায় নিষ্প্রয়োজন। তবে চর্যার রাগগুলি দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে যে সকল নাম ও স্বরূপে প্রচলিত আছে তা আবিষ্কৃত হলে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে চর্যাগুলির রাগরূপ আরো স্পষ্ট হতে পারে।

চর্যায় রাগসংগীতের বাণী ও ভাবসম্পদ

চর্যাপদের বাণীভাবের সাথে রাগসংগীত শৈলীর ভাবগম্ভীর অবস্থানের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনেকের ধারণা রাগসংগীতের প্রবন্ধ শৈলীর মতো গম্ভীর ভাবটি ঠিক যেন চর্যার বাণীতে মানায় না। কিন্তু এই ধারণা অনেকটা পক্ষপাতিত্বমূলক। রাগের ধ্যান শ্লোকে রাগের স্বরূপ কেমন হবে এমন বর্ণনা মেলে। গীতগোবিন্দ প্রবন্ধ শ্রেণীর সংগীত, সেখানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমভাবের বাণীসমৃদ্ধ রচনা বর্তমান। চর্যাপদের বাণী যদি কোনো সম্প্রদায়ের সাধনতন্ত্রের ভাবগাম্ভীর্য অর্থ বহন করে, তাতে রাগসংগীতের জন্য চর্যায় পাশাপাশি বিষয়টি আরো গম্ভীর ভাবাপন্ন হতেই পারে। আধুনিক কালের বন্দিশে, প্রেম, ভক্তি, বীরত্ব, রাজস্তুতি,-সহ নানা আঙ্গিক ও ভাবের উন্মাদনা মেলে। সেক্ষেত্রে চর্যাপদের বাণীকে আধুনিক কালের দৃষ্টিতেও উত্তম ভাবসম্পদের রসদ হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

উদ্ভবের সময় থেকে ভারতীয় সংগীত বৈদিক এবং তান্ত্রিক এই দুটি ধারায় বিভক্ত ছিল। বৈদিক সংগীত থেকে যেমন মার্গ ধারা প্রবাহিত, যা আধুনিক কাল পর্যন্ত শাস্ত্রীয় বা রাগসংগীতের অনুসারী, তেমনি তান্ত্রিক ধারার বাণীকে রাগসংগীত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করেছে এবং এ বিষয়ে সাধকগণই রাগের আশ্রয় নিয়েছেন বার বার, আর সাধকদের সান্নিধ্যে এসেছেন রাগসংগীত শিল্পীরা এর বাণীভাবের কারণেই। দুই ধারার সাধনার পথ যাই হোক না কেন, সংগীতে এসেই এদের মিলন সুদৃঢ় হয়েছে।

উপসংহার

চর্যার সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যের প্রধানতম আকর্ষণ হচ্ছে রাগ। রাগসংগীত বিভিন্ন শৈলীপ্রকরণের মধ্য দিয়ে আধুনিক কালেও একই স্বরূপে বিস্তৃত। বাংলা ভাষায় রাগসংগীত চর্চা বা বাঙালি সংগীতজ্ঞদের অবদানে রাগসংগীত চর্চার সূত্রপাত চর্যার আগেও ছিল। কেননা চর্যায় প্রচলিত রাগগুলি আধুনিক কালেও সুসংহতভাবে প্রচলিত আছে আর চর্যায় এগুলির অনুপ্রবেশ রাতারাতি হয়নি। বাঙালির সাংস্কৃতিক ও সাংগীতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, বাঙালিরা কথা বা বাণীপ্রধান গান সকল সময়ে চর্চা করেছে। কিন্তু বাঙালির রাগসংগীত চর্চার যে সুদৃঢ় ঐতিহ্য আছে চর্যায় রাগের ব্যবহার থেকে তা আরও স্পষ্ট হচ্ছে। বঙ্গাল, ধনশ্রী, পটমঞ্জরী ইত্যাদি রাগের ইতিহাস ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে রাগসংগীতে বাঙালি সংগীতজ্ঞদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তা বাংলা অঞ্চলের রাগ হিসেবে বিশেষভাবে সমাদৃত। চর্যার এই রাগগুলি মূলত ব্যবহারিক বিষয়। প্রবন্ধটির তখনি সম্পূর্ণভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে যখন চর্যায় উল্লিখিত নির্দিষ্ট রাগে এগুলি গীত হতে শোনা যাবে। আধুনিক কালে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে রাগগুলির রেকর্ড পাওয়া অসম্ভব কিছুই নয়। চর্যাগুলির সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যের প্রাচীন তাল বা ছন্দ প্রকরণ সমুন্নত রাখা সম্ভব হতো, যদি সবগুলি চর্যার সাথে তালের নামের বিষয়টি আবিষ্কার করা সম্ভব হতো। তবে আধুনিক কালের প্রচলিত (সে সকল তাল রাগসংগীতে ব্যবহৃত হয়) তালে এগুলি গীত হলে এর সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য কোনো রকম ক্ষুণ্ন হবে বলে আমি মনে করি না। জটিল হলেও চর্যাগুলি নির্দিষ্ট রাগে সুরারোপ সম্ভব এবং তা কেবল সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

কোনো কোনো চর্যায় ভক্তিভাবের সাথে নৃত্য-সংবলিত নাটকীয়তা পরবর্তী কালের বাংলা নাট্যধারায় পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগের সাথে সাথে সংগীতেরও কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। চর্যার পরে বাংলা গানের দ্বিতীয় ধারা হচ্ছে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' যা প্রবন্ধ শ্রেণীর-ই সংগীত।[২৯]

তথ্যনির্দেশ

১. ড. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৬।
২. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ* (৮ম মুদ্রণ; কলকাতা: নয়া প্রকাশ, ১৯৯৯)। তালিকায় গৃহীত রাগের নামগুলির বানান এই বই থেকে নেওয়া হয়েছে।
৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পাদনা), *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ)।
৪. পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *ক্রমিক পুস্তক মালিকা*, ৫ম খণ্ড (হিন্দী), সম্পাদক, লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ (হাথরস (উ.প্র.): সংগীত কার্যালয়, ১৯৮৩), পৃ. ২৪৩।
৫. পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, তদেব, পৃ. ২৪৭।
৬. পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *ক্রমিক পুস্তক মালিকা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (হিন্দী), সম্পাদক, লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ (হাথরস (উ.প্র.): সংগীত কার্যালয়, সংবৎ ২০১১), পৃ. ১৯৮-৯৯।
৭. পণ্ডিত বিনায়করাও পটবর্ধন, *রাগ বিজ্ঞান*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (হিন্দী), সহসম্পাদক, প্রফেসর না. বি. পটবর্ধন ও প্রফেসর ম, বি, পটবর্ধন, সংগীত গৌরব গ্রন্থমালা (৩য় সংস্করণ; পুণে : মহারাষ্ট্র মুদ্রণশালা ছাপাখানা,)।
৮. আবদুস সাত্তার, *নজরুল-সঙ্গীত অভিধান* (ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, ১৯৯৩), পৃ. ৫২, ৬৫।
৯. পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি*, ১০ খণ্ড, বঙ্গানুবাদ-সন্দীপন ভট্টাচার্য ও অসীম কুমার চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা : দীপায়ন, ????)।
১০. পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *ভাতখণ্ডে সংগীত শাস্ত্র*, প্রথমভাগ (হিন্দী) (৫ম সংস্করণ; হাথরস (উ.প্র.): সংগীত কার্যালয়, ১৯৮১), পৃ.২৬৯।
১১. পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *ক্রমিক পুস্তক মালিকা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, তদেব, পৃ.৩৩৯।
১২. পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি* (বাংলা অনুবাদ ৫ম খণ্ড), সম্পাদনা: ধরিত্রি রায় ও অসীম কুমার চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা: দীপায়ন, ১৩৯৭)।
১৩. পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *ভাতখণ্ডে সংগীত শাস্ত্র*, ৩য় খণ্ড (হিন্দী), সম্পাদক : লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ (হাথরস (উ.প্র.): সংগীত কার্যালয়, ১৯৮৪), পৃ.৩১২।
১৪. পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, তদেব পৃ.৩১৫।
১৫. পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, তদেব পৃ. ২৭৯।
১৬. যেমন, সৈয়দ আলী আহসান, *চর্যাগীতি প্রসঙ্গ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ????), পৃ. ১৭৭, ১৮৩।
১৭. পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *ভাতখণ্ডে সংগীত শাস্ত্র*, ৩য় খণ্ড (হিন্দী), তদেব, পৃ.২৮০-১।
১৮. পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *ভাতখণ্ডে সংগীত শাস্ত্র*, ১ম খণ্ড (হিন্দী), তদেব, পৃ. ২৬৮।
১৯. পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি*, ১০ম খণ্ড (বাংলা অনুবাদ), তদেব, পৃ.৩৮-৬৫।
২০. পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *ভাতখণ্ডে সংগীত শাস্ত্র*, ১ম খণ্ড, তদেব, পৃ. ১৬৮।
২১. পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, তদেব, পৃ.১৬৮।
২২. পণ্ডিত বিনায়ক রাও পটবর্ধন, *রাগবিজ্ঞান*, ৪র্থ খণ্ড (হিন্দী), সহসম্পাদক : শ্রী নারায়ণ বিনায়ক পটবর্ধন ও শ্রী মধুসুদন বিনায়ক পটবর্ধন (৫ম সংস্করণ; সংগীত গৌরব গ্রন্থমালা প্রকাশক, ১৯৬৮), পৃ. ১৬৯।
২৩. পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *ক্রমিক পুস্তক মালিকা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (হিন্দী), তদেব, পৃ. ২৫৯।
২৪. পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, তদেব, পৃ. ২৫৯।
২৫. পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *ক্রমিক পুস্তক মালিকা*, ৪র্থ খণ্ড (হিন্দী) (হাথরস (উ.প্র.): সংগীত কার্যালয়, ১৯৮৫), পৃ.৯১।
২৬. পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি*, ভাগ ৩ বাংলা অনুবাদ, সম্পাদনা: ধরিত্রী রায়/অসীম কুমার চট্টোপাধ্যায় দীপায়ন (২য় সংস্করণ; কলকাতা, ১৩৯৯), পৃ.৬৮।
২৭. বিমল রায়, *ভারতীয় সংগীত প্রসঙ্গ*, ১ম খণ্ড।
২৮. পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *ভাতখণ্ডে সংগীত শাস্ত্র*, ২য় খণ্ড (হিন্দী), সম্পাদক-লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ (হাথরস (উ.প্র.): সংগীত কার্যালয়, ১৯৮০), পৃ. ২৬৩।
২৯. স্বরলিপি প্রসঙ্গ : এই প্রবন্ধে স্বর বিষয়ক আলোচনা বা রাগের স্বরূপ (চলন) ভাতখণ্ডে (পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ) স্বরলিপির অনুসরণে করা হয়েছে।

ক. শুদ্ধ স্বর- সা রে গ ম প ধ নি (উচ্চারণ অনুসারে)
খ. কোমল স্বর- রে গ ধ নি এবং তীব্র মধ্যম র্ম
গ. মন্দ্র সপ্তকের স্বর- নি নি ধ ধ প
ঘ. তার সপ্তকের স্বর- সাঁ রেঁ রেঁ গঁ গঁ ম
ঙ. স্পর্শ স্বর- রে গ গ
ম প প

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ৯ম সংখ্যা ১৪০৮

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে লোকজীবন

শহীদ ইকবাল*

Abstract: The novel 'Aranyak' is a significant work in Bengali literature. In the novel Bibhutibhushan, who is well-known as a lover of nature, portrays a forest against the background of the folk-culture. This paper addressed that, though the main focus of the novel is the forest itself; the novelist portrays the life story of the poor, destitute who live in and with the forest. The paper asserts that the novelist has an artistic expression to sustain the ordinary daily activities and struggles of the poor people; their believes, myth, folk-rituals, their cultural heritage and their ordinary but significant experiences of life. It urgs, in conclusion, attempts to show what way 'Aranyak' becomes a portrayal of some folk people.

এক

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০) *আরণ্যক* (১৯৩৮) উপন্যাস মূলত অরণ্যের কথকতা। প্রকৃতির প্রতি তটস্থ দৃষ্টি *আরণ্যক*কে অন্য মাত্রা দেয়। কিন্তু শুধু প্রকৃতিই লেখকের মূল বিষয় থাকে না। বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রিয়তা নিয়ে এবং প্রকৃতির প্রতি তার বিশেষ পক্ষপাত নিয়ে গবেষক-সমালোচক এমনকি তার নিজেরও অনেক মন্তব্য আছে। কেউ কেউ বলেন একটা অধ্যাত্ম চেতনার গুণে তিনি প্রকৃতিপ্রেমিক, আবার এমনও মনে হয়েছে ত্রিশোত্তর সময় ও সমাজ বাস্তবতার নিরিখে তিনি এমন এক অনুষঙ্গকে উপন্যাসের উপাদান করেন, যেটা বাঙালি ও বাংলার মনন-বৈশিষ্ট্যজাত। কিন্তু *আরণ্যকে* লেখকের প্রকৃতির আকর্ষণ, প্রকৃতির কোলে আশ্রিত মানুষের প্রতি অনুরাগ তাদের ভালো-মন্দ ব্যথা-বেদনার ছবি একটি বৃহত্তর জীবনকে চিত্রিত করে। বিভূতিভূষণ প্রকৃতির মাঝে ব্যথাদীর্ণ মানুষের ছবি আঁকেন, চিত্রিত করেন এমন এক ব্রাত্য জীবন যা আবহমান এবং ভূমি প্রোথিত। বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষ স্থানান্তরিত হয়, ঘর বাঁধে, নতুন স্বপ্নে আশাবাদী হয়ে নীড় রচনা করে— এক রকমের মিশ্র লোকজ সংস্কৃতি তারা বয়ে বেড়ায় এবং স্থানিক সংস্রবে তা এক ধরনের জীবনধর্মে রূপ পায়। বিভূতিভূষণের অভিজ্ঞ ও নিবিড় শিল্পদৃষ্টি এ যাযাবর জীবনসংস্কৃতিকে এড়ায় না বরং আরো গভীর করে চরিত্রের অন্তর্নিহিত শক্তিকে টেনে বের করে তার স্পন্দনকে তুলে আনে। সার্বিক জীবনদৃষ্টিকে প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতিভূষণ তার নিমগ্নতায় সৎ সৌন্দর্যমুখরিত চার্চিত লৌকিক জীবনের ছবিই রূপায়িত করেন। তাঁর *স্মৃতির রেখায়* আছে "বাংলাদেশের সাহিত্যের উপাদান, বাংলার নরনারী, তাদের দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন, তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক— বহির্জগতের সঙ্গে তাদের রচিত ক্ষুদ্র জগৎগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র, বাংলার সন্ধ্যাকাল, আকাশ-বাতাস, ফুলফল— বাঁশবনের, আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজনে ফুল বিছানো পথের ধারে যেসব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে— তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখদুঃখকে রূপ দিতে হবে।"[১] যে জীবন-বৈশিষ্ট্যের জন্য বিভূতিভূষণের পক্ষপাত যেটাকে তিনি

* ড. শহীদ ইকবাল, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সাহিত্যের উপাদান করেন সেটা নিছক মানুষবিহীন প্রকৃতি নয়— প্রকৃতির ক্রোড়ে 'অদ্ভুত জীবনধারার স্রোত'। সুতরাং *আরণ্যক* পড়ে রাজশেখর বসুর 'হাওয়া বদলের কাজ হয়'[২]— এমন উপলব্ধির পাশাপাশি 'একটা কঠিন, শৌর্যপূর্ণ গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি'[৩] সেটারও পরিচয় মেলে। *আরণ্যক* নিশ্চয়ই কল্পলোকের কাহিনী নয়— এটা স্পষ্টই হয় বিভূতিভূষণের মতো একজন বড়ো আর্টিস্টের সাহিত্য ভাবনা থেকে। তবে *আরণ্যক* উপন্যাস কি-না কিংবা বিশ্ব সাহিত্যের উপন্যাসের সংজ্ঞায় তা পড়ে কি-না এ প্রশ্ন ভিন্ন। যদিও শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত স্পষ্টই বলেছেন, '*আরণ্যকে* অরণ্যের কথা আর মানুষের কথা এক হইয়া গিয়াছে। ইহা এক নূতন ধরনের উপন্যাসের কথা।'[৪] আর লেখক বলেন 'ইহা ভ্রমণবৃত্তান্ত বা ডায়েরি নহে— উপন্যাস।'[৫]

আরণ্যকের লোকায়ত জীবন এবং তার নিরীক্ষা নানামুখী এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। বাংলা সাহিত্যে সিরিয়াস কিংবা জীবনবাদী শিল্পীরা কেউই ব্রাত্য জীবনকে এড়াতে পারেননি। সংগ্রামশীল মানুষ একটা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সমাজের অনেকগুলো স্তরকে অতিক্রম করে সভ্যতার আলোকিত স্পর্শ লাভ করেছে। জীবন যেমন বহুবিচিত্রময়; বেঁচে থাকার প্রবণতায় মানুষও তেমনি বহু বর্ণে-গোত্রে-পেশায় উৎপাদন সম্পর্কের সূত্রে আবদ্ধ। সামাজিক স্তরবিন্যাসে মানুষ উৎসবে-পার্বণে দ্বান্দ্বিক বাস্তবতার সূত্রে এক জঙ্গম জীবনকে আত্মস্থ করে। বাঙালি সমাজে আধা-সামন্ত ও আধা পুঁজিবাদী জীবন বাস্তবতায় মানুষের যে অপূর্ণ বিকাশ এবং তার যে রুগ্‌ণ-জীর্ণ দশা সেখানে বেঁচে থাকার অবলম্বন চৈতন্যে একটা ভুঁইফোঁড় নির্মিতি দেয়। প্রকৃতির পরিবেশে, জল-মাটি-হাওয়ার বাস্তবতা যে অধ্যাত্ম-চেতনার চিরায়ত রূপকে গ্রোথিত করে সেখানে বিংশ শতাব্দীর আর্থ-রাজনৈতিক বাস্তবতা বাঙালির চিরন্তন বিশ্বাসের তরীকে একটু ভিন্ন দিকনির্দেশনা দেয়। গ্রাম ছেড়ে শহরে আসা মানুষ কিংবা একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন এসব একটা অংশের মানুষের জীবন-যাত্রাই শুধু নয়, বিশ্বাসের ভিত্তিতে ভাঙচুরও বটে। ইতিবাচক বা নেতিবাচক যেমনটাই হোক বাঙালি সমাজ নড়ে ওঠে। কিন্তু তা-কি সর্বত্র? উৎসব-পার্বণমুখর গতিশীল ব্রাত্য জীবনের পাড়ায়— লবটুলিয়া বইহার, ধরমপুর লছমানিয়াটোলা, ফুলকিয়া বইহার, মহালিখারূপের পাহাড় এদের মানুষগুলো কি খুব বদলানো? এদের পরিহাসপ্রিয় জীবন, স্ফূর্তিময়, সংস্কার-বিশ্বাস কেন আশ্চর্য বোধ হয়? এদের প্রতি কেন এতো মায়া হয় লেখকের? কেন এ জীবন তার ভালো লাগে? *আরণ্যক* প্রকৃতির কথকতা হলেও তার যে লোকায়ত জীবন এবং খণ্ড খণ্ড জীবনচিত্রের যে ছাপ— তা একটা ঐক্যসূত্র রচনা করে; পাঠককে চমৎকৃত করে।

দুই

আরণ্যক উপন্যাসের লোকায়ত জীবন এবং তার সমাজ বাস্তবতা লেখকের অভিজ্ঞতায় অধ্যায়ের পর অধ্যায় বর্ণিত হয়। অধ্যায় বিভাজন অনেকটা ঘটনার পরিসমাপ্তিতে— যেখানে ছুঁয়ে যায় লেখকের মননশক্তি। লেখকের বিস্ময়বোধ ও চৈতন্য পাঠককে আলোড়িত করে। নিষ্ঠুর জীবন কিংবা অনাহারী মানুষের সংস্কৃতি, উৎসবমুখরতা এক ধরনের প্রীতিবোধে জারিত হয়ে *আরণ্যককে* রসসিক্ত করে। অরণ্য বিভূতিভূষণের দৃষ্টিতে কেমন? কিংবা *আরণ্যক* কি অরণ্যের কথকতার বাইরে অন্য কিছু? এমন প্রশ্ন সহজাত হলেও অরণ্যের মানুষগুলো দৈনন্দিনতায় কিংবা স্বার্থে-ভোগে-বৈরাগ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। উদাস প্রকৃতি অন্য এক জীবন বাস্তবতার মুখোমুখি করেছে, তাদের বেঁচে থাকার সূত্র কিংবা উৎসবমুখরতা অনেকটা প্রকৃতি-প্রদত্ত। গণু মাহাতো, নন্দলাল ওঝা, ধাওতাল সাহু, রাজু পাঁড়ে, দোবরু পান্না প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যজাত। কিন্তু প্রকৃতি তাদের এক ধারাবাহিক জীবনকে বেঁধে দিয়েছে। যে জীবন-রীতি গড়ে দিয়েছে প্রকৃতি এবং বংশপরম্পরা সূত্রে ফুলকিয়া বইহার কিংবা ভীমদাসটোলার সংস্কৃতি যে জঙ্গমতাকে তুলে ধরে তা অন্য এক উপলব্ধিবোধ সঞ্জাত। সত্যচরণ অনেক সময়ে বিস্ময় বোধ করেছে, কখনো ভাত-না-পাওয়া মানুষদের দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে, কিন্তু এমন বাস্তবতার উর্ধ্বে কিংবা যে বিস্ময়কর জীবন তাদের কঠোরতা-দ্বন্দ্বে-সংগ্রামে বড় করেছে— সেখানে জীবন যে যুক্তিপূর্ণ এবং তাৎপর্যের মোহে উল্লম্ফিত; তা অস্বীকার করা যায় না। দ্বন্দ্বমুখর জঙ্গমের জীবনকে

সাক্ষাৎ অবলোকন করেছে সত্যচরণ। এ জীবনে সংস্কার-কুসংস্কার দৈব-নির্ভরতা কোনোটাই অনুপস্থিত নয়— সর্বাংশে বিশ্বাসযোগ্য। এসব যৌক্তিকতা থেকেই *আরণ্যক* শুধুমাত্র অরণ্যের পাঠ থাকে না— হয়ে ওঠে লোকায়ত জীবনের গল্প। এবং একটা তাৎপর্য নিয়ে এ মানুষগুলোর আঁতের খবর উন্মোচন জরুরি হয়ে পড়ে।

নায়ক সত্যচরণের উপলব্ধিতে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে লবটুলিয়ার জঙ্গলমহাল এবং তার প্রতিবেশ সম্পর্কে যে ধারণা জন্মে সেখানে একটা ভূমিব্যবস্থার স্বরূপই শুধু নয়— তার পাশাপাশি অরণ্য-নিবাসী মানুষের জীবনাচরণের চিত্রও মেলে। সত্যচরণ ম্যানেজার বাবু, কখনো হুজুর, কখনো জমিদার— অরণ্যের মানুষগুলো যুক্ত-করে তাকে আমন্ত্রণ জানায়; স্বাগত জানায় অপরিচিত লোকায়ত জীবন সন্দর্শনের জন্য। সত্যচরণ— লেখক নিজেই; বিভূতিভূষণের আত্মার নতুন পরিচয় কি! যে অন্তর্গত তাগিদে সত্যচরণের কলকাতা ছেড়ে জনহীন জঙ্গলে আবির্ভাব সেখানে বর্ধমানের গোষ্ঠবাবু আছেন, আছেন সিপাহী মুনেশ্বর সিং, মৈথিলি ব্রাহ্মণ পাটোয়ারী কন্টুমিত্র। কুল-বন ইজারা দেবার নিমিত্ত সত্যচরণের যাত্রা লবটুলিয়া। সেখানে দুই তিনশ বিঘা বন্যকুলের জঙ্গল ইজারা দেওয়া হবে। সত্যচরণ যে অনভ্যস্ত জীবনে পা রাখল, সেখানে তাকে ঘিরে যে আয়োজন— প্রথমেই এখানকার অভিনব সংস্কৃতি এবং অনাহারী-উৎকণ্ঠিত মানুষের বৈচিত্র্য আকৃষ্ট করে। জঙ্গলমহালে আবহাওয়া-জলবায়ুগত পরিবর্তন এবং অনভ্যাসগত জীবনের বিরূপতা যে 'ভালো-না লাগা'র কথা বলছিল তা অভিনব জীবন-বৈচিত্র্যের গুণে অনেক দূরে সরে যায়। বৈচিত্র্যের স্বাদই সত্যচরণকে মুগ্ধ করে। এ বৈচিত্র্য মূলত *আরণ্যকের* লোকায়ত সংস্কৃতির বৈচিত্র্য এবং মননগত আকর্ষণ। যেটা তাকে অন্য অভিজ্ঞতায় টেনে নিয়ে চলে নিরন্তর। অনাহারী উৎসবমুখর মানুষগুলোর টান; তাদের গল্পপ্রিয় ভাব সত্যচরণকে একদিকে যেমন বিস্ময়মুখর করে তোলে অন্যদিকে তেমনি তাদের জন্য কিছু করার অনুপ্রেরণা জোগায়। গনু মাহাতোর জীবনের গল্প, তার বেঁচে থাকার অবলম্বন, অরণ্যের ভূমিতে তাদের খাবার উপকরণ— এবং উৎপাদন-সম্পর্কের সূত্রে তাদের বেঁচে থাকার সংস্কৃতি *আরণ্যকে* উদাহরণ সৃষ্টি করে— "গণুর জীবিকানির্বাহের একমাত্র অবলম্বন মহিষ কয়টি। তাদের দুধ অবশ্য এ-জঙ্গলে কে কিনিবে, দুধ হইতে মাখন তুলিয়া ঘি করে এবং দু-তিন মাসের ঘি একত্রে জমাইয়া ন-মাইল দূরবর্তী ধরমপুরের বাজারে মাড়োয়ারীদের নিকট বিক্রয় করিয়া আসে। আর থাকিবার মধ্যে ওই দু-বিঘা খেড়ী অর্থাৎ শ্যামা ঘাসের ক্ষেত, যার দানা সিদ্ধ এ-অঞ্চলের প্রায় সকল গরিব লোকেরই একটা প্রধান খাদ্য।"[৬] লবটুলিয়ার চিত্র সংস্কারে-কুসংস্কারে বাঁধা। উড়ুক্কু সাপের কাহিনী বন্যমহিষের দেবতা টাঁড়বাড়োর প্রতি বিশ্বাস এবং রাজা দোবরু পান্না অসম্ভব চমৎকৃত করে খণ্ডায়িত কাহিনীকে।

আরণ্যক উপন্যাসে একটা সময়ের ধারাবাহিকতা আছে, কিছু পাত্র-পাত্রী গল্প বলে; ঘটনা বর্ণিত হয় সত্যচরণের মুখে। রাজা দোবরু পান্না উপন্যাসে উপস্থাপিত হয় একাদশ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় খণ্ডে। গরিব রাজা দোবরু পান্নার 'আট-দশটি ছেলেমেয়ে। এই বৃহৎ রাজপরিবারের সকলেই এই গ্রামে একত্রে থাকে। শিকার ও গোচারণ প্রধান উপজীবিকা।' গ্রামের বিচার কর্তা। নজরানা প্রথাও চালু আছে। অতিথিবৎসল রাজা; এখানে আরো পাওয়া যায় জগরু ও ভানুমতী। ভানুমতী সম্পর্কে সত্যচরণের উচ্ছ্বাস— 'ভানুমতী রাজকন্যা বটে, কিন্তু বেশ অমায়িক স্বভাবের রাজকন্যা। অথচ দিব্য সহজ, সরল মর্যাদাজ্ঞান।' গরিব রাজকন্যা, পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, গহীন অরণ্যে গুহায় সমাধিস্থানের বর্ণনায় সত্যচরণের অভিজ্ঞতা—

> এদের সমাধিস্থলে আড়ম্বর নাই, পালিশ নাই, ঐশ্বর্য নাই, মিশরীয় ধনী ফ্যারাওদের কীর্তির মতো— কারণ এরা ছিল দরিদ্র, এদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল মানুষের আদিম যুগের অশিক্ষিতপটু সভ্যতা ও সংস্কৃতি, নিতান্ত শিশু-মানবের মন লইয়া ইহা রচনা করিয়াছে ইহাদের গুহানিহিত রাজপ্রাসাদ, রাজসমাধি, সীমানাজ্ঞাপক খুঁটি। সেই অপরাহ্ণে ছায়ায় পাহাড়ের উপর যে বিশাল তরুতলে দাঁড়াইয়া যেন সর্বব্যাপী শাশ্বতকালের পিছন দিকে বহুদূরে অন্য এক অভিজ্ঞতার জগৎ দেখিতে পাইলাম— পৌরাণিক ও বৈদিক যুগও যার তুলনায় বর্তমান পর্যায়ে পড়িয়া যায়।[৭]

রাজা অনুসারী প্রজারা এতদঞ্চলে একটি সংস্কৃতিকে লালন করে। তারা বিত্তে দরিদ্র হলেও চিত্তে ধনী— জীবনবোধের মধ্যে আছে তাদের উল্লাসমুখরতা, ধর্মীয় চেতনায় তারা ঐতিহ্যানুসারী। সিঁদুরমাখা পাথরকে কুলদেবতা বলে পূজো দেয়। এ পাথরে বিভিন্ন প্রাণী বলির উৎসব হয়। টাঁড়বারো নামক বুনো মহিষের দেবতা প্রজাদের মনে বিশ্বাসের ভিত গড়েছে। এ বিশ্বাস শ্রদ্ধা ও সম্মানে টাঁড়বারোর দেবতাকে অনন্তকাল বাঁচিয়ে রেখেছে। সত্যচরণের বন্যসংকুল অভিজ্ঞতায় টাঁড়বারোর দেবতাকে অবিশ্বাস্য বা অকল্পনীয় মনে হয়নি। অথচ কলকাতার সিভিল-সমাজ প্রতিনিয়ত বন্যপ্রাণী ধ্বংসের যে তৎপরতা দেখায় সেখানে গহীন অরণ্যের দেবতা টাঁড়বারোর অসহায়ত্ব সত্যচরণকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়। ফুলকিয়ার কাছারিতে অনেক রাতে ঘুম ভাঙার পর সত্যচরণ বিষ্ণুরাম পাঁড়ে কিংবা গণোরী তেওয়ারীর মুখে শুনতে পায় নীলগাইয়ের জেরা; গাঙ্গোতা গণু মাহাতো শোনায় উড়ুক্কু সাপের কথা, জীবন্ত পাথর ও আঁতুড় ছেলের হেঁটে বেড়ানোর সংবাদ। সবকিছু অকল্পনীয় মনে হলেও প্রকৃতির আশ্রয়ে মানুষগুলোর এমন বিশ্বাস বিস্ময়কর নয়। পরিশ্রমী জীবনে এদের আছে যেমন পৌরাণিক বিশ্বাসের নির্ভরতা; তেমনি অনুকম্পায়ী জীবনে আছে সহজ-সরল আতিথেয়তা আর হাস্যরসে উৎসবমুখরতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ।

মৈথিল ব্রাহ্মণ নন্দলাল ওঝা, রাসবিহারী সিং, ধাওতাল সাহু, গিরিধারীলাল, জয়পালসহ বিভিন্ন বৈষয়িক ধারণার মানুষ পাওয়া গেলেও অরণ্যের প্রতিবেশে জাত-পাত ভেদ বহাল থাকে। দোষাদ-গাঙ্গোতা-ব্রাহ্মণ ছত্রী বর্ণভেদ সম্ভ্রমে মেনে চলে। সমাজে শ্রেণীস্তর জাত-পাত ভেদে গঠিত হয়, মহাজনী কারবার বা সুদের ব্যবসা এমনকি সত্যচরণের ম্যানেজারির উদ্দেশ্য এবং এর সাথে রাজু পাঁড়ে, গনু, গনোরী কিংবা কাছারীর কর্মচারী, পাটোয়ারীদের বেঁচে থাকা সবকিছুই উৎপাদন-সম্পর্কের সাথে গ্রোথিত। সমাজে যে শ্রেণীস্তর তৈরি হয় এবং বর্ণভেদে তাদের যে সংস্কৃতি, শ্রমবিন্যাস সবই ভূমি-ব্যবস্থার পরিণতি। সত্যচরণের লবটুলিয়া বা ফুলকিয়া বইহারে আগমনের সূত্র এবং শহর ছেড়ে গ্রামীণ জীবন বা অরণ্যে এসে বসতির উদ্দেশ্য এবং বিচিত্র মানুষ সন্দর্শনের যে অভিজ্ঞতা তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) *পুতুলনাচের ইতিকথার* (১৯৩৬) শশীর সাথে তুলনীয় না হলেও সত্যচরণের অভিজ্ঞতা প্রশ্নের সম্মুখীন করে। খেতে না পাওয়া মানুষ, ভাত না খাওয়া মানুষ কিংবা পাঁচটি মহিষের জন্য জঙ্গলে কুঁড়ে বাঁধানো ঘরে যাপিত জীবন— সেটা কঠিন ও সৌন্দর্যপূর্ণ জীবন কিন্তু শশীর দৃষ্টির মতো সিরিয়াস জীবন হয়তো নয় । কিন্তু দু'নায়কই শহর ছেড়ে গ্রামে বা অপেক্ষাকৃত সাধারণ ব্রাত্য জীবনের মধ্যে প্রবেশ সেখানে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি দুরকম, বাস্তবতাও দুরকম। বিভূতিভূষণ যেমনটা বলেন— 'শৌর্যপূর্ণ গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি ... এদেশের লোকের দারিদ্র্য, সরলতা তাই Virile, active life ...।' এর সাথে শশীর গাওদিয়ার তফাত কম। তবে সিরিয়াসনেস আলাদা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের ভূমি-ব্যবস্থার ফল এবং তার সাথে শ্রম-সম্পর্কের মানুষগুলোর— বা বৈষয়িক বুদ্ধির রাসবিহারী, নন্দলাল ওঝাদের সংবাদ; এদের লৌকিক জীবন এবং তার বাস্তবতা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। বিভূতিভূষণ অরণ্য আচ্ছাদিত মানুষদের অঙ্কন করলেও যে বাস্তব জীবনকে কিংবা সরল মনোভাবের মানুষগুলোর কষ্টের যে বৃত্তান্ত তুলে আনেন তাতে সামন্তবাদ ভাঙনের ফল কিংবা তথাকথিত পুঁজিবাদ উত্থানের পর্বের ক্ষেত্রকেই চিহ্নিত করে। পূর্ণিয়ার জঙ্গলমহালের অভিজ্ঞতা কিংবা বেঁচে থাকা মহিষগুলোর জীবন শুধু গল্প নয়; খাদ্যে-আহারে-উৎসবে তাদের মিশে থাকে সংগ্রামশীল এক জীবন-বাস্তবতা। *আরণ্যকের* এ কঠোরতম যৌক্তিক জীবন দেখেই হয়তো বিভূতিভূষণ বলেন, কেন জানি না, 'ইহাদের হঠাৎ এত ভালো লাগিল।'

আরণ্যকের চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছদে যথাক্রমে পুণ্যাহ উৎসব ও হোলি উৎসবের সূত্রে যে লোকসাংস্কৃতিক জীবনের সত্য আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয় তা অসামান্য—"ফাল্গুন মাসের হোলির সময় একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম্য মেলা বসে, এবার সেখানে যাইব বলিয়া ঠিক করিয়াছিলাম। বহু লোকের সমাগম অনেক দিন দেখি নাই, এদেশের মেলা কি রকম জানিবার একটা কৌতূহলও ছিল।" শুধু পুণ্যাহ বা হোলি উৎসব নয় দোল, ঝুলোনোৎসব ইত্যাদি দেখার পর সত্যচরণ মানব জীবনের অন্য অর্থ খুঁজে পায়। উৎসবে-আমোদে প্রাণ হরণকারী ভিটলদাসের 'ছক্করবাজ' নাচ, দশরথের 'ননীচোর নাটুয়া'র নাচ, 'মঞ্চী-নকছেদী'র, নাচ ভূ-সংলগ্ন

মানুষের সংস্কৃতিকেই শুধু তুলে ধরে না— একটি আকর্ষণীয় উপভোগ্য জীবনের ঈষৎ-প্রগল্‌ভা রূপের ছবিও ভেসে ওঠে। শ্রমনিষ্ঠ মানুষগুলো বেঁচে থাকার সূত্রে যে সংস্কৃতি লালন করে সেখানে উৎসব প্রবণতা কিংবা লোকজীবনের অনিবার্য অনুষঙ্গগুলো তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে গভীর অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী। বাঙালির ঐতিহ্যচর্চায় লোকসংস্কৃতি যেমন অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে লালন করে তেমনি বিচিত্র বর্ণের-গোত্রের মানুষকে একত্রিত করে বেঁচে থাকার আন্তরসঞ্জাত শক্তিকে শানিত করে। নাচ-গান-মেলা ধর্মীয় বিশ্বাস লোকায়ত জীবনের দস্তুর। ভিটলদাস নাচ দেখিয়ে পয়সা অর্জন করে; এমন ছক্করবাজের নাচে তার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে এবং মন হরণের ক্ষেত্রে সফল, তাই সে তা কলকাতায় প্রদর্শন করে গুণের আদর পেতে চায়। এমন সরল বিশ্বাসের মানুষ দশরথও। মঞ্চী শুধু নাচেই তা নয়, সে নিজেকে সাজায়; মঞ্চীর আচরণে লেখকের মন ছুঁয়ে যায়। সে বলে— "মঞ্চী আরো অনেক জিনিস দেখাইল। আহ্লাদের সহিত একবার এটা দেখায়; একবার ওটা দেখায়। মাথার কাঁটা, পাথরের আংটি, চিনামাটির পুতুল, এনামেলের ছোট ডিশ, খানিকটা চওড়া লাল ফিতে— এইসব জিনিস। দেখিলাম মেয়েদের প্রিয় জিনিসের তালিকা সব দেশেই সব সমাজেই অনেকটা এক। বন্য মেয়ে মঞ্চী ও তাহার শিক্ষিত ভগ্নীর মধ্যে বেশি তফাৎ নাই। জিনিসপত্র সংগ্রহ ও অধিকার করার প্রবৃত্তি উভয়েরই প্রকৃতিদত্ত ।"[৮] মঞ্চী ব্যবহার করে হিংলাজের মালা— এমন সুন্দর বালিকাস্বভাবা নারীর চাপল্য, আকর্ষণীয় দেহমূর্তি, অনায়াস আতিথ্য, সত্যচরণকে মুগ্ধ করে। উপন্যাসে মঞ্চীর মতো ভানুমতীও চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। নারীর নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার সত্যচরণকে মুগ্ধ করে। এমন আকর্ষণীয় চরিত্রগুলো উপন্যাসে ক্ষণিক প্রভা ছড়ায়। তবে লেখকের উদ্বেলতা অনেকাংশে পৌনঃপুনিকতার দোষে দুষ্ট।

আরণ্যকের আকর্ষণীয় চরিত্র রাজু পাঁড়ের উপস্থিতি ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। অতি গরিব পঞ্চাশ-ছাপ্পান্ন বছরের এ ব্রাহ্মণ সত্যচরণের দৃষ্টিতে 'অদ্ভুত ধরনের মানুষ'। কবি ও দার্শনিকতাসুলভ আচরণ নজরে পড়লেও এক সাত্ত্বিক স্বভাব, আধ্যাত্মিক মন— জগৎ-জীবনের মোহ সম্পর্কে তাকে নিরাসক্ত করেছে। লবটুলিয়া-বইহারে দু'বিঘার বেশি জমি বরাদ্দ থাকলেও তাতে আবাদ হয় না; এমনকি জঙ্গলও সাফ হয় না। সংসার সম্পর্কে বিবাগী কিন্তু মৃত স্ত্রী সরযূর প্রেম তার হৃদয়ে মলিন হয়নি। ধরমপুর পরগনার এ মানুষটি সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের বর্ণনা—

> রাজু অতি শান্ত প্রকৃতির লোক । তাহাকে কোন কিছু বুঝাইতে বেশি বেগ পাইতে হয় না। জমি সে লইল বটে, কিন্তু পরবর্তী পাঁচ-ছ মাসের মধ্যে জমি পরিষ্কার করিয়া উঠিতে পারিল না। সকালে উঠিয়া তাহার পূজা ও গীতাপাঠ করিতে বেলা দশটা বাজে, তারপর কাজে বার হয়। ঘণ্টা-দুই কাজ করিবার পর রান্না-খাওয়া করে, সারা দুপুরটা খাটে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ! তারপরই আপন মনে গাছতলায় চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবে। সন্ধ্যার পরে আবার পূজাপাঠ আছে।[৯]

বরাবরই লক্ষ করা যায় নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতি লেখকের টান। এক্ষেত্রে তিনি অনেকটা নিরহংকার। সেজন্য দোবরু পান্নার দুর্গ থেকে শুরু করে দেহাতি মুনেশ্বর কেউই তার কাছে অস্পৃশ্য মনে হয় না। বোধ করি একটা লৌকিকতার টানেই মাইলের পর মাইল এ অস্পৃশ্য-নিম্নবর্ণের মানুষগুলোর সন্ধান চলে— যারা সৎ, অনাবিল এবং নিরুপকরণ। কড়ারী তিনটাঙার গাঙ্গোতা গিরিধারীলালকে গ্রাম্য মেলায় দেখে সত্যচরণের স্বচ্ছ দৃষ্টির লৌকিক উদ্ভাসন অন্য এক ধারণা সামনে আনে—

> মুগ্ধ হইলাম তাহার চোখের দৃষ্টির ও মুখের অসাধারণ দীন-নম্রভাব দেখিয়া। যেন কিছু ভয়ের ভাবও মেশানো ছিল সে দৃষ্টিতে। ...ভাবিলাম লোকটার অত দীনহীন দৃষ্টি কেন? খুব কি গরিব? লোকটার মুখে কি যেন ছিল, বারবার আমি চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, Blessed are the meek for theirs is the kingdom of heaven এমনধারা সত্যিকার দীন-বিনম্র মুখ কখনো দেখি নাই।[১০]

এই 'দীন-বিনম্র মুখের' সন্ধান খোঁজা নিশ্চয়ই কোনো এলিটিস্টের কাজ নয়। একজন ক্ষুৎকাতর শিল্পীর দৃষ্টিতেই বোধকরি তা মাত্রিকতা পায়। নৃত্যশিল্পীর বা নর্তকজীবনের ভ্রাম্যমাণ মানুষদের পরিচয় পাওয়ার সূত্রে এমনটা নজরে আসে *আরণ্যকে* কোনো স্থায়ী জনপদের বা স্থির জীবনের ছবি অঙ্কিত হয়নি। প্রত্যেকটি চরিত্রই ভ্রাম্যমাণ। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে এক শ্রমসাধ্য জীবনকে তারা বেছে নেয়। তবে যে সংস্কৃতি, লোকায়ত মেলার যে বৈশিষ্ট্য এবং মেয়েলি আচারের প্রতি যে সমাদর সেখানে আরণ্যকের ভৌগোলিক বাস্তবতা এক ধরনের যাযাবর সংস্কৃতির ধারণাকেই তুলে ধরে। ব্রাহ্মণ, গাঙ্গোতা, দোষাদ, সাঁওতাল, রাজগোঁড় ইত্যাদি বিচিত্র বর্ণস্বভাবের মানুষ; তাদের অর্থাগমের উৎস এবং বয়ে আনা সংস্কৃতি অরণ্যপটের এক প্রসন্ন জীবনের ছবি তুলে ধরে। পার্বণে-উৎসবে নাচ-গান, ছড়া-ধাঁধা রং তামাশায় জীবনের উপভোগ চলে কিন্তু অর্থকষ্ট যখন তাদের খাজনা ফাঁকি দেওয়ায় তখন ব্রাহ্মণ দশরথ পালিয়ে বাঁচতে চেয়েও রক্ষা পায় না। সত্যচরণের অনুভূতির মায়ায় সে বাঁধা পড়ে। সত্যিকার অর্থে, লোকায়ত চরিত্রের এ মানুষগুলো আচরণে-স্নেহে-মায়ায় বিভূতিভূষণকে আকৃষ্ট করে। ক্ষুৎপীড়িত নাচের দলের নতুন ধরনের নাচ দেখে শুধু প্রসন্নবোধই নয় একটা ব্রাত্য-নিগ্রহও লেখকচিত্তকে তাড়িত করে।

লবটুলিয়া বইহারের ছবি এবং তার জীবনযাত্রা চতুর্দশ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে নজরে আসে। মঞ্চী, সুরতিয়া ও ভানুমতীর প্রতি পক্ষপাত এবং সরল বন্যমেয়ের প্রতি সহজাত আকর্ষণ সূত্রে হাসি-কান্নার যে গল্প লেখক বর্ণনায় উঠে আসে তা শান্ত-সারল্যের ছবি—

> বড় বড় কলের চিমনির মতো লম্বা, কালো কেঁদ গাছের গুঁড়ি ঠেলিয়া আকাশে উঠিয়াছে খুপরির চারিধারে, যেন কালিফোর্নিয়া রেডউড গাছের জঙ্গল। বাদুড় ও নিশাচর কাঁকপাখির ডানাঝটাপটি ডালে ডালে, ঝোপে ঝোপে অন্ধকারে জোনাকির ঝাঁক জ্বলিতেছে, খুপরির পিছনের বনেই শিয়াল ডাকিতেছে— এই কয়টি ছোট ছেলেমেয়ে লইয়া উহাদের মা যে কেমন করিয়া এই নির্জন বনে-প্রান্তরে থাকে, তাহা বুঝাইয়া ওঠা কঠিন। হে বিজ্ঞ, রহস্যময় অরণ্য, আশ্রিত জনের প্রতি তোমার সত্যিই বড় কৃপা।[১১]

অরণ্যের আরণ্যক জীবন এবং তার কোলে 'কতকগুলি খোলার চালের বিশ্রী ঘর, গোয়াল, মকাই জনারের ক্ষেত, শণের গাদা, দড়ির চারপাই, হনুমানজীর ধ্বজা, ফণিমনসার গাছ, যথেষ্ট দোক্তা, যথেষ্ট খৈনী, যথেষ্ট কলেরা ও বসন্তের মড়ক'— এমনটা ব্রাত্য জীবনের ছবি নয়তো কি! মঞ্চীর ছেলের মৃত্যু, নিরুদ্দেশ হওয়া, কুশ্রী নোংরা বস্তীর জীবন এসব সন্দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে এদের সাথে এক ধরনের মিতালী এবং সেখানে জীবনের আস্বাদ গ্রহণ করে সত্যচরণ— 'জনশূন্য বিশাল লবটুলিয়া বইহারের দিগন্তব্যাপী বনঝাউ ও কাশের বনে নিস্তব্ধ অপরাহ্নে একা ঘোড়ার উপর বসিয়া এখানকার প্রকৃতির এই রূপ আমার সারা মনকে অসীম রহস্যানুভূতিতে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে, কখনও তাহা আসিয়াছে ভয়ের রূপে, কখনও আসিয়াছে একটি নিস্পৃহ, উদাস, গম্ভীর মনোভাবের রূপে, কখনও আসিয়াছে কত মধুময় স্বপ্ন, দেশবিদেশের নরনারীর বেদনার রূপে। সে যেন খুব উচ্চদরের নীরব সঙ্গীত— নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোর তালে, জোৎস্নারাত্রের অবাস্তবতায়, ঝিল্লীর তানে, ধাবমান উল্কার অগ্নিপুচ্ছের জ্যোতিতে তার লয়-সঙ্গতি।'[১২] 'উচ্চদরের নীরব সঙ্গীতে'র অনুভূতি *আরণ্যকে* অনাদরের লোকশিল্পীদের এক তানে বাধে, 'বোধকরি একটা দ্বন্দ্বও সৃষ্টি করে। কেননা মটুকনাথের সংস্কৃতানুরাগ, কুন্তার মতো নারীর আত্মসম্ভ্রমবোধ, যুগলপ্রসাদের পুষ্পপ্রীতি, রাজা দোবরু পান্নার জাতিগত অহংবোধ এসবের বিপরীতে যখন ভিটলদাস, দশরথের শিল্পক্ষুধা বিপন্নতায় গড়াগড়ি যায় তখন একটা প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্বই উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে। এসব লোকায়ত মানুষের বিপন্ন জীবনকে শুধু অনুধাবনই নয় এদের খাদ্যাভ্যাস, রুচি, ধর্মকর্ম, বর্ণব্যবস্থা আন্তরসঞ্জাত উপলব্ধি করেন। যেন একজন ধ্যানী মরমি মানুষ দ্বিধাহীন বাস্তবের ভূমিতে নেমে এসেছে।

আরণ্যকে খাজনা তথা অর্থব্যবস্থার সূত্রে ভ্রামণিক কিছু অন্নসন্ধানী মানুষের পরিচয় মেলে। জমি বন্দোবস্ত দেওয়া তার বিনিময়ে খাজনা, শস্যপ্রদান এবং কাছারি, নায়েব এদের প্রতাপ সবই লক্ষ করা যায়। দরিদ্র

মানুষগুলো খেড়ীর দানা সিদ্ধ, বাথুয়া শাক সিদ্ধ, গুড়মী ফল, লতানে গাছ, কাঁকুড় ফল ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে। ভাত দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য বস্তু। বিত্তবান শ্রেণী ছাড়া মাছ, মাংস, ক্ষীর, দই কারোই মেলে না। কোথাও এমন খাবারের সন্ধান পেলে ক্রোশের পর ক্রোশ হাঁটা চলে। সত্যচরণ বলে "এত গরিব দেশ যে থাকিতে পারে তাহা আমার জানা ছিল না। বাংলাদেশ যতই গরিব হোক, এদের দেশের সাধারণ লোকদের তুলনায় বাংলা দেশের গরিব লোকেও অনেক বেশি অবস্থাপন্ন। ইহারা এই মুষলধারে বৃষ্টি মাথায় করিয়া খাইতে আসিয়াছে চীনা ঘাসের দানা, টক দই, ভেলি গুড় ও লাড্ডু। কারণ ইহাই এখানে সাধারণ ভোজের খাদ্য।" এমন খাদ্যই এদের জীবন সংস্কৃতিকে বেঁধে দিয়েছে। বিভিন্ন উৎসবে মিলনমেলায় তাদের খাবারের প্রকরণ বদলে যায়। পুণ্যাহ, শ্রাবণ-পূর্ণিমার ঝুলনোৎসবে যে মেলা বসে সেখানে উৎসবমুখর মানুষগুলোর খাবার গ্রহণের স্বাদে আনন্দে নেচে ওঠে। একই সাথে তাদের বিশ্বাস, সংস্কারময় আচরণবিধি, পরিবার ও সমাজের শিকড় থেকে অর্জিত ধ্যান-ধারণার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে এমন মেলায়। বিভূতিভূষণ ব্রাত্য মানসের অন্ধিসন্ধি অবলোকনে এক মেয়েলি আচারের চমৎকার বর্ণনা দেন উপন্যাসে—

> প্রকাণ্ড মেলা, ... ছোট্ট একটা গ্রামের মাঠে, পাহাড়ের ঢালুতে চারিদিকে শাল-পলাশের বনের মধ্যে এই মেলা বসিয়াছে ... তরুণী বন্য মেয়েরা আসিয়াছে চুলে পিয়ালফুল কি রাঙা ধাতুপফুল গুঁজিয়া; কারো কারো মাথায় বাঁকা খোঁপায় কাঠের চিরুনি আটকানো, বেশ সুঠাম, সুললিত, লাবণ্যভরা দেহের গঠন প্রায় অনেক মেয়েরই— তারা আমোদ করিয়া খেলো পুঁতির দানার মালা... ছেলেমেয়েরা তিলুয়া, রেউড়ি, রামদানার লাড্ডু ও তেলেভাজা খাজা কিনিয়া খাইতেছে। হঠাৎ মেয়েমানুষের গলায় আর্তকান্নার স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। একটা উঁচু পাহাড়ি ডাঙ্গায় যুবক-যুবতীরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া হাসিখুশি গল্পগুজব আদর-আপ্যায়নে মত্ত ছিল— কান্নাটা উঠিল সেখান হইতেই। ব্যাপার কি? কেহ কি হঠাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল? একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তা নয়, কোনো একটি বধূর সহিত তার পিত্রালয়ের গ্রামের কোনো মেয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে— এ দেশের রীতিই নাকি এইরূপ, গ্রামের মেয়ে বা কোনো প্রবাসিনী সখী, কুটুম্বিনী বা আত্মীয়ার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হইলেই উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া মড়াকান্না জুড়িয়া দিবে। অনভিজ্ঞ লোকে ভাবিতে পারে উহাদের কেহ মরিয়া গিয়াছে, আসলে ইহা আদর-আপ্যায়নের একটা অঙ্গ। না কাঁদিলে নিন্দা হইবে। মেয়েরা বাপের বাড়ির মানুষ দেখিয়া কাঁদে নাই— অর্থাৎ তাহা হইলে প্রমাণ হয় যে, স্বামীগৃহে বড়ই সুখে আছে— মেয়েমানুষের পক্ষে ইহা নাকি বড়ই লজ্জার কথা।[১৩]

ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ, শেকড়ের অনুসন্ধান, বিচ্ছিন্ন জীবনধারার মানুষকে উৎসবমুখরতায় আবদ্ধ করা এবং একই সাথে রাজা দোবরু পান্নার মতো চরিত্রের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের পানে ফিরে তাকানো— সর্বসাকুল্যে *আরণ্যকে* লেখক সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় কিছু ব্রাত্য মানুষের পরিণতি এবং হয়ে ওঠার গল্প বলেন। খণ্ডায়িত জীবনচিত্রের প্রত্যেকটি মানুষকে তার 'ভালো লাগিল'; এক্ষেত্রে বোধ করি তার অতিশয়োক্তি থাকলেও—প্রত্যেকের মধ্যে যে একটা ধারাবাহিক ঐক্যসূত্র আছে *আরণ্যকের* লোকায়ত চরিত্রগুলো পাঠে তা সহজেই স্বীকার করা যায়। এ মানুষগুলোর যেন কোনো চাহিদা নেই, এরা সারাদিন কাজ করে আর রাতে আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠে। তাই বিভূতিভূষণ শুধু নিজের অভিজ্ঞতার পসার সাজান না, জীবনবাদী প্রত্যেকটি চরিত্রের 'আহা কি আনন্দ'র স্বরূপকে উন্মোচন করতে চান এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে স্নেহ-মমতার অন্তর্দৃষ্টিতে উদ্দেশ্যপ্রবণ করে পরোক্ষ মেসেজ প্রদান করেন।

তিন

উপন্যাস বৃহত্তর জীবনের পটভূমিতে নির্মিত। 'ব্যক্তি'র উন্মেষের পর্বে সামন্তবাদী সমাজের ভাঙন ও পুঁজিবাদ বিকাশের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের জন্ম । বিভূতিভূষণের উপন্যাসে বিচিত্র বর্ণের-গোত্রের মানুষ মেলে। বাংলা

সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪) কিংবা রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) উপন্যাসের মতো মানুষ নেই বিভূতিভূষণের *আরণ্যক* উপন্যাসে। লবটুলিয়া, ফুলকিয়া বা নাঢ়াবইহারের যে জীবন সেখানে বিভিন্ন বিত্তের মানুষ যেমন আছে তেমনি তাদের মধ্যে আছে বৈচিত্র্যময় উপভোগ্য জীবনের আকর্ষণ। দুঃখ-কষ্টে, আনন্দ-বেদনায়, উৎসব-উপভোগ্যে তারা বেঁচে থাকে। জীবনের প্রয়োজনে তারা স্থানান্তরী, সংস্কারে-কুসংস্কারে ঐতিহ্যানুসারী, অভাবে-অনটনে আশাবাদী— অরণ্যের কোলে তারা আসন নেয় জীবনকে ভালোবেসে। *আরণ্যকে* অনেক জাত-পাতের মানুষ মেলে; তাদের সহাবস্থান, জীবনাচরণ, ব্রাত্য নিগ্রহ এসব থেকে প্রশ্ন আসে—বিভূতিভূষণ এদের জীবনকেই কি ব্রাত্য জীবন বলেছেন? সভ্য ইংরেজি শিক্ষিত জগতের প্রতিনিধি হয়ে অরণ্যের মানুষগুলির জীবন সম্পর্কে তার চিত্ত কি কখনো দ্বন্দ্ব-দোলাচলে আচ্ছন্ন হয়নি? আচার, সংস্কার, কিংবা ব্রাত্য মানুষদের অলি-গলির বিস্তারে বিভূতিভূষণ কি গভীরে যেতে পারেন? বিভূতিভূষণের অরণ্যের প্রতি ভালো লাগা বা সেখানেই থেকে যাওয়ার বাসনা কতটা মানস সঞ্জাত? তবে কেন আরণ্যকে কোলাহলের জনপদে পরিণত করার পাপভার তিনি কাঁধে নেন! ভানুমতী কি সত্যিই তাঁর নিকট চিরন্তন নারীর মর্যাদা পায়? — প্রশ্নগুলো *আরণ্যকের* লোকায়ত পাঠে সাধারণভাবেই জন্ম নেয়। তবে শেষ পর্যন্ত শহরেই ফিরে যায় সত্যচরণ; নাগরিক জীবনের বিত্তবৈভবের টান তাকে ছাড়ে না । মঞ্চী-ভানুমতীরা শুধু স্মৃতির ছবিই হয়ে থাকে, কারণ শিক্ষিত সত্যচরণ আর লোকায়ত নিম্নবর্ণের আলিঙ্গন সম্ভব হয় না। সত্যচরণের আত্মসমীক্ষণ 'ভিন্ন যুগের আবহাওয়ায় ভিন্ন সভ্যতার সংঘাতে যে রাজবংশ বিপর্যস্ত, দরিদ্র, প্রভাহীন— তাই আজ ভানুমতীকে দেখিতেছি সাঁওতালী মেয়ের মতো।' *আরণ্যকে* দোবরু পান্না-জগরু-ভানুমতী উপাখ্যান একেবারে শেষ পরিচ্ছদে লেখক আবার তুলে আনেন। কারণ বোধকরি বংশপরম্পরায় স্থির এবং একটি নির্দিষ্ট গ্রোথিত ভূ-সংস্কৃতি, মিথ, লৌকিক দেবতা একমাত্র এই কাহিনীতেই ধরা পড়ে। যেখানে ভ্রামণিক বা মাইগ্রেটেড মানুষের সংস্কৃতি শেকড় গাড়েনি। এক আদিবাসীর দীর্ঘ ঐতিহ্য-নির্ভর পরিপক্ব লৌকিক সংস্কৃতির সন্ধানই পাওয়া যায় এ পর্বে। এমন রাজপরিবারের রাজকীয় বৈভবের গুণেই ভানুমতী অন্য মাত্রা পায় লেখক চিত্তে। আতিথেয়তা ও শৌর্য-বীর্যের গল্পে রাজবংশের সমাধি, টাঁড়বারোর দেবতা, অরণ্যদুহিতা ভানুমতীর স্নিগ্ধ সংস্রব একটি স্থিতু উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুণে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিত্রিত হয়। সেখানের শেকড় সন্ধান কিংবা অরণ্যের প্রতি তাঁর আন্তরিক ধারণাকে তিনি যথাযথ প্রমাণ দেন। এক ধরনের সম্ভ্রমবোধ এবং আস্থার যেমন পরিচয় মেলে তেমনি উচ্চ মানবিক ধারণায় উচ্চারণ করেন 'এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম ! ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম।'

বিভূতিভূষণ সাহিত্য সম্পর্কে বলেন, "সাহিত্য আমাদের পরিচিত করবে নিগূঢ় বিশ্বরহস্যের সঙ্গে, জীবনের চরমতম প্রশ্নগুলির সঙ্গে, দেবে আমাদের উদার, মৃত্যুঞ্জয় দৃষ্টি, সকল সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে যে অসীম অবকাশ ও তৃপ্তি, আমাদের পরিচিত করবে সেই অবকাশের সঙ্গে— এও সাহিত্যের একটা মস্তবড় দিক।"[১৪] *আরণ্যকের* মধ্যে এমন জীবনবাদী, সাহিত্যরসিক বিভূতিভূষণকে পাওয়া যায়। উপন্যাসের মধ্যে স্বার্থ-চেতনার ধর্মবুদ্ধির বাইরের জীবনপিয়াসী কিছু মানুষের ছবি পাই। গনোরী তেওয়ারী, রাজু পাঁড়ে, ধাওতাল সাহু, দোবরু পান্নাসহ বিচিত্র জীবন-ধর্মের মানুষগুলো সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েই বেঁচে থাকে। স্বার্থপর হয়ে বৈষয়িক জীবনের তাগিদ তারা কখনো বোধ করে না। এমন মানুষের সন্ধান এবং নৈর্বক্তিক দৃষ্টিতে তা অবলোকন বিভূতিভূষণের মতো লেখকদের পক্ষেই সম্ভব। এক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিই প্রধান। সচেতন লেখক হিসেবে বিভূতিভূষণের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট— "সাহিত্যে দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা একটি বড় জিনিস। একই ঘটনা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে যা পাঠকের মনে বিভিন্ন প্রকার রসের সৃষ্টি করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতার নিমিত্ত যে জিনিসটি বেশি প্রয়োজনীয় সেটি হচ্ছে ভূয়োদর্শন। জীবনের নানা বিচিত্র দিকের সঙ্গে পরিচয় যত নিবিড় হয়ে উঠবে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি তত স্বচ্ছ হবে।"[১৫] দোবরু পান্নার ইতিহাস, ভানুমতীর প্রতি আকর্ষণ কিংবা সহজ-সরল জীবনের লোকায়ত মানুষগুলো প্রত্যেকেই লেখক অভিজ্ঞতার সাথে জড়িত এবং একটি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তৈরি। লেখক অরণ্যের জীবন কিংবা কিছু স্বপ্নাপ্লুত চোখ অবলোকন করেন—নিরঙ্কুশ দৃষ্টিভঙ্গির আঁচড়ে তাদের প্রাণস্পর্শী করে সৃষ্টি করেন। কখনো এ মানুষগুলির শিল্পদৃষ্টি তাকে টানে, কখনো সাহসী-সরলমতি চিত্তের ভালোবাসা কাছে টানে— কখনো উৎসব-পার্বণের আকর্ষণ বা সংস্কারের প্রতি পক্ষপাতের দৃষ্টি বিস্ময় এনে

দেয়। এ ভালো লাগা থেকে মুক্তি পেতেও আর মন চায় না—এবং এক সময়ে আবার শহরের জীবনে ফিরে গেলে লেখক আত্মগ্লানিতে ভোগেন। যে অরণ্য, অরণ্যানীর ছায়া, তার পরিবেশ নিজে ম্যানেজার হয়েই হয়তো নষ্ট করেছেন—

> বিস্মৃতপ্রায় অতীতের যে নাঢ়া ও লবটুলিয়ার অরণ্য-প্রান্তর আমার হাতেই নষ্ট হইয়াছিল, সরস্বতী হ্রদের যে অপূর্ব বনানী, তাহাদের স্মৃতি স্বপ্নের মতো আসিয়া মাঝে মাঝে মনকে উদাস করে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, কেমন আছে কুন্তা, কত বড় হইয়া উঠিয়াছে সুরতিয়া, মটুকনাথের টোল আজও আছে কি না, ভানুমতী তাহাদের সেই শৈলবেষ্টিত অরণ্যভূমিতে কি করিতেছে, রাখালবাবুর স্ত্রী, ধ্রুবা, গিরিধারীলাল কে জানে এতকাল পরে কে কেমন অবস্থায় আছে...[১৬]

দৃষ্টিভঙ্গিই যেন মমত্ববোধ; *আরণ্যকের* শিল্পীর একটা নস্টালজিক অনুভূতি চৈতন্যে ভর করে। অরণ্যের সফর তাকে শুধু নৈসর্গিক আমেজেই বাধে তা নয়—কিছু সংগ্রামী মানুষ নিঃস্বার্থ-উৎসবমুখর মানুষ তার চৈতন্যে উল্লসিত জীবনের মন্ত্র শোনায়, যান্ত্রিক নয়—হাসি-কান্নার মধ্যেও তারা উপভোগ্য জীবনের সন্ধানী। *আরণ্যকের* লেখক পাঠককে— এভাবেই তাঁর সাহিত্যদৃষ্টিকে পরিচিত করাতে চান।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যকের* চরিত্রগুলো যে ফ্রেমে বন্দি হয়েছে সেখানে সত্যজিৎ রায়ের (১৯২১-১৯৯২) একটি মন্তব্য মনে পড়ে—'বিভূতিভূষণের সংলাপ পড়লে কথা কানে শুনতে পাওয়া যায়, চরিত্রের বর্ণনা না থাকলেও কেবল সংলাপের গুণে চরিত্রের চেহারা চোখের সামনে ফুটে ওঠে।'[১৭] "*আরণ্যকের* দোষত্রুটি নেই এমনটা বলা যায় না—বর্ষা-ঝড়ের তাণ্ডববিহীন *আরণ্যক* নির্দিষ্ট জীবন ও জীবিকায় আত্মস্থ মানুষ নেই, জমিবিলির ফলে আরণ্যক জীবনের পটে যে অর্থনৈতিক সূত্র-সম্বন্ধ-সমাজ-জীবনের প্রাথমিক আবির্ভাব ঘটল তার কোনো পরিচয় লেখক দেননি।"[১৮] তবুও পরিবেশ মিলিয়ে বোমাইবুরুর জঙ্গল আর মহিষের দেবতার গল্প নৈসর্গিকতাকে ছাড়িয়ে যায়। এক মানবীয় বাস্তবতার কাহিনীই বোধ করি নির্মিত হয়। উপন্যাসটির আর্থ-সামাজিক পটভূমি যতই ক্ষীণ ও আপাত বিচ্ছিন্ন মনে হোক—সর্বসাকুল্যে তা এক ধরনের সমগ্রতায় পর্যবসিত হয় যেখানে কল্পনা আর অভিজ্ঞতা যেন একাকার হয়ে মিশে থাকে। কৌম সমাজের জীবন হয়তো শেষ পর্যন্ত সত্যচরণের জন্য অভিজ্ঞতার দর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে; কিন্তু রাজু, গণু মাহাতো, জয়পালের মতো মানুষ বা গাঙ্গোতাদের আরাধ্য বসন্তের দেবী জগদম্বার শক্তি, টাঁড়বারোর শক্তি ম্যানেজারের 'ভালো লাগা'কে শেষাবধি কেন অরণ্যে বসতির আশা জাগায়নি! *আরণ্যক* পাঠ সাঙ্গ হলেও সে প্রশ্ন বোধ করি রয়েই যায়।

তথ্যনির্দেশ

১ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতি রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৭০), পৃ. ৪২৬।

২ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতি রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৭০), 'ভূমিকা'।

৩ তদেব।

৪ তদেব।

৫ তদেব।

৬ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, হায়াৎ মামুদ ও তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (স.)(ঢাকা: অবসর, ১৯৯৬), পৃ. ৫৫৯।

৭ তদেব, পৃ. ৬৩১।
৮ তদেব, পৃ. ৬২৪।
৯ তদেব, পৃ. ৫৮৬।
১০ তদেব, পৃ. ৫৭৭।
১১ তদেব, পৃ. ৬৫২।
১২ তদেব, পৃ. ৬৬৩।
১৩ তদেব, পৃ. ৫৭৬।
১৪ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতি রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৭২), পৃ. ৩৭২।
১৫ তদেব, পৃ. ৩৫৬।
১৬ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮৪।
১৭ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (পরিমার্জিত সংস্করণ; কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৮), পৃ. ৩২২।
১৮ তদেব, পৃ. ৩২৩।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ৯ম সংখ্যা ১৪০৮

বাইবেল-কথার নবরূপায়ণ : সত্যেন সেনের উপন্যাস

সৌমিত্র শেখর*

Abstract: Satyen Sen (1907—1981) is powerful but little-discussed writer of Bengali literature. He wrote fifteen novels and fifteen other books on various subjects. People's democratic aspirations, humanism, progress and anti-imperialism are the main attitudes in the novels of Satyen Sen. He tooks up different subjects and stories, but mainly reflected in his novels is the dialectical progress of human history. Two novels by Satyen Sen are named '*Abhishapta Nagari*' ('City of the Cursed', 1967) and '*Paaper Santan*' ('Progeny of Sin', 1969). The story of these novels were taken from the Bible. It is the first example in Bengali literature of taking the story of a novel form the Bible. This credit goes to Satyen Sen. The rebellion of the exploited against monarchy and the priest class in the central theme of '*Abhishapta Nagari*'. In '*Paaper Santan*'- humanism in the main focus. Satyen Sen tried to predict the victory of humanism and the working class in these two novels.

বাংলা সাহিত্যে স্বল্প আলোচিত ও প্রায় উপেক্ষিত লেখক সত্যেন সেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা যেমন মোটেও নগণ্য নয়, রচনা-কুশলতায়ও তেমনি তিনি সমকালীন অন্য লেখকদের তুলনায় পিছিয়ে ছিলেন না। অথচ, তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানি সাহিত্যশিল্পীদের প্রসঙ্গ এলে তিনি প্রায় অনুপস্থিত থাকেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর সাহিত্য-শিল্পের সর্বক্ষেত্রে যে অনগ্রসরতা লক্ষ করা যায়, ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদীরা তা আরো প্রকট করে তোলেন। এ অবস্থায় আবুল ফজল বা আবুল মনসুর আহমদের মতো কতিপয় সাহিত্যিক মানবতার অমিত বাণীকে সামনে রেখে সাহিত্য রচনা করলেও প্রকৃত শিল্পের আঙ্গিনায় তাঁদের সৃষ্টির সব কিছুই প্রবেশ করতে পারেনি। পরবর্তী কালে শহীদুল্লা কায়সার, জহির রায়হানের মতো সত্যেন সেন মেহনতি মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, চাওয়া-পাওয়া আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যে স্থান দেন। শিল্পের দাবি তাঁদের কাছে প্রধান বিবেচনার মধ্যে থাকায় তাঁদের সৃষ্টি উদ্দেশ্যমূলক হয়েও শিল্পসফল হয়ে ওঠে। সত্যেন সেনের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ, যার মধ্যে পনেরটি উপন্যাস। বিচিত্র বিষয় নিয়ে লেখা এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের মুখ্য বিবেচনা মেহনতি মানুষ ও তাদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম।

ক

সত্যেন সেনের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী'--- ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে সিপাহি অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত। "পাকিস্তান আমলে ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে কিভাবে বিকৃত করার চেষ্টা হয়েছে তা দেখেছেন তিনি, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা রাতারাতি বলতে গেলে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে গেল। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যাঁরা লড়াই করেছেন নীরবতার শীতলতায় নির্বাসন দেয়ার চেষ্টা চললো সচেতনভাবে।"[১] এই অবস্থায় ইতিহাসের বিস্মৃতি ও ঐতিহ্যের বিকৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তিনি ওই গ্রন্থটি রচনা করেন। যদিও বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ক বই লিখেছেন এবং রচনা করেছেন মেহনতি মানুষের জীবননির্ভর আরো কিছু গ্রন্থ, তথাপি বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে সত্যেন সেন একজন ঔপন্যাসিক হিসেবেই সমধিক পরিচিত। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর

---

*ড. সৌমিত্র শেখর, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রথম উপন্যাস 'ভোরের বিহঙ্গী' প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে জেলে যাবার আগে থেকেই তিনি কবিতা রচনা করতেন। কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশের কোনো বাসনা তাঁর মনে ছিলো বলে জানা যায় না। ব্রিটিশ-বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণই বরং তিনি শ্রেয়তর বলে মনে করেছিলেন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের কারাবাসকালেই তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ রচিত। মূলত জেলে বসেও রাজনৈতিক দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন এই বইগুলো লিখে। আর তাই তাঁর রচিত গ্রন্থে মেহনতি মানুষের গণতন্ত্র, মানবতাবাদ ও প্রগতিশীলতার প্রতি আস্থা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সত্যেন সেন জানতেন, জীবন-ঘনিষ্ঠতা উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর জীবন যেহেতু কোনো উদ্বায়ী বস্তু নয়, সমাজের গভীরে এর শিকড় প্রোথিত, সেহেতু উপন্যাসও সমাজবিচ্ছিন্ন কোনো শিল্প-মাধ্যম হতে পারে না। ব্যক্তির জীবনচর্যা, রাজনীতির ঘাত-প্রতিঘাত এবং সমাজের আবর্তন-বিবর্তনের প্রতিফলক দর্পণ হিসেবে উপন্যাস তাই শ্রেষ্ঠ শিল্পের মর্যাদা দাবি করে। ব্যক্তি ও সমাজের অভ্যন্তরীণ ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ই কথাসাহিত্যে, বিশেষত উপন্যাসে মূর্ত হয় অধিক। এ কারণে তিনি তাঁর রচিত উপন্যাসে এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সমন্বয় রূপায়িত করেছেন নানা কাহিনীর আধারে।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ভোরের বিহঙ্গী' (১৯৫৯) ছিলো ত্রিভুজ প্রেমের দ্বন্দ্ব-বিষয়ক। রণেশ দাশগুপ্ত একে সত্যেন সেনের 'উপন্যাসের উপক্রমণিকা' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২] 'রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ' (১৯৬৬) উপন্যাসে সমাজসত্য অধিকতর প্রকটিত। নানা পেশার অভিযুক্ত কারাবন্দিদের পাত্রপাত্রী করে আদর্শিক একনিষ্ঠতার সঙ্গে বিরূপ সমাজ পরিবেশের স্বরূপ উন্মোচন এই উপন্যাসের অন্যতম লক্ষ্য। 'পদচিহ্ন' (১৯৬৮) উপন্যাস আপাত দৃষ্টিতে রাজনীতি প্রধান বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে সমাজচেতনাই সেখানে মুখ্য। পূর্ব পাকিস্তানি গ্রামীণ পরিবেশের সমাজ-সংকট এবং সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস-অবিশ্বাসই এখানে বাণীরূপ পেয়েছে। অপরাধ-প্রবণতার বাহ্যিক প্রকাশ যেভাবেই হোক না কেন, তার শিকড় প্রোথিত সমাজগভীরে। এই বক্তব্যের রূপায়ণ ঘটেছে 'সেয়ানা' (১৯৬৮) উপন্যাসে। এভাবে বলা যায়, সত্যেন সেন তাঁর প্রতিটি উপন্যাসে পৃথক পৃথক বক্তব্য-বিষয়কে সামনে রেখে মানবের জীবন-সত্য এবং তার দ্বান্দ্বিক অগ্রগতি তুলে ধরেছেন সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে। এরই ধারাবাহিকতায় বাইবেল থেকে কাহিনী নির্বাচন করে সত্যেন সেন 'অভিশপ্ত নগরী' (১৯৬৭) ও 'পাপের সন্তান' (১৯৬৯) নামে দুটি উপন্যাস রচনা করেন। এখনেও ধর্মীয় তত্ত্ব বা উপদেশ, এ সবের গুরুত্ব না দিয়ে তিনি মানব জীবনের শোষণ-সংগ্রামের দিকটিকেই প্রধান বিবেচনায় এনেছেন। 'অভিশপ্ত নগরী'তে রাজতন্ত্র-পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে শোষিতের বিদ্রোহই মুখ্য। কোনো ধরনের শোষণই অমিততেজী আত্মশক্তিসম্পন্ন মানুষকে পরাজিত করতে পারে না--- এখানে এটাই বক্তব্য-বিষয়। ধর্মীয় মিথকথা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হলেও, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এবং আজকের বাংলাদেশেও বাইবেলকথা নিয়ে সম্পূর্ণ দুটি উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব এখনো একমাত্র সত্যেন সেনেরই।

খ

আজকের বাংলাদেশের উপন্যাস ধারায় সত্যেন সেনই প্রথম ব্যাক্তিত্ব যিনি বাইবেলের কোনো কাহিনীকে আশ্রয় করে উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর 'অভিশপ্ত নগরী'র (১৯৬৭) কাহিনী-উৎস ওল্ড টেস্টামেন্টের 'বুক অব দ্য প্রফেট: যেরেমিয়া খণ্ড'। উপন্যাসটির গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র যেরেমিয়া, রাজা যিহোয়াকীম, নেবুকাডনাজার প্রমুখের ঐতিহাসিক সত্যতা পাওয়া যায়। তবে সত্যেন সেন এই সত্যের একটি ক্ষীণসূত্র অবলম্বন করেছেন মাত্র। খ্রিস্টপূর্ব ৬২৬ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ সময় কালে যেরেমিয়ার অবস্থান ছিলো বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। বাবিলরাজ নেবুকাডনাজার খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে যিরূশালেম আক্রমণ ও দখল করেন। রাজা যিহোয়াকীম নিহত হওয়ার পর তৎপুত্র যিহোয়াকীন বসেন সিংহাসনে। কিন্তু এই জয়-পরাজয়ের কাহিনী অথবা ইতিহাসের ক্রমধারাকে রক্ষা করে একটি শুধু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনাই সত্যেন সেনের লক্ষ্য ছিলো না। ফলে তিনি বাইবেল থেকে কাহিনী-উৎস গ্রহণ করেছেন, কিন্তু মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী চেতনার আলোকে পর্যবেক্ষণ করেছেন গতিমুখী সমাজদ্বন্দ্ব। এ কারণেই বলা যায় যে, "অভিশপ্ত নগরী যিরূশালেমের পতনের

ওপর দাঁড়িয়ে শুধু একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। এখানে য়িহুদী সমাজের ধারাবাহিক ট্র্যাজেডির পিছনে সমাজে কোন কোন শক্তি কিভাবে কাজ করেছে; রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব; ধর্মের আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব অন্তঃসারহীনতার বিরুদ্ধে বিবেকের বিদ্রোহ এখানে যা নবী যেরেমিয়ার প্রত্যাদেশে উচ্চারিত; সংক্ষেপে রাজতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র ও নবী— এই ত্রিমুখী সংঘাত য়িহুদী সমাজের বৈশিষ্ট্য— তার নিখুঁত বিশ্লেষণ এখানে সমুপস্থিত"।[৩] এই সবের মধ্যে দিয়ে নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের আত্মিক জাগরণ ও বিদ্রোহের স্বরূপ প্রকাশ ঔপন্যাসিক সত্যেন সেনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য; বিশেষত যে সমাজে চিহ্নিত মানবিক মূল্যবোধের ক্রম-অবক্ষয়।

'অভিশপ্ত নগরী'তে আমাদের পরিচিত সমাজ-পরিবেশের সন্ধান বাহুল্যমাত্র। এখানে বহির্বাংলার খ্রিস্টপূর্বকালের দাস সমাজের চিত্রই অঙ্কিত। রাজনীতির বিশ্বজনীন ধারাবাহিকতা বরং এ উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। পুরোনো যুগবাস্তবতাকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন না করে ঔপন্যাসিক এখানে আধুনিক করণকুশলতার আশ্রয়ে কাহিনী পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। ফলে একালের জিজ্ঞাসু পাঠক সাবলীলভাবে প্রবেশ করতে পারেন সমস্যার গভীরে, নানা জিজ্ঞাসা-উত্তরের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায়। সর্বহারার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী ঔপন্যাসিক সত্যেন সেনের 'বাইবেল' থেকে কাহিনী নির্বাচন বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় বিশিষ্ট মার্কসবাদী তাত্ত্বিক রণেশ দাশগুপ্ত'র বক্তব্য:

> টলস্টয় এবং ডস্য়েভ্স্কির বাস্তবতা অনুপম, কিন্তু তাই বলে সমাজতন্ত্রী ললিতকলা কেন আঙ্গিকের পাঠ নেবে না হোমার এবং বাইবেল, শেক্স্পীয়র এবং স্ট্রিণ্ডবার্গ, স্তাঁদাল এবং প্রুস্ত, ব্রেখ্ট এবং ওক্রাসি, রাবঁ এবং ইয়েটসের কাছ থেকে? এখানে অনুকরণের প্রশ্নই উঠতে পারে না। এখানে প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের আঙ্গিক ও অভিব্যক্তির উপকরণকে ললিতকলার আধারে ঢালাই করে নেওয়া, যাতে এই ললিতকলা সীমাহীন বৈচিত্র্য এবং বিভিন্নতাময় বাস্তবতার সঙ্গে মিলতে পারে।[৪]

সত্যেন সেন তাঁর উপন্যাসে 'সমাজতন্ত্রী ললিতকলা' নির্মাণের লক্ষ্যে শুধু 'আঙ্গিকের পাঠ'ই গ্রহণ করেননি, তিনি বাইবেলে বর্ণিত কাহিনীর সমাজবাস্তবতায় ইতিহাসের ইতিবাচক দ্বান্দ্বিক গতিশীলতা লক্ষ করেছেন। বিষয় এবং প্রকরণ উভয় ব্যাপারে পুরাণকাহিনী-ইতিহাসে প্রগতিমুখী বৈচিত্র্য অনুসন্ধানেই সত্যেন সেনের অনন্যতা।

উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র যেরেমিয়া জনসাধারণের মধ্যে 'নবী' হিসেবে পরিচিত। সে নিজেকেও 'যিহোবার [ঈশ্বর] বাণীবাহক' বলে মনে করে। "ওল্ড টেস্টামেন্টের যুগে এবং তারও আগে— এমন কি বর্তমান ঐতিহাসিক যুগেও--- লোক সমাজের সাহিত্য তথা প্রকৃত গণসাহিত্যে যিনি জনগণের মুখপাত্র রূপে আবির্ভূত হন, তাঁর কতকগুলো অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য থাকে। দুকূলপ্লাবী আবেগ আর ভয়ঙ্কর ক্রোধ ও ঘৃণা থাকে তাঁর; এই আবেগ জনগণের কল্যাণ-অভীপ্সা ও মুক্তিপিপাসার ধারক, ক্রোধ ও ঘৃণা জনগণের শত্রুদের বিরুদ্ধে, জনগণের ইচ্ছাপূরণমূলক ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে আর্বিভূত হন বলেই তিনি জনগণে মুখপাত্র রূপে বরিত হন। [.....] [.....] তিনি নিজেকে ঈশ্বরাশ্রিত বা অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে মনে করেন, তাঁর সেই ধারণা ব্যাপক গণস্বীকৃতিও লাভ করে বসে, 'উন্মাদ' আখ্যাটি তাঁর পক্ষে গৌরববর্ধক হয়েই দেখা দেয়। জনগণের নায়কের এসব বৈশিষ্ট্য ইউরোপের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ক্লাসিক সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে যে কোনো দেশের যে কোনো কালের লোকজীবনাশ্রয়ী সাহিত্যের মধ্যেই পাওয়া যায়।[৫] আলোচ্য উপন্যাসেও যেরেমিয়া পরিণত হয় গণনায়কে। কারণ জনগণ তার অলৌকিকতায় বিশ্বাস করে, সে ধারাবাহিকতায় যেরোমিয়াও প্রচার করে: 'প্রভু আমাকে যেমন দেখান, আমি তেমনি দেখি, যেমন বলান, তেমনি বলি, যেমন করান তেমনি করি। আমার নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই'।[৬] উপন্যাসের প্রারম্ভে বন্ধু অহিকমের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে যেরেমিয়ার অনিবার্য ঘোষণা যেরূশালেম নগরীর পতন সম্পর্কে। সে যেরূশালেমবাসীদের 'পাপের সন্তান' হিসেবে অভিহিত করে বলেছে যে, দুর্ধর্ষ ক্যালদীয় জাতির কাছে রুধির বন্যায় ভেসে যাবে তারা, কারণ প্রভু নিজে ক্যালদীয়দের অগ্রবাহিনী পরিচালনা করবেন। যেরেমিয়ার এই ধরনের সিদ্ধান্তের পেছনে পুরোহিততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের

অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, দাস সমাজের অসন্তোষ, সর্বোপরি সমগ্র যিরূশালেমে অবর্ণনীয় দুর্ভিক্ষকালীন দুরবস্থা কাজ করেছে। বন্ধু অহিকমকে যেরেমিয়া বলে:

> আঃ ওকি দৃশ্য! দুর্ভিক্ষের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে সারা দেশে। ক্ষুধা, ক্ষুধা, ক্ষুধা। ওই যে নগ্নদেহ যিরূশালেম-কন্যা মৃত্যু-যন্ত্রণায় ধুঁকছে। শিশুগুলি স্তন টানছে, কিন্তু সেই শুকিয়ে আসা স্তনে এক বিন্দু দুধ নেই। দুরন্ত ক্ষুধায় ওরা সেই স্তনের কোমল মাংসে দাঁত ফুটিয়ে দিচ্ছে। রক্ত! রক্ত! শিশুদের কচি মুখ সেই রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। (পৃ. ৪)

দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত, নির্জীব ও শোষিত যিরূশালেমের অনিবার্য পতন সম্পর্ক যেরেমিয়ার ঘোষণা একটি বিশেষ সত্যকে প্রকটিত করে। যিহোবার প্রত্যাদেশ প্রচারের নামে যেরেমিয়ার ঘোষণায় প্রথম ভীত হয় রাজতান্ত্রিক শাসক যিহোয়াকীম ও উপাসনাগারের অধ্যক্ষ পশহুর। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে, জনরোষ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে রাজা ও অধ্যক্ষ ঐক্য করে। কেননা জনগণের 'নবী' প্রকাশ্যেই বিরোধী রাজতন্ত্র এবং উপাসনাগারের। লোকপ্রধান অহিকমের ভাষ্য:

> তুমি কিছুই কর নি যেরেমিয়া, শুধু রাজাকে তার কলঙ্কিত সিংহাসন থেকে আর আচার্যকে তার ধর্মাসন থেকে টেনে নামাবার আহ্বান জানিয়েছ। তুমি গর্বোন্মত্ত অত্যাচারীদের বুকে কাঁপন ধরিয়েছ, পরভোজীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছ। তুমি কি যিরূশালেমকে অভিশপ্ত নগরী বলে ঘোষণা কর নি? (পৃ. ৬)

প্রভুর প্রত্যাদেশের নামে প্রচারিত এই বাণী প্রত্যক্ষভাবে রাজা ও আচার্যের বিরুদ্ধে যাওয়ায় নবী যেরেমিয়াকে বন্দী করা হয়। কিন্তু জনতার দাবির কাছে পরাজিত ও ভীত রাজশক্তি বাধ্য হয়ে তাকে মুক্তি দেয়।

নবী যেরেমিয়ার বাণীতে যিরূশালেমবাসীর অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মিশরের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রও উদ্ঘাটিত। একদা মিশর কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়েছিলো যিরূশালেম, আর সেই কথাই ব্যক্ত নবীর সতর্কবাণীতে। তাঁর কথায়, বিষাক্ত সাপকে বিশ্বাস করা গেলেও মিশরকে বন্ধু ভাবা যায় না। সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটনে নবী যেরেমিয়ার বিচক্ষণতা প্রশংসিত হতে পারতো যদি ক্যালদীয় জাতি কর্তৃক আক্রমণ বা বাবিলীয়দের আগ্রাসনকেও তিনি সমানভাবে চিহ্নিত করাতেন। কিন্তু যেরেমিয়া ক্যালদীয়দের আক্রমণ সমর্থন করে এবং বাবিলে নীত য়িহুদীদের বিদ্রোহের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান ও বংশবৃদ্ধির পক্ষে মত দিয়ে ফরমান পাঠায়। প্রকৃতপক্ষে যিরূশালেমবাসী তথা জনগণের জন্যে তার বাণী প্রচারিত হলেও সেখানে সর্বক্ষেত্রে জনতার কথা বিবেচিত হতো--- এমন বলা যায় না। তারপরও বলতে হয় যে, যেরেমিয়া নিঃস্বার্থবাদী এবং তার বাণী প্রত্যক্ষভাবেই কাজ করেছে রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশেষ করে দাসবৃত্তি যে সমাজে কার্যকর, সে সমাজে তার বাণীর প্রতিক্রিয়া কতটুকু প্রগতিমুখী তা সহজেই অনুমেয়।

দাসমুক্ত সমাজব্যবস্থায় নবীর বিশ্বাস না থাকলেও তাঁর বাণী রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রে যেভাবে আঘাত হেনেছে সেজন্যে দাসশ্রেণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে নিজেদের নেতা মনে করে এবং আন্দোলনের মাধ্যমে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করে আনে। দাস সমাজের কাছে ওই সময়ে বিশ্বস্ত কোনো নেতা ছিলো না। গেদিমিয়া বা য়ুসুফের প্রভাব সর্ববিস্তারী হতে পারেনি, যেমন হয়েছিলো নবীর। যেরেমিয়ার স্বার্থত্যাগ তাদের অনুপ্রাণিত করেছে। বিশেষত কয়েকবার বন্দিত্ব গ্রহণ, মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তি ইত্যাদি এবং সর্বশেষ বেবিলীয় রাজ-আতিথ্য গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখানের মধ্য দিয়ে তার ত্যাগী মানসিকতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রস্তাববাহী বাবিল সেনাপতি মেবুজার-আদানকে নবী বিনম্রভাবে বলেছে:

আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্পর্কে যদি প্রশ্ন করেন, তাহলে আমি বলছি---আমি প্রভুর পথাশ্রয়ী দাস। রাজকীয় সমাদর আমার সহ্য হবে না। (পৃ.১১৯)

প্রভু যিহোবার নামে ঘর ত্যাগ করেছে যেরেমিয়া, সপ্তদশী প্রণয়ী জিল্লার প্রেম প্রত্যাখ্যান করে প্রত্যাদেশ প্রচারে হয়েছে মনোযোগী। ভাববাদের মোহাকর্ষণ তাকে মানবপ্রেমিক করেনি, যতটুকু করেছে যিহোবাভক্ত। এ কারণে মালিক-ক্রীতদাসের সংঘর্ষের সময়ে সে কোনোভাবেই ক্রীতদাসের পক্ষাবলম্বন করতে পারে না; যদিও তার অজানা নেই যে, ক্রীতদাসেরা তাকে নেতা বলে মেনে নিতে প্রস্তুত। নগরীর চূড়ান্ত ধ্বংস, স্বামী ও পুত্রের মৃত্যু হওয়ার পরও যেরেমিয়ার পূর্ব-প্রণয়ী জিল্লা কিন্তু 'পুরনো দিনের দাসদাসী এবং কিছু নিঃসম্বল দরিদ্রলোকে'র উপর বিশ্বাস রেখে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা পায়। দুজনের দীর্ঘ কথোপকথনের মাধ্যমে প্রভু যিহোবার নবী বলে কথিত যেরোমিযার সীমাবদ্ধতা যেমন স্পষ্ট হয়েছে, তার চেয়ে অধিক স্পষ্ট জিল্লার মানব প্রেমের সমান্তরালে যেরেমিয়ার যিহোবাপ্রেম, এমন কি যিহোবার অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয়বোধ! নিচে দুটো উদ্ধৃতি উল্লেখের মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরা যায়:

উদ্ধৃতি. এক

এদের আমি তোমার মত করে দেখতে পাই না কেন, জিল্লা? সমস্ত মানুষের মাঝখানে থেকেও আমি কত দূরে সরে গেছি। আমি যেন মানুষের ভাষা ভুলে গেছি, তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। এ দুস্তর ব্যবধান কেমন করে কাটবে?

: যেরেমিয়া, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, তুমি প্রভুর অনুগৃহীত মানুষ, তুমি জানতে চাইছ আমার কাছে? আমি বিদুষী নই, শাস্ত্রজ্ঞ নই, তবু আমি আমার সহজবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি, তুমি প্রভুকে নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে যে মানুষ কোনদিনই তোমার চোখে পড়ল না। (পৃ. ১২৪)

উদ্ধৃতি. দুই

: কি প্রশ্ন যেরেমিয়া?

: এই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকারী, অনাদি অনন্ত সত্তা, যাকে আমরা যিহোবা বলে ভয় করি, ভালবাসি, তিনি সত্য সত্যই আছেন, কোনদিন ছিলেন? (পৃ. ১২৭)

ঈশ্বরের বাণীবহ একজন নবীর মুখ থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় ব্যক্ত করানোর মধ্যে দিয়ে একদিকে ঔপন্যাসিক সত্যেন সেনের যেমন মার্কসবাদী লেখক-দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি যেরেমিয়া চরিত্রে যতটুকু অতিলৌকিকতার ছাপ ছিলো তা-ও খসে পড়েছে। ভাববাদ সর্বস্ব ঈশ্বরপ্রীতি প্রকৃত মানবপ্রেমের মুখোমুখি যে সংশয়বিদ্ধ হতে বাধ্য--- এই সত্যটি নবী বলে কথিত যেরেমিয়া চরিত্রটির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। তবে অর্থনৈতিক ও জীবনযাপন পদ্ধতির দিক থেকে যেরেমিয়া মধ্যশ্রেণীভুক্ত, যেমন তার বন্ধু লোকপ্রধান অহিকম। ওই সমজে 'মধ্যবিত্ত' স্তরটি সুস্পষ্টতা পায়নি বলে যেরেমিয়া ও অহিকমের শ্রেণীচরিত্র নির্ণয়ে সামান্য অস্পষ্টতা থাকতে পরে--- এমন নয়। রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলায় নিশ্চিত দণ্ডপ্রাপ্ত যেরেমিয়াকে বাঁচাতে অহিকমের তৎপরতা আন্তরিকতাজাত। এজন্যে একাধিকবার বন্দিত্ব বরণ করতে হয় এবং তার মৃত্যু হয় দুজন দাসকে বাঁচাতে গিয়ে। তারপরও নিজেতো নয়ই, পুত্র গেদেমিয়ার ক্রীতদাসদের পক্ষাবলম্বনের সমর্থক সে ছিলো না। যেরেমিয়া ও অহিকমের এই সীমাবদ্ধতার স্বরূপ অনুসন্ধান প্রসঙ্গে যতীন সরকার বলেছেন:

ক্রীতদাস বিদ্রোহের আলামত যখন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তখন উদারনীতিক অহিকমও বিমূঢ় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন, ক্রীতদাসদের বিদ্রোহের ন্যায্যতা স্বীকার করে নেয়া কিছুতেই সম্ভব হয়ে ওঠে না তাঁর পক্ষে। যেরেমিয়ার পক্ষেও তা সম্ভব হয় না, তারও কারণ কি তাঁর শ্রেণীচরিত্রই নয়?[৭]

উপন্যাসেও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে এভাবে যে,

> লোকপ্রধান অহিকম স্বভাবতই সৎপ্রকৃতি ও দয়ালু হৃদয়ের লোক। কিন্তু তা হলেও তিনি মালিক। মালিক পক্ষের বক্তব্যটাকে তিনি ভালোভাবেই উপস্থিত করেছেন। (পৃ. ৯৪)

অহিকম-পুত্র গেদেমিয়া শ্রেণীচ্যুত হয়ে দাসশ্রেণীর পক্ষাবলম্বনকারী, আর দাস য়ুসুফ স্বশ্রেণীর সংবেদনশীল নেতা। গেদেমিয়ার শ্রেণীচ্যুতি সারা নাম্নী এক তরুণী ক্রীতদাসকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ঘটে, পুরো দাস সমাজকে সে পরে আপন ভাবতে পারে। সে দিক থেকে য়ুসুফের দাস সমাজের পক্ষাবলম্বন প্রশ্নাতীত হয়ে ওঠে তারা উভয়ে বন্ধু। ক্রীতদাসদের মানবেতর জীবন তাদের কাছে অসহ্য মনে হয়। উপন্যাসে আছে:

> নগরে যে এত ক্রীতদাস আছে, কেই-বা সে কথা ভাবতে পেরেছে! রাজপথের উপর এমন দল বেঁধে চলাফেরা করতে ওদের কমই দেখা যায়। নগরের আনন্দ-উৎসবে ওদের কোন অংশ নেই। ওদের হাসি নেই, গান নেই, ওরা শুধু বেঁচে যায়। ওরা ঘর-সংসারে, ক্ষেতখামারে, কর্মশালায় আর খনিতে দিনের পর দিন বিরামহীন একটানা তালে কাজের চাকা ঘুরিয়ে চলে, আর সেই চাকার নীচে নিজেরাও পিষ্ট হতে থাকে। (পৃ.১০৫)

এ ধরনের অমানবিক জীবনের পাশাপাশি রাজশক্তির দলনে ক্রীতদাসেরা সর্বসময় জীবনপাত করে বিনাবিচারে। সমাজের এই বৈষম্য দূর করার জন্যে য়ুসুফের শ্রেণীহীন সমাজের কল্পনা— যা, শুনে চমকে উঠেছে লোকপ্রধান অহিকম (দ্র.পৃ.৭০)। কিন্তু বন্ধু গেদেমিয়াকে সে পেরেছে নিজের শ্রেণীতে টেনে আনতে। তাই মা জিল্লার কাছে গেদেমিয়ার উক্তি:

> মা, য়ুসুফ আমাকে অনেক কিছুই নূতন করে দেখতে শিখিয়েছে। সেই দৃষ্টি নিয়েই আমি আমাদের এই ভাঙ্গাচোরা জীর্ণ আর রক্তমাখা সমাজে বসে--- আর একটি অপরূপ সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখি, যে-স্বপ্ন একদিন সত্য হয়ে উঠবে। (পৃ. ১২৪)

য়ুসুফ তার চেতনার সঞ্চার ঘটাতে পেরেছে গেদেমিয়ার মধ্যে। আর গেদেমিয়াও নির্যাতিত মানুষকে ভালোবেসে অমিত সাহসে প্রকাশ্য ক্রীতদাসের সভায় রাজতন্ত্র ও ধর্মীয় শোষণের বিপক্ষে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে। সমগ্র অব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ সম্পর্কে গেদেমিয়া তার মাকে বলছে:

> মা, তোমরা আমাকে দুষছ, আমি হাঙ্গামা বাধিয়েছি বলে। কিন্তু আমি কে? আমি কিছুই না। এ হাঙ্গামা বাধতই, এ হাঙ্গামা বাধবেই, এ হাঙ্গামা চলবেই। মানুষ আর কত সহ্য করবে? কি জান মা, তখন সেই উত্তেজিত ক্রীতদাসদের যদি আমরা সংযত করতে পারতাম, তা হলে সেই পশুটার আর চিহ্নমাত্র বাকী থাকত না। কিন্তু ওই পশুটাতো নগণ্য, ওকে মেরে আর কিই-বা হবে? ওর পিছনে ধর্ম ও সমাজের অনুমোদন নিয়ে যে বিরাট রাক্ষসটা বংশ বংশ ধরে সহস্র সহস্র দাসদাসীর রক্তপান করে চলেছে, আমরা তারই মৃত্যুবাণ খুঁজে ফিরছি। তাকে একদিন মরতেই হবে। (পৃ. ৮৫)

'বিরাট রাক্ষস'টা গেদেমিয়া ও প্রণয়ী ক্রীতদাসী সারার চন্দ্রালোকিত রাত্রে মিলনোদ্যোগেও বাধা সৃষ্টিকারী। সত্যেন সেন এই রাক্ষসের প্রতীকে ব্যক্ত করেছেন যে, বিরূপ-বৈরী সমাজ-পরিবেশে গোপন অভিসারও সার্থকতা পেতে পারে না।

আধুনিক সমাজেই শাসক শ্রেণীকে দেখা যায় ধর্মের দ্বারস্থ হতে, যাতে শোষণের ভিত আরও মজবুত হয়। প্রাচীন সমাজে শাসক ও ধর্মীয় কর্তাদের সখ্য আরও গভীর ছিলো এবং প্রায় সর্বত্রই ধর্মগুরুরা শাসকদের উপর খবরদারি করতো। কখনও দেখা গেছে এই কথিত ধার্মিকদের নানাবিধ অনুশাসনের ফাঁদে পড়ে রাজা বদল ঘটছে বারংবার। 'অভিশপ্ত নগরী'র আর এক অভিশপ্ত প্রাণী হচ্ছে রাজ্যের রাজা। আচার্য পশহুরের কাছে তাদের অসহায়ত্ব করুণার সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রথম দিকে, নবী যেরেমিয়াকে অভিন্ন শত্রু শনাক্ত করে রাজা যিহোয়াকীম ও আচার্য পশহুর রুদ্ধদ্বার বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে:

> আজ আমরা উভয় পক্ষই বুঝতে পারছি যে নবী যেরেমিয়া আজ আমাদের উভয়েরই স্থিতি ও শান্তির পক্ষে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। এই কন্টককে উৎপাটন করতেই হবে, এ বিষয়ে আমরা একমত। আর আমাদের নিজেদের ভিতরে যে সমস্ত গরমিল রয়ে গেছে, বৃহত্তর বিপদের সামনে তা আজ তুচ্ছ। (পৃ. ১১)

শক্তিশালী প্রতিপক্ষ মোকাবেলায় শোসকদের এ ধরনের অভ্যন্তরীণ ঐক্য ঘটে বারংবার। এর আগে নবী উরিয়াকে হত্যা করা হয়। যেরেমিয়াকে বিচারের নামে প্রহসন করে খুনের জন্যে মজলিস বসায় রাজা ও আচার্য। অথচ লেবীয় সম্প্রদায়-ভুক্ত না হওয়ায় আচার্য রাজাকে পর্যন্ত মন্দিরে ঢুকতে দেয় না। ক্যালদীয়দের আক্রমণে বিপর্যস্ত রাজা পুরোহিতের অনুমতি না নিয়ে লেখক যোনাথনের সঙ্গে ছদ্মবেশে মন্দিরে প্রবেশ করে; তার আগে মন্দিরের আচার্যদের সম্পর্কে তার বক্তব্যে পুরোহিততন্ত্রের মুখোশ উন্মোচিত হয়:

> : তুমি শাস্ত্র দিয়ে আমার মুখ চাপা দেবে? তা পারবে না। তুমি কি জান না, ধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন দেখা দিলে শাস্ত্রের পরিবর্তন পরিবর্ধন ও নব রূপান্তর গ্রহণে বেশী সময়ের দরকার হয় না। (পৃ. ৫২)

মন্দিরে অচ্ছুৎদের প্রবেশ সম্পর্কে লেখক যোনাথন বলেছে যে, যারা সেখানে প্রবেশ করেছে এবং করছে তারা 'অক্ষত ও নিরাপদ' আছে। এর মধ্য দিয়েও ধর্মের মিথ্যাচারিতা ও কপটতার স্বরূপ প্রকাশমান। রাজা যিহোয়াকীম ছদ্মবেশে মন্দিরে প্রবেশ করে প্রচুর রত্নরাজির সঙ্গে অপরূপ সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী বহুতরুণী আবিষ্কার করে, যাদের ভোগ করার জন্য আনা হয়েছে। আচার্য পশহুরের এই গোপন তথ্য রাজার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লে আচার্য কর্তৃক রাজা আক্রান্ত এবং কোনো মতে প্রাণে রক্ষা পায়। রাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় রাজা অবশ্যই শোষকের চরিত্র-মুক্ত নয়, কিন্তু আচার্য পশহুরের চেয়ে কম পাশবিকতা তার মধ্যে দেখা যায়। রাজ্যের সংখ্যালঘুদের স্বাধীনতাহরণ সে করতে পারতো, কিন্তু না করে তাদের ধর্মীয় স্থানগুলো নির্মাণে সহায়তা করে। রাজা যিহোয়াকীম বীর, সম্মুখ সমরে প্রাণবিসর্জন আত্মসমর্পণের চেয়ে শ্রেয়তর তার কাছে। ক্যালদীয়দের আক্রমণের সময়ে বাইরের সাহায্যের জন্য অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা অথবা আত্মসমর্পণের এই দুটো প্রস্তাব এলে রাজা 'সম্মুখযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে' পড়ে বীর-ধর্মের পরিচয় দেবার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে। তৃতীয় রাজা যেদেকিয়াও মন্দির কর্তৃপক্ষের হাতে পুতুল মাত্র। উপন্যাসের বিশতম পরিচ্ছেদে বন্দি যেরেমিয়াকে রাজা নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে বলেছে: 'নবী, আমাকে আর লজ্জা দেবেন না, আমি অনুপায়।'(পৃ. ১১৩)— এই 'অনুপায়ত্বে'র সমাধান ঘটে যিরূশালেমের পূর্ণপতনের ফলে, সমস্ত শোষণ-কেন্দ্রগুলো ধ্বংসের মাধ্যমে। কেননা, 'তারা প্রথমেই মন্দির, রাজপ্রসাদ ও ধনীদের ভবনগুলি লুটপাট করে একেবারে ঝাঁঝরা করে ফেলল।'(পৃ. ১১৭)

সম্পূর্ণ উপন্যাস নাটকীয় কথোপকথনের ঢঙে পরিবেশিত হওয়ায় একটি পাঠসুখতা এসেছে। ছোট ছোট বাক্যে গতিশীল গদ্য উপন্যাসটিকে করে তুলেছে ঋদ্ধ। জীবনের প্রবহমানধারা রূপ দিতে গিয়ে মহাকাব্যিক ভাষারীতি ও অলঙ্কার এখানে গৃহীত। "এ যাবৎ লেখকের প্রকাশিত উপন্যাস, কিংবা উপন্যাসের অন্যান্য পাণ্ডুলিপির মধ্যে বইখানি রচনার প্রসাদগুণে, অথচ প্রাচীন কাহিনীর বর্ণনায় ভাষার গথিকরীতিকে— সর্বত্র সমভাবে নির্বাধ করে দেয়ার সার্থকতা সর্বশ্রেষ্ঠ। লেখকের এই ভাষাশৈলীর সাথে হাওয়ার্ড ফাস্টের স্পার্টাকাসের ভাষারীতি তুলনীয়। লেখকও এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ--- অহঙ্কারে আত্মস্ফীত হয়ে নয়— ইতিহাস-সচেতন ও মননিষ্ঠ অকপট ভাষণের ফলশ্রুতি হিসাবে।"[৮] মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী ঔপন্যাসিক সত্যেন সেন তাঁর 'অভিশপ্ত নগরী'তে বাইবেলের কাহিনীর মধ্যে যেমন এনেছেন বিষয়ের অভিনবত্ব, আঙ্গিকের পাঠবদলে তাতে দিয়েছেন নতুনত্ব। তাই একে বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস ধারায় এখনও নতুন পথের নির্দেশক বলতে হয়।

গ

'অভিশপ্ত নগরী'র দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে পরিকল্পিত 'পাপের সন্তান' (১৯৬৯) শুধু সত্যেন সেনেরই সেরা সৃষ্টি নয়, বাংলা ভাষায় লিখিত একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসও। এই শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি হিসেবে উপন্যাসটি 'আদমজী পুরস্কার' লাভ করে, তবে পুরস্কার পাওয়ার পূর্বপর্যন্ত সুধীমহল এ-বই সম্পর্কে ছিলেন উদাসীন। 'বাঙলা একাডেমী পত্রিকা'তে (১৩৭৮) গ্রন্থটির সমালোচনার নামে অতি দুর্বল পরিচিতিমূলক লেখা প্রকাশ সমকালীন এই ঔদাসীন্যকেই মূর্ত করে।[৯]

বাইবেল থেকে কাহিনী-সূত্র গ্রহণ করে 'অভিশপ্ত নগরী'তে সত্যেন সেন যিরূশালেম নগরীর পতনের কথা তুলে ধরেছিলেন। নগরী পতনের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরের উল্লিখিত ঘটনার ধারাবাহিকতা বাণীরূপ পেয়েছে 'পাপের সন্তানে'। বাবিল-রাজ নেবুকাডনাজার যিরূশালেম বিধ্বস্ত করেই শুধু ক্ষান্ত হয়নি, তার নির্মম নির্দেশ মোতাবেক "রাজা যিহোইয়াকীন, তার মা নেহুশতা, তার পত্নীগণ, কুলপতিগণ আর নগরের যোদ্ধাগণকে বন্দি করে বাবিলে পাঠানো হল। রজ্জুবদ্ধ পশুর মত হাজার হাজার বন্দী গায়ের শিকল টানতে টানতে তাদের পিছনে পিছনে চলল। তাদের মধ্যে ছিল অস্ত্রধারণক্ষম সাত হাজার পুরুষ আর এক হাজার কারিগর ও কর্মকার। অভিজাত পরিবারের বাছা বাছা সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল ওরা।"[১০] অভিশপ্ত নগরবাসী য়িহুদীদের এই ধরনের শাস্তি দানের পর তাদের বাধ্য করা হয় বাবিলে নির্বাসিতের জীবনযাপন করতে। কিন্তু পরে পারসিকদের আক্রমণে বাবিলের পতন ঘটলে পারস্য রাজের অনুমতিতে য়িহুদীরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ও তার অনুগ্রহে নগরীর প্রাচীর গড়ে তোলা হয় নতুন নিযুক্ত তীরশথ (শাসনকর্তা) নেহেমিয়ার নেতৃত্বে। বিশাল প্রেক্ষাপটে এই সুকঠিন কাজের বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে উপন্যাসে। স্থানীয় রাজকর্মচারী, য়িহুদীবিরোধী গোষ্ঠীগুলোর নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা এর জটিলতা বাড়িয়েছে। গ্রন্থের শিরোনামহীন ভূমিকাতে ঔপন্যাসিক এই জটিল ইতিহাসের ইঙ্গিত দিয়ে লিখেছেন:

> য়িহুদী জনসাধারণের প্রাণপাত প্রচেষ্টার ফলে নতুন যিরূশালেম গড়ে উঠল বটে, কিন্তু ধর্মোন্মাদ য়িহুদী সমাজপতিদের ধর্মের গোঁড়ামি, কঠিন রক্ষণশীল মনোভাব ও তীব্র পরজাতিবিদ্বেষ সমাজকে এক আত্মধ্বংসী আবর্তের দিকে ঠেলে নিয়ে চলল। শাস্ত্রীয় বিধান মানবিকতাকে গ্রাস করে অন্ধতার বেদীমূলে নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক 'পাপের সন্তানদের' বলি হতে লাগল। দুর্ভাগা য়িহুদী সমাজকে এজন্য ভবিষ্যতে বড় কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল— ইতিহাস তার সাক্ষী।[১১]

য়িহুদী সমাজের প্রাচীন ইতিহাস-নির্ভর কাহিনী উপস্থাপনার মাধ্যমে সত্যেন সেন একটি নির্দিষ্ট ধর্মগোষ্ঠীর রক্ষণশীলতাজনিত বাধা-নিষেধ মূর্ত করে এই ধরনের গোঁড়ামি ও বিদ্বেষের অনিবার্য পরিণতি চিহ্নিত করেছেন। উপন্যাসটিতে ব্যক্তি-মানুষের জীবনাভিজ্ঞতায় তার মোহাবদ্ধতা, সংগ্রামশীলতা ও সঠিক পথানুসন্ধান প্রাধান্য পেয়েছে; যদিও 'অভিশপ্ত নগরী'তে কথিত ঐশ্বরিক বাণীর অমোঘতায় একটি নগরীও জাতির ধ্বংসই মুখ্যভাবে হয়েছে বিবেচিত।

য়িহুদীদের জাত্যভিমান এতোই গগনচুম্বী যে, তারা নিজেদেরকে 'পৃথিবীতে বিশুদ্ধতম জাতি' বলে মনে করে এবং তারা বিশ্বাস করে যিহোবার এই 'বাণী'— "তোমরা তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না। তাদের ছেলেদের কাছে তোমাদের মেয়েদের বিয়ে দেবে না। তোমাদের ছেলেদের জন্য তাদের মেয়েদের ঘরে নিয়ে আসবে না। না, না, ওদের বিশ্বাস করো না। এই বিধর্মীদের মেয়েরা তোমাদের ছেলেদের মন ভুলিয়ে নিয়ে যাবে।"(পৃ.৪৩) এই বিধিনিষেধের ফলে পুনর্গঠিত যিরূশালেমে দেখা দেয় তীব্রতম সংকট, যে সংকটকে মানবিকতার সংকট বলে চিহ্নিত করতে হয়। নগরী পতনের পর বাবিলে নীত য়িহুদীদের অনেকেই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর বসবাসের ফলে 'পরজাতীয়দের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ' হয়ে পড়ে। এ কারণে তাদের চেহারায় যেমন, সংস্কৃতিগতভাবেও তেমনি একটি বিমিশ্রতার ছাপ লক্ষ করা যায়। মুক্ত যেরূশালেমে প্রত্যাবর্তনকারীদের মধ্যে আচার্য ইষার ধর্মীয় আদেশ জারি হয়:

> বল--- আমরা যিহোবার নামে শপথ করে বলছি, আমরা যারা পরজাতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করেছি, তারা অবিলম্বে তাদের স্ত্রীদের এবং তাদের গর্ভজাত সন্তানদের পরিত্যাগ করব। (পৃ. ২৩৮)

শুধু তাই নয় পরজাতি স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী য়িহুদী সনন্তানদের 'পাপের সন্তান' আখ্যা দিয়ে তাদের দ্রুত ধ্বংস কামনা করা হয়। পুনর্গঠিত যিরূশালেমে এই ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধের ক্রান্তিকালে উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রী মিকা ও শদরার জীবনে ঘনীভূত হয়ে আসে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি-আঘাত; যা মূলত বিকৃত ও পঙ্গুত্বপ্রাপ্ত সমাজেরই সৃষ্টি। সময়ের এক কঠিন কালপর্বে সমাজ-সংগঠনের বিরূপতার মুখে মনুষ্যত্ব ও মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে মিকা ও শদরা যিরূশালেম ত্যাগ করে নীলনদের তীরে নতুন পৃথিবী গড়ে তুললেও সাধারণ য়িহুদী এর দ্বারা আকৃষ্ট হয়নি। কারণ 'য়িহুদীর আবরণের নীচেও মানুষ বাস করে' কিন্তু 'য়িহুদীর পুরু চামড়া ভেদ করে তার সেই কান্না বেরিয়ে আসতে' পারে না।

মিকার সংকট মূলত সমাজ-উদ্ভূত; যদিও ব্যক্তি আবেগ ও অহমিকা তাকে নিয়ে গেছে সেই সংকটের আবর্তে। জনক-জননীর পরিচয়হীন মিকা দাস-মালিক নারগেল শারেজেরের বাড়িতে য়িহুদী ক্রীতদাস হিসেবে প্রতিপালিত হয়। বাবিলবাসী মালিকের কন্যা শদরা তাকে ভালোবাসে। সে নিজেও শুধু নাম ছাড়া সব দিক থেকে ক্যালদীয়দের মতো গড়ে ওঠে কিন্তু য়িহুদিত্বের নামে আবেগাপ্লুত হয়ে যায় এবং বলে: 'আমার ভাগ্য হতভাগ্য য়িহুদী জাতির সঙ্গে জড়িত, আমার ভবিষ্যৎ তাদেরই মাঝখানে।' (পৃ. ৭) ক্যালদীয়দের মধ্যে বাস করেও, প্রেমিকা শদরা নিজে ক্যালদীয় হওয়া সত্ত্বেও এক উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিভোর হয় মিকা। আর তাই বাহ্যিক বস্ত্র-ব্যবচ্ছেদও য়িহুদী হবার উন্মাদনা তাকে পেয়ে বসে:

> মিকা য়িহুদী পোশাক পরল। সঙ্গে সঙ্গে যারা সেখানে উপস্থিত ছিল, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা সবাই যিহোবার জয়ধ্বনি করে উঠল। মিকাও যোগ দিল তাদের সঙ্গে। জীবনে এই প্রথম, তার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। পরিত্যক্ত মূল্যবান ক্যালদীয় পোশাকটাকে ওরা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। আগুন জ্বেলে জ্বালিয়ে দিল। পোশাকটা পুড়তে লাগল। আবার তারা যিহোবার নামে জয়ধ্বনি করল। সেই আগুনের প্রদীপ্ত আভায়, সেই মিলিত জয়ধ্বনির মহামন্ত্রের মিকা য়িহুদীর ধর্মে আর য়িহুদীর জাতীয়তায় দীক্ষিত হয়ে গেল। (পৃ. ১৮)

এই য়িহুদিত্ব বরণ নিয়ে মালিক নারগেল শারেজেরের সঙ্গে তার মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়। প্রাণের চেয়েও বেশি, প্রণয়ী ক্যালদীয় শদরাকে ত্যাগ করার জন্যে প্রস্তুত হয় সে। কিন্তু শদরার ঐকান্তিক আগ্রহে সে বিচ্ছেদ ঘটে না। মুক্ত যিরূশালেমে শদরাসহ মিকা ফিরে এসে দেশ গড়ার কাজে মনোযোগী হয়। বাবিল ত্যাগ করে যিরূশালেমে আসার পেছনে একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা ছাড়া আর কোনো ধরনের আদর্শিক প্রেরণা কাজ করেনি মিকার মনে। নোহমিয়ার বৈঠকে 'নোঙরা পোশাকের সঙ্গে সামনের লোকদের পরিচ্ছন্ন পোশাকের ঘেঁসাঘেঁসি, মাখামাখি' দেখে ভাবাবেগ ও উচ্ছাসপ্রবণ মিকার মনে হয় যে, 'অন্তত এই সময়টুকুর জন্য য়িহুদীর জাতীয়তাবোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধ উঁচুনিচু ভেদাভেদকে ছাপিয়ে উঠতে পেরেছে' (পৃ. ১৩৮)। এই ধরনের ক্ষণিক মিলন তাকে অনুপ্রাণিত করে এবং সমাজ-সংগঠনের রূপ সম্পর্কে অজ্ঞাত মিকার মনে সমাজভাবনা জেগে ওঠে। কোন আদর্শ-সঞ্জাত হয়ে নয়, একজন ক্রীতদাসের বুদ্ধির পরিসরে যতটুকু সামাজিক সুস্থতা ও সাম্য কাম্য হতে পারে সেই প্রেক্ষাপটে বিবেচ্য মিকার এই সামাজিক ভাবনা:

> সম্প্রতি যে সমস্যাটা তাকে উদ্ব্যস্ত করে তুলেছিল তা হোল এই যে, ভদ্রলোক আর শ্রমজীবী ছোটলোকদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য কি কি এবং পার্থক্যগুলোকে ভেঙ্গে সমান করে এই দুটো ভাগকে এক করে দেওয়া যায় কিনা এবং কি করেই বা দেওয়া যায়। (পৃ. ১৮৭)

কিন্তু মাঠ-পর্যায়ে প্রত্যক্ষ কাজ করার ফলে আম-জনতার সঙ্গে গভীরভাবে মেশার সুযোগ হয় মিকার। দরিদ্র য়িহুদীরাও মিকাকে নিজেদের মানুষ হিসেবে মনে করতে শেখে এবং বলে যে, 'তুমি ভদ্রলোক না ছোটলোক,

আমরা জানি না, তবে তুমি যে আমাদের লোক সে কথা জানতে আমাদের বাকী নেই, আমাদের ছেড়ে তুমি যাবে কোথায়?' (পৃ.১৭৮) এভাবেই এক সময়ে মিকা শ্রমজীবী য়িহুদীদের 'আমাদের লোক' হিসেবে তাদের অদৃশ্য নেতা হয়ে যায়। কিন্তু নেতৃত্ব গ্রহণ করার মতো যোগ্যতা তার ছিলো না, এমনকি শিক্ষারও অভাব ছিলো। পুনর্গঠিত যিরূশালেমের তীরশথ তথা নতুন শাসক নেহেমিয়া ও আচার্য ইষ্রার মুখোমুখি শোষিত য়িহুদীদের সঙ্গে নিয়ে তাই সে দাঁড়াতে পারে না। তবে গরিবদের বুঝাতে সক্ষম হয় যে কিভাবে তারা শোষিত হচ্ছে। নতুন শাসক নেহেমিয়ার কাছে তাই তাদের সোচ্চার প্রার্থনা শোষণমুক্তির লক্ষ্যে:

> : ওরা কারা? কাদের কথা বলছ?
>
> : বলছি আমাদের সেই সব ধনী য়িহুদী ভাইদের কথা, যারা এত দিন ধরে আমাদের হাড় মাংস চিবিয়ে খেয়েছে, আজও খাচ্ছে।
>
> : এরা কি করেছে তোমাদের?
>
> : আকালের সময় আমরা ওদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলাম, সেই ঋণ সুদসুদ্ধ পর্বত প্রমাণ হয়ে উঠেছে। আর তারই দায়ে আমাদের ভিটেমাটি জমি ওদের হাতে বাঁধা পড়েছে আর আমাদের ছেলেমেয়েগুলি ওদের বাড়ীতে দাস দাসী হয়ে গরু ভেড়ার মতই আটকে আছে। (পৃ. ২০৭)

সাধারণ শ্রমজীবী য়িহুদীদের শোষণ মুক্তির মন্ত্র প্রদানের মাধ্যমে মিকা চরিত্রটিকে যেমন মহত্বপ্রদ করা হয়েছে, ঔপন্যাসিক সত্যেন সেনও তেমনি উত্তরণ দেখাতে চেয়েছেন উগ্র-জাতীয়তাবাদ থেকে শ্রেণীচেতনার আদর্শে। মিকার মাধ্যমে ক্রমধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক এই চেতনায় উত্তরণের ফলে চরিত্রটি বাংলা সাহিত্যে অনন্যতায় ভাস্বর হয়েছে। কোনো ক্রীতদাসের মধ্যে শ্রেণী চেতনার বিপ্লবী জাগরণ বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম।

সামাজিক শোষণের তীব্রতার কারণে মিকা হয়েছিলো উগ্র জাতীয়তাবাদী, আবার এই শোষণের স্বরূপ সন্ধানের ফলেই সে হয়ে ওঠে শ্রেণী সচেতন। বাবিলে ক্রীতদাস হিসেবে জীবন যাপনের সময়ে স্বদেশহারা য়িহুদীদের উপর ক্যালদীয়দের অমানুষিক অত্যাচারই মিকাকে উগ্রজাতীয়তাবাদী করে তোলে, তার আত্মসমীক্ষণে এই সত্যই প্রকাশিত :"শোন হানানি, সে দিন আমি বুঝতে পারি নি, আজ মনে হচ্ছে, শোষণ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মন্ত্রই সেদিন আমাকে উদ্দীপিত করে তুলেছিল, য়িহুদীর মন্ত্র নয়।" (পৃ. ২৫৩) কিন্তু যিরূশালেমে প্রবেশ করার প্রথম দিনেই গরিব পাড়ায় গিয়ে মিকার কাছে স্পষ্ট হলো দরিদ্র য়িহুদীদের প্রতি ভদ্র য়িহুদীদের অত্যাচার ও শোষণ এবং তখনই তার জাত্যাভিমান ও জাতীয়তাবাদী 'স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল'। য়িহুদী সমাজেও দুই শ্রেণীর অবস্থান, ধর্মের নামে গোঁড়ামি, অন্ধত্ব ও পশ্চাৎপদতাকে প্রশ্রয় প্রদান মিকাকে ধর্মের প্রতি মোহহীন করে তোলে:

> প্রভুর নামগান? ভালই তো। বাবিলে থাকতে, তারপর বাবিল থেকে আসবার পর থেকে সেও তো এমন কত গান গেয়েছে। কিন্তু আজ তার এমন লাগছে কেন? (পৃ. ২৭২)

প্রভুর নামগান তথা ধর্মের প্রতি মিকার এমন ঔদাসীন্য মনুষ্যত্বের জাগরণ থেকেই উদ্ভূত। উগ্র য়িহুদীবাদের প্রতি মিকার আকর্ষণ শোষণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়। সে প্রত্যাশা ব্যর্থ হয় যখন শাসক নেহেমিয়া দায়িত্ব নেওয়ার পরও সুদে অর্থ গ্রহণকারী দরিদ্র মানুষের সমস্যার সমাধান হয় না। প্রণয়ী স্বামীদের ভালোবেসে যেসব পরজাতীয় স্ত্রীলোক যিরূশালেমে চলে আসে সর্বস্ব ত্যাগ করে, ধর্মের নামে আচার্য ইষ্রা ঘোষণা দেয় যে তারা অবশ্য-পরিত্যাজ্য; তাদের নিষ্পাপ শিশুদের 'পাপের সন্তান' বলে অভিহিত করা হয়। সমাজের এই ধরনের বন্ধ্যাত্ব ও রক্ষণশীলতা মিকার মধ্যে জাগরণ ঘটায় আত্মশক্তির, যা তাকে শেষ অবধি মনুষ্যত্বের পথসন্ধান দেয়। স্ত্রী শদরার কাছে নিজের অতীতকে অনুপুঙ্খভাবে তুলে ধরে মিকা বলে:

> বাবিলে থাকতে তুমিই তো একদিন বলেছিলে--- মিকা, তুমি যতই বল না কেন, আমি বলছি তুমি য়িহুদী নও। আমি সেদিন তোমার কথা বিশ্বাস করি নি আমি নিজের গায়ে পুরু করে য়িহুদীর রঙ মাখালাম। সবার কাছে সেই কথা ফলাও করে প্রচার করতে লাগলাম। আর তার মধ্য দিয়ে আমি নিজেও মনে প্রাণে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলাম যে আমি একজন সত্যিকারের য়িহুদী। কিন্তু আজ দিনে দিনেই আমার সেই বাইরে কৃত্রিম রং খসে পড়ছে, আর আমি আপনার স্বরূপ দেখতে পেয়ে চমকে উঠছি। (পৃ.২৭৭)

এতোদিন য়িহুদী হিসেবে গর্বিত মিকার প্রকৃত জন্ম পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হলে ধর্মীয় মহাসভার বিচারে যিরূশালেম ত্যাগের নির্দেশ জারি হয় তার উপর। কেননা, মিকার মালিক নারগেল শারেজের আচার্য ইস্রার কাছে চিঠিতে জানায় যে, মিকা ও শদরা উভয়ে তার ঔরসজাত সন্তান। মিকার মা য়িহুদী ক্রীতদাসী ছিলো। এ অবস্থায় মনোজাগতিক ও বর্হিজাগতিক নানা দ্বন্দ্ব সংঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে মিকা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে মানুষ এবং ক্রমে দেবতার উপরও। তার বোধ হয়: "দেবতা আর মানুষ সবাই আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। নির্দোষ হয়েও আমরা সমস্ত মানুষের কাছে ঘৃণার পাত্র। এর বিচার আমরা কার কাছে চাইব? শদরা, এ সংসারে বিচার নাই।" (পৃ. ৩১১) এখানে উপন্যাসটি শেষ হতে পারতো, চরিত্রটিও অনিবার্যভাবে থেমে যেতো এখানেই। কিন্তু এই নৈরাশ্যজনক পরিণতি এড়িয়ে উপন্যাসটির যেমন মহত্ত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, মিকাও হয়ে উঠেছে মহাকাব্যোচিত নায়কে। মহাকাব্যের মূল চরিত্র কাব্যের আদি থেকে অন্ত্য পর্যন্ত ব্যাপ্ত হবে। সে হবে সমগ্রিক চৈতন্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষার অধিপুরুষ। 'দেবতাকে নায়কের আসনে বসালে মহাকাব্যের অলৌকিক মহিমা বাড়তে পারে, কিন্তু মানবিক আবেদন কমে যায়।'[১২] এই 'মানবিক আবেদনে'র অন্বেষায় মহাকাব্যের নায়কের গুণাবলির অনুসন্ধান করা যেতে পারে। কেননা, সে আত্মশক্তির বলে সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে একটি সুস্থ মানবিক মূল্যবোধকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। মিকার মধ্যে কাজ করে এক পরাজয়হীন মনোভাব:

> নিষ্পাপ আমরা, নিষ্কলঙ্ক আমরা,--- আমরা কেন ওদের কাছে মাথা নীচু করে থাকব? কে, কবে, কোথায় তার অসংযত প্রাবৃত্তি চরিতার্থ করবার ফলে এক সন্তানের জন্ম দিয়েছিল— তার দায়-দায়িত্ব কি আমাদের বয়ে নিয়ে চলতে হবে? (পৃ. ৩১১)

শেষ অবধি মিকার 'মাথা নীচু' না-করা এই মনোভঙ্গি ও সুন্দর আগামীর জন্যে প্রতীক্ষা চরিত্রটিকে ক্রমধারাবাহিকতায় সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়। অভিন্ন ঔরসজাত মিকা ও শদরার স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক অটুটু রেখে নীল নদের তীরে বসবাস সম্পর্কে যতীন সরকার প্রশ্ন তুলেছেন: "যুক্তিটা যতোই মানবিক ও বৈপ্লবিক হোক না কেন, ঐতিহাসিক স্বাভাবিকতাকে কি তা লঙ্ঘন করে না?"[১৩] — এ প্রসঙ্গে মনে করতে হবে লেখকের উদ্দেশ্য কি? ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে চাননি সত্যেন সেন। পুরাণকাহিনী বা ঐতিহাসিক ঘটনা নির্বাচনের মাধ্যমে মেহনতি মানুষের প্রতিবাদ যে কত ধরনের হতে পারে— এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'পাপের সন্তান' উপন্যাসে মিকার মধ্যেও এই ধরনের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সামাজিক অনুষ্ঠানহীন পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর যার বৈবাহিক সম্পর্ক টিকে থাকে তার দ্বারা অনেক দুঃসাধ্য কাজ সম্ভব। সত্যেন-সাহিত্য বিচার করতে গিয়ে আমাদের এ-ও বিস্মৃত হলে চলবে না যে, "সত্যেন সেন সাহিত্যকর্মের জন্য সাহিত্য করেননি। সংগ্রামী জীবনের দায়িত্ব পালনের জন্য সাহিত্যে নিয়োজিত হয়েছেন। আর সেই দায়িত্ব পালনের তাঁর যে প্রয়াস ও সাফল্য তা আমাদের জন্য একটি অনন্য এবং বহুমাত্রিক সাহিত্য সংস্কৃতির মণ্ডলকে সৃষ্টি করেছে।"[১৪]

উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র শদরা, পিতার ক্রীতদাস মিকাকে গোপনে ভালোবাসার দুঃসাহসিক কাজে প্রথমেই লিপ্ত সে। প্রেমের প্রতি ঐকান্তিক শদরা মিকার মিথ্যা স্বাজাত্যবোধের স্বপ্নের অসারতা তুলে ধরে। 'তোমার আর আমার মাঝখানে এক দুস্তর রক্তসমুদ্রের ব্যবধান'— মিকার এ ধরনের নৈরাশ্যজনক বক্তব্যের প্রতিউত্তরে শদরার দৃঢ় প্রত্যয়:

> : মিকা, তুমি যাই বল না কেন, আমার কোন সংশয় নেই। আমার সাহস আছে আমি ভয় করি না। কোন বাধা আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। দেখো, আমি এই রক্তসমুদ্র সাঁতারে পার হয়ে তোমার কাছে গিয়ে পৌছব। (পৃ. ১২)

এই সংশয়হীন দুর্নিবার প্রেমাকর্ষণের কারণে পিতা, পিতৃভূমি ও পরিচিত পরিবেশ ত্যাগ করে মিকার সঙ্গে সে চলে আসে বিধ্বস্ত যিরূশালেমে। শদরার কাছে প্রেম বড়, য়িহুদী বা ক্যালদীয় মনোভাব নয়। মিকার সঙ্গে দেশত্যাগের সময়েও এই মনোভাব সতত ক্রিয়াশীল ছিলো তার মধ্যে। কিন্তু পুনর্গঠিত যিরূশালেমে ধর্ম ও য়িহুদী জাতীয়তার নামে মিকা যে উন্মত্ততায় মেতে ওঠে তাতে মানবিকতার নামে মিথ্যাচার ও ভণ্ডামি প্রত্যক্ষ করে শদরা। নির্বাসিত য়িহুদীরা স্বদেশে ফিরে নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা করার পর সবাই যখন নতজানু হয়ে মন্দির চুম্বন ও প্রভু-প্রার্থনায় ব্যস্ত তখন শদরা নিজেকে ওই ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একীভূত করতে না পেরে নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে থাকে অন্যত্র। কিন্তু মিকা 'জোর করে টেনে নিয়ে এসে তাকে তার পাশে বসিয়ে দিল'। য়িহুদিত্ব ও ভালোবাসার মধ্যে তখন মিকার কাছে ভালোবাসা ও প্রণয়ী গৌণ হয়ে পড়ে, শদরার তা অননুধাবনীয় ছিলো না। মিকাকে তাই সে ক্ষোভ মিশ্রিতভাবে জিজ্ঞেস করে:

> : মিকা, আমরা দুজন দুজনাকে ভালবেসেছিলাম। আমি জানতাম মিকা য়িহুদী আর শদরা ক্যালদীয়। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, এ শুধু একটা কথার কথা। সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে এই যে, শদরা মিকাকে আর মিকা শদরাকে ভালবাসে। আমি মিকার জন্য দেশত্যাগী হলাম। আমার জন্মভূমি আর আমার স্বজনদের ছেড়ে চলে আসবার সময় আমার প্রাণ কি কাঁদে নি? কেঁদেছিল। কিন্তু আমি আমার মিকাকে অবলম্বন করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ভেঙ্গে পড়ি নি। সেদিন আমার বোঝা উচিত ছিল, কিন্তু আমি বুঝেও বুঝতে চাই নি যে মিকার কাছে সব চেয়ে বড় সত্য যিহোবা আর য়িহুদী জাতি। শদরাকেও সে ভালবাসে, সে ভালবাসা মিথ্যে নয়, কিন্তু সে ভালবাসা গৌণ একথা তুমি অস্বীকার করতে পার মিকা?
>
> মিকা নিরুত্তর হয়ে রইল। (পৃ. ১৪৬)

এখানে মিকার কোনো উত্তর থাকবার কথা নয়। কারণ, সে তখন 'ধর্মোন্মাদ য়িহুদীজাতি'র প্রতিনিধি, যে শদরাকে 'যিহোবার মন্দিরের পাষাণ চত্বরে' চুল ধরে আছড়ে ফেলে দেয়। নিজের ভালোবাসার জোরে মিকাকে ফেরাতে ব্যর্থ হয়ে শদরা 'ভাগ্যের নিষ্ঠুর খেলা' বলে সব মেনে নিতে বাধ্য হয়। উপন্যাসে শদরা চরিত্রটির নিয়তি-নির্ভরতা লক্ষ করা যায়। "এই-টাই আমার ভাগ্যের তারা, আমার নিয়তি। গণৎকারেরা গুণে বলেছে ও আমার জন্য অনেক দুঃখ বয়ে নিয়ে আসবে।"— শদরা এই বিশ্বাস বারংবার ব্যক্ত করেছে। কিন্তু নিয়তির কাছে সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়নি কখনও। আর তাই চূড়ান্ত দুঃখ জেনেও প্রণয়ী মিকাকে অবলম্বন করে বাবিল ত্যাগের সাহস করে সে। নবগঠিত যিরূশালেমের য়িহুদী সমাজে শদরা যেন সম্পূর্ণভাবে 'আউট সাইডার'। জনারণ্যে নির্বাসিত একজন নারী প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে নিজের অবস্থান শনাক্ত করার জন্যে। যে সংকীর্ণ সমাজ অন্য মতাবলম্বীর সুকীর্তি গ্রহণ করতে জানে না, ধর্মীয় রক্ষণশীলতার মোড়কে নিজেকে তো রাখেই, অন্যকেও করতে চায় আবদ্ধ— সে সমাজে মুক্তচিন্তার বাধাগ্রস্ততা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তার পরও যাদের ভাবনা সংকীর্ণ আবিলতার জাল ছিন্ন করতে পারে তাদের চিন্তায় ধর্মভেদ অতীব গৌণ হতে বাধ্য। শদরা মিকাকে ভালোবাসার ফলে তার কাছেও বিষয়টি তুচ্ছ:

> শদরা বলল, মিকা, আমি আর এমন করে পারি না। আমাকে কি মেরে ফেলবে তোমরা? আমাকে না হয় তোমাদের কিছু কাজই দাও।
>
> : কি কাজ করবে তুমি?
>
> : কেন, তোমাদের প্রাচীর গাঁথবার কাজ, যা তোমরা করছ। না কি আমি তোমাদের শত্রুপক্ষের মেয়ে বলে আমাকে একাজ দেবে না? (পৃ. ১৯৭)

নিজের জাত্যভিমান ত্যাগ করতে পারে শদরা, কিন্তু অবশ্যই তা অন্যের ধর্মগ্রহণের মাধ্যমে নয়। এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাচেতনার বিকাশ তার মধ্যে লক্ষণীয়। মিকার সঙ্গে তার প্রকৃত সম্পর্ক উদ্‌ঘাটনের পর যিরূশালেম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে শদরা নিজে প্রথমে দ্বিধামুক্ত হয়; তারপর মিকাকে তার আবেগ ভরা, জিজ্ঞাসা: 'মিকা, সত্যি করে বল, তোমার মনে কোন গ্লানি নাই তো?' অন্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নয়, মূলত শদরাই মিকাকে অনুপ্রাণিত করে নতুন করে জীবন গড়ে তোলার। ধর্মীয় সংস্কারহীন মানবিক মহত্ত্বে তাই চরিত্রটি বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

সুসান রাজপ্রাসাদের কর্মচারী পানপাত্রবাহক নেহেমিয়া পারস্য সম্রাট আর্তাসারেকসের কর্তৃক যিরূশালেমের তীরশথ বা নতুন শাসক নিযুক্ত হয়ে নগরী পুনর্গঠনের কাজে মনোযোগী হয়। কিন্তু স্থানীয় স্বার্থবাদী লোক ও য়িহুদী বিদ্বেষী পরজাতিদের বিরুদ্ধতার মুখে প্রথমেই নানা ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয় তাকে। ধৈর্যাবলম্বন, বিচক্ষণতা এবং সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অসীম দক্ষতা থাকায় সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে ঈপ্সিত কর্ম সাধন করতে পারে। প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধতার জবাবে তার উত্তেজিত বক্তব্য:

> : ইতিহাস চিরকাল একই পথে চলে না। এবার ইতিহাসের মোড় ঘুরেছে। যাদের দেখবার মত চোখ আছে, তারাই শুধু দেখতে পায়। (পৃ. ১২১)

যিরূশালেম পুনর্গঠনের কাজে 'প্রতিটি য়িহুদীর সহযোগিতা' তার কাম্য, 'ছোট বড় কাউকে বাদ দিলে চলবে না' বলে মনে করে নেহেমিয়া। এই মানুষটিও য়িহুদিত্বের নামে সংকীর্ণ হয়ে ওঠে, নারীর স্বাধীনতা তার কাছে মূল্যহীন মনে হয়; আর পরনারীতো অবশ্যই পরিত্যাজ্য। স্নেহ-ভালোবাসা ধর্মকারার কঠোর প্রাচীন ডিঙাতে পারে না, সমাজ ও জাত্যভিমানের কাছে মানবিক মূল্যবোধ বাধাগ্রস্ত তার কাছে। পরজাতীয় নারীকে ভালোবাসে শুনে মিকার প্রতি তার সক্রোধ ভর্ৎসনা:

> এ কেমন ভালবাসা! নেহেমিয়া যেন গর্জন করে উঠলেন, এ কেমন ভালবাসা যে ভালোবাসা সমাজ, স্বজাতি আর ধর্মকে ভুলিয়ে দেয়। (পৃ. ১৪০)

নেহেমিয়ার এই গর্জনের উত্থান যে কৌণিক বিন্দু থেকে তার বিপ্রতীপে অবস্থিত মানবতা। নিজে নারীতে অনাসক্ত, কিন্তু সদ্যস্নাত শদরাকে দেখে প্রৌঢ় বয়সেও কামনার জাগরণ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। নারী প্রেমের সঙ্গে গণপ্রেমের অনুপুঙ্খ সাদৃশ্য না থাকলেও উভয়ের মধ্যে একীভূত হয়ে আছে মানুষ। ফলে নেহেমিয়া শুধুই ধর্মে মোহান্ধ এ কথা বলার উপায় নেই। সুদখোর য়িহুদীদের কাছ থেকে সে কথা আদায় করতে পেরেছিলো যে, তারা আর সুদগ্রহণ করবে না, অনাদায়ী সুদ মওকুফ করে দেবে। কিন্তু এভাবে সমস্যার সমাধান হয়নি গরিবের। ভালো মানুষী করে শ্রেণী সমস্যার সমাধান হয় না বা শোষকের শ্রেণীবদল ঘটানো সম্ভব নয়, নেহেমিয়ার তা ছিলো অজানা। তবে তার মনের গভীরে অনবরতই কাজ করতো ধর্মবোধের সঙ্গে মানবপ্রেমের দ্বন্দ্ব:

> আচার্য ইষ্রা তো স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, পরজাতীয়দের সম্বন্ধে সমাজের কোন দায়িত্ব নাই। কিন্তু কই, তিনি যে তেমন করে ভাবতে পারছেন না? কেন পারেন না? হায় পরজাতীয়া, তোমরা কেমন করে জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে গেলে? (পৃ.২৭০)

এতৎসত্ত্বেও শ্রেণীচরিত্রের জন্যেই মানুষের পক্ষে সর্বতোভাবে অবস্থান নেওয়া হয় না তার। আচার্য ইষ্রার সঙ্গে হানানির যৌক্তিক তর্কের সময়ে সে অস্বস্তিবোধ করে, মিকা শদরার জন্যে বিচারের সময়ে কৌশল গ্রহণ করতে হয়। আসলে নেহেমিয়া চরিত্রটি বাইবেলীয় সমাজ বাস্তবতায় ধর্মবোধ ও মানবতার সার্বক্ষণিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত, যেখানে শেষ পর্যন্ত মনুষ্যত্ব সংগ্রামশীল— যদিও একা! হানানিকে নেহেমিয়া বলেছে:

> বুঝতে বড় বেশী দেরী হয়ে গিয়েছে আজ আমি একা, বড় একা। আর আমি বড় ক্লান্ত। (পৃ. ৩০৫)

ক্রীতদাস য়িহুদী হানানির জাত্যভিমান ধ্বংস হয়ে যায় তখনই যখন গোত্র-বর্ণ জিজ্ঞেস করে য়িহুদী ধর্মগুরুরা তাকে যাহুদা থেকে বিদায় করে দেয়। পরজাতি স্ত্রী গ্রহণের ফলে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের

অধিকতর জর্জরিত হতে হয় তাকে। কিন্তু বিনা প্রতিবাদে কোন কিছুই সে গ্রহণ করেনি— তার চারিত্রিক বলিষ্ঠতা এখানেই। আচার্য ইস্রা যখন পরজাতীয় স্ত্রীদের ত্যাগ ও তাদের গর্ভের সন্তানদের 'পাপের সন্তান' বলে ঘোষণা করে, হানানি তখন ধর্মীয় পুস্তক থেকে নানা যুক্তি তুলে ধরে ইস্রাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। তার শাণিত যুক্তি ও 'জেরার মুখে পড়ে আচার্য ইস্রা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন'। 'সময় নাই' বলে রণে ভঙ্গ দেওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না ধর্মগুরুর। হানানি সংকীর্ণ ধর্মবোধের বিরুদ্ধে জাগ্রত মনুষ্যত্বের সুতীব্র প্রতিবাদ।

মোশির ভাই প্রধান যাজক হারোনের সপ্তদশ পুরুষ আচার্য ইস্রা ধর্মীয় রক্ষণশীলতার প্রতীক চরিত্র। ধর্মের নামে জনগণের মধ্যে বিপুল প্রভাব বিস্তারকারী ইস্রা বিধ্বস্ত যিরূশালেম পুনর্গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেনি, বরং মেহনতি জনতার দিনরাত প্রচেষ্টায় নগরীর প্রাচীর তৈরি সম্ভব হয়, পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় মন্দির। যিরূশালেমে যখন দরকার সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণে জাতিগঠন, তার বদলে আচার্য জাতি শুদ্ধির নামে অমানবিক কাজে তৎপর হয়ে ওঠে। ধর্মের নামে বিধিনিষেধ জারির সময়ে প্রকৃতপক্ষে সে কারও বাধার সম্মুখীন হয় না। হানানির যৌক্তিক প্রশ্নের উত্তরদানে তার অপারগতা ও 'সময় নাই' বলে পলায়ন একথাই প্রমাণ করে যে, ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের সম্মুখীন হলে আচার্যের পরাজয় সম্ভব হতো। মেহনতি মানুষের সঙ্গে ধনীদের স্বার্থদ্বন্দ্বে পুরুতগোষ্ঠী সর্বদাই ধনীদের পক্ষাবলম্বন এবং এক সময়ে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। 'অভিশপ্ত নগরী'তে পুরোহিতদের শোষকের পক্ষাবলম্বন করতে দেখা যায়; মিথ্যে নবীর আবির্ভাব ঘটে। এই উপন্যাসও নবী হিলকিয়া ও স্ত্রীনবী নোয়াদিয়ার আবির্ভাব মেহনতি মানুষের বিপক্ষে। সুদের বোঝায় জর্জরিত গরিব যিরূশালেমবাসী ধনীদের কাছে সুদ মওকুফ চাইলে আচার্য ইস্রার ধনীদের পক্ষাবলম্বন এইভাবে:

> দেখ, আমরা এখন সমাজকে রক্ষা করার বিরাট কাজে হাত দিয়েছি। এখন প্রয়োজন একতার। এখন এ সমস্ত কথা তুলে গৃহবিবাদ ডেকে এনো না। তাহলে আমাদের সমস্ত কাজ পণ্ড হয়ে যাবে। (পৃ.২৭৪)

শুধু আচার্য ইস্রা নয়, পৃথিবীর সব ধর্মগুরুরাই পরোক্ষভাবে ধনীদের স্বার্থ সিদ্ধি করে থাকে, টিকিয়ে রাখে শোষণ ব্যবস্থা। সত্যেন সেন য়িহুদী আচার্যের চিত্র অঙ্কন করে শুধু একটি মাত্র ধর্মের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেননি, তাঁর লক্ষ্য ছিলো 'ধর্মীয় শোষণে'র মূল অনুসন্ধান। কেননা, মার্কসবাদে দীক্ষিত লেখক জানতেন, ধর্ম হলো 'যেসব বহিঃশক্তি মানুষের দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের মনে সেগুলোর উদ্ভট প্রতিচ্ছায়া, যে প্রতিচ্ছায়ায় পার্থিব শক্তিগুলো ধারণ করে অতিপ্রাকৃত শক্তির রূপ।'[১৫]

উপন্যাসে মিকা ও শদরার কাহিনীর সমান্তরালে পাগলবাবা, পুত্রহারা পাগলিনী, বুড়িমাসহ আরও একাধিক উপাখ্যানের উল্লেখ আছে। বাবিল থেকে মিকাদের যিরূশালেমে পৌঁছার পথ পরিক্রমা ও নগরীতে প্রাচীর নির্মাণের বর্ণনায় 'পাপের সন্তানে'র একটি বড় অংশ ব্যয়িত। জনৈক সমালোচক বলেছেন:

> পাপের সন্তানের কাহিনী বহুগুণ জটিল। নতুন প্রেম ও নব জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ মিকার মানসিক যন্ত্রণা, য়িহুদী জাতির স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আনন্দ ও বেদনা, নতুন দেশের বহুমুখী সমস্যা ও বিচিত্র রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জটিলতা, পুরানো ও নবাগত য়িহুদীদের সংঘর্ষ, উচ্চবিত্তের শ্রেণী-সংঘাত, ধর্ম-যাজকদের উগ্র-আচার-নিষ্ঠার নিষ্ঠুরতা, রাজনৈতিক চক্রান্তের বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া, উদগ্র উচ্চাশার মর্মন্তুদ নৈরাশ্যজনক পরিণতি, চিরন্তন মানবিক প্রেম ও সমাজিক ধর্মীয় অনুশাসনের সংঘাত এ উপন্যাসের জটিলতর বিন্যাসকে বহুমাত্রিকতা দান করেছে।[১৬]

এখানে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে হাক্কাতন নামক এক সুদখোর য়িহুদীর চরিত্রের উল্লেখ আছে। অর্থের জোরে অষ্টাদশী পত্নী ক্রয় করেছে এই প্রৌঢ়। তার কাছে অর্থই মুখ্য, দেশগঠন বা জাতিগঠন নয়। এর পাশাপাশি অষ্টাদশী পত্নীর মনোবেদনাও প্রকাশিত। উপন্যাসের এসব দ্বন্দ্ব-জটিলতার মাধ্যমে ঔপন্যাসিক যে সত্যকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন তা হলো ধর্মীয় আবিলতা বা অনুশাসন নয়, মানবমুখী বৈষম্যহীন সমাজেই প্রকৃত প্রশান্তির বীজ উপ্ত--- যেখানে অবশ্যই পরিত্যক্ত উগ্রজাতীয়তাবাদ। আসলে "পাপের সন্তানে লেখক উগ্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তার বিপরীতে সুস্থ ও উদার আন্তর্জাতিকতাকে মহীয়ান করে তুলে ধরেছেন। সে আন্তর্জাতিকতা

প্রতিষ্ঠিত হতে পারে আর্থ-সামাজিক ভেদ-বৈষম্য অবসানেরই পৃষ্ঠপটে, তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত উপন্যাসটিতে বিদ্যমান।"[১৭] মিকা চরিত্রটির জাতীয়তাবাদের উন্মত্ততায় দীক্ষা ও অনতিবিলম্বে মোহভঙ্গের মধ্য দিয়ে উল্লিখিত বক্তব্য অধিকতর সুস্পষ্টতার দিকে এগিয়ে যায়।

'পাপের সন্তানে'র প্রকরণগত উৎকর্ষ শিখরস্পর্শী। সংলাপ-নির্ভর বহু উপাখ্যানের সমন্বয়ে উপন্যাসটি গড়ে উঠলেও মূল কাহিনীর ঐক্য বিনষ্ট হয়নি। গতিশীল গদ্যে উপস্থাপনার চমৎকারিত্বে কাহিনী এগিয়ে গেছে। পৃথক ঊনত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত উপন্যাসের কোনো কোনো পরিচ্ছেদ যেন উপমা উৎপ্রেক্ষার পশরা— যেখানে প্রচলিত অলঙ্কার বিবর্জিত, সেখানে ভাব আর ভাষা গেছে মিশে, হয়েছে সর্বত্রগামী। একটি উল্লেখ চয়ন করা যাক:

> শদরা ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। তার হাত থেকে বাতিটা পড়ে গিয়ে নিভে গেল। এক রাশি অন্ধকার যেন ওৎ পেতে বসেছিল। বাতিটা নিভতেই সেই অন্ধকার ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সব কিছু একাকার করে ফেলল। (পৃ.২০)

এখানে যে রূপকল্পটি সৃষ্টি করা হয়েছে তা পরবর্তী ঘটনার পুরো ব্যঞ্জনা ধারণে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে চমৎকার আঙ্গিক কুশলতাও উপন্যাসটিকে মহত্ত্ব দান করেছে। কিন্তু আধুনিক জীবনসত্য প্রকাশই ঔপন্যাসিকের মুখ্য অন্বিষ্ট ছিলো। বাইবেলের কাহিনী থেকে 'অভিশপ্ত নগরী' হয়ে 'পাপের সন্তানে'র মধ্যে তিনি 'ফুলের মত একটি শিশু' প্রত্যাশা করেছেন।

ঘ

লেখকের প্রত্যাশানুযায়ী 'পাপের সন্তান'-কে 'অভিশপ্ত নগরী'র দ্বিতীয় খণ্ড বলে গ্রহণ করলে দেখা যায়, এর সর্বশেষ স্তবকে নতুন 'ভোরে'র উল্লেখের মাধ্যমে তাঁর সোনালি প্রত্যাশাবাদ ব্যক্ত। সমালোচক তাই হয়তো উপন্যাস দুটি সম্পর্কে উচ্চ মন্তব্য করে লিখেছেন, 'মিথের নবরূপায়ণে, গদ্যরীতির ধ্রুপদীবিন্যাসে এবং বক্তব্যের সমকালীন-সংকট বিবেচনায় এ-দুটি উপন্যাস বাংলাদেশের উপন্যাসে স্বতন্ত্র অনতিক্রান্ত।'[১৮] নগরী ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সভ্যতার বিনষ্টি সাধন, ধর্মের নামে শোষণ পীড়নের পরও অমিততেজী মনুষ্যত্ব ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান মানুষ পরাভব মানে না; কেননা, পুরো পৃথিবীতেই তার অধিকার। বাইবেল থেকে কাহিনী সূত্র গ্রহণ করে সত্যেন সেন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এই আধুনিক বক্তব্য-সত্যটি।

সত্যেন সেনের এই উপন্যাস দুটোতে বাইবেল-কথার আধারে উঠে এসেছে সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং জীবনের অমিত সম্ভাবনার সোনালি রশ্মি। মিথকথার মধ্যেও যে মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবন-অভীপ্সা রূপায়িত করা সম্ভব, বাইবেলের কাহিনীকে উপন্যাসে গ্রহণ করে সত্যেন সেন আবার সে কথা প্রমাণ করলেন।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১) অজয় রায়, *সত্যেন সেন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ৪৫।

২) হায়াৎ মামুদ ও মফিদুল হক (সম্পাদক), *সত্যেন সেন রচনাসমগ্র*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: উদীচী, ১৯৮৬), রণেশ দাশগুপ্ত লিখিত 'ভূমিকা'।

৩) *প্রাগুক্ত*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: উদীচী, ১৯৮৭), পৃ. ৩৫২। সন্তোষ গুপ্ত লিখিত 'মুখবন্ধ'।

৪) রণেশ দাশগুপ্ত, *শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে* (ঢাকা: প্রকাশ ভবন, ১৩৭৯), পৃ. ৯৮।

৫) যতীন সরকার, *সত্যেন সেনের ঐতিহাসিক উপন্যাস*, মুক্তপ্রাণ সত্যেন সেন (প্রবন্ধ সংকলন), সম্পদক -- নেই (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী ,১৯৮০), পৃ. ৩৯।

৬) হায়াৎ মামুদ ও মফিদুল হক (সম্পাদক), *সত্যেন সেন রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত; পৃ.৩৫। এর পর রচনাসমগ্রের এই খণ্ড থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পাশে শুধু পৃষ্ঠানম্বর উল্লেখ করা হবে।

৭) যতীন সরকার, *প্রাগুক্ত;* পৃ. ৪২।

৮) হায়াৎ মামুদ ও মফিদুল হক (সম্পাদক), *সত্যেন সেন রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, *প্রাগুক্ত;* পৃ. ৩৫৩

৯) হুমায়ুন আবদুল হাই, "পাপের সন্তান" (গ্রন্থ সমালোচনা),*বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, ১৬শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, বসন্ত : ১৩৭৮, ঢাকা; পৃ. ১৪১।

১০) হায়াৎ মামুদ ও মফিদুল হক (সম্পাদক), *প্রাগুক্ত*, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৩।

১১) সত্যেন সেন, *পাপের সন্তান* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৪)। লেখকের শিরোনামহীন ভূমিকা। এর পর এই উপন্যাস থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পাশে শুধু পৃষ্ঠানম্বর উল্লেখ করা হবে।

১২) উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, *সাহিত্যের রূপ-রীতি* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৫), পৃ. ৫২।

১৩) যতীন সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬।

১৪) হায়াৎ মামুদ ও মফিদুল ইসলাম (সম্পাদক), *সত্যেন সেন রচনাসমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. পনেরো। সরদার ফজলুল করিম লিখিত 'ভূমিকা'।

১৫) মার্কস-এঙ্গেলস, *ধর্ম প্রসঙ্গে* (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮১), পৃ. ১৪৬।

১৬) মনসুর মুসা, *পূর্ব বাঙলার উপন্যাস* (ঢাকা: পূর্বলেখ প্রকাশনী, ১৯৭৪), পৃ. ৩৮।

১৭) যতীন সরকার, *প্রাগুক্ত;* পৃ. ৪৭।

১৮) সৈয়দ আকরম হোসেন, "বাংলাদেশের উপন্যাস : আঙ্গিক বিবেচনা", *উত্তরাধিকার*, এপ্রিল-জুন ১৯৮৭, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ৯ম সংখ্যা ১৪০৮

চল্লিশের দশকে রচিত বাংলাদেশের ছোটগল্পে সমাজবাস্তবতা

সরিফা সালোয়া ডিনা*

Abstract: The development of the Bengali short story gained its individual character during the 1940s. The short stories of this period depict the contemporary socio-economic condition as well as the day-to-day life of the middle and lower-middle classes of the Muslim community. Other thematic concerns of the period include: loss of cultural conciousness, degeneration of human values and the resultant religious bigotry and prejudices. The negative aspects of the restless political scenario of the times such as meaninglessness of existence, discrimination between the rich and poor, communal riots and natural disasters like famine, plague, etc. are also well documented in the short stories of the decade.

চল্লিশের দশকের ছোটগল্প বহন করেছে তৎকালীন রাষ্ট্রিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার উত্তরাধিকার। এ সময়ের অধিকাংশ লেখক মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় তাঁদের অনেকের রচনাতেই পূর্ববঙ্গীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন-পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজজীবনের ছবি অঙ্কিত হয়েছে। মধ্যযুগীয় সামন্তমূল্যবোধ মানুষের ব্যক্তিক-সমষ্টিক জীবনকে এ কালেও কঠোর নিগড়ে শৃঙ্খলিত করেছে, কুসংস্কারের কাছে পরাজিত হয়েছে নবজাগ্রত মানবীয় মূল্যবোধ—এ সময়ের গল্পে ইত্যাকার ছবি প্রস্ফুটিত। আবু জাফর শামসুদ্দীন, শওকত ওসমান, আবু রুশ্‌দ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম চল্লিশের দশকের প্রধান গল্পকার রূপে শনাক্ত হলেও আবুল মনসুর আহমদ, মাহবুব-উল-আলম, মতিনউদ্‌-দীন আহমদ, আবুল ফজল, মবিনউদ্‌দীন আহমদ, সিকান্দার আবু জাফর, সোমেন চন্দ, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ এ সময়ের উল্লেখযোগ্য গল্পকার হিসাবে বিবেচিত। এঁদের অনেকের এ সময়ের পত্র-পত্রিকায় গল্প প্রকাশের সূচনা হয়েছে বা প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দু-একজনের গল্পগ্রন্থ বা গল্প কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হলেও গল্পচর্চায় তাঁদের সরব উপস্থিতি চল্লিশের দশককে ঘিরেই আবর্তিত। সর্বোপরি, এ সময়ের যুগবৈশিষ্ট্য ও গল্পাঙ্গিক বোধকরি, এঁদের সবার গল্পে সম্যকরূপে প্রতিফলিত।

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ। ব্যঙ্গাত্মক গল্প লিখে তিনি সমকালে প্রশংসিত হয়েছেন। সমাজের বিচিত্র মানুষ ও তাদের বৈচিত্র্যময় কার্যকলাপ, ভণ্ডামি, মূর্খতা, ব্যভিচার, অত্যাচার তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এড়ায়নি। অসৎ রাজনীতিবিদ ও কপট সমাজসেবকের ব্যক্তিস্বার্থরক্ষা, নির্বাচনের প্রহসন, তোষণনীতি, মোল্লা-মৌলভিদের হীনমন্যতা, কুৎসা রচনা, ইসলামি শিক্ষার নামে প্রগতির বিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িক কলহ সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয় বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে তাঁর গল্পদেহে সংযোজিত। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলো হলো : আয়না (১৯৩৫), ফুড কনফারেন্স (১৯৪৪), আসমানী পর্দা (১৯৬৩), আবেহায়াত (১৯৬৮)। 'আয়না' গল্পগ্রন্থের মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গ-ধারার গল্পকার হিসাবে আবুল মনসুর আহমদের আত্মপ্রকাশ। 'হুযুর-কেবলা', 'গো-দেওতা-কা-দেশ', 'নায়েবে নবী', 'লীডরে-কওম', 'মুজাহেদীন', 'বিদ্রোহী-সংঘ', 'ধর্মরাজ্য'—এই সাতটি গল্প নিয়ে প্রণীত 'আয়না' গ্রন্থে বিদ্যমান মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ভণ্ডামি-গোঁড়ামি, কুসংস্কার অসামান্য দক্ষতায় উপস্থাপিত হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) 'আয়না' গ্রন্থের মুখবন্ধে যথার্থ বলেছেন :

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

> ভাষার কান মলে রস সৃষ্টির ক্ষমতা আবুল মনসুরের অসাধারণ। এ যেন পাকা ওস্তাদী হাত। আবুল মনসুরের ব্যঙ্গের একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, সে ব্যঙ্গ যখন হাসায় তখন হয় সে ব্যাঙ। কিন্তু কামড়ায় যখন, তখন হয় সে সাপ; আর সে কামড় গিয়ে যার গায়ে বাজে তার মুখের ভাব হয় সাপের মুখের ব্যাঙের মতই করুণ।[১]

প্রকৃতপক্ষে, আবুল মনসুর আহমদের রচনায় বিদ্যমান সমাজের মানুষের দ্বৈতরূপ তথা মুখোশধারী মানুষের অন্তর-বাহিরের রূপ-বৈসাদৃশ্য সার্থকভাবে উন্মোচিত হয়েছে।

'ফুড কনফারেন্স' গল্পগ্রন্থের বিষয়-বিন্যাসের ক্ষেত্রেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। তবে এখানে ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ীর বদলে ভণ্ড রাজনীতিবিদের চরিত্র উন্মোচিত। গ্রন্থের 'ফুড কনফারেন্স', 'লঙ্গর খানা', 'রিলিফ ওয়ার্ক', 'জনসেবা য়ুনিভার্সিটি' প্রভৃতি গল্পে ভণ্ড রাজনীতিবিদের মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের সম্যক পরিচয় উপস্থাপিত। দরিদ্র জনসাধারণের উপকারের নামে, দরিদ্রতার সুযোগে স্বীয় পকেট ভারী করা এক শ্রেণীর ভণ্ড রাজনীতিবিদের চরিত্রের মুখোশ খসে পড়েছে এসব গল্পে। গল্পগুলোর বিষয় প্রায়শ এক। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সাহিত্য সৃষ্টির ফলে ব্যঙ্গ প্রকাশিত হলেও শিল্পরূপ অনেকাংশেই ব্যাহত হয়েছে। ছোটগল্পের ব্যঞ্জনাময় ও ইঙ্গিতপূর্ণ প্রকাশ না থাকা সত্ত্বেও তিনি সমকালে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এর কারণ উদ্‌ঘাটন করে সমালোচক বলেন :

> অভিজ্ঞতা কিংবা অন্তর্দৃষ্টি কোনটারই অভাব ছিলো না আবুল মনসুর আহমদের। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো পরিমিত সৃজনশীল ক্ষমতা; রচনার উৎস হিসেবে তাঁর উৎসাহ যুগিয়েছে বিচিত্র মানুষ ও তাদের অদ্ভুত সব ক্রিয়াকাণ্ড।[২]

বাংলাদেশের ছোটগল্পের রূপনির্মিতিতে আবুল মনসুর আহমদের স্থান ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক রূপে পরিগণিত। সমকালীন সমাজব্যবস্থায় দুঃসাহসিকতার সাথে তিনি ভণ্ড সাধু ও ভণ্ড রাজনীতিবিদের চরিত্র উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছেন একথা অনস্বীকার্য।

মাহবুব-উল-আলম (১৮৯৮-১৯৮১) গ্রামীণ জীবনের রূপকার হিসাবে আবির্ভূত হন। ধর্মান্ধতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, আর্থ-সামাজিক দৈন্য তাঁর গল্পের মুখ্য বিষয়। সাহিত্যের নানা শাখায় পদচারণাকারী মাহবুব-উল-আলমের গল্পগ্রন্থ দুটি যথাক্রমে, 'তাজিয়া' (১৯৪৬) এবং 'পঞ্চঅন্ন' (১৯৫৩)। তাঁর 'মফিজন' (১৯৪৬) এবং 'গাঁয়ের মায়া' (১৯৪৯) গ্রন্থ দুটি মূলত, দুটি বড় গল্প। 'মফিজন' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নির্মিত। নিরীক্ষাধর্মী এ গল্পে জৈবিকতা, আদিমতা প্রধান রূপে অবলম্বিত। সমকালে এটি প্রশংসনীয় হয়েছিল এর গাল্পিক সুদৃঢ় কাঠামো, সাবলীল বর্ণনাভঙ্গি, শব্দসৃজনের বাঙ্ময় কারুকার্যতার কারণে। 'গাঁয়ের মায়া'-তে মাহবুব-উল-আলমের পল্লীপ্রেমের ছবি অঙ্কিত। গ্রামের সহজ সরল জনমানুষের জীবনযাত্রা, প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় অনুষঙ্গ গল্পটিতে অনুপ্রবিষ্ট।

'তাজিয়া' গল্পগ্রন্থের 'তাজিয়া', 'কোরবানী', 'ঈদ', 'আনব্যালেন্‌সড' শীর্ষক চারটি গল্পে পল্লীপ্রকৃতির চিত্র ছাড়াও মুসলিম সমাজের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনে গ্রাম্য দলাদলি, সংকীর্ণতা, ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিস্ফুট। 'তাজিয়া' গল্পের নামকরণ থেকে স্বভাবতই মনে আসে মুসলিম সমাজের মহরম-পর্ব উপলক্ষে নির্মিত তাজিয়ার অনুষঙ্গের কথা। ফোরাত নদীতীরে কারবালা প্রান্তরে সংঘটিত বীরোচিত মহিমা আর বিষাদের কাহিনী এ গল্পের অনুপ্রেরণা। ইসলাম ধর্মের ইতিহাসে সখিনা ও কাশেমের প্রণয় এবং ত্যাগের মহিমা, হোসেনের মৃত্যু মহরম-পর্ব বলে চিহ্নিত। গল্পের খলিল ওস্তাদ প্রতিবছর তাজিয়া নির্মাণ করে। তবে প্রায়শ তাজিয়া নির্মাণকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজে দলাদলি, সংঘাত, ঈর্ষা-রেষারেষি থেকে দাঙ্গা পর্যন্ত সংঘটিত হয়। দরিদ্র খলিল ফি-বছর তাজিয়া নির্মাণে প্রদর্শন করে চরম কুশলতা। একবার নিঃস্ব খলিলের স্ত্রীর চূড় বিক্রয় করে নির্মিত হয় তাজিয়া। প্রতিবেশী গ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সাথে তাজিয়া নির্মাণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হলে খলিল ওস্তাদ মৃত্যুবরণ করে। হানাহানি, গ্রাম্য দলাদলি বিষয় হিসেবে নতুন না হলেও মুসলিম সমাজের ধর্মাচরণের সংকীর্ণ দিক চিত্রায়ণে মাহবুব-উল-আলম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ধর্মবিধি পালনের অন্ধত্ব মানুষের কল্যাণ নয় অকল্যাণবাহী—এ তত্ত্বপ্রণোদিত লেখকের এ গল্প আঙ্গিক-নৈপুণ্য প্রদর্শনে অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছে। গল্পে

অনেক অসঙ্গতিপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ ছাড়াও অবান্তর চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষণীয়। তবে আবেগময় বর্ণনায় লেখকের পটুত্ব অনস্বীকার্য। 'কোরবানী' মাহবুব-উল-আলমের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ গল্প। গল্পটিতে মুসলিম-পর্ব ঈদ-উল-আজহায় পশু কোরবানির প্রতীকে ত্যাগের মহিমা প্রকাশিত হয়েছে। অপরিসীম স্নেহ-মমতার গৃহপালিত পশু কোরবানি করে ত্যাগের মহিমা প্রচারই এর মূল উদ্দেশ্য। গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে রচিত 'কোরবানী' গল্পে মূক পশু 'মুন্না'কে কোরবানী দেওয়ার কাহিনী উপস্থাপিত। রমিজ 'মুন্না'কে অপত্যস্নেহে বড় করে তুললেও গ্রাম্য সালিসের বিচারে মুন্নাকে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। তবে পরবর্তী সময়ে কোরবানির জন্য বাড়ির লোকজন মুন্নাকে কিনে আনে। ঈদের দিন মুন্নাকে দেখে চিনতে পারলেও রমিজের কিছুই করার থাকে না। ফলে রমিজের হৃদয় অপত্যস্নেহে হাহাকার করে ওঠে। পোষা জীবজন্তুর প্রতি মানুষের বাৎসল্য স্নেহই গল্পের অবলম্বন এবং এই বাৎসল্য স্নেহের রূপটি আশ্চর্য তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে গল্পে প্রবিষ্ট।

হৃদয়বেদ্য, ব্যঞ্জনাময় ও জীবনরসে সমৃদ্ধ এ গল্প স্বভাবতই স্মরণ করিয়ে দেয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) 'মহেশ' গল্পটিকে। গফুর ও রমিজের পোষা প্রাণীর প্রতি অপত্যস্নেহের ধরন স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অভিন্ন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০০-১৯৬৭) 'পুষি' ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৩-১৯৩২) 'আদরিণী' এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে খ্যাত। 'কোরবানী'র গল্পভাষা, বর্ণনা কুশলতা; সর্বোপরি গতিময়তা সৃষ্টিতে লেখকের দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়।

'ঈদ' ধর্মীয় উৎসব অবলম্বনে রচিত। মুসলিম সম্প্রদায়ের জীবনের বৃহৎ উৎসব ঈদ খুশির বারতা বয়ে আনে। ধনী-গরিবের ভেদাভেদ ভুলে খুশির আনন্দে মেতে ওঠাই এ উৎসবের লক্ষ্য। কিন্তু সমাজের উঁচুতলার মানুষের অন্যায়-অবহেলা সবসময়ই যে দুর্বল-দরিদ্রের প্রতি তা এ গল্পে সমবেদনার সাথে প্রকাশিত। উপরন্তু, ভণ্ডামির মধ্য দিয়ে ধর্মব্যবসা করেও ধূর্ত ব্যক্তিরা যে আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে তাও সূক্ষ্ম ব্যঙ্গরসের মাধ্যমে উপস্থাপিত। গ্রামে বসবাসকারী দরিদ্র রফিজের বাবাকে ভাগ্যান্বেষণে নানা স্থানে ঘুরতে হয়। অপরদিকে রফিজের জ্যাঠা নানা স্থানে ভাগ্যান্বেষণে ঘুরে অবশেষে আরব থেকে নিয়ে এলেন একটি 'উট'। অজ্ঞ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীর নিকট 'উটপীর'কে দেখিয়ে তিনি ধর্মব্যবসায় মেতে ওঠেন। গ্রামবাসীর ধারণা এই উট 'পয়গম্বর না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে ভক্তি করিলে সে-ভক্তি যে রসূল পর্যন্ত গিয়া পৌঁছে'[৩]; তার কারণ, রসূলের বাহন ছিল উট। আর এই ভীতিবিমিশ্র শ্রদ্ধা-ভক্তির কারণে রফিজের ঈদের লুঙ্গি কেনার টাকা উটপীরের নজরানা হিসেবে দিতে হয়। ফলে অর্ধনগ্ন রফিজ ঈদের নামাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না। 'ঈদ' গল্পটিতে লেখকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির একটি বলিষ্ঠ পরিচয় মেলে। একটি দুঃস্থ পরিবারের মাতাপুত্রের জীবনে ঈদের আগমনে আনন্দ বেদনার যুগল সম্মিলন লেখক দেখাতে সক্ষম হয়েছেন।'[৪] তিনি সূক্ষ্ম ব্যঙ্গরসের মাধ্যমে ধর্মব্যবসায়ীদের মুখোশ উন্মোচনে সচেষ্ট হয়েছেন।

'আনব্যালেন্‌স্‌ড' গল্পে 'তাজিয়া' গ্রন্থের অন্যান্য গল্পের মতই দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ধর্মীয় অনুষঙ্গ তথা বিশেষ কোনো ধর্ম-সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গ এ গল্পে ব্যবহৃত হয়নি। তবে এ গল্পে সুদখোর মহাজনের কৌশলী শোষণে গ্রামের দরিদ্র ব্যক্তিদের ভিটে ছাড়া হওয়ার প্রসঙ্গ বিধৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে আবু ইসহাকের (১৯২৬-) 'জোঁক' গল্পেও অনুরূপ সুদখোর মহাজনের শোষণ-নিপীড়নের প্রতিচ্ছবি পরিদৃষ্ট হয়। বলা যায়, বিষয় নির্বাচন ছাড়াও 'আনব্যালেন্‌স্‌ড' গল্পে মাহবুব-উল-আলম শিল্প সৌকর্যের সার্থক প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে, মাহবুব-উল-আলমের গল্পের কাহিনী দরিদ্র মানুষের জীবনকেন্দ্রিক। তাঁর গল্পের চরিত্রেরা বাস করে গ্রামে, কথা বলে সহজ সাবলীল স্বাভাবিক ভঙ্গিতে এবং সবাই সবল ব্যক্তি কর্তৃক নির্যাতিত, নিষ্পেষিত। প্রায় প্রতিটি গল্পেই তিনি ধর্মীয় অন্ধতা-কুসংস্কার-পীরবাদ প্রভৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার সচেতন প্রয়াস চালিয়েছেন। বিষয়-বিন্যাসের সাথে ভাষাবিন্যাস ও বর্ণনাভঙ্গিতে প্রবহমানতা সৃষ্টি লেখকের দক্ষতার পরিচায়ক। মাহবুব-উল-আলমের সাহিত্যরচনাকাল বাংলাদেশের সাহিত্যে মুসলিম লেখকদের উন্মেষকাল। সে কারণে এক ধরনের সীমাবদ্ধ ও প্রতিকূল সমাজজীবন থেকে উঠে আসা মাহবুব-উল-আলমের গল্পে কিছু অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। 'ভাষায়, বিবৃতিতে, চরিত্রাঙ্কনে কিংবা সমাজ বীক্ষণে মাহবুব-উল-আলম তাঁর

ছোটগল্পে কোনো উচ্চতর সাহিত্য-ধারণার বিকাশ সাধন করতে পারেননি, অভিজ্ঞতা ব্যাপক থাকলেও সে অভিজ্ঞতা তাঁর আঞ্চলিক সংকীর্ণতার মধ্যেই উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। ছোটগল্পের শিল্পরূপে যে ইঙ্গিতময়তা, সেই অনন্য বৈশিষ্ট্যও তাঁর গল্পের শেষ পরিণতিতে প্রায় দেখা যায় না।'[৫] তদুপরি, পল্লীজীবন, গ্রামীণ জীবনের ঈর্ষা-দলাদলি-রেষারেষির কারণ অনুসন্ধান ও তা চিত্রায়ণে সার্থক প্রয়াসী মাহবুব-উল-আলম মাটি-মানুষ ও প্রকৃতির গল্পকার হিসাবেই স্বীকৃত।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণকারী মতিনউদ্-দীন আহমদের (১৯০০-১৯৮০) বেশ কিছু ছোটগল্প ত্রিশের দশকে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'স্বপ্নাদ্য সিংহাসন', 'ছাপান্ন সেকেণ্ড গতে', 'বিশ্বাস না হয় হিসাব করো', 'ছেলেবেলা', 'পঞ্জিকা সংস্কার', 'বরের অভিশাপ', 'কুবলাং' প্রভৃতি গল্প রচনা করে তিনি সমকালে খ্যাতি অর্জন করেন। এছাড়া পরবর্তীকালে 'মাহে নও' ও 'লেখক সংঘ' পত্রিকাতেও তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়। বিভাগ পূর্বকালে তথা চল্লিশের দশকে কলকাতা থেকে 'চেরাগ' শীর্ষক একটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশের কথা জানা গেলেও গ্রন্থটি পাওয়া যায় না; এমনকি গ্রন্থটি প্রকাশের সমর্থনে যথার্থ প্রমাণাদিরও অভাব রয়েছে।[৬] তবে এটা নিশ্চিত, ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'চালাক হওয়ার পয়লা কেতাব' (১৯৫৮)। এটি শিশুপাঠ্য উপদেশমূলক গ্রন্থ। নামকরণ দেখে গ্রন্থটিকে 'রস-রচনার সংকলন' মনে হলেও মূলত এটি মনন সমৃদ্ধ রচনা-সম্ভার। তাঁর প্রকাশিত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ গল্পগ্রন্থ 'তিন চেরাগ তিন শামাদান ফাউ' (১৯৬৪)। গ্রন্থটি হাস্যরসাত্মক সাতটি রচনার সমাহার। এ গ্রন্থের সবচেয়ে প্রশংসিত গল্প 'এজমালী উপন্যাস'। এতে তাঁর রচনা কুশলতার সম্যক ধারণা মেলে। বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী মতিনউদ্-দীন আহমদের সাহিত্যে স্বভাবসুলভ রসিকতা, রঙ্গ-ব্যঙ্গ প্রকাশিত। গল্প রচনার কারণ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য :

> গল্প লিখতে গিয়ে মনে হল দুঃখের পশরা ভরা এই জীবনে যদি কোথায়ও একটা আনন্দের মাল যোগান যায় তা হলেও বা মন্দ কি ? কলম বলে আমিও রাজি। পোড়া লোহা দিয়ে গায়ে ছিদ্র করে নিজের ব্যথা নিজের মনের বোরকার আড়ালে লুকিয়ে রেখে বাঁশিতে বাজাই মিষ্টি হাসির সুর।[৭]

তবে তাঁর দীর্ঘ বর্ণনা গল্পের পাত্র-পাত্রীদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন করেছে এবং ছোটগাল্পিক ব্যঞ্জনা আনয়নে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। তদুপরি তাঁর অনাড়ম্বর ভাষায় মৌলিক বিষয় উপস্থাপনের সৃজনশীলতা বাংলাদেশের সাহিত্যের পথ-নির্মাণে পালন করেছে সহায়ক ভূমিকা।

'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) তাঁর গল্পসাহিত্যে প্রতিফলিত করেন প্রগতিশীল সমাজচেতনা, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের ভাবালুতা, স্বপ্নকাতরতা প্রভৃতি বিষয়। তাঁর সাহিত্যিক মানসগঠনে 'কল্লোল' (১৯২৩) 'সওগাত' প্রভৃতি পত্রিকার ভূমিকা অনন্য। 'মাটির পৃথিবী' (১৯৪০) চল্লিশের দশকে প্রকাশিত তাঁর একমাত্র গল্পগ্রন্থ। বলা বাহুল্য, বিশের দশক থেকেই পত্র-পত্রিকায় তাঁর সরব উপস্থিতি। আবুল ফজলের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'একটি আরবী গল্প' ১৩৩০ সালে 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৮] পরবর্তীকালে রচিত 'আয়ষা' (১৩৫৮), 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৩৭১), 'স্মৃতির আত্মহত্যা' (১৯৭৮) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে তাঁর পরিশীলিত উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। 'মাটির পৃথিবী', 'আয়ষা', 'একখানি হাসি', 'হাকিম', 'পরদেশিয়া', 'জয়', 'জনক', 'সংস্কারক', 'ল্যাঠ্যৌষধ', 'আলোছায়া', 'শরীফ', 'আহমদ', 'রহস্যময়ী প্রকৃতি', 'নবাব-আমির-বাদশা', 'চোর', 'পরিণাম' এবং 'দুই রাত্রি' এই সতেরোটি গল্পের সমষ্টি 'মাটির পৃথিবী' গল্পগ্রন্থ। পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'শ্রেষ্ঠ গল্পে' 'আয়ষা' গল্পটি 'মা' নামকরণে সংকলনভুক্ত হয়। সমাজ ও সময় সচেতন কথাকার আবুল ফজলের ছোটগল্পে সমাজ-নিরীক্ষা, যুগ-জিজ্ঞাসা, উপযুক্ত নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণভঙ্গি প্রকাশিত। সে কারণে তাঁর গল্পে মুসলমান সমাজের তিরিশ থেকে পঞ্চাশের দশকের মৌল প্রবণতা দৃষ্টিগ্রাহ্য। এ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ভাবনা নিম্নরূপ :

> আমার অন্যান্য লেখার মতো এ লেখাগুলিতেও আমাদের সামাজিক বিবর্তনেরও কিছুটা ছায়াপাত ঘটেছে এবং কোন কোন গল্পে তা গল্পের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে। শুধু গল্পের খাতিরে গল্প আমি খুব বেশী লিখিনি। সাহিত্যের যে এক বিশেষ সামাজিক ভূমিকা আছে গোড়া থেকেই এ ধারণা আমার বদ্ধমূল। ব্যক্তি ও সমাজকে ব্যবহারিক জীবনে, দৈনন্দিন অভ্যস্ত চোখ দিয়ে যেটুকু দেখা বা জানা তা নেহাৎ খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন। সাহিত্য আর শিল্পের আলোয় জানাই হচ্ছে যথার্থ জানা।[৯]

আবুল ফজলের এ বক্তব্যে তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার সাহিত্যিক রূপায়ণে শিল্পীর দায়িত্ববোধ প্রকাশিত।

জনজীবনের সার্থক রূপকার আবুল ফজলের গল্প বিষয়-বৈচিত্র্যে অনন্য। সমাজজীবনের নানাবিধ সমস্যা যেমন—ধর্মীয় কুসংস্কার-গোঁড়ামি-পশ্চাৎপদতা, দাম্পত্য জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত-প্রেম, জটিল মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা তথা মানব মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য উন্মোচন-প্রয়াস প্রভৃতি বিষয়রূপে সন্নিবিষ্ট হয়েছে আবুল ফজলের গল্পে। এ গ্রন্থের 'মাটির পৃথিবী' গল্পে একটি বিশেষ অঞ্চলের গ্রামীণ সমাজজীবনের, বিশেষত শিক্ষার আলো বঞ্চিত দরিদ্র ও অন্ধ-সংস্কার-জর্জরিত জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গল্পের প্রথমাংশে সামাজিক জটিলতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংকুল পরিবেশে শাশুড়ি-পুত্রবধূর একঘেঁয়ে সনাতন ঝগড়ার বর্ণনা গল্পটিকে ক্লিশে করে তুলেছে। তবে শেষাংশে এসব জটিলতাকে উপেক্ষা করেও স্নেহবৎসল মাতৃহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে গল্পের শিল্পসৌকর্য। একই সাথে নিম্নবিত্ত, অশিক্ষিত, কুসংস্কারদীর্ণ, মুসলিম সমাজের সামগ্রিক জীবনচিত্র অঙ্কনে এবং আঞ্চলিক ভাষায় সংলাপ সৃজনে আবুল ফজলের ক্ষমতা অসাধারণ। সে কারণে ছলিমন, তজু, ফুলজানের মা, তজুর মা, তজুর স্ত্রী প্রভৃতি চরিত্র বিশেষত তজুর স্ত্রী খাতুন চরিত্র গল্পে উজ্জ্বল রূপে সংস্থাপিত। 'আয়ষা' গল্পটি 'মাটির পৃথিবী' ও 'আয়ষা' গ্রন্থে 'আয়ষা' নামে পরিচিত হলেও 'শ্রেষ্ঠ গল্পে' তা 'মা' নামকরণে অন্তর্ভুক্ত হয়। দরিদ্র নিম্নবিত্ত অশিক্ষিত গ্রামীণ জনপদে বসবাস করেও এ গল্পের 'আয়ষা' চরিত্র দৃঢ়চিত্ত ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়বাহী। নানাবিধ প্রাচীন মূল্যবোধ, পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহ, মিথ্যা আভিজাত্য ও বংশমর্যাদার অহমিকায় আক্রান্ত একটি পরিবারের সর্বস্বান্ত হওয়ার বাস্তবচিত্র গল্পে বর্ণিত। গ্রাম্য কোন্দল-দলাদলি-প্রতিশোধস্পৃহা, কৌলীন্য প্রথার সমান্তরালে বাঙালি নারীর শাশ্বত মাতৃরূপ ও স্বামীর প্রতি সততা-একনিষ্ঠতা এ গল্পে প্রকাশিত। তৎকালীন মুসলিম সমাজপতিদের প্রদত্ত 'ফৎওয়া' জর্জরিত গ্রামীণ সমাজজীবনের প্রকৃতরূপ উন্মোচনে লেখকের প্রচেষ্টা এখানে লক্ষণীয়। ধর্মের নামে তাদের ফতোয়াবাজির নমুনা নিম্নরূপ :

> তাহারা আশে পাশের প্রায় দশটি গ্রামের মৌলবী হইতে দস্তখত করাইয়া আনিল— হামিদ তালাক দেওয়া বৌ লইয়া ঘর করিতেছে, তাহাকে একঘরে করা প্রত্যেক মোমিন মুসলমানের কর্তব্য।. . .
>
> হামিদকে তালুকদারীর অবশিষ্টাংশ বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে হইল। তারপর সেই অঞ্চলের বড় মৌলবী সাহেবকে পঞ্চাশ টাকা নজর দিয়া সে তাহার হাল খুলিয়া বলিল— তিনি ফৎওয়া লিখিয়া দিলেন তাহার বিবি তালাক হয় নাই এবং দশ পনর জন মৌলবী হইতে এই মর্মে দস্তখৎ করাইয়া দিলেন।
>
> দুইদিকের দুই ফৎওয়া, গ্রামবাসীরা মহাবিপদে পড়িল— তাহারা কোন ফৎওয়ার হুকুম মানিবে।[১০]

'আয়ষা' তথা 'মা' গল্পে চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনজীবনের রেখাচিত্র বিধৃত। গল্পকার এ পরিবেশে ও আঞ্চলিক কথ্যভাষায় সংলাপ সৃজনে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'একখানি হাসি' গল্পের প্রধান অবলম্বন তির্যক ব্যঙ্গরস। রফিক মাস্টার উচ্চশিক্ষিত, পেশায় শিক্ষক অথচ আত্মঅহংকারী। তার ক্লাশের লাজুক ছাত্র মনিরের ঈষৎ বঙ্কিম হাসি তাকে পীড়া দেয় এবং এই হাসিজনিত পীড়া তার মানসিক বৈকল্য ঘটায়। ফলে সে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্রমেই অন্তর্গত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে জর্জরিত হতে থাকে। একসময়ে চিত্ত-দৌর্বল্য তার অন্তর্দ্বন্দ্বকে জয়ী করে এবং সে কর্মস্থল থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। গল্পটি যথেষ্ট সংহত এবং ছোটগল্পের যথার্থ পরিণামবাহী। লেখকের নিপুণ বর্ণনায় একখানি বঙ্কিম হাসির ট্র্যাজিক পরিণতি গল্পটিকে প্রাণস্পর্শী করে তুলেছে।

মানবজীবনের বিচিত্রকর্ম, দুর্জ্ঞেয় মন-রহস্য এবং প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'রহস্যময়ী প্রকৃতি' গল্পের কাহিনী। গল্পটি আবাল্য হাঁপানি রোগাক্রান্ত ফুলির উপেক্ষিত-অত্যাচারিত জীবনকথার সফল চিত্রায়ণ। সুস্থ দেহ-মন নিয়ে ফুলি বেড়ে ওঠেনি বলে চতুর্থ স্ত্রীরূপে বিপত্নীক বসিরের সাথে তার বিয়ে হয়। চতুর্থ স্ত্রীর এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যুর পর পঞ্চম স্ত্রী দীর্ঘজীবী হবে—জ্যোতিষীর এরূপ ভবিষ্যৎবাণী বিশ্বাস করে বসির রোগাক্রান্ত ফুলিকে বিয়ে করে। প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে কোনো চিকিৎসা ছাড়াই ফুলি সুস্থ হয়ে ওঠে। এ গল্পে হতাশার অন্তরাল থেকে জীবনের ধনাত্মক দিকে উত্তরণের লক্ষ্যে জীবনবাদী আবুল ফজল মানবসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, 'এ গল্পে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলের

জীবনচর্যা ও জীবনচর্চা প্রতিফলিত হয়েছে। তখনকার গৃহস্থ ঘরে দীন নিরন্ন সংসার, তাদের সংস্কার, দৈনন্দিন জীবন যাপনের উজ্জ্বল বর্ণনা— গল্পের ভাবমূর্তিকে সমৃদ্ধ করেছে।'[১১] গল্পের কাহিনী বুননে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গরসকে করুণরসে প্রবাহিত করে তিনি দান করেছেন উজ্জ্বল মিলনান্তক পরিণতি। এ গল্পে ছোটগাল্পিক সংহতি ও ইঙ্গিতময়তা এবং চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার সর্বোত্তম ব্যবহার লক্ষণীয়। 'মাটির পৃথিবী' গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পই শিল্প-সফল। গ্রামীণ জীবনের সফল রূপকার আবুল ফজলের গল্পে স্থান পেয়েছে লৌকিক ও সামাজিক নানা পার্বণ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং লোকজ জীবনযাত্রার চিত্র। এ গ্রন্থের কোনো গল্পে সূক্ষ্ম রঙ্গ-ব্যঙ্গ এবং কোন গল্পে গভীর জীবনবোধ প্রবিষ্ট করে তিনি মূলত মুসলিম সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্নতা উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছেন। 'মাটির পৃথিবী' গ্রন্থ সম্পর্কে লীলা রায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> In Earthen World, a collection of short stories by Abul Fazal, the author shows exemplary courage in writing in the dialect of his characters, eastern Bengal Musalmans. It is strong and pungent with a raciness that is rewarding to the preserving reader for it is rough going at first to unaccustomed ears. The life of the eastern Bengal Musalman is as rich as it is untapped and the world of its women is totally unknown.[১২]

'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনে বিশ্বাসী আবুল ফজলের গল্পে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন দরিদ্র মুসলিম সমাজের জীবনচিত্রের উন্মোচন দৃষ্টিগ্রাহ্য। চল্লিশের দশকে 'শিল্পীর কৌতূহল নিয়ে নয় বরং মানবতাবাদী সমাজকর্মীর নিষ্ঠা নিয়ে তিনি একটি যুগ ও সম্প্রদায়ের জীবনালেখ্য রচনা করে খণ্ডিত জীবন চেতনায় পূর্ণতা দান করেছেন'।[১৩] এখানেই আবুল ফজলের ছোটগাল্পিক পূর্ণতা ও সার্থকতা।

পাশ্চাত্য কথাসাহিত্যের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত আবু জাফর শামসুদ্দীনের (১৯১১-১৯৮৮) সাহিত্য জগৎ গড়ে উঠেছে ধর্মনিরপেক্ষ মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন সুস্থ চেতনার ভিতের উপর। পল্লীপ্রকৃতি, দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের জীবনসংগ্রাম, নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনচিত্র তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। 'জীবন' (১৯৪৮), 'শেষ রাত্রির তারা' (১৯৬৬), 'এক জোড়া প্যান্ট ও অন্যান্য' (১৯৬৭), 'রাজেন ঠাকুরের তীর্থযাত্রা' (১৯৭৮), 'ল্যাংড়ী' (১৯৮৪) প্রভৃতি তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ। এছাড়াও 'আবু জাফর শামসুদ্দীনের শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৬২), এবং 'নির্বাচিত গল্প' (১৯৮৮) নামে দুটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। চল্লিশের দশকে প্রকাশিত আবু জাফর শামসুদ্দীনের একমাত্র গল্পগ্রন্থ 'জীবন'-এ গ্রামীণ জীবনের অভিজ্ঞতা ও জীবনাচরণের নানা সূক্ষ্ম দিক উদ্ভাসিত। প্রগতিশীল মুক্ত জীবন দৃষ্টির অধিকারী আবু জাফর শামসুদ্দীনের কথাসাহিত্যের ভিত্তি প্রোথিত ছিল জীবনের বাস্তবতায়। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য :

> কল্পনার চেয়ে বাস্তবজীবন নাকি অধিক চিত্তাকর্ষক। তাই গল্প-উপন্যাসের পটভূমি বাস্তব জীবন। কথাসাহিত্যিক রূপে স্বদেশ তার মানুষ, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সাংস্কৃতিক জীবনের প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেছি।[১৪]

এ গ্রন্থের নামগল্প 'জীবন'-এ লেখকের শৈশব-জীবনের বিশেষ কিছু স্মৃতি বিধৃত। বয়োধর্মের কারণে শৈশবে কিশোর-লেখকের ভালো লেগেছিল এক বৈরাগী-দম্পতি ও তাদের মনোমুগ্ধকর গান। বিশেষত বৈরাগিনীর 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী' লেখককে স্বপ্নাতুর করেছে। তাঁর ভাষায়, 'কাঁচা হরিদ্রার বর্ণ, লম্বা চুল—আজানুলম্বিত। দীর্ঘ হস্তদ্বয়—সর্বোপরি উদ্ভিন্ন যৌবন-ভারাতুর ছিল তার দেহ। জল যখন তুলতো, দূরে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকতাম—মনে হতো স্বপ্ন দেখছি।'[১৫] কালের আবর্তনে জীবন-সংগ্রামে জর্জরিত প্রৌঢ় বৈরাগী-দম্পতিকে দেখে যুবা-লেখক পূর্বতন স্বপ্ন কল্পনায় স্থিত থাকতে পারে না। জীবন ও বয়সের এই পরিবর্তিত রূপ, সর্বোপরি সৌন্দর্যের পরিবর্তন দেখে তিনি বিস্মিত। পার্থিব জগতের পরিবর্তনশীলতা চিরচলিষ্ণু—স্মৃতিচারণের আড়ালে এই মর্মকথা 'জীবন' গল্পে প্রকাশিত। স্মৃতিকথা বর্ণিত হলেও গল্পের গাঁথুনি শিথিল নয়। এ গ্রন্থের 'তালাক' গল্পের বিষয় সাদামাটা—নিম্নবিত্ত মুসলিম সমাজের জীবনযাত্রা এবং ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ীদের গোঁড়ামি এখানে চিত্রিত। ক্ষুধার্ত ও ক্রোধে উন্মত্ত আইজদ্দিন মুহূর্তের ভুলে স্ত্রীকে তালাক দিলে

গ্রাম্য শালিস-ফতোয়ার শিকারে পরিণত হয়। পল্লীর আনাচে কানাচে ছড়ানো কথিত এই ধর্মীয় বিধির নির্মমতা-নিষ্ঠুরতা সমাজ সচেতন শিল্পী আবু জাফর শামসুদ্দীনের গল্পে বাস্তব-বীক্ষায় রূপায়িত। উল্লেখ্য, আবুল ফজলের 'মা' গল্পেও অনুরূপ ঘটনা চিত্রিত। 'উঙ্গিল গোশত' গল্পে ধনী-নির্ধনের সামাজিক বৈষম্য বিষয়রূপে উপজীব্য। হতদরিদ্র দিনমজুর কাবিলের কনিষ্ঠ কন্যা জরিনা বায়না ধরে 'উঙ্গিল গোশত' বা 'মুরগীর গোশত' খাওয়ার জন্য। দরিদ্র কর্মচ্যুত কাবিল বা তার স্ত্রী কিছুতেই পারে না কন্যার বায়না মেটাতে। ধনী প্রতিবেশীর উচ্ছিষ্ট মুরগির হাড্ডি খেয়ে জরিনা তার 'উঙ্গিল গোশত' খাওয়ার স্বপ্ন পূরণ করে। সমাজ ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যকে তীব্র কশাঘাত হেনেছেন গল্পকার। গ্রামীণ জীবনের প্রাত্যহিকতা আবু জাফর শামসুদ্দীনের গল্পের মুখ্য উপজীব্য। গ্রামীণ জীবনের ধর্মান্ধতা, অন্ধসংস্কার, সামাজিক বৈষম্যকে চিত্রায়ণে সফল হলেও ভাষা ব্যবহারে অর্থাৎ চরিত্রানুগ সংলাপ সৃষ্টিতে অধিকাংশ সময়েই হয়েছেন ব্যর্থ। 'বিষয়াংশ ও ঘটনাবিন্যাসের প্রতি আবু জাফর শামসুদ্দীন মনোযোগী শিল্পী, কিন্তু প্রকরণ নিরীক্ষায় তাঁর সেই মনোযোগ বা সতর্কতা দুর্লক্ষ্য। প্রথাশাসিত পথেই তিনি গল্পের আঙ্গিক বিন্যাস করেছেন, নতুন নিরীক্ষায় হননি অগ্রসর। আঙ্গিকগত পরীক্ষায় তাঁর সামান্য প্রয়াসটুকুও হতে পারেনি সার্থকতাবিমণ্ডিত।'[১৬] এসব সত্ত্বেও বলা যায়, আবু জাফর শামসুদ্দীন চল্লিশের দশকে মুক্তবুদ্ধি, ধর্মনিরপেক্ষতা, উদার মানবতাবোধসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গল্প রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর গল্পের পটভূমিতে গ্রামীণ জীবনের পরিবর্তে নাগরিক জীবনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলেও মুক্ত জীবন-দৃষ্টি প্রকাশে তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ।

তিরিশের দশকের শেষে এবং চল্লিশের দশকে 'মৃত্তিকা', 'আজাদ', 'মোহাম্মদী' প্রভৃতি পত্রিকায় গল্পচর্চার মাধ্যমে সমাজ সচেতন, বাস্তব-ঘনিষ্ঠ জীবনের রূপকার হিসেবে মবিনউদ্‌দীন আহমদের (১৯১২-১৯৭৮) আবির্ভাব। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ সত্ত্বেও তিনি গল্পকার হিসেবে সমধিক খ্যাত। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা এগারো; ছয়টি শিশু পাঠ্য, দুটি উপন্যাস এবং তিনটি গল্প-সংকলন যথাক্রমে 'কলঙ্ক' (১৯৪৬), 'হোসেন বাড়ির বৌ' (১৯৫২), 'ভাঙ্গা বন্দর' (১৯৫৪)। চল্লিশের দশকে তাঁর একটি মাত্র গল্পগ্রন্থ 'কলঙ্ক' প্রকাশিত হলেও এ সময়েই গল্পকার হিসেবে তিনি সম্যক পরিচিতি লাভ করেন। 'কলঙ্ক' গ্রন্থের ছয়টি গল্প যথাক্রমে–'কলঙ্ক', 'এক জোড়া চোখ', 'ভূমিকম্প', 'ক্রিমিন্যাল', 'লিফ্‌ট' ও 'কিছুক্ষণ'। মবিনউদ্‌দীন আহমদের ছোটগল্প সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা তথা মানুষের বিভিন্ন রকম আচরণকে উপজীব্য করে গড়ে উঠেছে। নামগল্প 'কলঙ্ক'-এর মূল বিষয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত সৎ ভদ্র শিক্ষিত ভালোমানুষ কর্তৃক নারীর অবমাননা, যৌন অনাচার এবং তার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা। প্রকৃতপক্ষে, লেখক এ গল্পে তীব্র-তীক্ষ্ণ-তির্যক দৃষ্টিতে ব্যক্তি মানুষের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। গল্পের সমাপ্তিতে তিনি সচেতনভাবে নাটকীয়তা তথা ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যঞ্জনা প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছেন। সিগমন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯) ও হ্যাভলক এলিসের (১৮৫৯-১৯৩৯) উদ্ভাবিত মনোসমীক্ষণ পদ্ধতি এ শতকের তিরিশের দশকে বাঙালি কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে গুরুত্ব পেতে থাকে এবং শিল্প-সাহিত্যে তার সফল প্রয়োগ ঘটতে শুরু করে। মনোসমীক্ষণে দক্ষ মবিনউদ্‌দীন আহমদের গল্পেও মনোসমীক্ষণ পদ্ধতি তথা নরনারীর মনস্তত্ত্ব বিষয়রূপে স্থান পায়। 'একজোড়া চোখ' ও 'ক্রিমিন্যাল' গল্পে অনুরূপ বিষয়ের আশ্রয়ে চিত্রিত হয়েছে ছলনাময়ী নারী চরিত্র। এ গল্প দুটিতে তিনি সমাজে অবস্থিত ভণ্ড মুখোশধারী পুরুষ ও বিকৃতমনা নারী চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। মনোসমীক্ষণ প্রসঙ্গে তাঁর আরো দুটি গল্প 'ভূমিকম্প' ও 'হোসেন বাড়ির বৌ' স্মরণযোগ্য। মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড আডলারের একটি তত্ত্ব : লোক দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হবার সাধ মানব জীবনকে দারুণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। উল্লিখিত গল্পগুলোতে অনুরূপ তত্ত্বের ছায়াপাত ঘটেছে।

মবিনউদ্‌দীন আহমদের গল্পের পটভূমি প্রায়শ গ্রাম্য-জীবন। গ্রাম বাংলার সমাজ জীবনের নানাদিক : একান্নবর্তী পরিবারের ক্রম ভগ্নদশা, পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহ-সন্দেহ, দাম্পত্য জীবনের সংকট-সংকুলতা প্রভৃতি পূর্বাপর তাঁর সব গল্পগ্রন্থেই সন্নিবেশিত। গল্পের আখ্যানভাগ নির্মাণে, বর্ণনাকৌশলে এবং নাটকীয়তা সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা অপরিসীম। তবে কোনো কোনো গল্পে বর্ণনার আধিক্যহেতু ছোটগাল্পিক সংহতি ক্ষুণ্ন হয়েছে। তিনি সমাজ-সমীক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলেই সমাজ মানুষের মানসিক অবসাদবৈকল্যের বস্তুনিষ্ঠ চিত্র পরিবেশন করতে পেরেছিলেন। কোনো কোনো সমালোচক 'মানসিক যন্ত্রণা-বৈকল্যের রূপায়ণ'কে তাঁর

ব্যক্তিগত জীবনে দ্বিতীয় দার গ্রহণের ফলাফল বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু বিষয়টি আদৌ সে রকম নয়।[১৭] সমকালে মবিনউদ্‌দীন আহমদ যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিলেন এবং ছোটগল্পে গুরুত্বপূর্ণঅবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' (১৯৬১) লাভ করেছিলেন। কাজী আফসারউদ্‌দিন আহমদ, শামসুদ্‌দীন আবুল কালাম, আহসান হাবীব, শওকত ওসমান প্রমুখ সে সময়ে মবিউদ্‌দীনের সাহিত্যসহযোদ্ধা ছিলেন। শওকত ওসমানের দীর্ঘ স্মৃতিচারণে মবিনউদ্‌দীনের কাল ও সাহিত্যকৃতি ধরা পড়ে এভাবে:

> চল্লিশের দশক। সামাজিক-রাজনৈতিক এক বিশেষ হুল্লোড়ের কাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি ভয়ানকভাবে সক্রিয়। দুটি বড়ো পার্টি—মুসলিমলীগ ও কংগ্রেস— নানারকম রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া দিয়ে সোচ্চার। সাহিত্যেও তখন নানা শোরগোল। ইতিমধ্যে আসে 'তিতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ'। তাতে সাত লক্ষ লোক মৃত। একদিকে যুদ্ধের দৌলতে নতুন ধনিক শ্রেণীর অভ্যুদয়, অন্যদিকে গ্রামাঞ্চল গ্রামীণ কাঠামো হারিয়ে ফেলছে।
>
> সেই সময় 'আজাদ'কে ঘিরে অনেক লেখকই জমায়েত হতেন। তখন 'মোহাম্মদী'তে 'তিতাশ একটি নদীর নাম' বের চ্ছে। মবিন কখন লেখা শুরু করেন, জানা নেই। কিন্তু তাঁর গল্প 'আজাদ'-এর বিশেষ সংখ্যায়, 'মোহাম্মদী'তে, 'মদিনা'-য়, 'সওগাত'-এ বের তো। এই সব ছোটোগল্পের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য : এগুলিতে তিনি বাস্তব ও অবাস্তবের সংঘাত মারফত একটা অদ্ভুত জগৎ সৃষ্টি করতেন। তাঁর অনেক গল্প পৃথিবীর উত্তম গল্পকারদের যে কোনো সংকলনে জায়গা পেতে পারে।[১৮]

কথাশিল্পী মবিনউদ্‌দীন আহমদ সম্পর্কে এরূপ মন্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায়, বিভাগপূর্বকালে যাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে বিভাগপরবর্তী বাংলাদেশের সাহিত্যিক-পথ নির্মিত হয়েছিল তিনি সেই পথনির্মাতাদের অন্যতম।

দেশ-কাল-পাত্রের নিবিড় পর্যবেক্ষক কথাশিল্পী শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) আবির্ভাব বিভাগপূর্বকালে হলেও বিশ শতকের নব্বই দশক পর্যন্ত তিনি গল্প রচনায় নিজেকে রেখেছিলেন ব্যাপৃত। বিভাগপূর্বকালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা : 'যুগান্তর', 'আনন্দবাজার', 'অমৃতবাজার', 'আজাদ', 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড', 'সওগাত', 'কালান্তর', প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে তাঁর সাহিত্য চর্চা চলতে থাকে।[১৯] তাঁর প্রথম পর্যায়ের গল্পে প্রধানত মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক-সামাজিক সমস্যাবলি চিত্রিত। তবে তাঁর পরবর্তীকালের গল্পে নিম্নবিত্ত মানুষের ক্ষুধা-অভাব-দারিদ্র্য, যুদ্ধের অভিঘাতে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, সামাজিক অবক্ষয়-বঞ্চনা, শিক্ষার অবরুদ্ধ পরিবেশ, নারীনির্যাতন, দমন-পীড়ন, শ্রেণীচেতনা-শ্রেণীসংগ্রাম, বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক চেতনায় বিশ্লেষিত হয়েছে। বহু বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী শওকত ওসমান একাধারে ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, অনুবাদসাহিত্য, রম্যরচনা, সাহিত্যের প্রভৃতি শাখায় বিচরণ করে সৃষ্টিসাফল্য অর্জন করেছেন। তবে কথাসাহিত্যিক হিসাবে তিনি সমধিক পরিচিত। 'পিঁজরাপোল' (১৩৫৮), 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প' (১৩৫৮), 'সাবেক কাহিনী' (১৯৫৩), 'প্রস্তর ফলক' (১৯৬৪), 'উভশৃঙ্গ' (১৩৭৫), 'নেত্রপথ' (১৯৬৮), 'উপলক্ষ' (?), 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৭৪), 'জন্ম যদি তব বঙ্গে' (১৯৭৫), 'নির্বাচিত গল্প' (১৯৮৪), 'মনিব ও তাহার কুকুর' (১৯৮৬), 'এবং তিন মির্জা' (১৯৮৬), 'বিগত কালের গল্প' (১৯৮৭), 'পুরাতন খঞ্জর' (১৯৮৭), 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' (১৯৯০), 'হন্তারক' (১৯৯১), 'রাজপুরুষ' (১৯৯৪) প্রভৃতি তাঁর গল্পগ্রন্থ। গল্পসাহিত্যের এই বিপুল সম্ভারের মধ্যে চল্লিশের দশকে 'ওটেন সাহেবের বাংলো' (১৯৪৪) শীর্ষক শিশুতোষ গল্পগ্রন্থ ব্যতীত শওকত ওসমানের কোনো গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তবে এই দশককে ঘিরেই সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর স্ফূর্তি ঘটে।

শওকত ওসমানের সাহিত্যজীবন শুরু হয় কিশোর বয়সে, কলকাতার মাদ্রাসা-এ-আলিয়াতে অধ্যয়নকালে। চল্লিশের দশকে 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় শওকত ওসমানের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'সাবেরা ও একটি মোটর গাড়ী' (১৯৪১) সাহিত্যমোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করলেও 'আব্বাস' (১৯৪২) গল্পটি প্রকাশের পর তা সাহিত্যরসিকমহলে আদৃত হয়। শওকত ওসমানের ছোটগল্পে সমস্যাসংকুল মানবজীবনের নানাবিধ অসঙ্গতি ও বৈচিত্র্যময় দিক বিষয়রূপে উপস্থাপিত। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালি-জীবন এসব বিষয়ের প্রধান অবলম্বন। 'জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের 'জুনু আপা', 'সাদা ইমারত', 'নতুন জন্ম', 'গেঁহু', 'দুই চোখ কানা'

গল্পে নারীর প্রতি অত্যাচার-নিপীড়ন-অমর্যাদার চিত্র, দেশভাগের প্রেক্ষিতে রিফুজি জীবনের সার্বিক চালচিত্র ও স্বদেশের ছবি অঙ্কিত হয়েছে। 'পিঁজরাপোল' গ্রন্থের 'থুতু', 'ইলেম', 'পিঁজরাপোল', 'দাতব্য চিকিৎসালয়ের ইতিহাস', 'কাঁথা', 'আলিম', 'মুয়াজ্জিন' প্রভৃতি গল্পে দারিদ্র্যের দুঃসহ কশাঘাত, নিপীড়ন, মন্বন্তর, ঘুষ-দুর্নীতি প্রভৃতি বিষয় শওকত ওসমানের শৈল্পিক পরিচর্যায় অনন্যতা লাভ করেছে। 'সাবেক কাহিনী' গল্পগ্রন্থটি ১৯৫৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হলেও এর গল্পগুলি রচিত হয়েছিল ১৯৩৯-১৯৪৩ সময়কালে। এ গ্রন্থের 'মোজেজা', 'বকেয়া', 'ভাগাড়', 'তিন পাপী', 'সে কিরূপে স্বর্গে গেল', 'হুকুম নড়ে না', 'খোওয়াব', 'দীর্ণপত্র', 'প্রতীক্ষা', 'তুচ্ছ স্মৃতি', 'দেনা' ও 'বিবেক' গল্পে মানব হৃদয়ের চিরায়ত অপত্য স্নেহ তথা বাৎসল্য রস, তৎকালীন মুসলিম নিম্নবিত্ত দরিদ্র-সমাজে ধর্মীয় কুসংস্কার-অন্ধত্ব, ধর্মব্যবসা তথা ভণ্ড ধার্মিকদের স্বরূপ, নিম্নবিত্তের প্রতি উচ্চবিত্তের শোষণ, দয়াহীনতা, দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তর প্রভৃতি বিষয় সন্নিবিষ্ট হয়েছে। পরবর্তী কালে রচিত 'জন্ম যদি তব বঙ্গে' গল্পগ্রন্থে শওকত ওসমান উপস্থাপন করেছেন ১৯৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধের সার্বিক চিত্র। পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ, বাঙালি নিধন এবং মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক পাকিস্তানীবাহিনী নিধনের সার্বিক যুদ্ধকৌশল এ গ্রন্থে অঙ্কিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, দেশপ্রেমিক প্রগতিশীল মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী শওকত ওসমান তাঁর গল্পে দেশ-জাতি-জাতীয়তা, সর্বোপরি এ দেশের মানুষের নানাবিধ দাবি ও অধিকারের চিত্র উপস্থাপনে বরাবর উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে রচিত গল্পে তাঁর এই মতাদর্শ অধিকতরভাবে পরিলক্ষিত।

বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ শওকত ওসমানের ছোটগল্পে আঙ্গিক সফলতাও লক্ষণীয়। আখ্যানসৃষ্টি, ছোটগাল্পিক ব্যঞ্জনা, বর্ণনাময়তা, চরিত্র বিন্যাস এবং চরিত্রানুগ ভাষা সৃষ্টিতে শওকত ওসমান প্রদর্শন করেছেন অসাধারণ কুশলতা। পরিবেশের বর্ণনা, পরিবেশানুগ ভাষা ও শব্দ সৃষ্টিতে শওকত ওসমান সিদ্ধহস্ত। যেমন :

> একটা গেরস্তর সংসার রীতিমত। এইটুকু জায়গা। তবু সান্নিধ্যের কি অপরূপ মহিমা। এক কোণে হাঁড়ি-কুড়ি, পায়খানার লোটা, রান্নার অন্যান্য আসবাব : উঠোন-চুলো, লক্ড়ী, ন্যাকড়া, ফ্যান-গালা গামলা, কয়েকটা বাঁশের পাৎলা চুপড়ী। অন্য কোণে কয়লা এবং এই জাতীয় ইতর স্তূপের বোঝা। একটা ছাগল বাঁধা রয়েছে দুই কোণের মাঝখানে। কয়লার উপর জমেছে ছাগলের লাদি।[২০]

পরিবেশের নিখুঁত বর্ণনা এবং চরিত্রানুগ ভাষা সৃষ্টিতে বিশেষত কুমিল্লা, চট্টগ্রাম অঞ্চলের পটভূমি সমৃদ্ধ গল্পে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারে শওকত ওসমানের দক্ষতা পরিলক্ষিত। ভাষা বিন্যাসের মতো উপমা-প্রতীক নির্মাণেও দক্ষ-কুশলী শওকত ওসমান। তাঁর সমগ্র কথাসাহিত্যে বিষয় ও আঙ্গিকের বিচিত্রতা ও সফলতা লক্ষ্যযোগ্য।

চল্লিশের দশক থেকে বিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত কথাসাহিত্যচর্চায় শওকত ওসমান প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। বলা যায়, 'আর্থ-সামাজিক জীবন-অন্বেষা শওকত ওসমানের মধ্যে বরাবর গভীর ও সত্যময় দীপ্তি নিয়ে বিচ্ছুরিত হয়েছে। জীবন ও সমাজের সূক্ষ্মদ্রষ্টা হিসেবে গ্রাম ও শহরের আবেষ্টনী থেকে কথাসাহিত্যে তিনি যে মাটি ও মানুষের প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন তা নিরতিশয় বাস্তবমণ্ডিত, চেতনাদর্শী ও শিল্পনিপুণ।'[২১] শওকত ওসমানের ছোটগল্পে দেশীয় সমাজ-জীবন-মানুষ-পরিপার্শ্বের যে সফল অনুবর্তন তা তাঁকে বাংলাদেশের ছোটগল্প-ধারায় বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক রূপে পরিগণিত করেছে।

সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫) কবি এবং সাংবাদিক হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। 'সমকাল' (১৯৫৭) পত্রিকাব প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা তাঁর সর্ববৃহৎ কীর্তি। কাব্য, উপন্যাস, নাটক, অনুবাদসাহিত্য, গানরচনা ছাড়াও ছোটগল্প রচনায় তাঁর কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। বিভাগপূর্বকালে অর্থাৎ চল্লিশের দশকে সিকান্দার আবু জাফরের একমাত্র গল্পগ্রন্থ 'মতি আর অশ্রু' (১৯৪১) প্রকাশিত হয়। বিভাগোত্তরকালে সিকান্দার আবু জাফর আর কোনো গল্প রচনা করেননি। তাঁর 'মতি আর অশ্রু' গ্রন্থের গল্পে মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত-দরিদ্র মানুষের প্রাত্যহিক জীবনচিত্র উপস্থাপিত। সিকান্দার আবু জাফর তীক্ষ্ণভাবে সমাজ-সচেতন, 'তাই তাঁর প্রধান অবলম্বন নিসর্গ নয় মানুষ; তিনি পীড়িত মানুষের কল্যাণের ধ্যানে উচ্চকিত ও মগ্ন; ভিতরের নির্জন ও অনচ্ছ মানুষটি নয়, বরং যে মানুষ সমাজসীমার বাসিন্দা তারই মঙ্গল তাঁর আরাধ্য।'[২২] কবিতার মতো গল্পক্ষেত্রেও সমালোচকের এ মত প্রণিধানযোগ্য। দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি-অস্থিরতা, মানবিকতার লঙ্ঘন তাঁর শিল্পী মানসকে

গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, ফলে তাঁর সাহিত্যকর্মে দেশ ও সমাজমনস্কতার পরিচয় সর্বতোভাবে উৎকীর্ণ হয়েছে।

নাগরিক জীবনের জটিলতার অভিক্ষেপ ধারণ করেই গল্প চর্চায় আবু রুশদের (১৯১৯-) যাত্রা শুরু। পারিবারের সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের আবহে কিশোর বয়সেই তাঁর সাহিত্য প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। তাঁর জন্ম কলকাতায়, জন্মাবধি ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ মানসগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল তাঁর সেখানেই কাটে; বিভাগোত্তর কালে তিনি ঢাকায় চলে আসেন। ফলে বাঙালি মুসলিম সমাজের নাগরিক জীবনকেন্দ্রিক নানাবিধ জটিলতা রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংকট গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কলকাতা থাকাকালেই 'বুলবুল', 'মোহাম্মদী', 'সওগাত', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। ১৯৩৬ সালে 'বুলবুল'-এ প্রকাশিত 'অথর্ব্ব' শীর্ষক গল্পের মাধ্যমে গল্পকার আবু রুশদ-এর আত্মপ্রকাশ।[২৩] গদ্যশিল্পী আবু রুশ্‌দ গল্প-উপন্যাস রচনা করলেও গল্পকার হিসেবেই সর্বাধিক পরিচিত। 'রাজধানীতে ঝড়' (১৯৩৯), 'প্রথম যৌবন' (১৯৪৮), 'শাড়ী বাড়ী গাড়ী' (১৯৬৩), 'মহেন্দ্র মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' (১৯৭৪), 'স্বনির্বাচিত গল্প' (১৯৭৯), 'নির্বাচিত গল্প' (১৯৯০) প্রভৃতি এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ। প্রাক্‌চল্লিশ-দশকে প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হলেও প্রবণতা ও বিষয়বিন্যাসের দিক থেকে তিনি চল্লিশের অনুগামী। প্রথম দিকে আবু রুশদ রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। সে কারণে 'রাজধানীতে ঝড়' গল্পগ্রন্থে রোমান্টিক জীবন-চেতনা এবং স্বপ্নকল্পনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। পরবর্তী কালের গল্পে সমাজ-মনস্কতার ছাপ লক্ষণীয়। এসব গল্পে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের জীবনচিত্র বিধৃত হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, 'মুসলিম মধ্যবিত্তের সংস্কারচেতনা ও চিত্তের প্রবঞ্চনা, নাগরিক মধ্যবিত্তের আত্মগ্লানি ও জীবনবোধের দীনতা এবং দেশবিভাগের আবেগ-উচ্ছ্বাস-উদ্বেগে সিক্ত আবু রুশ্‌দের গল্পভুবন।'[২৪] 'প্রথম যৌবন'-এর গল্পগুলোর মূল উপজীব্য বাস্তবজীবনের প্রেম ও মনস্তত্ত্ব এবং বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা। 'প্রথম যৌবন' গল্পে মাসুদ নামের ষোল বছর বয়সের ছেলেটির জীবনে যৌবন সমাগমের কাহিনী বর্ণিত। বাল্যাবধি দুরন্ত অবাধ্য ও সংসার-অনভিজ্ঞ মাসুদ হঠাৎ করেই আমূল পাল্টে যায়। পাশের বাড়ির মেয়েটিকে দেখে সে প্রথম অনুভব করে যৌবনের আগমন। এ গল্পে ঘটনা-বিন্যাসের চেয়ে কিশোর মনের ক্রম পরিবর্তনই সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। 'অভাবনীয়' গল্পে বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা উপস্থাপিত হয়নি; মজিবুল নামক এক যুবকের' 'যৌবনের প্রাণধর্ম' আবিষ্কারই এর মুখ্য বিষয়। নাজমাকে কেন্দ্র করে মজিবুলের মনে স্বপ্ন-কল্পনাজাত উপলব্ধি জন্মে কিন্তু চিত্তের দৃঢ়তার অভাবে বলতে পারে না। ফলে নাজমাকে হারাতে হয়। মোহাচ্ছন্নতা থেকে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, তা থেকে মজিবুলের চিত্ত-জাগরণ ঘটে। 'লাজুক' গল্পেও দুর্বলচিত্ত শাহরিয়ারের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন প্রকাশিত। তার লাজুক স্বভাব থেকে সৃষ্টি হয় হতাশা ও সংশয়ের; ক্রমে তা চিত্ত বৈকল্যে রূপ নেয়। ফলে ভালোলাগার নারীকেও ব্যক্তিমনের অনুভূতি জানাতে সে কুণ্ঠিত ও ব্যর্থ হয়েছে।

বস্তুত, বয়ঃসন্ধিকালে যুবামনে যেমন নানারূপ পরিবর্তন ঘটে, তেমনি যৌবনে প্রাণধর্মের বিকাশে বিবিধ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা পরিলক্ষিত হয়। এসব গল্পের চরিত্রগুলো আবু রুশ্‌দ প্রায় মনোসমীক্ষকের মতোই বিশ্লেষণ করেছেন। পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'শাড়ী বাড়ী গাড়ী', গ্রন্থের 'দাহন', 'শাড়ী বাড়ী গাড়ী', 'ছেদ', 'যোগাযোগ', 'হাড়' প্রভৃতি গল্পে উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তের নৈতিক অবক্ষয়, চেতনাগত অনন্বয় ও দাম্পত্যজীবনের জটিলতা তির্যক ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ সহকারে রূপায়িত হয়েছে। কোনো কোনো গল্পে গল্পকার বিত্ত-বৈভবে ফুলে ফেঁপে ওঠা নাগরিক উচ্চবিত্তের অন্তঃসারশূন্য জীবনের ছবি এঁকেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সম্পদ-ঐশ্বর্য নয়; পারস্পরিক অকৃত্রিম সম্পর্কে নিহিত থাকে সুখ। 'মহেন্দ্র মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' গ্রন্থের গল্পগুলোতে নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজে বিদ্যমান নানা অসংগতি, ভণ্ডামি চিত্রিত। স্বল্পপ্রজ কথাশিল্পী আবু রুশ্‌দ-এর পরিমিতিবোধ অত্যন্ত প্রখর; গল্পে তীক্ষ্ণতা ও নাটকীয়তা সৃষ্টিতে তিনি সর্বদা সচেতন। 'আবু রুশ্‌দ এমনিতে কম লেখেন, দীর্ঘকাল ধরে লিখলেও তাঁর গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা বেশি নয়। গদ্যপ্রবন্ধ আরো কম। অল্প লিখলেও—মনে হয়—লেখা ব্যাপারটিকে তিনি কখনো গুরুত্বহীন মনে করেননি। সেজন্য তাঁর লেখার গতি কম বটে, কিন্তু খোড়ল নেই।'[২৫] স্বল্পপ্রজ কথাশিল্পী আবু রুশদের সমাজ-ঘনিষ্ঠতার পরিচয় তাঁর গল্পে বিদ্যমান। তিনি পারিপার্শ্বিক চেনা মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ ছবি এঁকেছেন এবং বাংলাদেশের ছোটগল্পে নির্মাণ করেছেন স্বতন্ত্র অবস্থান।

প্রগতিশীল মার্কসবাদী জীবনদৃষ্টিসম্পন্ন সোমেন চন্দের (১৯২০-১৯৪২) সাহিত্যচর্চার সূচনা স্কুল জীবনেই। জীবিতাবস্থায় তাঁর কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি: মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম গল্প-সংকলন 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' (১৯৪২)। এর এক বছর পর কলকাতা থেকে প্রকাশ পায় দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ 'বনস্পতি' (১৯৪৩)। তবে ঢাকা-কলকাতার বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর সাহিত্য চর্চা অব্যাহত ছিল। ঢাকার 'প্রভাতী' (১৯৩৬), 'সোনার বাংলা' (১৯৩৪), 'শান্তি' (১৯৩৪), 'ক্রান্তি' (১৯৪১), 'সারথী' (১৯৪০), 'বলাকা' (১৯৩৭) এবং কলকাতার 'দেশ' (১৯৩৩), 'অরণি' (১৯৪১), 'জনযুদ্ধ' (১৯৪২), 'সবুজ বাংলার কথা' (১৯৩৮), 'অগ্রগতি' (১৯৩৮), 'নবশক্তি' (১৯৩৯), 'বালীগঞ্জ' (১৯৩৯), 'পরিচয়' (১৯৪২), 'আনন্দবাজার' (১৯৩৩) প্রভৃতি পত্রিকায় গল্পপ্রকাশের মধ্য দিয়ে সোমেন চন্দ অর্জন করেন ছোটগাল্পিক সিদ্ধি।[২৬]

চল্লিশের দশকের শুরুতে বাংলা ছোটগল্পের অঙ্গনে বিস্ময় সৃষ্টিকারী সোমেন চন্দ ১৯৪২ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে ফ্যাসিবাদ বিরোধী মিছিলে নেতৃত্ব প্রদানকালে ফ্যাসিবাদ-সমর্থকদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। উল্লেখ্য, স্বল্পকাল, মাত্র তিন বছর (১৯৩৯-৪২) সোমেন চন্দ সাহিত্য চর্চা করেন। এই সময়কালে সাহিত্য চর্চায় ব্যস্ত থাকলেও তিনি 'প্রগতি পাঠাগার' পরিচলনায় সফলতা অর্জন করেন, ঢাকায় নব্য প্রতিষ্ঠিত 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের' (১৯৪০) সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং সংগঠনের সাহিত্য সংকলন 'ক্রান্তি' প্রকাশে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ (১৯৪১) করে পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং দক্ষতার সাথে 'ঢাকা রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়ন' পরিচালনা করেন। প্রগতিশীল সাহিত্যিক বা সাহিত্যকর্মী হিসাবেই নয়, বিপ্লবী চেতনায় উজ্জীবিত সোমেন চন্দ রাজনৈতিক জীবন ও তৎসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে ছিলেন একীভূত।

সোমেন চন্দ, 'সংকেত ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে 'রাত্রিশেষ', 'স্বপ্ন', 'একটি রাত', 'সংকেত', 'দাঙ্গা', 'ইঁদুর' গল্প। তাঁর গল্পে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবনসংগ্রাম ও কর্মমুখরতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লক্ষণীয়। ব্যক্তিজীবনে নিম্নবিত্ত সোমেন চন্দ সমাজের বিত্তহীনদের দীনহীন জীবনযাপন এবং শোষিত শ্রেণীর জীবনসংগ্রাম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন—তাঁর গল্পে এই পর্যবেক্ষণের শিল্পিত প্রকাশ ঘটেছে। 'সংকেত' গল্পে তিনি শ্রমিকদের পক্ষাবলম্বন করেছেন। মালিকশ্রেণী ইচ্ছেমতো নতুন নতুন শ্রমিক নিয়োগ করে অথচ পুরনো শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরিটুকু দেয় না—শোষণের এই প্রক্রিয়ায় শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয় এবং বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্রোহ শুরু করে। কিন্তু চতুর মালিক পক্ষের দমনপীড়নে তাদের বিদ্রোহ থেমে যায়। এ গল্পে লেখক শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার উপায় নির্দেশ করেননি, তবে সংকেত দিয়েছেন; শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর যূথবদ্ধ আন্দোলন ব্যতিরেকে দমন-শোষণ থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। লেখকের সমকালে ঢাকায় সংঘটিত হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে 'দাঙ্গা' গল্প রচিত। শুধু গল্পের কাহিনী নয়, চরিত্রাবলি, দাঙ্গার রক্তপাত, মানুষের উৎকণ্ঠা প্রভৃতি লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। এ সম্পর্কে রণেশ দাশগুপ্তের বক্তব্য :

> সোমেন চন্দ তাঁর কাহিনী এবং চরিত্র নিয়েছিলেন জীবন থেকে। সুতরাং সে সময়ে তার চারপাশে ঘটনামূলক ছোট বড় সবকিছুর জন্যই তাঁর চোখ খোলা থাকতো। সে সময় ঢাকায় একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল। স্বাধীনতার জন্য যারা সংগ্রামে নিয়োজিত তাদের মধ্যে কেউ পাছে সাম্প্রদায়িক বিষ খেয়ে বসে, এ নিয়ে সোমেনের উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। 'দাঙ্গা' গল্পটি এই উৎকণ্ঠার ফল। নিজেকেও তিনি তাঁর এই গল্পের বাইরে রাখেননি। তিনি যে সাইকেলে চড়ে দাঙ্গাদুর্গত শহরে ঘুরে বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজ নিতেন, তার মধ্য দিয়েই সরেজমিনে দাঙ্গার চেহারাটাকে দেখেছিলেন। নায়ককেও এই সূত্রে আমরা সাইকেল আরোহীর চেহারায় পাই।[২৭]

এ গল্পেও লেখক সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মানবিক ও দেশপ্রেমিক শক্তির পক্ষাবলম্বন করেছেন। দাঙ্গাবিক্ষুব্ধ দুর্দিনে তাই তিনি চক্রান্ত ও প্রতিক্রিয়ার বিষধোঁয়া দূরীকরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে রচিত 'ইঁদুর' গল্পে লেখক মধ্যবিত্ত পরিবারের দুঃখময় জীবনযাত্রা ও অসহায়ত্বের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। ইঁদুরের প্রতীকে তিনি বাঙালি মধ্যবিত্তের পচনশীলতার সম্যক পরিচয় দিয়েছেন। লেখকের বর্ণনার চমৎকারিত্ব নিম্নরূপ :

> তাদের সাহস দেখে অবাক হতে হয়। চোখের সামনে, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের সুচতুর পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার মতো ওরা ঘুরে বেড়ায়, দেয়াল আর মেঝের কোণ বেয়ে-বেয়ে তর্-তর্ করে ছুটোছুটি করে। যখন সেই নির্দিষ্ট পথে আকস্মিক কোন বিপদ এসে হাজির হয়, অর্থাৎ কোন বাক্স বা কোন ভারী জিনিসপত্র সেখানে পথ আগলে বসে, তখন সেটা অনায়াসে টুক্ করে বেয়ে তারা চলে যায়। কিন্তু রাত্রে আরও ভয়ঙ্কর। এই বিশেষ সময়টাতে তাদের কার্যকলাপ আমাদের চোখের সামনে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে সুর হয়ে যায়। ঘরের যে কয়েকখানা ভাঙ্গা কেরোসিন কাঠের বাক্স, কেরোসিনের অনেক পুরনো টিন, কয়েকটা ভাঙ্গা পিঁড়ি আর কিছু মাটির জিনিসপত্র আছে, সেখান থেকে অনবরতই খুট্ খুট্ টুং-টাং ইত্যাদি নানা রকমের শব্দ কানে আসতে থাকে। তখন এটা অনুমান করে নিতে আর বাকী থাকে না যে এক ঝাঁক ন্যূজদেহ অপদার্থ জীব ঐ কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপরে এখন রাতের আসর খুলে বসেছে।[২৮]

'ইঁদুর' গল্পে মধ্যবিত্তের গৃহসমস্যা, অন্ধকারের জীব ইঁদুরের উৎপাত, দৈনন্দিন জীবন-যাপনের অস্বাস্থ্যকর কুৎসিত রূপ ফুটে উঠেছে। ইঁদুর-অতিষ্ঠ জীবনকথার অন্তরালে সোমেন চন্দ মানবিক সমাজ গড়ার সংগ্রামে একাত্ম হতে মধ্যবিত্তের যে সংশয় ও চিন্তার দৈন্য তা উন্মোচিত করেছেন। তবে মধ্যবিত্তের দোলাচলতা পরিহার করে সমাজবদলের সংগ্রামের অংশগ্রহণের কথা এখানে বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থের 'একটি রাত', 'স্বপ্ন', 'রাত্রিশেষ' প্রভৃতি গল্পে জীবনের ইতিবাচক দিকটির অনুসন্ধান করা হয়েছে। 'মরূদ্যান', 'ভালো-না-লাগার শেষ', 'অমিল', 'সত্যবতীর বিদায়', 'সিগারেট', 'গান', 'প্রত্যাবর্তন', 'অকল্পিত', 'মহাপ্রয়াণ', 'প্রান্তর' ও 'বনস্পতি'—এই এগারোটি গল্প নিয়ে 'বনস্পতি' গ্রন্থ সুগ্রথিত। 'বনস্পতি' গল্পে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ বিজড়িত এক দীর্ঘ ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। দুশো বছরের পুরনো বটবৃক্ষ—যা একদিকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, সিপাহি বিদ্রোহ, বঙ্গভঙ্গ, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, অপরদিকে পীরপুর গ্রামের মানুষের আনন্দ-বেদনা, হর্ষ-বিষাদ, জীবন-মৃত্যুর প্রত্যক্ষ সাক্ষী তাকে 'বনস্পতি' বলে অভিহিত করা হয়েছে। 'সোমেন চন্দের মননের যে বৈশিষ্ট্য সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের প্রতি অপার মমতার প্রকাশ, প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সমাজতান্ত্রিক চেতনার উৎক্ষেপণ, তার পরিচয়ও রয়েছে এ গল্পে'।[২৯] মহাত্মা গান্ধী তৎকালে বিলিতি দ্রব্য বর্জনের যে ডাক দিয়েছিলেন তার আলোকে 'সিগারেট' গল্পটি রচিত। এতে স্বদেশি দ্রব্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির কথা যেমন রয়েছে তেমনি সিগারেটের বিষক্রিয়ার কথাও উল্লেখিত হয়েছে। গ্রন্থের অন্যান্য গল্পে পারিবারিক জীবনের ছোট-বড় দ্বন্দ্ব-সংঘাত স্থান পেয়েছে। তাঁর অগ্রন্থিত সাতটি গল্প, একটি উপন্যাস, দুটি একাঙ্কিকা পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'সোমেন চন্দ রচনাবলী'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মার্কসবাদী সোমেন চন্দের গল্প বিশেষ উদ্দেশ্য থেকে রচিত হলেও তীক্ষ্ণ জীবনদৃষ্টি ও বিস্ময়কর প্রতিভাগুণে তা শিল্পসফলতা অর্জন করেছে। প্রকৃতপক্ষে, 'সোমেন চন্দ সাহিত্যের মাধ্যমে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন গণমানবিক উপলব্ধি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিশের দশকের বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিকতার উন্মেষ, তিরিশের দশকে তার উত্তরণ ঘটেছিল প্রগতিতে। রাজনীতিচেতনা এই দশকের সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। চল্লিশের দশকে যার প্রবল বিস্তৃতি। সোমেন চন্দ, সাহিত্যে এই প্রগতিচেতনা বিকাশের পথিকৃৎ-শিল্পী'।[৩০] তাঁর ছোটগল্পে বিষয় ও ভাষাবিন্যাস, বর্ণনাকুশলতা, ছোটগাল্পিক সংহতি ও ব্যঞ্জনাধর্মিতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁকে বাংলাদেশের ছোটগল্পের সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী ধারার প্রবর্তক বললে অত্যুক্তি হয় না।

বাংলা সাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক চেতনাপ্রবাহ রীতির সংযোজক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) প্রধানত কথা-সাহিত্যিক, তবে নাট্যসাহিত্যে তাঁর বিচরণ দুর্লক্ষ্য নয়। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে মনস্তত্ত্বধর্মিতা প্রকাশিত। কর্মসূত্রে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। ফলে, তাঁর রচনার শৈলী ও প্রকরণে ইউরোপীয় সাহিত্যকলার উপস্থিতি সত্ত্বেও বিষয়বস্তুতে দেশীয় বাস্তবতা তথা স্বদেশের মাটি-মানুষ-গ্রাম-প্রকৃতি সম্যকরূপে প্রতিভাত। অর্থাৎ তিনি 'বিষয়ে দেশজ, কিন্তু প্রকরণে দেশোত্তর'।[৩১] জীবনের রূঢ় বাস্তবতা, জন্ম-মৃত্যুচিন্তা, প্রেম, নিম্নবিত্তের জীবনযাত্রা, দাম্পত্য-সমস্যা, ধর্মীয় অন্ধত্ব প্রভৃতি বিষয় তাঁর গল্পে যথোপযুক্ত ভাষায় চিত্রময়। প্রতিক্রিয়াশীলদের কুকর্মের নিঃশব্দ প্রতিবাদ, পঞ্চাশের মন্বন্তরের দুঃসহ চিত্র,

সামাজিক-রাজনৈতিক অপচ্ছায়ায় অভিশপ্ত সমকালীন জীবনযাত্রা বিধৃত করার সচেতন প্রয়াস সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পে লক্ষণীয়। বস্তুকেন্দ্রিক বিষয়কে বস্তু-অতিক্রমী দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতা উপন্যাসের ন্যায় তাঁর ছোটগল্পে প্রতিস্থাপিত। 'নয়নচারা' (১৯৪৫) ও 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫) গল্পগ্রন্থে অনুরূপ প্রবণতার শাণিত শিল্পরূপ প্রকাশ পেয়েছে।

ইন্টারমিডিয়েট পড়াকালে (১৯৩৯) কলেজ বার্ষিকীতে প্রকাশিত 'সীমাহীন এক নিমেষে' গল্পের মাধ্যমে গল্পকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র আত্মপ্রকাশ। ৪৪টি গল্পের মধ্যে ২৭টি অগ্রন্থিত, দুটি গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে ১৭টি। চল্লিশের দশকে ছোটগল্প লিখে, বিশেষত 'লালসালু' উপন্যাস রচনা করে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। তিরিশের দশকে কল্লোলের চেতনায় উজ্জীবিত লেখকবৃন্দ বিশেষত জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-৬৭), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-৫৬) গল্পসাহিত্যে সমাজ-বাস্তবতার নানা প্রসঙ্গ— কুসংস্কার-অন্ধত্ব-নিষ্পেষণ-অত্যাচারের ছবি এঁকেছেন এবং বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ, ফ্রয়ডীয় মনোবিকলনতত্ত্ব প্রভৃতির যথাযথ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁদের সফল উত্তরাধিকারী। 'জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান আছে—প্রধান সাধর্ম এখানে যে তাঁরা নিম্নবিত্তের জীবনচিত্রণে বহির্বাস্তবতাকে সমসূত্রে মিলিয়েছেন। ওয়ালীউল্লাহ্‌ও এই পথেরই পথিক'।[৩২] উল্লেখ্য, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অধিকাংশ গল্প চল্লিশের দশকে রচিত এবং 'মোহাম্মদী', 'সওগাত' ও 'মাহে নও' পত্রিকায় প্রকাশিত। 'নয়নচারা' গ্রন্থে 'নয়নচারা', 'জাহাজী', 'পরাজয়', 'মৃত্যু-যাত্রা', 'খুনী', 'রক্ত', 'খণ্ড চাঁদের বক্রতায়', 'সেই পৃথিবী'—এই আটটি গল্প সংকলিত। 'নয়নচারা' গল্পে পঞ্চাশের মন্বন্তরের ভয়াবহ ফল সমকালীন সমাজজীবনে যে আগ্রাসী প্রভাব বিস্তার করেছিল তার স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে। গ্রামত্যাগী আমু চরিত্রের মনোবিশ্লেষণে নগর জীবনের নির্মম মানসিকতার প্রকৃত চিত্র উপস্থাপিত। ক্ষুধার্ত আমু ভাতের অন্বেষণে শহরে আসে এবং দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে অবশেষে কাঙ্ক্ষিত অন্নের সন্ধান পায়। আমুর ভাত সংগ্রহের চিত্র নিম্নরূপ:

> সে ভাতই চায় : এ-দুনিয়ায় চাইবার হয়তো আরো অনেক কিছু আছে, কিন্তু তাদের নাম সে জানে না। ত্রস্ত ভঙ্গিতে ময়লা কাপড়ের প্রান্ত মেলে ধরে সে ভাতটুকু নিলে, নিয়ে মুখ তুলে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইলো মেয়েটির পানে।[৩৩]

কারণ অন্নদাত্রীকে দেখে তার মায়ের কথা মনে পড়ে এবং স্বগ্রাম নিবাসী বলে মনে হয়। 'নয়নচারা' গল্পের বিষয়বিন্যাস এবং সংহতিতে গল্পকারের শিল্পীসত্তার সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। আমু চরিত্রের স্বপ্নচারিতা কল্পনাময়তার মাধ্যমে বাস্তবতার ভেতর দিয়ে দূর ভবিষ্যতের বাস্তবতাকে দৃশ্যমান করে তোলার প্রয়াসে গল্পকারের স্যুররিয়ালিজম প্রভাবিত শিল্পীমনের বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। 'জাহাজী' গল্পে নির্মিত হয়েছে এক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ করিম সারেঙের স্বজনহীন নিষ্করুণ জীবনযাত্রার জলছবি। আশৈশব জলমণ্ডলে ভাসমান করিম সারেঙ জন্মভূমি ও পৃথিবীর স্নেহ-মমতা থেকে বিচ্ছিন্ন। তবু এই নিরবচ্ছিন্ন শূন্যতায় তার অবচেতন মন বিচিত্র ভাবনার সংসর্গে মাঝে-মধ্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে। 'পরাজয়' গল্পের কাহিনী গতানুগতিক ; নারীদেহ কেন্দ্র করে পুরুষের উগ্র কামনার নগ্ন প্রকাশ এখানে বিধৃত। যৌবনবতী বিধবা কুলসুমকে দেখে কালু ও মজনুর মনে সম্ভোগ-লিপ্সা জাগে। কিন্তু পরক্ষণেই কুলসুমের নম্র-শান্ত মুখাবয়ব দেখে তাদের আদিম-লিপ্সা উবে যায়। মানবমনের বিচিত্র ভাবনা-কল্পনার একটি দিকের উন্মোচন ঘটেছে এ গল্পে। এ গ্রন্থের 'মৃত্যুযাত্রা' গল্পে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা এবং ক্ষুধাক্লান্ত মানুষের খাদ্যান্বেষণের চিত্র অঙ্কিত। জাহাজের খালাসি আব্দুলের হতাশাক্রান্ত ব্যর্থ জীবনালেখ্য 'রক্ত' গল্পের উপজীব্য। 'খণ্ড চাঁদের বক্রতায়' গল্পের কাহিনীর মূলবিন্দু এককালের ঢাকার বস্তিবাসী গাড়োয়ানদের জীবনযাত্রা। এতে একটি বিশেষ অঞ্চলের অর্থাৎ ঢাকার আদি অধিবাসী-অঞ্চলের আঞ্চলিক আবহ শিল্প-সাফল্যে প্রবাহিত।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রতিটি গল্পেই চরিত্রের অন্তর্জগত ও বহির্জগতের সঙ্গতি-অসঙ্গতি, কামনা-বাসনার নগ্নরূপ সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষিত। বাস্তবজীবনের অনুপঙ্খ বর্ণনা সংযোজিত বলে তাঁর গল্প সর্বাংশে বস্তুনিষ্ঠ হতে পেরেছে। তবে বিষয়ের চেয়ে আঙ্গিকরীতির দিকে তিনি বেশি মনোযোগী। তাঁর গল্পের ভাষা কাব্যময় এবং

বর্ণনা সাবলীল। চরিত্রের মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যায়ও তিনি ব্যঞ্জনাময় রসসমৃদ্ধ কাব্যময় ভাষা ব্যবহার করেছেন। তাঁর গল্পে প্রতীক, উপমা, চিত্রকল্পের যথাযথ প্রয়োগ পরিলক্ষিত। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্প মূলত, 'চিন্তা-স্রোত, ঘটনা-গ্রন্থন নয়'। তিনি বাংলা ছোটগল্পে 'চিন্তাস্রোত' বা 'মনস্তাত্ত্বিক চেতনাপ্রবাহ রীতি' সংযোজন করে যে অভিনব পথ নির্মাণ করেছেন পরবর্তী কালে অনেক গল্পকার সে পথেই অর্জন করেছেন প্রভূত সাফল্য।

প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, সমালোচক, নাট্যকার মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) চল্লিশের দশকের গল্পকারদের অন্যতম। গল্পচর্চার মাধ্যমে সাহিত্য জগতে পদার্পণ করলেও সাহিত্যের ছোটগল্প শাখায় তাঁর বিচরণ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বিভাগ-পূর্ব কালে বেশ কিছু ছোটগল্প রচনা করে গল্পলেখক অভিধায় ভূষিত হলেও তাঁর কোনো গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তবে পরবর্তী কালে 'মুনীর চৌধুরী রচনাবলী'তে গল্পগুলো সংকলিত হয়েছে। চল্লিশের দশকের রচনা হিসেবে এগুলোর শিল্পমূল্য অত্যল্প নয়। সংকলনভুক্ত গল্পগুলো হলো : 'নগ্ন পা', 'ফিডিং বটল', 'বাবা ফেকু', 'ন্যাংটার দেশে', 'খড়ম', 'একটি তালাকের কাহিনী', 'মানুষের জন্য'। এসব গল্পে তৎকালীন মুসলিম সমাজের নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষের নিষ্করুণ জীবনচিত্র উপস্থাপিত। 'মানুষের জন্য' গল্পে ফতোয়া-জর্জরিত এক গ্রাম্য দম্পতির শাস্তি ভোগের কাহিনী বর্ণিত। বদমেজাজি ও একরোখা ছদু ক্রোধান্বিত হয়ে প্রিয়-স্ত্রী তফুরীকে তালাক দেয় এবং তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল বুঝতে পেরে স্ত্রীকে ফিরে পেতে চায়। কিন্তু বাদ সাধে ফতোয়া। মানুষের অবস্থান যে কোনো বিধি-বিধানের উর্ধ্বে; মানুষের কল্যাণেই বিধি-বিধানের সৃষ্টি— 'মানুষের জন্য' গল্পে লেখক এ সত্য উন্মোচনে প্রয়াসী। 'একটি তালাকের কাহিনী' গল্পেও 'শরিয়ত', 'ফতোয়া' ইত্যাদি বিষয়াবলি উপস্থাপিত। সন্দেহের বশে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে উভয় পক্ষের মধ্যে শরিয়ত বিষয়ক বাক-বিতণ্ডা এবং অবশেষে প্রবল দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। পরে আইনি ব্যবস্থায় ঘটনাটি মীমাংসিত হয়। 'বাবা ফেকু' ও 'খড়ম' গল্পে সাধারণ মানুষের জীবনের দুঃখ-দুর্দশা বর্ণিত হয়েছে। উভয় গল্পেই নারী-লোলুপ লম্পট চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষণীয়। অবশ্য 'বাবা ফেকু' গল্পে প্রেমের মতো সৎ-প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে। প্রেম-প্রবৃত্তির অনুষঙ্গ 'নগ্ন পা' গল্পেও বিদ্যমান। অসম বয়সী দেবর-ভাবীর পরকীয়া প্রেম লোকচক্ষুর আড়াল করতে ভাবী রাহেলা বোরকা পরিধান করে। মানুষের সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতাকে ব্যবহার করে সে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করে। এ গল্পে লেখক সমাজের সংস্কারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ হেনেছেন। 'খড়ম' ও 'ন্যাংটার দেশে' গল্পে অভাবগ্রস্ত অন্নহীন-বস্ত্রহীন মানুষের দুর্দশা নির্মম পরিহাসে বর্ণিত। এর উল্টো চিত্র 'স্মিত-মধুর দাম্পত্য জীবনের এক চমৎকার ছবি' 'ফিডিং বটল' গল্পে অঙ্কিত হয়েছে। মুনীর চৌধুরীর গল্পে প্রচলিত সমাজ, নানা শ্রেণীর মানুষ এবং তাদের জীবনের নানা রূপ অসঙ্গতি বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপিত। এ সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত :

> সামাজিক অসঙ্গতিকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন, কিন্তু গল্পে পাত্রপাত্রীরা লেখকের সর্বব্যাপী সহানুভূতি থেকে কখনো বঞ্চিত হয়নি। এবং তাদের অমার্জিত ভাষা, অসংস্কৃত আঞ্চলিকতা, অশ্লীল জীবনাচরণ আর অপাংক্তেয় সামাজিকতার মধ্য দিয়েই দীপ্ত হয়ে উঠেছে। সমাজবিষয়ক অভিজ্ঞতা ছাড়াও সাধারণ মানুষের জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে মুনীর চৌধুরীর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ শক্তি বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁর সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সত্ত্বেও গল্পকার মুনীর চৌধুরীর সাফল্যের অন্যতম কারণ।[৩৪]

বস্তুত, প্রগতিশীল সমাজচিন্তক মুনীর চৌধুরীর সমগ্র রচনা তাঁর ব্যক্তি চিন্তার বৈশিষ্ট্যানুসারী। মুনীর চৌধুরীর অধিকাংশ গল্পে বিশেষ অঞ্চলের আঞ্চলিকতা—আঞ্চলিক জীবন ও আঞ্চলিক ভাষা ব্যঞ্জনাময় রূপ লাভ করেছে। বাস্তবজীবনাভিজ্ঞ গল্পকার বিষয় নির্বাচনের মতো চরিত্রানুগ ভাষা সৃষ্টিতেও অসাধারণ পটুতার স্বাক্ষর রেখেছেন। নিচের সংলাপে নোয়াখালী-চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভাষা ব্যবহারে লেখকের দক্ষতার প্রমাণ সুস্পষ্ট :

> : এই দরজা খুলি বাইর অই গেল কে?
>
> : আই একবার উঠছিলাম। হোওনের ওক্তে লাগানোর কথা মোনো আছিল না আঁর।
>
> : আরে আর ভারাইচ্চারে হারামজাদি? তোর গা উদাম করল কে হেইলে, তোর গার কাপড়ের প্যাঁচ হস করাইল কে?
>
> চিৎকারে ব্যঙ্গে কর্কশ হয়ে এল ফাতেমার গলাও।

: আঁই কি নটি নি। আঁই কি নটি নি। সোয়ামির গরে হুইতাম না গা উদাম কইরা। ছালার চট দি নিজেরে মুড়ি রাইখুম নি ?[৩৫]

মোট কথা, মুনীর চৌধুরী দেশীয় বিষয় ও ঐতিহ্যে সত্যানুসন্ধান করেছেন বলে স্বল্পসংখ্যক গল্প রচনা করেও সমকালে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে খ্যাতি লাভে সক্ষম হয়েছিলেন।

দেশবিভাগের পর কলকাতা থেকে যে কয়জন খ্যাতিমান সাহিত্যিক এদেশে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে শামসুদ্দীন আবুল কালাম অন্যতম। চল্লিশের দশকেই কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'পরিচয়', 'কুয়াশা', 'সওগাত' প্রভৃতি পত্রিকায় গল্পরচনা করে প্রসংশিত হন। ঔপন্যাসিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করলেও গল্প শাখায় ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলো হলো : 'শাহের বানু' (১৯৪৫), 'পথ জানা নেই' (১৯৪৮), 'অনেক দিনের আশা' (১৯৪৯), 'ঢেউ' (১৯৫৩), 'দুই হৃদয়ের তীর' (১৯৫৫), পুঁই ডালিমের কাব্য' (১৩৯৪) প্রভৃতি। উল্লেখ্য, 'দুই হৃদয়ের তীর' গল্পগ্রন্থ প্রকাশকালে তিনি তাঁর নামে পরিবর্তন আনেন; এর পূর্বে তিনি 'আবুল কালাম শামসুদ্দীন' নামে পরিচিত ছিলেন।[৩৬] 'শাহের বানু' গল্পগ্রন্থে, 'শাহের বানু', 'ইতিকথা', 'জাহাজ ঘাটের কুলি', 'কেরায়া নায়ের মাঝি', 'পৌষ', 'শেষ প্রহর', 'মূলধন', 'মুক্তি', 'জোর যার', 'ভাঙ্গন'—এই দশটি গল্প স্থান পেয়েছে। চলিত ভাষায় রচিত 'জাহাজ ঘাটের কুলি' গল্পকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল; এতে কুলি জীবনের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডের চিত্র বিধৃত। সে সময়ে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রত্যহ হাজার হাজার যাত্রী ও মালামাল নিয়ে বড় বড় স্টিমার বরিশালে আসতো এবং লাল পোশাক পরা নম্বরওয়ালা কুলিরা জাহাজ ঘাটে কর্মব্যস্ত থাকতো। বরিশাল থেকে অন্যত্র যাতায়াতের জন্য লেখকের প্রায়শ জাহাজ ঘাটের এরূপ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে হতো। কুলিদের কঠোর পরিশ্রমী অথচ বঞ্চিত জীবনকথা এ গল্পের উপজীব্য। 'কেরায়া নায়ের মাঝি' গল্পে হতদরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের চিত্র সংযোজিত। একদিকে অনাহার-অর্ধাহার অন্যদিকে রোগ-শোক তাদের নিত্যসঙ্গী। অথচ খাটা-খাটুনির বিকল্প নেই। লেখকের বর্ণনায় দারিদ্র্যের এই কারুণ্য আরো স্পষ্ট :

> দুই ছেলে আর শিশু মেয়ে তখনো ঘুমন্ত; শুধু আজাহার বিছানায় নেই, পুর কাঁথাটা পায়ের কাছে সরিয়ে দিয়ে কখন উঠে গেছে। গত সপ্তাহখানেক ধরে আমাশয় ভোগা কাহিল শরীরে সে বিছানা ছেড়েই উঠতে অক্ষম, তবু এই এত ভোরে কোথায় বেরিয়ে গেল ?[৩৭]

সমাজ-সমস্যার আরেকটি বাস্তবরূপ 'ভাঙ্গন' গল্পে প্রতিফলিত। একটি বিয়েকে কেন্দ্র করে কন্যাপক্ষের প্রতি বরপক্ষের আধিপত্য প্রদর্শনের অশুভ পায়তারাই এ গল্পের প্রধান অবলম্বন। 'শাহের বানু' গল্পগ্রন্থের অধিকাংশ গল্পেই দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত মানুষের কথা প্রধান বিষয়ে পরিণত হয়েছে। গল্পকারের প্রথম দিকের রচনা হলেও গল্পগুলোতে জীবন-ঘনিষ্ঠতা, মানবতাবোধ প্রবলভাবে উপস্থিত। বিশেষত নদীমাতৃক বাংলাদেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য বর্ণনায় তাঁর দক্ষতা অপরিসীম। 'শাহের বানু' গল্পগ্রন্থে নদীমাতৃক বাংলাদেশ ও আপামর বাঙালির জীবনছবি, বিশেষত দক্ষিণ বাংলার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার রূপচ্ছবি অঙ্কিত। এ গ্রন্থপাঠে শেকড়ের সন্ধান মেলে; মনে হয় বাংলাদেশ কথা কয়ে ওঠে।

'পথ জানা নেই', গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে 'পথ জানা নেই', 'বন্যা', 'মেঘনায় কত জল', 'জীবনের শুভ অর্থ', 'বজ্র', 'মদন মাঝির গেলেপতার', 'সরেজমিন', 'বান', 'কাল রাত্রির ভোর', 'অনেক দিনের আশা' দশটি গল্প। 'পথ জানা নেই' গল্পে দক্ষিণ বাংলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাম 'মাউলতলা' ও সে গ্রামের অধিবাসী ভিতরে-বাহিরে নিঃস্ব কৃষক গহুরালির ভাঙা-গড়ার ইতিকথা বর্ণিত। প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় শহরের সাথে গ্রামের সংযোগকারী একটি সড়ক নির্মিত হয়। এই সড়ককে কেন্দ্র করেই বঞ্চনাহীন নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে গহুরালি। এই সময়ে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তর। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, দালাল ফড়িয়ার উৎপাত বাড়ে। ফলে মানুষের দুর্ভোগ চরমে পৌছায়। নতুন নির্মিত সড়ক ধরে মাউলতলার জনজীবনেও এসবের অশুভ ছায়াপাত ঘটে। দুর্ভিক্ষের উত্তাপে গহুরালির আর্থিক জীবনের নিরাপত্তা বিনষ্ট হয় এবং দালালের কারসাজিতে স্ত্রীর গৃহান্তর ঘটে। অবশেষে দুর্দশাগ্রস্ত নিঃস্ব গহুরালি রাস্তা-উৎখাতে কোদাল চালায়। সে বুঝতে পারে, এ রাস্তা শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। গল্পটির সাংকেতিক নামকরণে নতুন পথ অনুসন্ধানের ইঙ্গিত নিহিত। গহুরালির সরল-কৃষক জীবনের বেদনাঘন পরিণাম নাটকীয় আকস্মিকতায়

উপস্থাপিত। গল্পের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি সাবলীল; চরিত্রানুগ আঞ্চলিক ভাষা বিনির্মাণে গল্পকারের দক্ষতা প্রশংসনীয়। এ গ্রন্থের 'বান' গল্পে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় কবলিত মানুষের দুর্দশার চিত্র বিম্বিত। এ গল্পে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার প্রসঙ্গ এসেছে। মানবতার বাণী উচ্চকিতভাবে প্রচারিত হওয়ায় গল্পটি প্রচারধর্মী হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটির অন্যান্য গল্পেও বাংলাদেশের নিরন্ন দুঃখী মানুষের জীবনালেখ্য বিবৃত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর অধিকাংশ গল্পেই আধুনিক নগর সভ্যতার নেতিবাচক দিকগুলো উন্মোচিত। কর্মসূত্রে ইউরোপ-প্রবাসী হলেও তিনি বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের পটভূমিতে গল্প রচনা করেছেন। তবে গ্রামীণ জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, ক্ষয়-বঞ্চনাকে বিপ্রতীপ অবস্থান থেকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে রোমান্টিকতা-আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর এ সময়ের অধিকাংশ গল্পে ছোটগাল্পিক সংহতি ও ইঙ্গিতধর্মিতার অভাব পরিদৃষ্ট, সর্বোপরি, অতিকথন দুষ্টতায় গল্পের শিল্পমূল্য অনেকাংশেই ক্ষুণ্ন হয়েছে। এসব সত্ত্বেও, সমাজ-সচেতন ও তীক্ষ্ণ জীবনবোধসম্পন্ন শামসুদ্দীন আবুল কালাম বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদের অপাঙ্‌ক্তেয় জীবনের রূপকার হিসাবে বাংলাদেশের ছোটগল্পে নির্দিষ্ট স্থান দখল করে আছেন।

চল্লিশের দশকের গল্পকারগণের হাতে বাংলাদেশের ছোটগল্পের যুগান্তকারী বৃহৎ কোনো পরিবর্তন না ঘটলেও গল্পের বিষয়গত ও আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে নানা রূপ পরিবর্তনের সূচনা পরিলক্ষিত হয়। বিষয়-নির্বাচন ও আঙ্গিক-নির্মাণে এ সময়ের অধিকাংশ গল্পকারের মধ্যে আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তবে এসব ক্ষেত্রে দু-একজনের ভিন্নধর্মী শিল্পভাবনা মাত্রাতিরেকভাবে দৃশ্যমান। তাঁদের সবার গল্পেই বাংলাদেশের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা তথা গ্রামীণ নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার রেখাচিত্র গুরুত্ব সহকারে অঙ্কিত হয়েছে। এছাড়া, এ সময়ের সাংস্কৃতিক চেতনার দৈন্য, প্রায় সর্বক্ষেত্রে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় অর্থাৎ ধর্মীয় গোঁড়ামি লোকাচার-কুসংস্কারের বিষময় ফল তাঁদের গল্পে স্থান পেয়েছে। এই দশকে পূর্ববাংলার রাজনীতি অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে এবং অস্থিতিশীল রাজনীতির আশ্রয়ে জন্ম নেওয়া কূপমণ্ডুকতা-অন্তঃসারশূন্যতা-ধর্মীয় ভণ্ডামি ক্রমেই সমাজদেহে বিস্তার লাভ করতে থাকে। সমাজ সচেতন; প্রগতিবাদী গল্পকারগণ সমাজের কুসংস্কারমুক্তির মানসে জীবনাচরণের এই সব অসঙ্গতি গল্পে প্রতিস্থাপিত করেছেন। এইসূত্রে, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল ফজল, আবু জাফর শামসুদ্দীন, মুনীর চৌধুরী প্রমুখের গল্পে 'ফতোয়া'র নেতিবাচক দিকের যথার্থ প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁরা বিভিন্ন গল্পে ফতোয়াবাজ মুখোশধারী ধর্মব্যবসায়ীদের অন্তঃসারশূন্যতা ও ভণ্ডামি উন্মোচনে সচেষ্ট হয়েছেন। সমকালীন আর্থ-সামাজিক শোষণ-বৈষম্যের চিত্র আবুল মনসুর আহমদ, আবু জাফর শামসুদ্দীন, শওকত ওসমান, সোমেন চন্দ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রমুখের গল্পে সম্যকরূপে প্রতিভাত। ধনী-নির্ধনের বৈষম্য, দুর্বলের প্রতি সবলের কর্তৃত্ব, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মারী ও মন্বন্তরের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা তাঁদের গল্পে বিষয়রূপে সংযোজিত। এছাড়া মানুষের হৃদয়বৃত্তির নানামুখী অনুরণন, প্রবৃত্তির জাগরণ-সুপ্তি ও নদীমাতৃক বাংলাদেশের নিসর্গ-চিত্র উপস্থাপনে তাঁদের শিল্পানুভবের পরিচয় লক্ষ করা যায়। তবে কথাসাহিত্যিকের কাজ, 'সমকালীন জীবনের বাস্তবতার ছবি আঁকাই নয় শুধু, এমন কি সামগ্রিক ছবি দেওয়াও নয়, তাঁর কাজ সমকালীন জীবনকে আমূল কেটে কেটে বিশ্লেষণ করে দেখানো, সবকটি স্তর, আঁশ, তার গভীরতম স্বরূপ, জীবনের সমস্ত তন্ত্র আলাদা করে ফেলা এবং একেবারে চোখের সামনে আনা'।[৩৮] যতোটা সমাজ-ঘনিষ্ঠ হলে অস্ত্রচিকিৎসকের ভূমিকায় গ্রামীণ জীবনের বিবর্ণ, ক্ষয়িষ্ণু ও নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে' রূপায়ণ করা যায় চল্লিশ দশকের গল্পকারগণ পুরোপুরি সে ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেননি। এ সময়ের গল্পকারগণ আঙ্গিক ও প্রকরণগত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ততোটা উৎসাহী ছিলেন না। তবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, সোমেন চন্দ, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখের গল্পে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য ও নতুনতর মাত্রা পরিদৃশ্যমান। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পে অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও সোমেন চন্দের গল্পে মার্কসবাদী জীবনদৃষ্টি অনুসৃত; উভয়ই বাংলাদেশের ছোটগল্পে স্ব-স্ব ধারার সূচনাকারী। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বহির্বাস্তবতার চেয়ে মানবমনের জটিলতা উদ্‌ঘাটনে বেশি মনোযোগী। আবুল মনসুর আহমদ বাংলাদেশের ছোটগল্পে সূচনা করেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ধারা। তাঁর ব্যঙ্গাত্মক রচনা নিছক ভাঁড়ামি বা ক্যারিকেচার নয়; সমাজবাস্তবতার অসঙ্গতি থেকে উদ্ভূত।

এ সময়ের অনেক গল্পকারই বিষয়-বক্তব্য ও চরিত্র নির্মাণের দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়েছিলেন। ফলে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁদের সযত্ন অনুশীলন পরিলক্ষিত হয় না। তবে মুনীর চৌধুরী ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এসব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তাঁরা বিষয়ানুগ ও চরিত্রানুগ ভাষা ব্যবহারে গভীরভাবে মনোযোগী ছিলেন। স্বল্পকথায়, চল্লিশের দশকে গল্পকারদের মধ্যে আবুল মনসুর আহমদ, মাহবুব-উল-আলম, সোমেন চন্দ, মতিনউদ্-দীন আহমদ, আবুল ফজল, মবিনউদ্দীন আহমদ, আবু জাফর শামসুদ্দীন প্রমুখ যেমন বাংলাদেশের ছোটগল্পের পথ নির্মাণে তেমনি শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, আবু রুশ্দ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম ছোটগল্পের শিল্প-প্রকরণ ও ভাষার শৈলী গঠনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। চল্লিশের দশকের গল্পকারদের হাত ধরে সাতচল্লিশোত্তরকালে যথার্থ অর্থে বাংলাদেশের ছোটগল্পের যাত্রা শুরু হয় এবং পরবর্তী কালে অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকের গল্পকারগণ পূর্বসুরিদের পথ ধরেই অনেক দূর অগ্রসর হন। বলা হয়ে থাকে, বাংলাদেশের ছোটগল্পের ধারায় ষাটের দশক বিপুল পরিবর্তনের সূচক। এই পরিবর্তনের, ব্যাপকতর পালাবদলের মূলস্রোত পূর্ববর্তী কালের গল্পধারায় নিহিত। ষাটের বিচিত্র ফসলের বীজ উপ্ত হয়েছিল চল্লিশের প্রায়-উষর ভূমিতেই। 'চল্লিশের দশকের ছোটগল্পের ঐতিহ্যকে ধারণ করে এই যে সৃজনশীলতার অগ্রযাত্রা তার মধ্যে বৈচিত্র্য ছিল, জীবন উপলব্ধির বাস্তবতা ছিল। এভাবে যে ফসল উঠলো তার মূল্য সেজন্য কোন অংশেই কম নয়।'[৩৯] বাংলাদেশে ছোটগল্পের সূচনাপর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল উদার মানবতাবাদ, প্রগতিশীল সমাজ-ভাবনা ও মুক্ত চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ। পরবর্তী কালের গল্পে সূচনাপর্বের এসব বৈশিষ্ট্য প্রবলভাবে উপস্থিত। জীবনের সমস্যা-সংকট-সংকুলতা থেকে উত্তরণের যে পথ চল্লিশের দশকের গল্পকারদের হাতে নির্মিত ও শক্তিশালী হয়েছিল আজকের বাংলাদেশের ছোটগল্প সেই ঋদ্ধ উত্তরাধিকার বহন করে ক্রম-অগ্রসরমাণ।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ আবুল মনসুর আহমদ, *আয়না*, নবম সংস্করণ,'কাজী নজরুল ইসলাম লিখিত মুখবন্ধ'(ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৮৮), পৃ. ভূমিকা-পাঁচ।

২ আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ৪৭।

৩ মাহবুব-উল-আলম, 'ঈদ', *তাজিয়া*, ৩য় সংস্করণ, (চট্টগ্রাম: ১৯৯৬), পৃ. ২৭।

৪ খালেদা হানুম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প*, (চট্টগ্রাম: এ্যাডর্ণ পাবলিকেশন, ১৯৯৭), পৃ. ২৬।

৫ আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য* , পৃ. ৬১।

৬ 'প্রবীণ সাহিত্যিকার দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ একদিন বর্তমান লেখককে বলেছিলেন, মতিনউদ্-দীন আহমদের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় বিভাগ পূর্বকালে কলকাতা থেকে, তাঁর কিছু গল্প নিয়ে। এবং গ্রন্থখানির নাম ছিলো 'চেরাগ'। কিন্তু বিভিন্ন মহলে খোঁজ-খবর নিয়ে আমি তাঁর এ বক্তব্যের কোন সমর্থন পাইনি। অথচ আজরফ সাহেবের মত ব্যক্তির বক্তব্য ঠিক ফেলে দেয়ার মতও নয়। বিষয়টি তাই আমার কাছে এখনো অমীমাংসিত রয়ে গেছে।' আতোয়ার রহমান,*মতিনউদ্-দীন আহমদ,*(ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯০), পৃ. ৩৫।

৭ উদ্ধৃত, আতোয়ার রহমান,*মতিনউদ্-দীন আহমদ*, পৃ. ৩০।

৮ আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, পৃ. ৮০।

৯ আলাউদ্দিন আল আজাদ সম্পাদিত, *আবুল ফজল রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ভূমিকা-ছয়।

১০ আলাউদ্দিন আল আজাদ সম্পাদিত, *আবুল ফজল রচনাবলী*, ২য় খণ্ড , পৃ. ২৯।

১১ খালেদা হানুম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প* , পৃ. ৫৭।

১২ আলাউদ্দিন আল আজাদ সম্পাদিত, *আবুল ফজল রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫২।

১৩ খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ৪৬৭।

১৪ অনীক মাহমুদ, "আবু জাফর শামসুদ্দীনের উপন্যাস : প্রাসঙ্গিকতা ও শিল্পলোক", *আধুনিক সাহিত্য : পরিপ্রেক্ষিত ও প্রতিকৃতি*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ১০১।

১৫ আবু জাফর শামসুদ্দীন, *জীবন*, (ঢাকা: ১৯৪৮), পৃ. ৫-৬।

১৬ বিশ্বজিৎ ঘোষ 'বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ:ছোটগল্প',*বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ:ছোটগল্প*, সম্পাদক করুণাময় গোস্বামী,(নারায়ণগঞ্জ: সুধীজন পাঠাগার, ১৯৯৪), পৃ. ২৭৭।

১৭ 'যয়তুন' গল্প প্রসঙ্গে আজহার ইসলাম *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য* গ্রন্থে এ তথ্য দিয়েছেন। প্রকৃত তথ্য এ রকম: 'যয়তুন' গল্পটি ১৯৫৪ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ভাঙ্গা বন্দর' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। তখন মবিনউদ্দীন আহমদ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের কথা ভাবেননি। ১৯৭০-এ প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর ১৯৭৪ সালে তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহণ করেন। ফলে 'যয়তুন' গল্পে দ্বিতীয় দারগ্রহণ প্রসূত মানসিক যন্ত্রণার প্রতিফলন সম্ভব নয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : আতোয়ার রহমান, *মবিনউদ্দীন আহমদ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), প. ২৩।

১৮ আতোয়ার রহমান, *মবিনউদ্দীন আহমদ*, পৃ.৪৩-৪৪।

১৯ অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*, (রাজশাহী: ইউরেকা বুক এজেন্সী,১৯৯৫), পৃ. ৩৫।

২০ শওকত ওসমান, *জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প*, (ঢাকা: ১৩৫৮), পৃ. ৯০।

২১ অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান*, পৃ. ১৩৬।

২২ আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ২৬৬।

২৩ খালেদা হানুম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প*,পৃ. ১২৮।

২৪ বিশ্বজিৎ ঘোষ 'বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ:ছোটগল্প',*বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ:ছোটগল্প*, সম্পাদক করুণাময় গোস্বামী, পৃ. ২৭৪।

২৫ আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা*,পৃ. ৩১৯।

২৬ বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'সোমেন চন্দ : প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী', *সোমেন চন্দ রচনাবলী*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ৩২৩।

২৭ রণেশ দাশগুপ্ত, *আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ*, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী,১৯৮৬), পৃ. ২১০।

২৮ বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'সোমেন চন্দ : প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী', *সোমেন চন্দ রচনাবলী* , পৃ. ৫৬।

২৯ আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, পৃ. ৭৪।

৩০ বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'সোমেন চন্দ : প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী', *সোমেন চন্দ রচনাবলী*, পৃ. ৩৩৩।

৩১ আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা*, পৃ. ১৬০।

৩২ আবদুল মান্নান সৈয়দ,'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগল্প', *দিবারাত্রির কাব্য*, সম্পাদক আফিফ ফুয়াদ, (গল্পসংখ্যা), ষষ্ঠবর্ষ, ৩য় সংখ্যা, (কলকাতা: ১৯৯৮), পৃ. ৩১১।

৩৩ সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), পৃ. ১০।

৩৪ আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, পৃ. ২২৩।

৩৫ আনিসুজ্জামান সম্পাদিত *মুনীর চৌধুরীর রচনাবলী*, ৪র্থ খণ্ড, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৩৪।

৩৬ 'দুই হৃদয়ের তীর' গল্পগ্রন্থের 'নিবেদন'-এ গল্পকার লিখেছেন :

> 'এই গল্পগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্পাদক-বন্ধুদের তাগিদে লেখা। কিন্তু সংকলনকালে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এ জাতীয় অন্যান্য বহু লেখা ছিলো, কিন্তু সেই সব গল্পের কোনো কপিই আমার কাছে নেই। আরেক কথা, আজাদ পত্রিকা-সম্পাদক ও আমার নাম এক হওয়াতে যেসব অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে, তার অবসানের জন্য এখন থেকে আমার নাম 'শামসুদ্দীন আবুল কালাম' বলে লেখা হবে।'সৈয়দ আবুল মকসুদ, "শামসুদ্দীন আবুল কালাম', সেলিনা বাহার জামান সম্পাদিত, *শামসুদ্দীন আবুল কালাম স্মারকগ্রন্থ*, (ঢাকা: বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৮), পৃ. ৯৪।

৩৭ শামসুদ্দীন আবুল কালাম, *শাহের বানু*, ২য় সংস্করণ, (কলিকাতা: নবযুগ প্রকাশনী, ১৯৫৭), পৃ. ৪৯।

৩৮ হাসান আজিজুল হক, *কথাসাহিত্যের কথকতা*, ২য় সংস্করণ,(ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪), পৃ. ২৭।

৩৯ আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *বাংলাদেশের নির্বাচিত ছোটগল্প*, (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৩৯৫ বা.স.), পৃ. পূর্বলেখ।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ৯ম সংখ্যা ১৪০৮

বাংলাদেশের নকশি কাঁথা

আবু তাহের*

Abstract: Nakshi Kantha is a very atractive and skillful folk art form of Bangladesh. This paper maps out ist historical evolution and aesthetic qualities while special emphasis is given on its characteristics as an embroidery art form. This paper also shows the distinction between ordinary Kantha and Nakshi Kantha highlighting the process of its making, uses, techniques, its remarkable form or motif, and its use of curves, line and colours. Finally, this paper discusses the means and possibilities of its development and uses.

ভূমিকা

নকশি কাঁথা বাংলাদেশের লোকশিল্পের একটি উন্নত ও চিত্তাকর্ষক 'সূচিশিল্প'। নকশি কাঁথাকে এমব্রয়ডারিকৃত কাঁথাও বলা হয়ে থাকে। এই শিল্পের স্রষ্টা আমাদের দেশের অশিক্ষিত গ্রাম্য মহিলাগণ। কাঁথা অনেক দেশের মহিলারাই তৈরি করে থাকেন, কিন্তু নকশি কাঁথা তৈরির সূক্ষ্ম এবং অনুভূতিশীল শিল্পনৈপুণ্য সম্ভবত বাংলাদেশের গ্রাম্য মহিলাদের মধ্যেই সবচেয়ে সুন্দরভাবে বিদ্যমান। অতীতে কাঁথা তৈরি হতো বিক্রয়ের জন্য নয়, কোনো ধনী লোক এর জন্য ফরমায়েস করতেন বলেও নয়, এমনকি ঘর সাজানোর সচেতন উদ্দেশ্য নিয়েও নয়। প্রাথমিকভাবে নকশি কাঁথা পরিবারের সদস্যদের উপহার দেবার জন্য তৈরি হয়ে থাকে। সাধারণত পরিত্যক্ত পুরানো শাড়ি, লুংঙ্গি, ধুতি বা তার অংশবিশেষ দিয়ে গ্রামের মহিলারা অবসর সময়ে কাঁথা তৈরি করে থাকেন। পুরাতন বস্ত্রের কয়েকটি স্তর একত্রে বিছিয়ে প্রয়োজন মতো পুরু করে সাজিয়ে নেওয়া হয় এবং সেলাইয়ের জন্য রঙিন সুতা সাধারণত পুরাতন কাপড়ের পাড় থেকে সযত্নে সংগ্রহ করা হয়। অনেক সময়ে পুরাতন কাপড়ের বিভিন্ন ডিজাইন নকশি কাঁথায় ব্যবহার করা হয়।

নকশি কাঁথার প্রতিটি ফোঁড় যেন গ্রাম-বাংলার নারীদের অব্যক্ত মনের অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। বিভিন্ন মোটিফে ছড়িয়ে আছে তাদের স্নেহ ভালবাসা। প্রতিটি ডিজাইন যেন তাদের কথামালার ভাণ্ডার, এর ফোঁড়ে ফোঁড়ে ছড়িয়ে আছে তাদের হৃদয়ের ব্যথা-বেদনা, কামনা-বাসনা, অফুরন্ত চাওয়া-পাওয়া। কাঁথা তৈরি করতো পল্লি রমণী তার মনের ভেতরের অনুপ্রেরণা থেকে। নান্দনিক অনুভূতি ঢেলে দিয়ে কারুকার্যময় করে গড়ে তুলতো কাঁথার পাটাতন। কাঁথা ছিলো তার ছবি আঁকার পট, অক্ষরের পাতা ও রোজনামচা। তার চিন্তা অনুভূতি, কল্পনা রূপান্তরিত হতো এতটা যে শুধু তার সুখের স্বপ্ন নয়, তার বিভীষিকা ও ক্রোধও বস্ত্রের উপর নকশা হিসেবে ফুটে উঠতো। নিঃসন্দেহে সুচ ও সুতার সাহায্যে এই প্রেরণালব্ধ সৃষ্টি এমনই এক হস্তনৈপুণ্যের নির্দেশক যা যৌক্তিকতা ও প্রশিক্ষণ বহির্ভূত, সৃষ্টির আনন্দই এর মূল উদ্দেশ্য। নকশি কাঁথার বিভিন্ন ডিজাইনে মানব জীবনের চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটে। আবার এই ডিজাইনের মধ্যেই প্রকাশ পায় সুখ-দুঃখ, কৃষ্টি, ধর্মীয় অনুভূতি, ঐতিহাসিক উপাদান ও পৌরাণিক বিষয়বস্তু। এই সমস্ত অনুভূতি থেকেই প্রকাশ ঘটে আমাদের সৌন্দর্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

প্রয়াত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন তাঁর নিজের জন্য এবং সোনারগাঁ লোকশিল্প যাদুঘরে সংরক্ষণের জন্য বেশ কিছু কাঁথা সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এসব লোকশিল্পের উপাদানগুলো থেকে ভবিষ্যৎ বংশধররা গবেষণার মাধ্যমে তাদের নিজেদের ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে আবিষ্কার করতে পারবে। পল্লী কবি

* ড. আবু তাহের, সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

জসীমউদ্‌দীন তাঁর 'নকশী কাঁথার মাঠ' গীতিকাব্যে গ্রাম-বাংলার নারীদের জীবনযাত্রার ছবি তুলে ধরেছেন। তাঁর এই মহৎকর্ম বাঙালি সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। 'নকশী কাঁথার মাঠ' গ্রন্থটি প্রকাশনার ছয় বছর পর 'নকশি কাঁথা' একটি 'আর্টফর্ম' হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের নকশি কাঁথার উপর তিন পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে নকশি কাঁথার উপর প্রচুর লেখা বের হয়। স্ট্রেলা ক্রামরিশ এবং জি. সি. দত্ত কাঁথার নান্দনিক গুণাগুণের উপর আলোকপাত করেন। এ সময়ে অজিত মুখার্জী কাঁথাতত্ত্বের অবতারণা করে বলেন যে, কাঁথা শিল্প হচ্ছে বাংলার লোকশিল্প চর্চার সবচেয়ে সুন্দর কর্মগুলোর একটি।[১] অবিভক্ত বাংলায় এই কাঁথা শিল্পের ব্যাপক প্রচলন ছিল, তবে বাংলাদেশেই তৈরি হতো সবচেয়ে বেশি। রাজশাহী, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা এবং ফরিদপুর অঞ্চলেই নকশি কাঁথা তৈরি হতো সবচেয়ে বেশি। অবশ্য বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, জামালপুর এবং ঢাকা এলাকাতেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কাঁথা প্রস্তুত হতো।

নকশি কাঁথা এখনও তৈরি হচ্ছে তবে প্রতিযোগিতার জন্য এগুলোতে আধুনিকতার ছোঁয়া বিদ্যমান। কিন্তু কাঁথার শিল্পসত্তা একেবারে অটুট না থাকলেও একেবারে হারিয়ে যায়নি। আগের দিনের কাঁথার নমুনা এখনও বাংলাদেশের সোনারগাঁ লোকশিল্প যাদুঘর, বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘর, কলকাতা আশুতোষ যাদুঘর ও গুরুসদয় যাদুঘরসহ অন্যান্য সংগ্রহশালায় কিছু কিছু দেখা যায়। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান আদি শিল্পসত্তা অটুট রেখে বর্তমানে নকশি কাঁথা তৈরির একটি প্রকল্প চালু রেখেছে। তাছাড়া, বিভিন্ন সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান, নারী সংগঠন ও এনজিও গুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় সম্প্রতি কাঁথা শিল্পে রেনেসাঁ এসেছে বলা যেতে পারে।

এমব্রয়ডারি একটি শিল্প মাধ্যম

"সারা বিশ্বব্যাপী এমব্রয়ডারি আর্টের সনাতনী ঐতিহ্য খুব আগ্রহের সাথেই স্বীকার করে নেয়া হয়। আর প্রাচ্যে এই আর্ট ফর্মের জন্ম–একথা বিশ্বাস করার পেছনে অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে।"[২] প্রাচীনকালে নারী ও পুরুষ সকলেই উন্নতমানের এমব্রয়ডারি করা পোশাকাদি ব্যবহার করতো। গ্রিক চিত্রকলা থেকেও একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। এদিকে মহেঞ্জোদারো খনন কাজের সময়ে ব্রোঞ্জ নির্মিত সুচ পাওয়া গেছে। সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলের সভ্যতার নিদর্শনে এমব্রয়ডারি কাজ করা পোশাকাদির প্রমাণ থেকে বলা যায়, সে সময়কার বিলুপ্ত সভ্যতাও এমব্রয়ডারি শিল্পের সাথে পরিচিত ছিল। ক্লাসিকাল যুগের রচনায় এবং ভাস্কর্যে এমব্রয়ডারি শিল্পের অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান। ভারহুত ও সাঁচিতে অবস্থিত বৌদ্ধযুগীয় ভাস্কর্যের গাত্রে খচিত পোশাকাদিতে এমব্রয়ডারি কাজের নিদর্শন পাওয়া যায়। পোশাকাদির মধ্যে গলাবন্ধ, ঘোমটা, জামা ও বিভিন্ন ধরনের জ্যাকেটে এমব্রয়ডারি কাজ করা রয়েছে। এ ধরনের চিত্রকলা থেকে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, এমব্রয়ডারির কোনো বিশেষ রীতি তাতে ব্যবহৃত হয়নি। তবে অজন্তা ডিজাইনের সাথে এসবের সাদৃশ্য রয়েছে। বলাবাহুল্য, এ ধরনের চিত্রে জ্যামিতিক নকশা বহুলভাবে ব্যবহার হয়েছে। কখনও কখনও এগুলোকে সজীবতা দান করার জন্য হংস ও সিংহের সারিবদ্ধ যাত্রা নকশা করা হয়েছে। তবে ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকের মোগল কিংবা ইন্দো-পারশিয়ান চিত্রকলায় যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি আছে সেইরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য এইসব চিত্রকলায় লক্ষ করা যায় না। স্মরণাতীতকাল থেকে বাঙালির সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এমব্রয়ডারি করা কাঁথা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পৌরাণিক ও কাল্পনিক গল্প-গাঁথার সুস্পষ্ট প্রভাব এই কাঁথাগুলোতে বিদ্যমান। (চিত্র নং ১) উল্লেখ্য, এই শিল্পগুলো নকল প্রবণতার প্রভাব থেকে মুক্ত। প্রতিটি শিল্পকর্ম যেন মানব জীবনের গতিধারার সাথে সম্পৃক্ত। মানব মনের শাশ্বত আবেগ ও আগ্রহ প্রকাশের প্রচেষ্টাগুলো এর মধ্যে গতিশীলতার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

বাঙালির কাঁথা হচ্ছে লোকশিল্পের নিখুঁত সৌন্দর্যমণ্ডিত উপাদানগুলোর একটি। অথচ এই কাঁথা তৈরিতে পুরাতন সুতা ও কাপড় ব্যবহৃত হয়, তা সত্ত্বেও এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য অপরিসীম। "একজন চিত্রশিল্পী যেমন তার দেখাকে রং ও তুলির মাধ্যমে প্রকাশ করে——তেমনি একজন সাধারণ মহিলা সুচ ও বিভিন্ন রংয়ের সুতা দিয়ে এমব্রয়ডারির মাধ্যমে তার স্বকীয়তা প্রকাশ করে।"[৩] কাঁথার বিভিন্ন কারুকার্যে যাদু ও লোক-বিশ্বাসের উপস্থিতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কারণ গ্রামীণ মানুষ প্রকৃতির খামখেয়ালির প্রতি আনুগত্যে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার তাদের জীবনে উল্লেখযোগ্য অংশ হিসেবে প্রভাব বিস্তার করে আছে।

প্রতিটি কাঁথা সেলাইকারীর নিজস্ব ঢঙে তৈরি হয়। একজন মহিলা তার কল্পনা জগতের ব্যক্ত-অব্যক্ত কথাগুলো যতদূর সম্ভব কাঁথার মধ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। কল্পনার যেমন রকমভেদ আছে তেমনি নকশি কাঁথা তৈরির মধ্যেও রকমভেদ রয়েছে। যে কোনো আকার আকৃতির বা গঠনের নকশা হোক না কেন সুচের ফোঁড়ে বিষয়বস্তুর ছাপ তাতে পরিষ্কার হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন রঙের সুতায় তা জীবন্ত বলে মনে হয়। এমব্রয়ডারি কাঁথার কারুকার্যে প্রকৃতির ছোঁয়া যেন সর্বত্র বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে কাঁথার সৌন্দর্য প্রকাশ পায় শিল্পীর বিস্তৃত কল্পনা ও অদ্ভুত দক্ষতা। প্রাচীন লোকগাথা এবং বীরত্বের কাহিনীও কখনো কখনো চিত্রের মাধ্যমে কাঁথায় বর্ণনা করা হয়।

কাঁথা ও নকশি কাঁথা

মানুষের প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য থেকেই বিভিন্ন হস্তশিল্পের জন্ম হয়েছে। শিকারের জন্য যেমন হাতিয়ার তৈরি হয়েছিল ও কৃষি কাজের জন্য যন্ত্রপাতি তৈরি হয়েছিল, তেমনি গৃহকার্যের প্রয়োজনে উদ্ভাবিত হয়েছিল বুদ্ধিদীপ্ত সৃষ্টি। মানুষ তার দৈনন্দিন ব্যবহার্য বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী তৈরি করে এবং তা সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করে। এই সব দ্রব্য সুন্দর ও আকর্ষণীয় করতে তারা রং ও রেখার সাহায্যে বিভিন্ন জনপ্রিয়, আনুভূতিক ও হৃদয়স্পর্শক মোটিফ বা প্রতীক ব্যবহার করে। আর এই সব মোটিফগুলো হচ্ছে সাংকেতিক যা লোকশিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য। বাস্তব বা অলীক কল্পনার সংকেত সাধারণভাবে জনপ্রিয় হলে নিশ্চিত একটি ধারণার সূত্রপাত ঘটে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাচীন ধর্ম-বিশ্বাস এবং প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস লোকশিল্পের মোটিফের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

রেখার সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়কে রূপ দিতে বা মনের ভাবকে প্রকাশ করতে বিভিন্ন মোটিফ বা প্রতীক নকশা তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। রং ব্যবহারেও এই সব প্রতীক বিভিন্ন অর্থ বহন করে। সাধারণত সাংকেতিক নকশায় যে সব কাঁথায় নকশা তৈরি করা হয় তাকেই নকশি কাঁথা বলে। সাধারণ কাঁথা ও নকশি কাঁথার মধ্যে পার্থক্য হলো–নকশি কাঁথা খুব সতর্কতার সাথে সুন্দরভাবে সূচিকর্মের মাধ্যমে নকশা করা হয়। এর রং ও নকশাগুলো শুধুমাত্র সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যই তৈরি করা হয় না, এগুলো কিছু সাংকেতিক অর্থও বহন করে। আর দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য যা শুধু কাঁথা হিসেবেই ব্যবহার করা হয় তা খুব সাধারণভাবে তৈরি করা হয়। 'নকশি' কথাটা কাঁথার এমব্রয়ডারির অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কাঁথার বিবর্তন ও ব্যবহার

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে 'চর্যাপদ'-এ কাঁথার উল্লেখ রয়েছে। চর্যাপদের পর মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যকর্মে বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যেও এমব্রয়ডারির কাঁথার উল্লেখ রয়েছে। চর্যাপদের রচনাকাল দশম শতাব্দীর নিকটবর্তী। এদিক থেকে বিবেচনা করলে অনুমান করা যায় যে, সেকালে এদেশে কাঁথার প্রচলন ছিল। বর্তমানের কাঁথাশিল্পের প্রতিষ্ঠাকাল উনিশ শতকের মাঝামাঝির আগে। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, অতীতের কাঁথা শিল্পের অবলুপ্তি ঘটেছে আর্দ্র আবহাওয়া এবং বন্যাজনিত কারণে। স্টেলা ক্রামরিশ মনে করেন যে, কাঁথা শিল্পের সাথে অতীতের একটা যোগসূত্র রয়েছে। যদিও আঠার শতকের আগে এর উদ্ভবের সঠিক কোনো সময় কেউ দিতে পারেননি। বর্তমান কাঁথা শিল্পের উন্মেষকাল যে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ, বঙ্গাব্দ ১২৮২, তা এসব কাঁথার পাশে দেওয়া বর্ডার থেকে জানা যায়।

বাংলার মানুষ প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠ। প্রাকৃতিক শক্তিই মানুষের সামাজিক জীবন পরিচালিত করে। প্রকৃতি এবং ইন্দ্রজালের সাথে এদেশের দুইটি শিল্পমাধ্যমের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র লক্ষ করা যায়। এই দুইটি শিল্পেরই অনুশীলন ও চর্চা করে থাকেন এদেশের মহিলারা। একটি আলপনা এবং অন্যটি কাঁথা। এর দুইটির শিল্পের উৎস মূলত এক এবং অঙ্কনশৈলী ও বিষয়বস্তুও এক। কৃষিভিত্তিক সমাজের লোকের বিশ্বাস বা ধর্ম সাধারণত প্রকৃতি বিষয়ক এবং প্রকৃতির খেয়ালখুশি থেকেই এর উৎপত্তি। আমরা জানি যে, সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সর্বাপেক্ষা প্রাকৃতিক ধর্ম হলো মাতৃকাশক্তির উপাসনা। বিভিন্ন দেবতারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির রক্ষক, তারাও স্ত্রীলোকদের উদ্ভাবিত আলপনা এবং কাঁথায় আচ্ছাদিত। স্ত্রীলোকেরা পরমাশক্তির কাছে প্রার্থনা করে তাদের নিকটতম এবং প্রিয়তমদের জন্য, তাদের গৃহের নিরাপত্তার জন্য, তাদের সমৃদ্ধির জন্য, তাদের স্বামীর স্বাস্থ্যের জন্য, অসংখ্য সন্তানের জন্য এবং প্রচুর শস্যের জন্য।

শুরুতে কাঁথা তৈরি হতো শীতকে ঠেকানোর জন্য। কাঁথার ব্যবহার বাংলাদেশে শুরু হয়েছে দীর্ঘ বর্ষা এবং মৃদু শীতের জন্য। মৃদু শীতের মাসগুলোতে এবং বর্ষার ঠাণ্ডা রাতগুলোতে একটা হালকা আচ্ছাদন প্রয়োজন হয়। তাই স্ত্রীলোকেরা অবসর সময়ে কাঁথা সেলাই করে বর্ষার দীর্ঘ মাসগুলোতে। কাঁথার টানাটানা সেলাইগুলোতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয় এদেশের তরঙ্গায়িত চঞ্চল নদীর জলরাশি। একটা বিশেষ উপলক্ষে কাঁথা সাধারণত উপহার হিসেবে প্রদত্ত হয়ে থাকে। মা একটা কাঁথা তৈরি করে দেয় তার আদরের মেয়েকে অথবা ছেলেকে, যখন তারা বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যায়। অথবা স্ত্রী তার স্বামীকে কাঁথা তৈরি করে দেয় যখন দূরে কোথাও স্বামী চাকুরিতে বা অর্থ উপার্জনে তাকে ছেড়ে যায়। দূর অবস্থানে যেন তার স্বামী মাথার নীচে কাঁথার তৈরি বালিশের আচ্ছাদনে অথবা গায়ে শীতের কাঁথা মুড়ে স্ত্রীর উষ্ণ ভালবাসার অনুভূতি অনুভব করে। এসব কাঁথায় নকশা থাকে, দৃশ্য থাকে। স্টেলা ক্রামরিশ বলেছেন–'কাঁথা যদি একটি সঞ্চয়ের কাজ হয় তাহলে এটা একটা ভালবাসারও কাজ, যা উপহার দেওয়া হয়ে থাকে আনন্দ অনুষ্ঠানে তার প্রিয়জনকে'। শীতের সময় শরীরকে আচ্ছাদিত করার কাঁথা সাধারণত বড় আকারের হয়ে থাকে। কাঁথা কখনও ভাঁজ করে জিনিসপত্র রাখার আধার হিসেবে ব্যবহার করা যায়, যেমন–বই, মূল্যবান দ্রব্যাদি, আয়না এবং চিরুনি। আবার সম্মানীয় মেহমানদের বসবার আসন হিসেবেও ব্যবহার হয়ে থাকে। কখনও তা ছোট আকারেও হয়ে থাকে, যা বালিশের আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীনকালে কাঁথা কখনও কিনতে পাওয়া যেত না। হাতের কাছে যেসব উপকরণ পাওয়া যায় তা দিয়েই কাঁথা তৈরি হয় এবং যে তৈরি করে সে কোনো কিছুই কিনতে খরচ করতো না। বাংলাদেশ চিরকালই ছিল তুলো উৎপাদনের এবং তাঁত বোনার দেশ। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, সুতি কাপড়ই এসব কাঁথার জন্য ব্যবহার হয়। আর কাঁথা তৈরিতে সাধারণত কোনো নতুন কাপড় ব্যবহার করা হয় না। শুধুমাত্র অব্যবহার্য, অপ্রয়োজনীয় এবং বাদ দেওয়া পোশাকাদির কাপড় থেকেই এগুলো তৈরি হয়।

নির্মাণ কৌশল

ঐতিহ্যগতভাবে পুরাতন কাপড় দ্বারাই সাধারণত কাঁথা তৈরি করা হয়। মেঝের উপর একটির পর একটি পুরাতন কাপড় স্তরে স্তরে বিছিয়ে এর পাশগুলো সুন্দরভাবে আগে সেলাই করে নেওয়া হয়। বড় আকারের কাঁথা কয়েকজন মহিলা একত্রে মিলে সেলাই করে থাকে। কাঁথা দুইভাবে সেলাই করা যায়, প্রথমত যে কোনো এক প্রান্ত থেকে সেলাই শুরু করা হয় অথবা মাঝখানে থেকেও সেলাই শুরু করা হয়। তারপর আস্তে আস্তে প্রান্ত পর্যন্ত আসে। সবশেষে পেছনের দিকে সেলাই করা হয়। প্রথমে মাঝে মাঝে কয়েকটি ফোঁড় দিয়ে সাজিয়ে নেবার পর শুরু হয় ভরাট সেলাই। স্টেলা ক্রামরিক বলেছেন- কাপড়ের চেয়ে সেলাইগুলো বেশি প্রাধান্য লাভ করে।

কাঁথা তৈরির জন্য পুরাতন কাপড়ের সাথে সেলাইয়ের কাজে পুরাতন সুতাও ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহার হয়। শাড়ির পাড়ের রঙিন সুতা সেলাইয়ের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এই সুতা পাকানো হয়, কেননা বহুবার ধৌত করার ফলে ইহা যথেষ্ট নরম হয়ে যায়। নতুন কাপড় দ্বারা কাঁথা তৈরি করার ক্ষেত্রেও আগে সেই কাপড়কে বেশ কয়েকবার ধুয়ে নিতে হয়। তবে সহজে প্রাপ্ত কাপড় দিয়েই সাধারণত কাঁথা তৈরি হয়। কাঁথার আকৃতির আয়তন কাঁথা শিল্পীর স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সম্ভবত কাঁথার পূর্বসূরি হলো ক্ষেতা (ক্ষেত অর্থ জমি), এক ধরনের আচ্ছাদন যা গ্রাম্য লোকেরা ব্যবহার করতো। পুরাতন শাড়ি ও ধুতি মিলিয়ে লম্বা লাইনবদ্ধভাবে সেলাই করে তা তৈরি করা হতো। গ্রাম্য স্বল্প পরিসর অর্থনীতিতে প্রয়োজনেই ক্ষেতার প্রচলন হয়েছিল, কিছু কালের মধ্যেই গ্রামের মেধাসম্পন্ন মহিলারা কাঁথার সম্ভাবনার কথা অনুধাবন করতে থাকেন এবং সূচিকর্মের ভেতর দিয়ে তাদের কল্পনার অধীত স্মৃতিরূপকে রূপায়িত করতে থাকেন। অলঙ্কারযুক্ত সেলাই, রেখাচিত্র, জ্যামিতিক ও আকৃতিযুক্ত চেহারার ক্রমবিকাশ কাপড়ের উপরে আসতে থাকে এবং প্রত্যেক অঞ্চলের গ্রাম্য মহিলাদের অন্তর্নিহিত সৃজনী শক্তির প্রভাবে নব নব রীতির জন্ম হতে থাকে।

লোকগাথা ও কিংবদন্তীর বিভিন্ন দেবদেবী ও উপাস্যের আকৃতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে এবং আলপনা নমুনার বিস্তৃত প্রয়োগকে কেন্দ্র করে যশোহর ও ফরিদপুরের কাঁথার রীতির সুখ্যাতি গড়ে উঠতে থাকে। কাঁথার জগতে যশোহর ও ফরিদপুরের সেলাইয়ের ধরন সবচেয়ে সুন্দর। এসব কাঁথার জমিনের সেলাইয়ের

আঙ্গিক রীতিতে অতুলনীয় সূক্ষ্ম ফোঁড় তুলে, সুতা টেনে তরঙ্গায়িত করা হয়। খুলনা জেলায় কাঁথার মোটিফের ক্ষেত্রে জাঁকজমকের চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছিল–পত্রপুষ্পশোভিত বড় পাড় কল্কা ও বিদেশি পৌরাণিক প্রতীক ব্যবহার করে। রঙিন সুতার ব্যবহারও ছিল স্পন্দময় ও বৈপরীত্য নির্দেশক। কুষ্টিয়ার কাঁথা সুন্দর পাড়তোলা, উদ্ভিদকুল, প্রাণী ও পাখির নমুনা সংবলিত। ময়মনসিংহের কাঁথা তৈরির কেন্দ্র ছিল জামালপুরে। এই কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর পরিবর্তে গীতিময় রীতিতে দেশীয় শিল্পকলার মোটিফ ব্যবহারের মাধ্যমে কাঁথার বিকাশ সাধন করেছিলো। সেলাইকর্ম প্রধানত রৈখিক ধরনের, গতানুগতিক সূচিকর্ম, শৃঙ্খল, হেরিংবোন, স্টেমস্টিচ ও ক্রসস্টিচযুক্ত। বগুড়া জেলার কাঁথায় রয়েছে স্বতন্ত্র পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন যা আঁকাবাঁকা গাছগাছালি ও সনাতনী পত্র প্যাটার্ন এবং গতানুগতিক গোলাপ ফুলের নমুনা চিত্রিত। লাল, কালচে, নীল ও হলুদ রঙের শক্তিশালী ব্যবহারসহ ভোরাত ও স্টেমস্টিচ বিশেষ শোভা সৃষ্টি করে। রাজশাহীর কাঁথা ভারী ও শক্ত বুনোট ডিজাইনের ফরমাট অনুযায়ী কাজ করার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে। কিছু কিছু কাঁথার ভেতরে মোটা চট দেওয়া হয় যাতে তা স্থায়িত্ব লাভ করে (ভেতরের স্তর বাইরে প্রকাশের জো নেই)। ফলে দুই নমুনার কাঁথা বিকাশ লাভ করে। এক নমুনা হলো লাল, নীল, কালো ও সাদা বর্ণের বস্ত্রে পুনরাবৃত্তিমূলক সূচিকর্ম যা লোহোরিয়া কিংবা কায়ইতিয়া সেলাই নামে পরিচিত এবং অন্য নমুনা হলো সনাতনী কার্পাস বস্ত্র শালু ব্লক বা মুদ্রিত প্যাটার্নসহ উজ্জ্বল ক্রস সেলাই দিয়ে তৈরি। রাজশাহী একমাত্র জেলা যেখানে তল ডিজাইনের ক্ষেত্রে প্যাটার্ন ব্লক ব্যবহৃত হতো এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যূনতম ইচ্ছামাফিক সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটতো। অপরপক্ষে এতে একটি অনন্য ফরম্যাট আকার বিকশিত হতো। এই ডিজাইনসমূহের সঙ্গে ইসলামি আরব্য ডিজাইনের স্পষ্ট সাদৃশ্য ছিল এবং সাধারণভাবে কার্পেট কাঁথা বলে উল্লিখিত হতো, যার সঙ্গে বুনোয় কার্পেট প্যাটার্নের যোগ ছিল। রাজশাহীর সুজনি কাঁথায় যে জটিল প্যাটার্নের নকশা থাকত তা শালুর উপর বুটি তোলা। সাদা সুতার সাহায্যে সূক্ষ্ম সেলাই সীমাহীন প্যাটার্নের ইঙ্গিত বহন করে। প্যাটার্নসমূহ হিন্দু ও ইসলামিক পত্রযুক্ত প্যাটার্নের এক অনবদ্য সংমিশ্রণ।[৪]

(ক) রেখা

বিভিন্ন রকমের বর্ডার বা পাড় সংবলিত কাঁথা দেখতে পাওয়া যায়। এককেন্দ্রিক পাড়যুক্ত কাঁথার সেলাই ভেতর থেকে বাইরে ধারের দিকে দেওয়া হয়। পাড় দেওয়া কাঁথায় পাড়ের মাধ্যমে দিগন্ত ভাগ করা হয়। প্রথমে পাড় শেষে বাকি অংশ সেলাই করা হয়। নকশাগুলো সরাসরি সেলাই দিয়ে তৈরি করা হয়। এর অনেক তারতম্য আছে। যশোহরে 'শাড়ির পাড়' বা বর্ডারযুক্ত কাঁথাতে লম্বালম্বিভাবে টানা সেলাই দেওয়া হয় অথবা বাইরের পাড়ের সাথে সমান্তরালভাবে করা হয়। ফরিদপুরের পাড়যুক্ত কাঁথায় সামান্য কিছু পার্থক্য থাকলেও মূলত তা যশোরের কাঁথার মতোই। ফরিদপুরের কাঁথা যশোহরের চেয়ে অনেক বেশি রংচঙে হয়, কিন্তু উভয় কাঁথাই চিত্রধর্মী এবং পাড়ের রেখাবিশিষ্ট।

কাঁথাতে এমব্রয়ডারি সেলাইয়ের সংখ্যাগুলোর মধ্যে আদি এবং সবচেয়ে মৌলিক হলো টানাসেলাই। এর অনেক প্রকারভেদ রয়েছে। 'কাইত্য' বা বাঁকানো সেলাই টানা সেলাইয়ের একটা ধরন। এই টানা সেলাই বা 'ডারনিং' সেলাইয়ের আর একটা প্রকারভেদও কাঁথাতে পাওয়া যায় যা এমব্রয়ডারি করার সময়েই বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই সেলাই ফোঁটা বা ফুটকির ব্যবহারে এক বিশেষ ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। 'চাটাই' পদ্ধতিতে সেলাই হচ্ছে বাঁশের মাদুর বানানোর রীতিতে সেলাই করা। এই পদ্ধতিতে সেলাই সাধারণত একটার সাথে অপরটা ঘন সমান্তরালভাবে করা হয়। যশোরের সেলাইতে রিপুকর্মের মধ্যে কিছু বিভিন্নতা থাকে। কাঁথা সেলাইয়ের জন্য আড়াআড়ি ফোঁড় হচ্ছে এক নতুনতর পদ্ধতি। এটা রাজশাহীতে তৈরি হয়। আড়াআড়ি সেলাই চাঁপাইনবাবগঞ্জে 'লিকফোঁড়' বা হলবিন সেলাই নামে পরিচিত। এই সেলাই সম্পন্ন করতে সুঁচকে তিনবার সেলাই কাজে লাগাতে হয়। এই 'লিকফোঁড়' যশোরে 'আনারশি' বা 'ঘর হাসিয়া' নামে পরিচিত। রাজশাহীতে 'লহরি' কাঁথা 'কাপা' থেকে তৈরি হয়। এতে সাদা কাপড়ের লাল অথবা নীল বর্ডার থাকে। 'লহরি' কাঁথা সেলাই করতে পুরাতন শাড়ির পাড়ের সুতা নেওয়া হয় না। সুতাগুলো 'টাইকা' দ্বারা পাকানো হয়। এই সুতা দ্বারা সরাসরি ও সমান্তরালভাবে সেলাই দেওয়া হয়। এগুলোতে ভঁঙ্গুর এবং তরঙ্গায়িত বুননি দেখা যায়। সে কারণে এগুলো 'লহরী' বা তরঙ্গযুক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ঘন সমান্তরাল ফোঁড় দিয়ে তরঙ্গযুক্ত বুননির ভাব

প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এতে সুবিন্যস্ত ও সুগোছাল ভাব প্রকাশিত হয়। স্থানে স্থানে রঙিন সুতার ব্যবহারের ফলে রঙিন তরঙ্গের প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়। সেগুলো সাদা সুতার সাথে আড়াআড়িভাবে বুনানো হয়। লহরি কাঁথার মধ্যে সবচেয়ে সাদামাটা হচ্ছে 'সোজা' বা সাধারণ কাঁথা। এর রয়েছে দণ্ডায়মান রেখার কাজ, যার ফলে টানাটানা বুনন বোঝা যায়।

সুজনি কাঁথায় সাধারণত ভেতরের অঙ্গগুলো পুরাতন কাপড় দিয়ে ভরা হয়। যদিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই ভরাটগুলো পাতলা তুলোর প্যাড হতে পারে। একেবারে সব তলের পরলটি নতুন আদ্দির কাপড়ের হতে পারে। তবে উপরের পরলটি সর্বদাই নতুন লাল শালু কাপড়ের হয়। সুজনির যে এমব্রয়ডারি সূচিকর্ম তা খুবই মনোরম, যা সেলাই কলের কাজ বলে ভ্রম হয়। নতুন সাদা সুতা ভাঁজ করে টাইকার সাহায্যে পাকিয়ে প্রায় সর্বদাই ব্যবহার করা হয়। যেসব কাঁথায় 'লিক' সেলাই ব্যবহার হয় সেগুলো সুজনির ভিন্নতর রূপ। আকর্ষণীয় 'লিক' টানাটানা সেলাই একটার পর একটা সারি দিয়ে করা হয়। প্রথম সারির সেলাইয়ের সাথে সমান্তরালভাবে আবার দ্বিতীয় সারিবদ্ধ সেলাই করা হয়। পূর্ববর্তী সমান্তরাল সারির মতোই একই সংখ্যায় পরবর্তী সারিগুলো করা হয়। এরপর কাঁথাকে উল্টে ফেলা হয় এবং সারিবদ্ধ সেলাইগুলো জোড়া দেওয়া হয়। এই বুননের অনেক ধরনের প্রকারভেদ দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি পৃথক নাম আছে, যেমন–'লিকটান', 'লিক টাইল', 'লিক ঝুমক', 'লিক লহরি'। একটি কাঁথাকে একই বুননে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

(খ) রং

একটা কাঁথার সেলাইয়ের জন্য সুতার ব্যবহার নির্ভর করে একটা বিশেষ রঙের সুতার প্রাপ্তির উপর। অনেকবার ধোয়ার পর একটা পুরাতন শাড়ির সুতার রং হারিয়ে ফেলে। সুতরাং পুরাতন কাঁথায় কম রং দেখতে পাওয়া যায়। যেসব রং সহজেই নষ্ট হয়ে যায়, যেমন–হলুদ রং যা পুরাতন কাঁথায় পাওয়াই যায় না। তবে কিছু নতুন কাঁথায় যা শাড়ির পাড় থেকে নেয়া সুতার উপর নির্ভর করে না, সেগুলোতে অনেক ধরনের রং থাকে।

যেমনটা পুরানো কাঁথায় তেমনটা আলপনা নকশাতেও আমরা সাধারণত তিনটি রং লাল, কালো এবং সাদার বারবার ব্যবহার লক্ষ করে থাকি। তিনটি গুণ যথা–সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ, যথাক্রমে–সাদা, লাল এবং কালো দিয়ে বুঝানো হয়। এই তিনটি গুণের সমন্বয়ে আমাদের পার্থিব সকল গুণ এবং ব্যবহারের বিচিত্রধর্মী বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। সাদা রং পানি অথবা 'অপ'র গুণ প্রকাশ করে, যেমন–বিশুদ্ধতা, কোমলতা বা নমনীয়তা। আগুনের জ্বলন্ত শিখা বা লাল রঙের অগ্নি হচ্ছে 'রজঃ'-এর রং। এটা হচ্ছে কাজ, গতি এবং আকাঙ্ক্ষার রং। প্রকৃতির রং হচ্ছে কালো, যা কিনা খাদ্য বা 'আনা'র উৎপাদক। (তবে বর্তমানে চিত্রকলায় প্রকৃতির রং অর্থে সবুজ রংকে বোঝানো হয়।)

কে. কে. গঙ্গোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, কাঁথার রং প্রধানত তিন রকমের: হলুদ, লাল এবং কালো। কখনও কখনও সবুজ বা নীল কালোয় জায়গা নিয়ে থাকে। স্টেলা ক্রামরিশের মতে, কাল অথবা নীল এবং লাল সাধারণত কাঁথার মৌলিক রং। এর থেকেই এই সত্যটি বোঝা যায় যে, সবুজ এবং হলুদ রঙের বহুল ব্যবহৃত কাঁথাগুলো পরবর্তীকালে তৈরি এবং অনেক সেলাই সংবলিত কাঁথা।

(গ) মোটিফ

নকশি কাঁথার মধ্যে যেসব মোটিফ বা প্রতীক ব্যবহার হয় তা বিমূর্ত এক ধরনের ভাষা। বাংলার কাঁথা শিল্পের যে ক্রমবিকাশ সাধিত হয়েছিল একাধিক কারণে তা তাৎপর্যপূর্ণ। কাঁথা মহিলাদের একক শিল্পরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এর ভাষারও বিকাশ সাধন করেছিল। গ্রাম্য মহিলাদের শৈল্পিক অভিব্যক্তিতে ধর্মবোধ প্রবল শক্তি সঞ্চার করে ফলে মোটিফগুলোর মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ প্রতীকবাদসহ ইসলামিক অলঙ্করণের বিষয় লক্ষ করা যায়। কাঁথায় অনেক ধরনের মোটিফ দেখতে পাওয়া যায়, যেমন–পুষ্পশোভিত পত্র পল্লব, পক্ষী ও মৎস্য, নৃ-তাত্ত্বিক ও প্রাণী বিষয়ক মোটিফ। প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন ধরনের ধারণা নেওয়া হয়েছে, যেমন–বৃক্ষ লতাপাতা, বিভিন্ন ধরনের প্রাণী, অশ্ব এবং হস্তী। এগুলোর সমৃদ্ধির জন্য যে প্রার্থনা তাও তার সাথে সম্পৃক্ত। ঐতিহ্যবাহী রাজশাহীর কাঁথাতে জ্যামিতিক নকশা ত্রিকোণ এবং হীরকাকৃতি প্যাটার্ন খুব জনপ্রিয়। এগুলো ধর্মবোধ বর্জিত নকশা।

অধিকাংশ কাঁথাতেই কেন্দ্রীয় মোটিফ হচ্ছে 'পদ্ম', যা কিনা ধর্মাচরণের 'আলপনা'র অনুরূপ। ভারতীয় চিত্রকলায় পদ্ম অত্যন্ত জনপ্রিয় মোটিফ এবং স্বাভাবিকভাবে কাঁথার ক্ষেত্রে তাই। পদ্ম হচ্ছে ঈশ্বরের আসন, যা হচ্ছে 'সৃষ্টির প্রধান প্রতীক'। যেহেতু তা প্রাণদায়িনী পানি থেকে উদ্ভূত তাই সূর্যের সাথে এর সুসম্পর্কযুক্ত প্রস্ফুটন ও আকাশমুখী বিকাশ। সংকোচন বা পাপড়িগুলোর বন্ধ হয়ে যাওয়া সূর্যের উদয় এবং অস্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পদ্ম চিরন্তন প্রকৃতি–ঐশ্বরিক ঐক্যের প্রতীক। এটা হচ্ছে প্রকৃতি, জল এবং আকাশের ঐক্যের বিশুদ্ধ প্রতীক। পানির নিচে যে ভূমি তাতে আছে এর শেকড় এবং পাতা ও ফুল জলের উপরে ভাসমান, অর্থাৎ উপরিভাগ এর উন্মোচন এবং সংকোচন আকাশে সূর্যের অপ্রস্থানের উপর নির্ভরশীল। এটা জীবনের পুনঃপ্রাপ্ত শক্তির প্রতীকযুক্ত। জল শুকিয়ে গেলে পদ্ম শুকিয়ে যায়, আবার বিস্ময়করভাবে বেঁচে ওঠে যখন বৃষ্টি হয়। এর যোগাযোগ রয়েছে বিশুদ্ধতার সাথে এবং সংস্কৃতি, সৌভাগ্য ও সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর সাথে। প্রকৃতিগতভাবে যা স্ত্রীবাচক——পদ্ম হচ্ছে তারই প্রতীক। "যদিও এটা প্রাচীন ধারণা সম্ভূত তথাপি পদ্ম হচ্ছে পূর্ব-অস্তির নকশার একটা ব্যাপক প্রকাশজাত। একটি বৃত্তের মধ্যে পুষ্পিত নকশা সর্বদাই এবং সবখানে স্ত্রী অঙ্গের প্রাথমিক ধারণা দেয়, ভারতীয় রীতিতে যাকে 'যোনি' বলে। পদ্ম শেষ অবধি নারী প্রকৃতি এবং নারী ম্যাজিকেরই প্রতিনিধিত্ব করে"।[৫] পদ্মের অনেক ধরন লক্ষণীয়——আট পাতা বিশিষ্ট বা 'অষ্টদল পদ্ম' থেকে শুরু করে শতপাতা বিশিষ্ট 'শতদল' পদ্ম। শতপাতা বিশিষ্ট পদ্ম মনে করিয়ে দেয় পারসিক মসজিদের গোলাকার গম্বুজবিশিষ্ট ছাদের কেন্দ্রীয় নকশার কথা। কাঁথা নকশায় কেন্দ্রস্থলে পদ্মমোটিফ আঁকা হয় শুধুমাত্র এর সৌন্দর্যের কারণেই নয়, বরং এর অসংখ্য এবং বিভিন্নধর্মী অর্থের প্রয়োজনে।

'চাকরা' বা চাকা একটি জনপ্রিয় মোটিফ যা কাঁথায় ব্যবহার হয়। ভারতীয় চিত্রে হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় ঐতিহ্যেই চাকা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই চাকার প্রতীক সম্বন্ধে উপনিষদে বলা হয়েছে: চাকার শলাকাগুলি যেমন চক্রনাভিতে সম্বন্ধ থাকে, তেমনি বিশ্বের সব কিছুই ব্রহ্মে নিবদ্ধ রয়েছে।

মোগল আমল থেকে আমরা জনপ্রিয় ও আকর্ষণীয় 'কল্কে' মোটিফের দেখা পাই। এই মোটিফের সাথে আনারস বা আমের সাথে তুলনামূলক মিল পাওয়া যায়। এই কল্কে নকশা করা কিছু কাঁথা কাশ্মীরি শালের এমব্রয়ডারির অনুরূপ বলে মনে হয়।

কাঁথাতে পাওয়া যায় এমন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মোটিফ হচ্ছে 'সৌর মোটিফ'——যা কিনা সূর্যের জীবনদায়িনী শক্তির প্রতীক। প্রায়শই এটা পদ্ম প্রতীকের সাথে জড়িত থাকে। সূর্য হচ্ছে অগ্নি, জীবন, বিশুদ্ধতা, আলোক, স্বাস্থ্য, এবং হিন্দু জরথ্রুস্থবাদ, পৌত্তলিক ও উপজাতীয় দর্শন এবং উপাসনায় যা কিছু ইতিবাচক গুণ আছে তার সাথে জড়িত। এমনকি এটা এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত এই মোটিফ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে সূর্যকে জীবন ও শক্তির উৎসের প্রতীক হিসেবে আনা হয়েছে।

'চন্দ্র' মোটিফের জনপ্রিয়তা রয়েছে মুসলমানদের সাথে। মুসলমানদের তৈরি কাঁথায় এমব্রয়ডারিতে এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যেমন–জায়নামাজ। সাধারণত অর্ধচন্দ্রাকৃতি এবং তারকা সংবলিত নকশা বহুল ব্যবহৃত।

'স্বস্তিকা' মোটিফের উৎপত্তি সিন্ধু সভ্যতা থেকে। প্রকৃতিগতভাবে এটি ভারতীয় নকশা এবং প্রায়ই চলমান চাকার সাথে সম্পর্কযুক্ত। মহেঞ্জোদারোতে যেসব সিল পাওয়া গেছে তাতে এই নকশার প্রচুর খোদাই দেখতে পাওয়া যায়। অনেকের কাছে যা সৌভাগ্যের এবং চিরন্তন গতির প্রতীক হিসেবে বিবেচ্য।

'জলমোটিফ' একটি সর্বজনীন ব্যাপার। কাঁথার মাঝখানে এবং ধারের নকশায় এর বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার দেখা যায়। তরঙ্গায়িত জলের উপরিভাগ যা কাঁথার ওপরের অংশটুকু তরঙ্গায়িত করে বোঝানো হয়।

'কল্পবৃক্ষ' বা জীবন বৃক্ষের মোটিফ হচ্ছে উর্বরতা এবং সমৃদ্ধির প্রতীক। সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকে এটা আছে। সিন্ধু সভ্যতায় লোকদের কাছে 'পিপুল গাছ' ছিল পবিত্র গাছ, যা বৌদ্ধদের কাছেও পবিত্র। কারণ এই গাছের তলেই বুদ্ধদেব বোধিজ্ঞান লাভ করেছিলেন। মানুষের কাছে বৃক্ষরাজি সেই প্রাচীনকাল থেকেই উর্বরতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত। প্রতীকী আচারে স্ত্রীলোকদের বিয়ে দেওয়া হয় বৃক্ষের সাথে। প্রচুর ভারতীয় ভাস্কর্যে আমরা দেখতে পাই বৃক্ষ এবং স্ত্রীলোকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যময় যুগলদেহ। স্ত্রীলোকের নাভিমূল থেকে উত্থিত বৃক্ষ প্রকৃতির নারীত্ব ঘোষণা করে। সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে বৃক্ষ উর্বরতার প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত এবং যে কাঁথা স্ত্রীলোকেরাই তৈরি করে তাতে এর ব্যাপক ব্যবহার স্বাভাবিক। কাঁথাতে বৃক্ষ মোটিফের ব্যাপক প্রচলন যা

প্রায়ই 'কল্কে' বা 'পাতা' মোটিফ ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে। চারটি কোণায় এই 'কল্কে' ও পাতা মোটিফগুলো আঁকা হয় যাতে চারটি দিক বুঝানো হয়। এর অর্থ বিশ্বজনীন, যা আমরা অধিকাংশ কাঁথার মোটিফ দেখতে পাই (চিত্র নং ২)। তবে এর মূল অর্থ এখন হারিয়ে গেছে।

'পানপাতা' যা 'পিপুল' পাতা মোটিফ কাঁথার নকশায় প্রায়ই দেখা যায়। যা রাজশাহীর লহরি কাঁথার একমাত্র অজ্যামিতিক নকশা। বিভিন্ন কাঁথায় 'পর্বত' নকশা ব্যবহারও দেখা যায়। এটা পৃথিবীর সাথে স্বর্গের যোগাযোগের প্রতীক। বাংলাদেশে 'মৎস্য' নকশা খুবই জনপ্রিয় এবং প্রায়ই তা দেখতে পাওয়া যায়। এটাও উর্বরতার প্রতীক। 'নৌকা' প্রতীক জনপ্রিয়। এগুলো আড়াআড়ি সেলাই করা কাঁথায় বেশি দেখা যায়। বৌদ্ধ চিত্রকলায় 'পদচিহ্ন' মোটিফ জনপ্রিয় যা বুদ্ধকেই বোঝায়। আলপনা এবং কাঁথাতে এটা লক্ষ্মীদেবীর প্রতীক। আমরা আরো কিছু অন্যরকম মোটিফও লক্ষ করি, যেমন–'রথ' এগুলো সাধারণত হিন্দু স্ত্রীলোকের কাজ। 'মসজিদ' দেখতে পাওয়া যায় শুধুমাত্র জায়নামাজ কাঁথাতে। পাঞ্জা বা খোলাহাত নকশা মাঝে মধ্যে দেখা যায়, যা মহররম শোভাযাত্রার সাথে সম্পৃক্ত এবং শিয়া মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত। 'পালকি' মোটিফ অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং বিয়ের সাথে সম্পৃক্ত। যা প্রাচীন বাংলায় কনে নিয়ে যাবার প্রধান যানবাহন ছিল। প্রাণী বিষয়ক মোটিফ যেমন–হাতি, ঘোড়া, ময়ূর, হরিণ, বাঘ, বানর ইত্যাদি, যা কিছু কিছু কাঁথায় দেখতে পাওয়া যায়। প্রসাধন সামগ্রী, যেমন–আয়না, চিরুনি, কানের দুল, সুরমাদানি, রন্ধন তৈজসপত্র, যেমন–বটি, জাঁতি ইত্যাদি, কৃষিজ যন্ত্রপাতি, যেমন–কুশা, হাঁসিয়া, কাঁথার জনপ্রিয় মোটিফ।

নকশি কাঁথার প্রকারভেদ

বাংলাদেশের মহিলারা বংশানুক্রমে বিভিন্ন প্রকারের নকশি কাঁথা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তৈরি করে থাকেন। ব্যবহারের প্রয়োজন অনুসারে এগুলোর আকৃতিও ভিন্নতর হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের কাঁথা সম্পর্কে নিম্নে আলোচিত হলো:

লেপকাঁথা: শীতকালের জন্য একটি উষ্ণ আবরণী। সাড়ে ছয় ফুট লম্বা এবং সাড়ে চার ফুট প্রস্থ এবং ঘন সেলাইযুক্ত। বাংলায় 'লেপ' শব্দটি এসেছে 'লেহাপ' শব্দ থেকে। যার অর্থ ঘন প্যাডবিশিষ্ট কাঁথা।

সুজনি কাঁথা: আকৃতিতে বৃহৎ ও চতুষ্কোণী। দৈর্ঘ্য ছয় ফুট এবং প্রস্থ তিন ফুট। সাধারণত বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে এর ব্যবহার হয় বিছানায় চাদর অথবা পাতলা কম্বল হিসেবে।

'বৈতান' বা বোস্তানি: পুস্তক বা মূল্যবান দ্রব্যাদির আবরণী। এটি আকৃতিতে চারিদিকে সমান এবং প্রত্যেক দিকই তিন ফুট করে। আজও বাঙালি মহিলারা তাদের মূল্যবান রেশমি শাড়ি আলমারিতে রাখার আগে আর এক টুকরো কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখে।

'ওয়াড়' বা বালিশের ঢাকনা: আকৃতিতে চতুষ্কোণ। দুই ফুট লম্বা এবং দেড় ফুট চওড়া। এ কাঁথাগুলো সাধারণত বালিশের তেল চিটচিটে ভাব প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহার হয়। বর্তমানে এই জাতীয় কাঁথাগুলোর স্থান দখল করেছে ছোট ছোট তোয়ালে।

আরশিলতা: এটি হচ্ছে চিরুনি এবং আয়নার আবরণী। এগুলো আকৃতিতে সংকীর্ণ চতুষ্কোণী। প্রায় এগার ইঞ্চি লম্বা ও ছয় ইঞ্চি চওড়া।

গিলাফ: এটি হচ্ছে কোরআন শরিফের মতো পবিত্র গ্রন্থের আবরণী বিশেষ। এর তিনটি কোণ একত্রে সেলাই করা হয়ে থাকে এবং চতুর্থ কোণায় একটি টারসেল বাঁধা থাকে। 'বটুয়া' হচ্ছে এর ক্ষুদ্রতর সংস্করণ।

'দুর্জনী' বা থলিয়া: চার কোণাকৃতি। যা বিভিন্ন জিনিসপত্র রাখার থলিয়া হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

জায়নামাজ: এটি হচ্ছে প্রার্থনার মাদুর যা নামাজ পড়তে ব্যবহার করা হয়। ঐতিহ্যবাহী কায়দায় এর সেজদা দেবার জায়গায় মসজিদের নকশা আঁকানো থাকে।

দস্তরখান: এটি হচ্ছে লম্বা সরু কাঁথা, যা খাবার জায়গায় বিছানো হয়। এই কাঁথা দশ থেকে আঠার ইঞ্চি চওড়া এবং কতজন লোক বসবে তার উপর নির্ভর করে দৈর্ঘ্যের আকার নির্ধারণ করা হয়। বর এবং বরযাত্রী বসার জন্য যে আসন বিছিয়ে দেয়া হয় তার নাম 'নকশি আসন'।

শিশুদের ব্যবহার করার জন্য সাধারণ কাঁথা বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে, যা সদ্যপ্রসূত শিশুদের ক্ষুদ্রাকৃতি কাঁথা থেকে হামাগুঁড়ি দেওয়া শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় মাপের। এই সব কাঁথায় পুরাতন কাপড় ব্যবহারের দুইটি কারণ রয়েছে। একটি হচ্ছে ছোট্ট শিশুদের জোড়া দেওয়া পুরনো কাপড় দিয়ে তৈরি কাঁথা যা সব কিছু

চুষে নেয় এবং এগুলো অত্যন্ত আরামদায়ক। দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রচলিত বিশ্বাস–নতুন কাপড় কুদৃষ্টিকে আকর্ষণ করে থাকে, যা কিনা শিশুর অকল্যাণ ঘটাতে পারে।

উপসংহার

একটি দেশের সংস্কৃতি নির্ভর করে তার ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক অবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক আচার-আচরণ, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর। একটি দেশের যথার্থ চেহারা দেখা যাবে সে দেশের সংস্কৃতিতে। দীর্ঘদিন ধরে জীবনযাত্রা প্রণালি ও তার ফলশ্রুতি একটি সংস্কৃতির ভিত্তি নির্মাণ করে। মানুষ জীবন ধারণের প্রয়োজনে যা কিছু সৃষ্টি করেছে সেগুলোকেই সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গণ্য করা যায়। প্রাত্যহিক জীবনধারার প্রয়োজনের বাইরেও মনের কল্পনার যে সব বহিঃপ্রকাশ ঘটে সেগুলো শিল্পীর সৃষ্টিধর্মী শিল্প হিসেবে বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয়। এসব হচ্ছে জীবনের পরিশ্রমের মহত্তম এবং সুন্দরতম বিকাশ এবং প্রকাশ।

আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত এই নকশি কাঁথা শিল্পের পুনর্জাগরণ ও উন্নয়নে কিছু অবদান রাখা। এতে দেশের বিপুল শ্রমজীবী মহিলাকর্মীর কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত হবে এবং জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটবে। অবশ্য এই পুনর্জাগরণ বর্তমান সময়োপযোগী প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে উৎপাদন হতে হবে। একথা সত্য যে, পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করবে না। কারণ ঐতিহ্য কখনই একটি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে স্থির অথবা স্থিতিশীল নয়। এটা সর্বদাই ধীর পরিবর্তন এবং সময়ের সাথে অগ্রসরমান। অতএব ঐতিহ্যবাহী এই কারুকলাকে আধুনিক সময়ের সাথে উন্নততর করলে এবং এর বহুবিধ ব্যবহার ঘটালে দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে। পাশাপাশি এই কাঁথা চিত্রকলার গঠন-কৌশলের 'ন্যারেটিভ কম্পোজিশন' (কাহিনী ভিত্তিক উপস্থাপনা), সাংকেতিক প্রতীক, রেখা, রং ও 'টেক্সচার' (দানা) আমরা আধুনিক চিত্রকলাতে ব্যবহার করে দেশীয় বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে পারি।

তথ্যনির্দেশ

১। এন. জামান, *দি আর্ট অব কাঁথা এমব্রয়ডারী* (ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮১), পৃ. ৫।

২। আর.জে. মেহেতা, *দি হ্যান্ডক্রাফট এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস অব ইন্ডিয়া* (বোম্বে: ১৯৬০) পৃ. ১০৬।

৩। *নকশা।* বাংলাদেশ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৭, পৃ. ২৩।

৪। আহমেদ পারভীন *দি এয়েসথেটিক্স এন্ড ভোকাবোলারী অব নকশীক কাঁথা* (ঢাকা: বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম) পৃ. ৪-৫।

৫। সি. মাত্তরী *ফোক অরিজিনস্ অব ইন্ডিয়ান আর্ট* (নিউইয়র্ক: ১৯৬৯) পৃ. ১০১।

৬। অজিত মুখার্জী, *ফোক আর্ট অব বেংগল* (নতুন দিল্লী: ১৯৭৫)।

৭। ওয়াকিল আহমেদ, *বাংলার লোক সংস্কৃতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪)।

৮। স্টেলা ক্রামরিশ *দি আর্ট অব ইন্ডিয়া,*(লন্ডন: ১৯৬৫)।

৯। কে. কে. গাঙ্গুলি, *ডিজাইন ইন ট্রেডিশনাল আর্টস ইন বেঙ্গল* (পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৭৩)।

১০। মাহমুদ শাহ্ কোরেশী, *কালচার এন্ড ডেভলপমেন্ট*। (ঢাকা, ১৯৮২)।

চিত্র

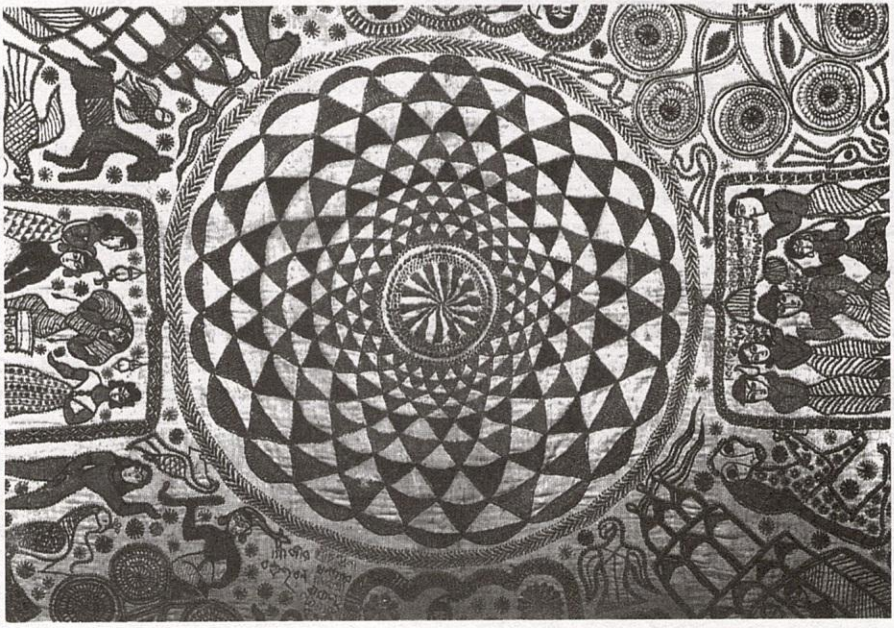

চিত্র নং-১. সুজনি কাঁথা ঃ 'শতদল পদ্ম' মোটিফ, আনুমানিক উনিশ শতকে তৈরি। ঢাকা বিসিক-এ সংগৃহীত।

চিত্র নং-২. বোস্তানি ঃ আনুমানিক উনিশ শতকের, যশোর নড়াইলে তৈরি। কলকাতা আশুতোষ যাদুঘরে সংগৃহীত।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ৯ম সংখ্যা ১৪০৮

বাংলাদেশের প্রাচীন পোড়ামাটি-ফলকে গল্পচিত্রণ : ধ্রুপদী সাহিত্যের প্রতিফলন

আবদুল মতিন তালুকদার*

Absttract: The Terracotta Art in Bangladesh emerged and flourished during Pala period. The use of terracotta in our art has been very pervasive and multi-dimensional. Numerous terracotta plaques, available in Barind region reflect the plots of classic literature. The present article focuses on such reflection of classical literature on terracotta plaques found in Paharpur.

মানব সভ্যতার ইতিহাসে মৃৎশিল্প মাধ্যমটির গুরুত্ব অপরিসীম। নদীমাতৃক সভ্যতা থেকে যেমন এই শিল্প মাধ্যমটির উদ্ভব ঘটেছে, তেমনি তা মানব জাতির সভ্যতা বিকাশেও অনেকটা সহায়ক হয়েছে। প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বংশপরম্পরায় একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা—পোড়ামাটির ভাস্কর্যের কলা-কৌশল নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর পূর্বে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর সভ্যতার মৃৎশিল্পীগণ ধর্মীয় ও ব্যবহারিক সামগ্রীর পাশাপাশি শিশু-কিশোরদের মনোরঞ্জনের জন্যেও নানা ধরনের মাটির খেলনা তৈরি করতো।

হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর 'মাদারগডেজ' জাতীয় মৃৎশিল্প বাংলাদেশের "মা-পুতুল"-এর এক সুপ্রাচীন প্রপিতামহী।[১] বর্তমান বাংলাদেশের কুম্ভকারেদের হাতেও এই ধরনের 'মা-পুতুল' তৈরি হতে দেখা যায়, যা ঐ প্রাচীন ধারারই সাক্ষ্য বহন করে। পোড়ামাটির ভাস্কর্য, পোড়ামাটির হাঁড়ি-পাতিল, খেলনা ইত্যাদি তৈরির প্রচলন সেই প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। মসজিদ বা মন্দির অলঙ্করণের জন্য পোড়ামাটির ফলকের ব্যবহার বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়।

এই পেশায় নিয়োজিত শিল্পীরা সহজলভ্য উপাদান মাটিকে তাদের দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রে পরিণত করতো। এদেশে মুসলমান শাসনকালের পূর্বে বিভিন্ন স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক খননে কিংবা প্রাথমিক প্রত্নানুসন্ধানে ছোট বড় অসংখ্য প্রত্ন-নিদর্শন আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত হয়েছে। বগুড়ার মহাস্থানগড়, নওগাঁর সোমপুর বিহার এবং ময়নামতি বিহারে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যসমূহে বাংলার প্রাচীন শিল্পচর্চার কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন পাওয়া যায়। এইসব পোড়ামাটির ফলকে সমসাময়িক জীবনের লৌকিক রূপ এবং কথা-কাহিনীর ছাপ স্পষ্টই লক্ষ করা যায়। পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ দেব-দেবীর মূর্তি, 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'জাতক', 'পঞ্চতন্ত্র', 'কথাসরিৎসাগর', 'বৃহৎকথা' ও 'হিতোপদেশ' প্রভৃতি ধ্রুপদী সাহিত্যের কাহিনী এবং পশু-পাখি, ফুল-ফল, লতা-পাতা, ইত্যাদির প্রতিকৃতি অত্যন্ত দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটে উঠেছে। ঐসব লোকায়ত শিল্পকলার মধ্য দিয়েই যুগপৎ তৎকালীন বাঙালি জনজীবনের অসংখ্য এবং বর্ণাঢ্য ঘটনাবলির প্রকাশ ঘটেছে। সেসব বস্তুসংস্কৃতির উপস্থিতি অন্য কোনো শিল্প মাধ্যমে তেমন নেই বললেই চলে। সবদিক বিবেচনা করে এইসব শিল্পের বিষয়বস্তুকে সমকালীন সমাজজীবনের অভিজ্ঞতাজাত চালচিত্র বলা যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় জানা যায় যে, খ্রিস্টীয় নবম-দ্বাদশ শতাব্দীর পাল শাসকদের শাসনামলেই, বাংলাদেশে অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের তুলনায় পোড়ামাটির ভাস্কর্য উন্নতির শীর্ষে গিয়ে পৌঁছে। খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম-দশম শতকে পাল শাসনামলে বিশেষ করে দ্বিতীয় পাল সম্রাট ধর্মপালদেবের প্রত্যক্ষ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায়

* সহকারী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রামের সাধারণস্তরে বসবাসকারী মৃৎশিল্পীরা এই শিল্পকর্ম নির্মাণে বিশেষ উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। এ কারণে, সোমপুর বিহার বা পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকগুলি বিশেষ করে কলা-ইতিহাসের বিবেচনায় আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। তাই প্রত্নকলার বিচারে, এগুলিকে অবহেলার চোখে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

পাথরের অপ্রতুলতার জন্য নদ-নদী, বিল-ঝিল, ডোবা-নালায় প্রাপ্ত অতি সাধারণ এঁটেল মাটি দিয়ে তৈরি মৃৎশিল্প প্রাচীন বাংলার শিল্পচর্চা, শিক্ষা, দক্ষতা এবং বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়েছেন মৃৎশিল্পীরা। মাটিকে শিল্পোপকরণ হিসেবে বেছে নিয়ে যেভাবে তাঁদের সৃষ্টিতে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সহজ-সুন্দর এবং সাবলীলভাবে শিল্পকর্ম নির্মাণ করে সমাজের মানুষের কাছে উপস্থাপন করেছেন; তা কেবল দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, দেশ-কালের গণ্ডি পেরিয়ে, সেসব সৃষ্টি বিশ্বের শিল্পকলার অঙ্গনে স্থান করে নিয়েছে। একথা সত্য যে, উপমহাদেশে সর্ব-ভারতীয় আদলে একটি শিল্পরীতি গড়ে উঠেছিল, শিল্প শাস্ত্রের ভাষায় তাকে ধ্রুপদী শিল্পকলা বলা যায়। সুকুমার ভট্টাচার্যের মতে, "ধ্রুপদী সাহিত্য বা শিল্পকলা একান্তই ধর্মনিরেপেক্ষ"।[২] পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ এই ধ্রুপদী শিল্পকলা কিভাবে ধ্রুপদী সাহিত্যের বিষয়বস্তু থেকে নেওয়া হয়েছে, তা 'মহাস্থান', 'ময়নামতি' ও 'পাহাড়পুরে' প্রাপ্ত পোড়ামাটির ভস্কর্যগুলো পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই অনুমান করা যায়। তদানীন্তন গ্রাম-বাংলার শিল্পীরা শিল্পকর্ম প্রস্তুতের সময়ে সমাজে প্রতিদিন ঘটে যাওয়া ঘটনা এবং পারিপার্শ্বিক দৃশ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন উৎকীর্ণ এইসব পোড়ামাটির ফলকে।

অনেক খ্যাতিমান গবেষক মনে করেন, এই ধরনের শিল্পকলা, বিশেষ করে পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মূর্তিগুলো এক যুগের নয়; বরং শিল্পদৃষ্টির বিবেচনায় এই মূর্তিগুলো তিন শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর মূর্তির সংখ্যা খুব কম। মূর্তিগুলোতে ধর্মীয় এবং পূর্বাঞ্চলীয় গুপ্ত শিল্পের প্রভাব স্পষ্ট। এই শ্রেণীর মূর্তিতে কৃষ্ণের বিচিত্র লীলার দৃশ্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর মূর্তিগুলো অপেক্ষাকৃত গতিহীন এবং নিষ্প্রাণ। বেশিরভাগই কৃষ্ণের বাল্যজীবন বিষয়ক। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত মূর্তিগুলো অধিকাংশই বর্ণনামূলক। তাতে লোকায়ত জীবনের চিত্র তথা বাস্তব ঘটনার দৃশ্য চিত্রায়ণের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়'[৩]। এই শ্রেণীর মূর্তিতে 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'পঞ্চতন্ত্র', 'বৃহৎকথার' নানা জনপ্রিয় গল্প, কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক কাহিনীর উপাদান কিছু কিছু ফলকে স্থান পেয়েছে।' এতে ধারণা করা হয় ঐ সব জনপ্রিয় গল্প-কাহিনী সম্পর্কে মৃৎশিল্পীদের পরিচিতি বা ধারণা ছিল। প্রথমত, শিল্পীরা তাদের আত্মিক প্রবৃত্তি নিবারণ এবং তার সঙ্গে চিরায়ত ঐতিহ্যবাহী কৌশল, শিক্ষা ও নৈতিকতার সমন্বয় ঘটানো এবং দ্বিতীয়ত, তাঁরা চেয়েছিলেন যাতে দর্শকগণ পোড়ামাটির ফলকগুলো দেখামাত্র অনায়াসে সেগুলোকে সনাক্ত করতে পারে'[৪]।

'রামায়ণ', 'মহাভারতে' বর্ণিত ঘটনাবলী যেমন, 'বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধ', 'সুভদ্রা-হরণ', 'বানরসেনা কর্তৃক সেতু নির্মাণ', 'কৃষ্ণ-বলরামের কুস্তি' ইত্যাদি। কৃষ্ণ-বলরামের কুস্তি- এই গল্পটি স্থান পেয়েছে দিনাজপুরের কান্ত নগর মন্দিরের একটি পোড়ামাটির ফলকে।[৫] ক্রীড়ামঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হয় দুই ভ্রাতাকে যুদ্ধ করার জন্য। মথুরার রাজা কংস, দুই মল্লযোদ্ধাকে কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বলেন। কংসের উদ্দেশ্য মল্লযোদ্ধাদের হাতে দুই ভাই পরাজিত হবে এবং মারা যাবে। কৃষ্ণ এবং বলরামের সঙ্গে উদ্ধব, অক্রূর ও কৃতবর্মাও যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে দুই ভ্রাতার হাতে মল্লযোদ্ধারাসহ রাজা কংস ও তার দেহরক্ষীরা নিহত হয়। পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকগুলোতেও যোদ্ধাদের চিত্র স্থান পেয়েছে। বিষয়বস্তু বা কলা-কৌশলের দিক দিয়ে 'মহাস্থান', 'ময়নামতি' 'পাহাড়পুরের' মৃৎফলকগুলোর মধ্যে অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হয়নি বিধায় পোড়ামাটির এই শিল্পকর্মে দেব-দেবীর মূর্তি গড়ার তেমন কোনো চেষ্টা হয়নি। পোড়ামাটির ফলকের মূল বিষয়বস্তুই ছিল লোকায়ত সমাজের দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্যাবলী তুলে ধরা। লোকায়ত শিল্পীরাও উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি রাখতো। এমনি আরেকটি শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু হচ্ছে "বালী সুগ্রীবের যুদ্ধ"(Fight of Vali and Sugriva)[৬]। সুগ্রীব ও বালী দুই ভাই। পিতার মৃত্যুর পর মন্ত্রীরা বালীকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করেন। একবার দুন্দুভি নামে এক তেজস্বী অসুর বালীর সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তাব দেয়, বালী দুন্দুভিকে পরাজিত এবং তাকে বধ করে।

পিতৃহত্যা এবং নারীঘটিত কারণে দুন্দুভির পুত্র মায়াবীর সাথে বালীর শত্রুতা হয়। একদিন মায়াবীর গর্জনে বালীর ঘুম ভাঙ্গে এবং মায়াবী বালীকে যুদ্ধে অহ্বান করে। বালীও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। যুদ্ধে যাবার

সময়ে বালীর স্ত্রী এবং ভ্রাতা সুগ্রীব বাধা দেয়। সকলের বাধা উপেক্ষা করে বালী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সুগ্রীব ভ্রাতৃস্নেহবশে বালীকে অনুসরণ করে, মায়াবী সুগ্রীবের উপস্থিতি টের পেয়ে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে এক গুহার মধ্যে প্রবেশ করে। বালী সুগ্রীবকে গুহার বাইরে অপেক্ষা করতে বলে, এবং মায়াবীকে হত্যা করার জন্য গুহার মধ্যে প্রবেশ করে। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে বালী ফিরলো না দেখে সুগ্রীব ভাবলো যে যুদ্ধে বালী হয়তো মৃত্যু বরণ করেছে। এই ভেবে বালী বড় একটা পাথর দিয়ে গুহার মুখ বন্ধ করে বিষণ্ন মনে ফিরে আসে। মন্ত্রীরা এসব ঘটনা শোনার পর তাদের অনুরোধে সুগ্রীব রাজপদে অভিষিক্ত হয় এবং বালীর স্ত্রী তারাকে বিবাহ করে। সুগ্রীব ন্যায়ানুসারে রাজ্য শাসন করতে থাকে।

অন্যদিকে মায়াবীকে হত্যা করে বালী গুহার প্রবেশ পথে ফিরে আসে এবং গুহার মুখ পাথর দিয়ে বন্ধ দেখে চিৎকার করে সুগ্রীবকে ডাকতে তাকে। অন্ধকার গুহা থেকে পথ খুজে বের হতে বালীর অনেকদিন কেটে যায়। অবশেষে বালী নিজ রাজ্যে ফিরে আসে। ভ্রাতা সুগ্রীবকে সিংহাসনে দেখে বালী সুগ্রীবের চালাকি বুঝতে পারে। সুগ্রীব সমস্ত ঘটনা বালীকে খুলে বলে এবং বালীর পায়ে মুকুট স্পর্শ করে প্রণাম করে। ক্ষমা চেয়ে নিজের ভুল স্বীকার করে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে চাইলো, কিন্তু বালী সুগ্রীবের কোনো কথাই বিশ্বাস করলো না। উত্তেজিত হয়ে ক্রোধে, যন্ত্রণায় সুগ্রীবকে ধিক্কার দিতে লাগলো। এবং বললো 'ভ্রাতৃস্নেহে বিস্মৃত হয়ে রাজ্যের লোভে তুমি গুহার পথ বন্ধ করে ছিলে, তুমি নির্লজ্জ, চরিত্রহীন। একবস্ত্রে আমার রাজ্য থেকে বের হয়ে যাও।' সুগ্রীব অভিমানে, অপমানে মনে কষ্ট নিয়ে রাজ্য ত্যাগ করলো। রাম-লক্ষ্মণের পরামর্শে একদিন কিষ্কিন্ধ্যায় এসে সুগ্রীব আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করে বালীকে ডাকতে লাগলো, 'কোথায়রে তুই নির্লজ্জ পাপী, সাহস থাকে তো সামনে আয়।' বালী বের হয়ে এলো এবং দুই ভ্রাতার মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তারা পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলো। এই যুদ্ধে সুগ্রীব হেরে যায় এবং প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে রাম অন্তরাল থেকে বান দ্বারা বালীকে হত্যা করে। সুগ্রীব নিজ স্ত্রী রমাকে ফিরে পায় এবং বালীর বিধবা স্ত্রী তারাকেও গ্রহণ করে।

বৈচিত্র্যপূর্ণ এসব লোকায়ত শিল্পে, বাঙালি জীবনে 'কৃষ্ণ' ও 'রামের' গল্প-কাহিনী তৎকালীন সমাজে যে যথেষ্ট সমাদৃত ও প্রসংশিত হয়েছিল তার প্রমাণ মিলে। 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'বৃহৎকথার' নানা গল্পকে অত্যন্ত সজীব ও প্রাণাবেগে উপস্থাপন করা হয়েছে, ঐসব পোড়ামাটির ফলকে। 'পঞ্চতন্ত্রের' জনপ্রিয় গল্পগুলোর মূল চরিত্রগুলি ছিল মূলত মানুষ এবং পশু-পাখি। ঐসব পশু-পাখির স্বভাব-চরিত্র ছিল মানুষের মত। নানা পরিবেশ ও প্রতিকূলতার মধ্যে পড়েও তাদের বুদ্ধির কৌশলে কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করেছে।

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত অনেকগুলো ফলকের মধ্যে একটি ফলকচিত্রের বিষয়বস্তু ছিল এমন- 'Lion in a talking cave'[৬] 'এক বনে একটি সিংহ ছিল। সে ছিল হিংস্র এবং বদমেজাজি। নিজেকে বনের রাজা বলে মনে করতো। একদিন বনের সব পশু একত্র হলো, সিদ্ধান্ত নিলো সবাই তারা সিংহের কাছে যাবে এবং তাদের মনের দুঃখের কথা জানাবে। সিদ্ধান্তানুযায়ী সবাই একদিন সিংহের কাছে গেল। পশুদের প্রতিনিধি হয়ে মহিষ বললো যে, হুজুর, আপনি আমাদের একমাত্র রাজা, আপনার কাছে আমরা এসেছি একটি অনুরোধ নিয়ে। সিংহ গর্জন করে উঠলো এবং বললো, যা বলার তাড়াতাড়ি বল, আমি এখন বিশ্রাম নেব। মহিষ ভয়ে ভয়ে আবার বলতে লাগলো, 'আপনি প্রত্যহ কষ্ট করে পশু শিকার করেন, তার আর প্রয়োজন হবে না। বরং আমরাই প্রত্যেকদিন একটি করে পশু আপনার কাছে পাঠাবো, আপনি এখানে বসে বসেই তার স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন'। সিংহ ভেবে দেখলো প্রস্তাবটা মন্দ নয়। সে রাজি হয়ে গেল। এরপর থেকে পর্যায়ক্রমে পশুরা আসতে লাগলো। একবার আসে খরগোশের পালা। খরগোশ পরাক্রমশালী সিংহের কাছে যেতে যেতে ভাবে, কি করে এই অত্যাচারী সিংহটার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অতঃপর সে সিংহের কাছে গিয়ে বললো, হুজুর, আপনার কাছে আসতে বিলম্ব হওয়ার কারণ পথে আর একটি সিংহ আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। সেও দেখতে ঠিক আপনারই মতো। খরগোশের কথা শুনে সিংহ গর্জন করে উঠলো, 'এত বড় স্পর্ধা ! আমার বনে বাস করে আমার প্রজাকেই হত্যা করতে চায়? কোথায় সে হতভাগা? খরগোশ সিংহটাকে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে গেল এবং একটি কুয়া দেখিয়ে বললো, 'হুজুর, সে আপনার ভয়ে এই গর্তে লুকিয়ে আছে।' সিংহ কুয়ার

ভেতর তাকিয়ে খুঁজতে লাগলো- কে সেই প্রতিদ্বন্দ্বী? সিংহ কুয়ার স্বচ্ছ পানিতে দেখতে পেল তারই মতো আর একটি সিংহ। সে কালবিলম্ব না করে গর্জন করে লাফিয়ে পড়লো কুয়োর মধ্যে শত্রুকে মোকাবেলা করার জন্য। অল্প সময়ের মধ্যেই সিংহ হাবু-ডুবু খেয়ে মৃত্যু বরণ করল, খরগোশটাও প্রাণে বাঁচলো।'

এভাবে 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'বৃহৎকথায়' বাঙালির প্রাচীন জীবনের রূপায়ণই কেবল নয়, লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তুকেও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও দক্ষতার সাথে চিত্রায়িত করেছেন তৎকালীন শিল্পীরা। উৎকীর্ণ পোড়ামাটির ফলকে তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন যে, শক্তির দ্বারাই সব সময় সব কাজ হয় না, দৈহিক শক্তির চেয়ে বুদ্ধিই পরম শক্তি। 'রামায়ণ', 'মহাভারত' বা 'পঞ্চতন্ত্রের' এই সব জনপ্রিয় গল্প-কাহিনীর মধ্যে সমাজের মানুষের বিধি কেমন হওয়া দরকার সে দিকেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত আরেকটি পোড়ামাটির ফলকে চিত্রিত কাহিনীর বিষয়বস্তু এমন- Monkey pulling out the wedge[৯]। 'এক ধনাঢ্য ব্যক্তির একটি বাগান ছিল। সে ভাবলো, এই বন পরিষ্কার করে এখানে একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করলে কেমন হয়। যে চিন্তা সেই কাজ। মিস্ত্রি ও শ্রমিক লাগিয়ে দিল গাছ কাটার জন্য। এক দিকে মিস্ত্রিরা কাঠ ফাড়াই করছে, অন্য দিকে খালি জায়গায় ইটের গাঁথুনি দিয়ে মন্দির নির্মাণের কাজ চলছে। একদিন রাতের বেলা হঠাৎ করে একদল বানর এসে সমস্ত বাগান তোলপাড় করে তুললো। বানরদের যা স্বভাব। দলের একটি বানর নিজেকে সর্দার বলে মনে করতো। কিন্তু কেউ তাকে সর্দার হিসেবে মানত না। সেই সর্দার বানরটি লাফ দিয়ে একটি গাছের গুঁড়িতে চেপে বসলো এবং নিজের লেজটি কাঠের ফাঁকে ঝুলিয়ে দিয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিল। চালাক বানরটি দেখতে পায় তার আসনের সামনে একটি কাঠের গোঁজ দেওয়া আছে। সেটা দেখতে ভাল না লাগায় গোঁজটা তুলে ফেললো, সাথে সাথে কাঠের ফাঁকটা বন্ধ হয়ে চালাক বানরটির লেজ শক্ত ভাবে সেখানে আটকে গেল এবং অন্য বানরগুলো তার লেজ ধরে টানাটানি করতে লাগলো তাকে মুক্ত করার জন্যে। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। সারারাত যন্ত্রণায় ছটফট করে সে মারা গেল।

নির্মিত পোড়ামাটির ভাস্কর্যে তখনকার দিনের শিল্পীরা ঐ সমসাময়িক কালের মানুষের জীবন যাত্রা, ধর্মীয় বা ধর্মনিরপেক্ষ প্রেক্ষাপটে, বিভিন্ন জীব-জন্তু, পশু-পাখি, লতা-পাতা ইত্যাদির দৃশ্যাবলীতে তাদের শৈল্পিক মুন্সিয়ানার সঙ্গে একনিষ্ঠতা, ধৈর্য, মনোযোগ ও সংযমের সাথে কল্পনা ও মননের, মার্জিত রুচি ও সূক্ষ্মবোধ, শিল্পদৃষ্টি ও আঙ্গিকের, আদর্শ ও ভাবের সৌন্দর্যকে প্রাণবন্ত ও বাস্তবধর্মী করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, যা কেবল পোড়ামাটির শিল্পচর্চাই নয়; প্রাচীন বাঙালীর সামগ্রিক শিল্পচর্চার ইতিহাসে যে ভিন্ন এক মাত্রা যোগ করেছে, তা বলাই বাহুল্য।

তথ্যনির্দেশ

১ মোহাম্মদ শাহজালাল, *বাংলাদেশের মৃৎশিল্প* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৩৩।

২ সুকুমার ভট্টাচার্য, *ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস* (কলকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান,১৯৯১), পৃ. ৬।

৩ S.K. Saraswati, *Early Sculpture of Bengal* (Calcutta: Sambodhi Publication, 1962), p. 38-39.

৪ Saifuddin Chowdhury, *Early Terracotta Figurines of Bangladesh* (Dhaka: Bangla Academy, 2000), p. 68.

৫ Nazimuddin Ahmed, *Epic Stories in Terracotta* (Dhaka: University Press Ltd., 1990), plate – 18.

৬ K. N. Dikshit, "Memoirs of the Archaeological Survey", *MASS No. 55, Excavation at Paharpur,* (Delhi: 1938) Pl. XXXIII fig.(a) No. 55

৭ Ibid. PL. LII fig(a)

৮ Ibid. Pl. LII.(d)

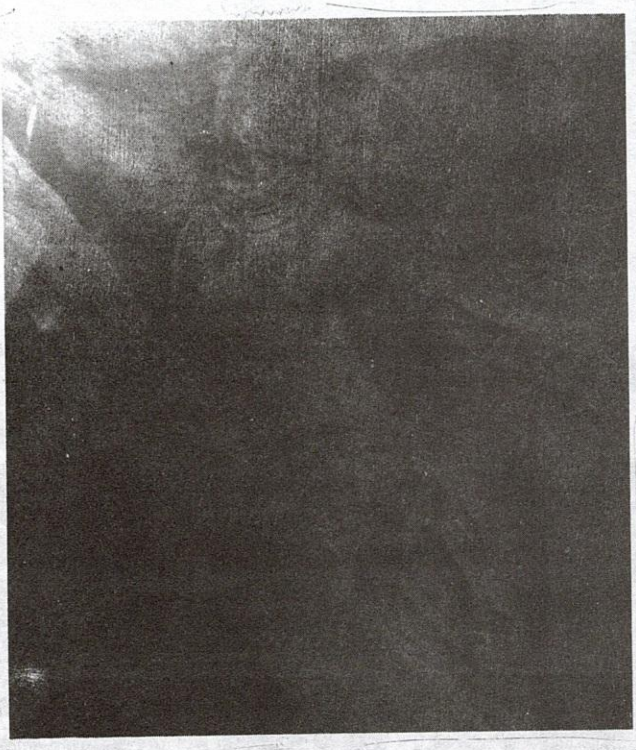

Monkey pulling out the wedge
Plate LII(D)

Lion in a talking cave
Plate No. LII(A)

Ph. 18 Krishna and Balarama wrestling with Chanura and Mustaka, the two wrestlers of Kansa.

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ৯ম সংখ্যা ১৪০৮

বাংলার দৃশ্যশিল্পে উপনিবেশবাদ ১৮৩৯-১৯৪৭

মোঃ আমিরুল মোমেনীন চৌধুরী*

Abstract: Since 1839 colonial impact on visual arts began to be discernible in India. To perpetuate their rule in India the British colonialists, from this time, adopted some plans. Among these, displaying colonial emblems through visual arts was one bearing immense historical importance. The colonialists though that they were anointed to civilize all the colonized people. So the British erected the statues of their heroes, monarchs and rulers in the major places like Calcutta as the Romans did in Europe to evoke admiration mixed with fear in order to inculcate a sense of superiority in the mind of the colonized people. This paper seeks to analyze this colonial modality in Bengal from the point of view of art history.

ভূমিকা

১৮৩৯ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টিকে যেভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে নিবিড়ভাবে অবলোকন করা হয়েছে, সেভাবে শিল্প সংস্কৃতির দিক থেকে এই সময়ের অধ্যয়ন এখনও বাকি। এই প্রবল ঐতিহাসিক পালাবদলের কালে উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক জীবন যেমন স্তিমিত থাকেনি, সেই সঙ্গে এই ক্ষেত্রে আরও একটি ঐতিহাসিক সংশ্লেষও সে সময়ে ঘটে গেছে। ইংরেজদের আগমনে উপনিবেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন সাধিত হয় ও যে আদর্শ অনুকৃতি আমরা ১৮৩৯ থেকে ঔপনিবেশিক প্রভাবে স্থাপিত শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে লক্ষ করি, তাকে উপেক্ষা করে ইতিহাসের কোনো অধ্যয়ন সম্ভব নয়। ১৮৩৯ থেকে ১৯৪৭ সাল অবধি ঔপনিবেশিক ইংরেজ 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' নামে চিহ্নিত ভৌগোলিক অঞ্চলে তাঁদের শাসন কায়েম রেখেছিল। এই ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া বা ভারত উপমহাদেশে তার শাসনের স্থায়িত্বের তাগিদে ইংরেজ কয়েকটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। তার মধ্যে অন্যতম দৃশ্যশিল্পে উপনিবেশবাদ। আঠারো-উনিশ শতকের ইতিহাস কেবল উপনিবেশ বিস্তার বা আর্থ-রাজনৈতিক আধিপত্যের ইতিহাস নয়। এই দুই শতকে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের সূত্রে আদান-প্রদানে উপনিবেশগুলির ও উপনিবেশের বাইরের দেশগুলির সাংস্কৃতিক লক্ষণগুলি বন্যার বেগে ইউরোপে পৌঁছতে থাকে। জাপান ইউরোপের কোনো দেশের উপনিবেশ না হলেও জাপানি সংস্কৃতির স্রোত ইউরোপে পৌঁছে সেখানকার সমকালীন চিত্র ভাবনে বিপুল পরিবর্তন সাধন করেছিল। উনিশ শতক জুড়ে যেমন ইউরোপে তেমনি এশিয়া আফ্রিকার নানা আত্মসচেতন ও অসচেতন সংস্কৃতিতেও নিজেদের নতুন করে দেখার প্রবণতা জোরদার হয়েছিল। এই বিশ্বজনীন প্রবণতার কারণে দেশে দেশে নিজেদের সাংস্কৃতিক অবরুদ্ধতার বাইরে তাকাবার এবং দেশ বিদেশের চিত্রগুণ আত্মগত করবার ব্যাপক প্রয়াস ছিল। গত শতকের শেষে তাৎকালিক ইউরোপের শিল্পকলার তীর্থভূমি প্যারিসের তরুণ চিত্রশিল্পীরা নতুন শিল্পভাষার প্রেরণা ও উপাদান খুঁজেছিল নিজেদের পরিচিত সাংস্কৃতিক আবহের বাইরে।

* ড. মোঃ আমিরুল মোমেনীন চৌধুরী, সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উপনিবেশবাদ

উপনিবেশবাদ হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে অন্যদেশ বা অন্য জনগোষ্ঠীকে শক্তি প্রয়োগের (সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক) মাধ্যমে নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসা এবং শাসকের উপরে নির্ভরশীল করে তোলা।

উপনিবেশবাদ মূলত একটি আর্থরাজনৈতিক অবস্থা যা ১৫০০-এর দিকে শুরু হয়। সে সময়টাতে ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা নিজেদের অধিকারে এনে সেখানে হয় বসতি স্থাপন করে অথবা উপনিবেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে নির্মমভাবে শোষণ চালায়। ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল, স্পেন ও ওলন্দাজ উল্লেখযোগ্য।[১]

উপনিবেশবাদ অনেকাংশেই সাম্রাজ্যবাদী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে অন্য দেশ দখল করে তার উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার যে প্রক্রিয়া তার ফলেই উপনিবেশের জন্ম হয়। ১৬০০-তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইংরেজরা ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। তারই ফলশ্রুতিতে তারা রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশে পরিণত করে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে তার প্রক্রিয়ার ধরন ও ক্রিয়াকলাপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অনেক উপনিবেশ থেকে আলাদা। ইংরেজরা যখন ভারতবর্ষে আসে তখন ভারতবর্ষ দীর্ঘদিনের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও দার্শনিক চিন্তাচেতনায় সমৃদ্ধ ছিল। এমনকি ভারতবর্ষের ছিল দীর্ঘদিনের সাম্রাজ্যবাদী (মৌর্য শাসন, খ্রিস্টপূর্ব ৩২২-১৮৫ অব্দ—মোঘল শাসন, ১৫২৬-১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ) ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতা। ভারতবর্ষে উপনিবেশবাদী ব্রিটিশরা আইন, সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে জনগোষ্ঠীকে শাসন করলেও এই ভূখণ্ডের মৌলিক গুণাবলিতে কোনো পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি। যেভাবে আফ্রিকার দক্ষিণ ভাগের জনগোষ্ঠীকে (হটেনটটদের) বর্বর আখ্যা দিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে নিজেদেরকে উন্নততর সভ্যতার প্রতিভূ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল।[২]

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ বণিক ভারত সমুদ্রে প্রতিপত্তি গড়ে তুলেছিল। এই ঘটনা শুরু হয়েছিল প্রায় ১৭২০-র দশক থেকে। বাংলাদেশে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে ফারুকশিয়ারের ফরমান জারির পর থেকেই কলকাতায় এক নতুন বাণিজ্য বহর তৈরি হয়, যেটাকে পিটার মার্শাল তাঁর বইয়ে ক্যালকাটা ফ্লিট বলে বর্ণনা করেছেন। রবার্ট ক্লাইভ যদি ভারত দখলের সূচনা করে থাকেন তাহলে ক্যালকাটা ফ্লিট সূচনা করেছিল ভারত সমুদ্র দখলের এবং এই ক্যালকাটা ফ্লিট ভারতসমুদ্রে কখনোই প্রতিপত্তি বিস্তার করতে সক্ষম হত না, যদি না কলকাতার পিছনে পূর্ব ও উত্তর ভারতের অঞ্চলগুলির রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের হাতে আসত। ১৭২০-তে উপনিবেশবাদের সূচনা হলেও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ উপনিবেশের আধিপত্য কার্যকর ছিল মূলত ১৮৫৭ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত।

দৃশ্যশিল্প

শিল্প ও কলা শব্দ দুটি বাংলা ভাষায় এসেছে সংস্কৃত ভাষা থেকে। শব্দ দুটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সুনির্দিষ্ট নয়। শব্দগত দিক থেকে "শিল্প" ও "কলা" এক অর্থবোধক হলেও সংস্কৃত ভাষায় শিল্পকলা বলতে নৃত্য, গীত-সঙ্গীত, অভিনয় ইত্যাদি চৌষট্টি রকম বিদ্যাকে বোঝাত। বাংলায় কলা বলতে শিল্পবিদ্যা বোঝায়। শিল্পবিদ্যা বলতে আমরা Art-কে বুঝি। Art শব্দটি ল্যাটিন। ইংরেজি ভাষায় Art এসেছে ফরাসি ভাষার মাধ্যমে। ইংরেজি Fine Art কথাটি ফরাসির অনুবাদ। ফরাসি দেশে যেসব স্কুলে কেবল ছবি আঁকা ও মূর্তি গড়া শেখানো হতো সেইসব স্কুলকে বলা হতো Academie des Beaux Arts। এই ফরাসি Beaux Art (বো-জার)-এর ধারণা সমগ্র ইউরোপকে প্রভাবিত করে। "বো" মানে সুন্দর, সুকুমার, চারু।[৩]

শিল্পকলাকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। চারুকলা ও কারুকলা। চারু শব্দটি এসেছে সংস্কৃত "চর্" শব্দ থেক। "চর্" অর্থ আনন্দিত হওয়া অথবা সন্তোষ লাভ করা। কারু শব্দটি এসেছে "কৃ" ধাতু থেকে। কারু বলতে বোঝায় যেমন কারিককে (চিত্রকর) তেমনি শিল্পীকে (চিত্রশিল্পী)। বাংলা ভাষায় চিত্রকর ও চিত্রশিল্পী শব্দ দুটি সমার্থক। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু (১৮৮২-১৯৬৬) চারুকলা ও কারুকলা সম্পর্কে লিখেছেন "ভাষা চর্চার যেমন দুটো দিক আছে একটা আনন্দ ও জ্ঞানের দিক আর একটি অর্থলাভের দিক, তেমনি শিল্প চর্চারও দুটো দিক আছে একটি আনন্দ দেয় আর একটি অর্থ দেয়। এ দুটো ভাগের নাম চারুশিল্প ও কারুশিল্প।[৪]

শিল্পকলা একটি ব্যাপক শব্দ। দৃশ্যমান শিল্পে চারুশিল্প ও কারুশিল্পের যে চরিত্রগত বিভক্তি, আধুনিক শিল্পদর্শনে এর সীমারেখা নির্ণয় খুবই আপেক্ষিক ব্যাপার। দার্শনিক সান্তায়নার (George Santayana 1863-1952) মতে কোনো কিছুর নন্দনমূল্যকে তার ব্যবহারিক ও নৈতিক মূল্য থেকে আলাদা করে দেখা উচিত নয়। তাঁর মতে–"Neither in the history of the art nor in a national estimate of its value can the aesthetic function of things be divorced from practical and moral"।

চারুশিল্প একটি দৃশ্যশিল্প। এই দৃশ্যশিল্প কোনো হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ব্যাপার নয়। মানব সভ্যতার ইতিহাসের সাথে দৃশ্যশিল্পের সম্পর্ক প্রায় অবিচ্ছেদ্য। সভ্যতার উষালগ্নে দৃশ্যকলা গুহামানবদের জীবন সংগ্রামের অন্যতম প্রধান অবলম্বন হিসাবে কাজ করেছে। প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে শিল্পকলা ছিল পরলৌকিক সাফল্যের চাবিকাঠি। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় সমাজ ব্যবস্থায় দৃশ্যশিল্প ধর্মীয় প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার হয়েছে। অন্যদিকে ভারতীয় ঐতিহ্যে ইহলৌকিক নির্বাণ লাভের প্রয়োজনে ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের অঙ্গ হয়েছে দৃশ্যশিল্প।

দৃশ্যশিল্প দৃষ্টি গোচরতায় পৃথিবীকে অনুভব করার একটি আবেগময় কৌশল। এছাড়া আরো নানা ভাবে পৃথিবীকে অনুভব করা যায়। যেমন ভূ-তত্ত্বের সংজ্ঞায়, জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে, গাণিতিক বিবেচনায়, আপেক্ষিকতায় কল্প কাহিনী তৈরি করে অথবা দার্শনিক বিভাবনে বা চিন্তায়। কিন্তু দৃশ্যশিল্প হচ্ছে ভিন্নতর একটি চৈতন্যভিত্তিক সিদ্ধি, দৃষ্টির সহায়তায় যাকে আমরা ব্যাখ্যা করে এবং দৃষ্টিগত তাৎপর্যে মূর্তিমান করি। শিল্পী বিশেষ কৌশলে তার দৃষ্টি নির্ভর, অনুভূত সত্যকে রঙ ও রেখার সাহায্যে রূপ দান করে অথবা ভাস্কর্যে মূর্ত করে। মানুষ যে কত বিচিত্র রূপে পৃথিবীকে দেখে তার বিবিধ প্রমাণ পাওয়া যায় শিল্পসত্তার বিকাশের ইতিহাসে। দৃষ্টিগত অনুভূতির যে কত রকম স্বরগ্রাম, বিচিত্র প্রয়াস আছে, দৃশ্যশিল্প তার প্রমাণ।

দৃশ্যশিল্প ও উপনিবেশবাদ

আঠারোশ উনপঞ্চাশে ইমপ্রেসনিস্ট চিত্রশিল্পী এদগার দেগা (Edgar Degas 1834-1917) নতুন শিল্প ভাষার অনুসন্ধানে জাপানি কাঠ খোদাইয়ের গুণ আত্মগত করেছিলেন। এদুয়ার মানে (Edouard Manet 1832-1883), অলফ্রেদ সিসলি (Alfred Sisley 1839-1899), পিয়ের অউগুস্ত রেনোয়া (Pierre Auguste Renoir 1841-1919), জাপানি কাঠখোদাইর গুণ আত্মগত করণে তৎপর হয়েছিলেন। জাপানি কাঠ খোদাই ইমপ্রেশনিস্ট ও পোস্টইমপ্রেসনিস্ট চিত্রকরদের কাছে নতুন চিত্রভাষার জোগান দিয়েছিল। পোস্টইমপ্রেসনিস্ট পল গগ্যাঁ (Paul Gauguin 1848-1930), ভিনসেন্ট ভ্যান গগ (Vincent van Gogh 1853-1890), তুল লোএ (Toylouse Lautrec 1864-1907)-এর ছবিতে জাপানি কাঠখোদাইয়ের প্রভাব অক্ষয় হয়েছে। এর পরে "আর্তনুভ" আন্দোলনে ছবিতে স্থাপত্যে ও অন্যান্য নির্মাণে জাপানি, জাভানি, কম্বোজি, ফারসি শিল্পের নকশাগুণ প্রবল প্রভাব ফেলেছে। কিউবিজমে হিস্পানি, আইবেরিয় প্রাচীন শিল্পকলা ছাড়াও আফ্রিকি উৎসর্গশিল্প ও আনুষ্ঠানিক শিল্প যথা দারু ভাস্কর্য ও মুখোশের লক্ষণ সরাসরি বিদ্যমান। একেবারে আধুনিক সময় পর্যন্ত এই গ্রহণের ব্যাপারটি লক্ষ করা যায়। শেখ মুহম্মদ আমিরের ছবিতে (১৮৪০থেকে ১৮৫০ এর মধ্যে আঁকা) ইউরোপীয় স্বভাবনিষ্ঠতা অন্বিত হয়েছিল।[৫] গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

(১৮৬৭-১৯৩৮) আলো আঁধারিতে গড়া সাদা-কালোর বিন্যাসে আঁকা নতুন ছবিতে এদেশি এবং ওদেশি সমালোচকরা ফরাসি কিউবিজমের অনুকৃতি প্রমাণে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তখন অজিত ঘোষ 'রূপম' পত্রিকার অক্টোবর উনিশশো ছাব্বিশ সংখ্যায় কলকাতার কালিঘাটের পটের বলিষ্ঠ রেখার উল্লেখ করে একে চীনা ক্যালিগ্রাফের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কালিঘাটের পটে ইমপ্রেসনিজম ও কিউবিজমের পূর্বাভাস দেখা দিয়েছিল। তাঁর ধারণাকে উড়িয়ে না দিলেও উইলিয়াম আর্চার (William Archer) কালিঘাটের পটের প্রভাব যে ফার্নান্দ লেজে (Fernand Leger 1881-1955) প্রমুখ কিউবিস্টের ছবিতে দেখা গিয়েছিল তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেননি। আর্চার এ-ও বলেছেন যে কালিঘাটের পট (এবং অবশ্যই কলকাতার বটতলার কাঠখোদাই) ইউরোপে সহজ প্রাপ্য ছিল। অজিত ঘোষের মন্তব্য যে অমূলক ছিল না, তা পিকাসো (Publo Ruiz-y Picasso 1881-1973), মাতিস (Henri Matisse 1869-1954) ও ফার্নান্দ লেজের, ছবিতে স্তম্ভকসদৃশ্য গড়ন, টোন, ড্রইং-এর সংস্থানই বলে দেয়। একেবারে পাথুরে প্রমাণ হিসাবে আর্চার নিজেই বটতলার কাঠখোদাই আর ফার্নান্দ লেজের ছবি পাশাপাশি ছেপে দেখিয়েছেন কালিঘাটের পটের অনুকরণে বটতলার কাঠখোদাইকরেরা হাতে ধরা চিংড়ির ছবিতে বাঙালির মৎস্যপ্রিয়তাকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। ফার্নান্দ লেজের ছবির রচনা কালিঘাট বটতলাকে অনুসরণ করলেও বাঙালির মৎস্যপ্রিয়তাকে ফার্নান্দ লেজে ফরাসির মদ্যপ্রিয়তার পরিপূরক মনে করে হাতে মাছের বদলে সোডার বোতল দেখিয়েছিলেন।[৬] কালিঘাটের নিবারণচন্দ্র ঘোষের গোলাপসুন্দরী আর ফার্নান্দ লেজের শায়িতা রমণী, জর্জেস ব্রাক-এর নায়িকা, পাবলো পিকাসোর 'ঝরনায় তিন রমণী' দেখলেই সেই পাথুরে প্রমাণ তো মেলেই। ফার্নান্দ লেজে কালিঘাটের গোলাপ সুন্দরীর মতো তাঁর 'শায়ীতা রমণীর' হাতে গোলাপ ধরিয়েছিলেন। আধুনিক চিত্রভাষার অন্বেষণে প্যারিস-কেন্দ্রিক আন্দোলনে গত শতকের শেষের ও এই শতকের প্রথম দিকের চিত্রশিল্পীদের আত্মপর বিবেচনা ছিল না। উনিশ শতকে আঁকা অঁরি মাতিসের যে 'লা লুকস' ছবিটি সমতলীয় রঙে রেখায় রূপের সমীকরণের জন্য এখনও প্রশংসা পায়, সেই ছবির গঠন শৈলীতে বাংলার পটের সমর্থন মেলে।

এই শতকের প্যারিস, লন্ডন, নিউইয়র্কের ছবিকে আমরা আধুনিক বিশ্বশিল্পকলার আদর্শ জ্ঞান করে তাদের অনুকরণে সক্রিয় থেকে দাস জাতীয় হীনম্মন্যতায় নিজেদের বিশ্বশিল্পভাবনের শরিক মনে করছি। ইমপ্রেশনিজম থেকে সমকালীন পশ্চিমি চিত্রের নির্মিতের ইতিহাস না জেনেই আমরা সেইসব আধুনিকতার লেজুড়বৃত্তি করে চলেছি। পশ্চিমি চিত্রশিল্পের আধুনিক ভাষিক অভিব্যক্তি নির্মাণে চীন, জাপান, পারস্য, মিসর, মেহিকো, জাভা, কম্বোজ ও আফ্রিকার দেশগুলোর মতো কলকাতার উনিশ শতকের চিত্রশিল্পও যে, উর্বরক শক্তির কাজ করেছে তার ইতিহাস এখনও লেখা বাকি। অজিত ঘোষ নান্দনিক বিশ্লেষণ না করলেও তাঁর মন্তব্য অহেতুক ছিল না। তা আমরা কলকাতার ছবি আর প্যারিসের ছবি পাশাপাশি রাখলে বুঝতে পারি। কালিঘাটের পটে ও বটতলার কাঠখোদাইতে যে অবয়বের তলবিন্যাসগত সরলীকরণ, অবয়বকে স্থূল পিণ্ডগুণসম্পন্নতায় স্তম্ভকের গড়নে দেখা, স্পষ্ট বহিঃরেখার ভিতর দিয়ে বিলীয়মান মেলায়েম পর্দা অবয়বগুলিকে ছবির পুরোভূমিতে দ্বিমাত্রিকতায় তুলে ধরা, রঙের সমতলীয়তা ও রেখার খেলা, কালো সাদার বিন্যাস ইত্যাদির হুবহু আত্মীকরণ আমরা পিকাসো, ব্রাক, (Braque, Georges) মাতিস, ফার্নান্দ লেজে প্রমুখ আধুনিক শিল্পীদের ছবিতে লক্ষ করি। কিন্তু শিল্প বিচারে এ যাবৎ পশ্চিমা রায় নির্দ্বিধচিত্তে মেনে নেওয়ার কারণে আমরা তা তুলনামূলক বিশ্লেষণ দেখিনি। কালিঘাটের পট আর বটতলার ছাপা ছবি এ দেশি শিক্ষিত মানুষের কাছে সমাদৃত হয়নি।[৭] মেকলের অভিভাবনে অভিভূত এদেশি শিক্ষিত অভিজাত মানুষ তখন পশ্চিমে রেনেসাঁস, বারোক, রোকোকো, রোমান্টিসিজম, রিয়্যালিজম ছবিতে মশগুল। তাছাড়া আমাদের ভিক্টোরীয় রুচিতে এই ছবির চেহারা আর বিষয় গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। এই ছবির তীব্রতাও রুচিকর ঠেকেনি। কিন্তু বিষয়ের ভার বইবার জন্য এই উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার বাঙালি শিল্পীরা যে আশ্চর্য বাংলা ঘরানার শিল্পের রচনা করেছিলেন, সেই শিল্পের অসাধারণ শৈলীগুণই তখন চোখ এড়িয়ে গেছে।

এর পরই কলকাতায় শুরু হয় উপনিবেশবাদী শিল্পের বিস্তার। শিল্পকলা সমালোচক অধ্যাপক শোভন সোম যাকে আখ্যায়িত করেছেন 'কলোনিয়্যাল অলিম্পাস' বলে। কারণ কলোনিয়্যাল অলিম্পাসের দৃশ্যমান

মূর্তিকলাগুলি শুধু স্টাচুর মান বিচারে স্থাপিত হয়নি,[৮] নীল-নকশায় ছিল দেব-দেবীর দেশে দেবকুল প্রতিষ্ঠার। ১৭৫৭-এ পলাশির নির্ণায়ক যুদ্ধে এ দেশি মানুষের বিশ্বাসঘাতকতার পর থেকে ইংরেজের ক্রমাগত উত্থান হতে থাকে। বনবাদাড় সাফ করে গোবিন্দপুরের মানুষদের অরাধ্যদেবতা গোবিন্দজীসহ উৎখাত করে নতুন কেল্লা ফোর্ট উইলিয়াম গড়া হয়।

আঠারোশ তিনের মধ্যে কলকাতার ময়দানের লে-আউটসহ ডালহৌসি স্কোয়ার, এসপ্ল্যানেড ধর্মতলা, লালবাজার থেকে চৌরঙ্গী, পার্কস্ট্রিট হয়ে দক্ষিণ বির্জিতলা অবধি বেড়ের মধ্যে তৈরি হলো কলকাতার হোয়াইট টাউন বা সাদা আদমির শহর। এরই মধ্যে গড়ে তোলা হলো লাট প্রসাদ, রাইটার্স বিল্ডিং (বর্তমান মহাকরণ), সুপ্রিম কোর্ট, কাচারিবাড়ি, টাঁকশাল, কাউন্সিল হাউস ইত্যাদিসহ লন্ডনের পর ব্রিটিশ সম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর কলকাতা, যার আদুরে নাম হলো প্রাসাদনগরী। আঠারো-উনিশ শতকে ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা এই শহরের ইমারতি সৌন্দর্যের যে ফলাও বিবরণ দিয়েছেন, তা এই সাদা আদমির শহর কলকাতারই বিবরণ। সাদা আদমির নির্ধারিত এলাকার বাইরে উত্তরে-দক্ষিণে-পূর্বে ছিল কালা আদমি বা নেটিভদের নির্ধারিত স্থান, যা ছিল ঘিঞ্জি, নোংরা, অনুন্নত, জমিদার আর বাবুদের প্রাসাদ ছাড়া যার অধিকাংশ ছিল হতশ্রী কুঁড়েঘর। উনিশ শতকীয় বাংলার রেনেসাঁস ছিল এই কালা আদমির শহরের জাগরণ।

চুয়ান্ন খ্রিস্টপূর্বাব্দে জুলিয়াস সিজার ব্রিটেনে বিজয়ী হিসাবে পর্দাপণ করেছিলেন। তখন রোমকরা ছিল তুলনামূলকভাবে সুসভ্য, উন্নত জ্ঞানে-গরিমায় ছিল অতুলনীয়। কিন্তু ব্রিটিশরা ছিল ট্রাইবে বিভক্ত, বর্বর। এখনও ব্রিটিশদের ধারণা, ইংল্যান্ডে সিজার প্রথম সভ্যতার বার্তা এনেছিলেন। এর আগে কেল্ট, স্যাক্সন, ডেইন-রা ব্রিটেনে এসেছিল ব্রিটেনের আদি অধিবাসীদের খেদিয়ে বসতি করতে। পনের শতক থেকে হিস্পানিরা মেহিকো থেকে নিচের দিকে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে আদি অধিবাসীদের হয় খেদিয়ে নয় তা সংকর বানিয়ে ওদের সম্পূর্ণ হিস্পানি সংস্কৃতিতে দীক্ষিত করে উপনিবেশ গড়তে গিয়েছিল। কিন্তু সিজারের নেতৃত্বে রোমকরা তাদের উন্নত সভ্যতার অধিকারে ব্রিটেনদের সুসভ্য করে তুলতে এবং সেই অধিকারে তাদের শাসন করতে গিয়েছিল। ব্রিটেনের নেটিভ ট্রাইবাল অর্গানাইজেশন বা স্থায়ী আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থাকে রোমকরা আধুনিকীকরণের দিকে নিয়ে যায়, নগর সভ্যতার প্রতিনিধি রোমকরা ব্রিটেনের গ্রাম্যসভ্যতাকে নগর সভ্যতার দিকে নিয়ে যায়। ব্রিটেনে তখন কেল্টিক দেবকুল চালু ছিল। কেল্টদের মতো রোমকরাও ছিল মূর্তিপূজক। ব্রিটেনে কেল্ট দেবকুল থাকলেও সরকারি রোমক দেবকুল গৃহীত হতে বাধা পায়নি। বরং রোমকরা তাদের পবিত্র পর্বত অলিম্পাসবাসী দেবকুলের সঙ্গে কেল্টিক দেবকুলের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিল।

লক্ষণীয় যে, উপনিবেশ বিস্তারে ও দখলে ইংরেজ কেল্ট বা হিস্পানি মডেল বা আদর্শ নেয়নি, ইংরাজরাও বিজেতা রোমকদের মতো মনে করতো যে, তাবৎ বিজিত জাতিকে বর্বরাবস্থা থেকে সভ্যতার আলোকে উত্তরণ করার জন্য ইংরেজ স্বর্গাদিষ্ট। এই ধারণা একেবারেই অমূলক ছিল না। কেননা ইংরেজদের এই আবির্ভাব অনেক মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছিল। শুধু ইংরেজ সাহেবদের নয়, মোঘলদের আবির্ভাবের সময়েও একই ধারণা পোষণ করেছিল অনেক সাধারণ মানুষ।

বাংলা ১১৭২ সালে বা ইংরেজি ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ই আগস্ট তারিখটি কোম্পানির দেওয়ানি লাভের ঐতিহাসিক তারিখ। ইংরেজদের এদেশে রাজনৈতিক জয়যাত্রা সেই থেকেই শুরু হয়, যাকে কেন্দ্র করে বাংলার মাটিতে তৈরি হয়েছিল অনেক করুণ ইতিহাস। পাবনা জেলার নাকালিয়া গ্রামের এক অখ্যাত কবি রামপ্রসাদ মৈত্রেয় সেই ঐতিহাসিক তারিখটিকে অমর করে রেখে গেছেন তার পদ্য কবিতায়।

"অপূর্ব্ব শুনহ সবে স্বর্গের যতক দেবে
বিলাতে হইলা সাহেবরূপী।
ছাড়িলা আহ্নিক পূজা পরিধান কুর্ত্তি মুজা
হাতে বেত শিরে দিলা টুপী।
বাঙলার অভিলাষে আইলা সদাগরবেশে
কৈলকাতা পুরানা কুঠি আদি।

গতামত সুভেদারী শুভসন বাহাত্তরী
আংরেজ আমল তদবধি।" [৯]

এখানে গ্রাম্যকবি ইংরেজ বণিকদের দেবতার আসনে বসিয়েছেন অক্লেশে। তাঁর মতে স্বর্গের দেবতারাই রূপবদল করে, পূজা-আহ্নিক পরিত্যাগ করে, সাহেবরূপে আর্বিভূত হয়েছেন বাংলায়। গ্রাম্যকবিদের এই ধরনের মনোভাব ইতিপূর্বে মুসলমান আমলেও দেখা গেছে। আওরঙ্গজেবের সমকালীন জনৈক বাঙালি হিন্দু কবির উক্তিতে পাই স্বর্গে দেবতারা তাঁদের রূপগুণ আচরণের পরিবর্তন করে যবনরূপে "দিল্লীয়ে কৈলে পাশ্চাই ঠাকুরালী"। অর্থাৎ স্বর্গের দেবতারাই যবনরূপে দেশ শাসন করতে আবির্ভূত হলেন। এই প্রসঙ্গে রামাঞী পণ্ডিতের 'শ্রীধর্মপুরাণ' পুঁথিটির কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে দেখি ব্রাহ্মণের জাতি নষ্ট করতে প্রভু নিরঞ্জনের যবন বেশে আবির্ভাবের কাহিনী।

ব্রাহ্মণের জাতি ধ্বংস হেতু নিরঞ্জন।
জাজপুরে প্রবেসিলা হইয়া জবন॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব জত পথে নাগালি পায়।
ভালের তিলক সব পুচ্ছ্য পেলে পায়॥
জাতি নাশ করে কার মুখে দিয়া ছিবা।
মারা কাড়্যা খায় কার দিয়া ঘাড় দাবা॥
পাসান প্রতিমা ভাঙ্গে গোহাড়ের ঘায়।
হাতি প্রাণ কর‍্যা কত দেয়াসি পালায়॥
বামনে ডাকিয়া প্রভু কহেন কৌতুক।
তিন ভাগ জাজপুর করিব তুড়ুক॥
বেদ বিদ্যা ঘুঁচাইয়া পড়াব কোরান।
নিশ্চয় কিরল তোরে ইথে নহে আন॥
আনিয়া করার পানি ধোয়াইল হাত।
বামনে যবন করে দুনিয়ার নাথ॥ [১০]

শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বইতে এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, এ দেশের মানুষ ইংরেজ শাসনকে অরাজক অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হবার ও অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার উপায় হিসাবে দেখেছিলেন। এই দেশ ছিল অনৈক্যে হীনবল, বিবদমান ও অপদার্থ শাসকদের শাসনে নিঃস্ব এবং এক অনড় সমাজব্যবস্থার কারণে জড়ীভূত। শিক্ষা, যোগাযোগ ও জনহিতকর কোনো কার্যক্রমই এ দেশে ছিল না। সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা ছাড়াও যেমন কর্মপ্রসারের কোনো প্রয়াস ছিল না, তেমনি বৃত্তিনির্বাচনের স্বাধীনতার অভাবে মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ছিল বংশানুক্রমিক কৌলিকবৃত্তিনির্বাহে বাধ্য।[১১] কিন্তু ইংরেজ শাসক গোড়ায় এই অঞ্চলে তার নির্ব্যূঢ় স্বার্থে প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ছাড়া আর কোনো সংস্কারে উদ্যোগী হতে উৎসুক ছিল না। উনিশ শতকের প্রারম্ভ অবধি এ দেশে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের কোনো উদ্যমেই ইংরেজ আগ্রহ প্রকাশ করেনি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো ভূমিব্যবস্থার বিকাশ ইংরেজ করেছিল সহজে ভূমিরাজস্ব আদায় নিশ্চিত করবার জন্য। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল উন্নতিতে ইংরেজ তৎপর হতে বাধ্য হয়েছিল উপনিবেশ বিস্তার, কাঁচামাল আহরণ ও রপ্তানি এবং শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করবার ঐকান্তিক লক্ষ্যে। এই পরিকল্পনা ও প্রকল্প ইত্যাদির পিছনে এই দেশকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে উদ্ধারের কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না। লক্ষণীয় যে, ইংরেজ এ দেশের মানুষের পরম্পরাগত শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে চায়নি বিদ্রোহের আশঙ্কায়। বরং এ দেশের পরম্পরাগত ব্যবস্থাকে উৎসাহিত ও বলীয়ান করে মানুষের আস্থাভাজন হবার চেষ্টাই তাদের ছিল।

দেওয়ানি কাজের ভার কোম্পানি নিজের হাতে নেবার পরও দীর্ঘদিন বাদশাহি পরম্পরায় ফৌজদারি কাজের ভার ছিল ফারসি জানা মুসলিম কর্মচারীদের উপর। মুঘল শাসনাধীন এলাকায় তো বটেই নবাব আলিবর্দি, নবাব সিরাজউদ্দৌলাহর বাংলায়ও শাসন ও আভিজাত্যের ভাষা ছিল ফারসি। উনিশ শতকের

মাঝামাঝি অবধি শিক্ষিত হিন্দু মুসলমান ফারসি শিখতেন, ফারসি পরিচ্ছদ পরিধান করতেন, ফারসি আদব-কায়দা রপ্ত করতেন। সেটাই ছিল অভিজাতের সংস্কৃতি। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ফারসিতে পণ্ডিত। কোম্পানির শাসনের গোড়ায় ফৌজদারি বিচারের কাজে ইংরেজ বিচারপতিকে সাহায্য করবার জন্য একজন ফারসিতে পারদর্শী আলিম থাকতেন। কিন্তু সব ফারসি জানা আলিম মৌলবিই যে আইন জানতেন, এমন নয়। বস্তুত এই অভাব দূর করবার লক্ষ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস উদ্যোগী হয়ে ১৭৮১-তে কলকাতায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। হেস্টিংস এ ব্যাপারে এমনই আগ্রহী ছিলেন যে এই মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য তিনি ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের প্রয়োজনীয় অনুমোদনের অপেক্ষা করেননি। আরবি, ফারসির জ্ঞানচর্চা বিবর্ধন তাঁর লক্ষ্য ছিল না, ছিল কোম্পানির স্বার্থের লক্ষ্য। কিন্তু এ অঞ্চলের জনমানুষ ছিল দুটি বৃহৎ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত এবং এই দুটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল সাম্প্রদায়িক। মাদ্রাসা স্থাপনের পর দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বারানসীর রেসিডেন্ট জোনাথন ডানকান উদ্যোগী হয়ে বারানসীতে সতেরশ বিরানব্বইতে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করলেন। দুটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের রীতিরেওয়াজের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে কোম্পানি গোড়ার দিকে খ্রিস্টধর্ম প্রচারেও বিরত ছিল। দিনেমার শাসনাধীন শ্রীরামপুরেও দিনেমার রাজার অনুমতি নিয়ে উইলিয়াম কেরি, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, ডব্লু. ওয়ার্ড প্রমুখ ইংরেজ পাদ্রি খ্রিস্টধর্ম প্রচার করলেও তাঁরা ইংরেজের অঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অনুমতি পাননি। এই অঞ্চলের মানুষ যে ধর্মাচরণের স্বাধীনতাকেই সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা মনে করে, ইংরেজ তা বুঝেছিল। হিন্দু পর্বোপলক্ষে কলকাতার কেল্লা থেকে সম্মানজনক তোপ দাগা হতো। আঠারশ চল্লিশ অবধি ইংরেজ কোনো যুদ্ধে জয়ী হলে কালিঘাটের কালীমন্দিরে পূজা দেওয়া হতো।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার ৮ই জুলাই ২০০০ সংখ্যায় প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার মার্ক অরেল স্টাইন (১৮৬২-১৯৪৩)-এর ১৯৪২-এ লন্ডনে "দি জিওগ্রাফিক্যাল জার্ণাল" পত্রিকায় এ সার্ভে অফ এনসিয়েন্ট সাইট্স অ্যালং দি "লস্ট" সরস্বতী রিভার নামে যে একটি প্রত্নতত্ত্ব ক্ষেত্রসমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছিল, ভারতীয় যাদুঘরের অধিক্ষক ড. শ্যামল কান্তি চক্রবর্তী কৃত তারই অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তাতেও ইংরেজদের ভারত শাসনের অধিকারের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষাটির "আর্যামিয়ানার রাজনীতি" অংশে স্যার অরেল লিখেছেন গত ঊনবিংশ শতকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের চর্চাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের কথা আজ পণ্ডিত মহলে সুপরিচিত। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের মধ্যে 'আর্য' জাতির খোঁজ, ইউরোপে বা ইউরোশীয় অঞ্চলে তাদের আদি বাসস্থানের সন্ধান এবং নর্ডিক জাতির সঙ্গে তাদের অভিন্নতাবোধ অনেক ইউরোপীয়দের ধারণায় 'আর্য'দের "সবচাইতে সংগঠিত, উদ্যমী ও সৃজনশীল জাতি বলে" চিহ্নিত করল। ১৮৫৮ তে উইলসন অভিমত প্রকাশ করলেন যে, বহু পূর্বে যেমন আর্যদের এক শাখা ভারতে এসে দস্যু দমন করেছিলেন, তেমনি ঐ জাতির আর এক শাখাভুক্ত লোকেরা অর্থাৎ ইংরেজরা ভারতে 'আদি' আর্যদের ও দস্যুদের বংশধরদের উপরে আধিপত্য স্থাপন করেছে। অতএব ব্রিটিশরা ভারতে আর্যশাসনের ন্যায্য ও সঙ্গত উত্তরাধিকারী।

প্রাচীন ব্রিটিশ, রোমক উভয়ই ছিল শ্বেতকায়। কিন্তু ব্রিটিশ উপনিবেশের অধিবাসীরা ছিল কৃষ্ণকায়। তাই ইংরেজ এও মনে করতো যে, তারা কালা মানুষকে উদ্ধার করতে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হয়েছে। পার্থিব রাজ্য জয়ের পর উপনিবেশবাদ বিজিত জাতির মস্তিষ্ক শোধনের চেষ্টা করে। উন্নত সভ্যতার অধিকারে বিজেতা এটা করে থাকে মানসিক দাসত্বের বাতাবরণে অনুগতদের সহযোগিতায় রাজত্বকে দীর্ঘমেয়াদি করে তুলতে। সিজারের সময়ে রোমক সম্রাট ও সেনাপতিদের দৈবীশক্তি সম্পন্ন মানুষরূপে দর্শিয়ে তৈরি করা মূর্তি নগরের চৌমাথায়, উদ্যানে স্থাপন করা হতো। সম্রাট অগস্টসের প্রতীকী উপস্থিতি জাহির করতে গোটা রোমক সাম্রাজ্য জুড়ে তাঁর নানাভঙ্গির দৃপ্তমহিম মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল।

রোমক শাসনে দৃশ্যশিল্প ছিল রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি প্রচার ব্যবস্থার হাতিয়ার। প্রতিকৃতি কেবল সাদৃশ্যধর্মীই করা হতো না, বয়স্ক বৃদ্ধ সম্রাট ও সেনাপতিদের তরুণ বয়সী চেহারায় গড়া গতো। হিন্দু শাস্ত্রীয় বিধানেও দেখা যায় যে, আরাধ্য দেবতাকে বৃদ্ধ, রুগ্ন, হাড়পাঁজরায় না দেখাতে বলা হয়েছে, বলা হয়েছে বালক

বা তরুণ সুকুমার সুঠাম সুন্দরকান্তি হিসাবে দেখাতে, যাতে ঐ দেবতার তারুণ্যের প্রভাবে ভক্ত হৃদয়েও প্রফুল্লতা সঞ্চারিত হয়। রোমকরা অবশ্য অন্য কারণে বৃদ্ধ বয়স্ক শাসকদেরও তরুণ মূর্তিতে দেখাত। তথাকথিত বীর যে বৃদ্ধ বয়স্ক হয়ে যাননি, তিনি যে চিরতরুণ এবং কীর্তি যে কখনো জরাগ্রস্ত হয় না, এটা প্রজার মনে গেঁথে দেওয়াই রোমকদের লক্ষ্য ছিল। এই রোমক আদর্শেই ইংরেজ ভারত সাম্রাজ্যে তার সাম্রাজ্যবাদী তথাকথিত বীরদের মূর্তি বসিয়ে শাসকের নতুন দেবকুল প্রতিষ্ঠা করেছিল। বিজিত জাতির মস্তিষ্ক শোধনের নানাবিধ প্রক্রিয়ার মধ্যে রাজধানীতে নিজেদের সেনাপতি, শাসক প্রমুখের মূর্তি বা স্ট্যাচু স্থাপনের কাজটি ছিল অন্যতম। জীবন্ত চরিত্রের মূর্তি উপনিবেশে স্থাপন করে উপনিবেশবাদীরা তাদের আত্মশক্তি শানিয়ে নেয় ও বিজিতের সামনে নিজেদের অক্ষয় কীর্তি প্রচার করে দেবমহিমায় তুলে ধরে। সেই সঙ্গে চোখের সামনে তাদের প্রতিকী উপস্থিতি জাহির করে বেদির উচ্চতা ও নির্মাণের বিশালতা দিয়ে প্রজাদের মনে ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগিয়ে রাখাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।

উপনিবেশের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সময় প্রতিটি ইংরেজ রাজপুরুষ মনে করতেন যে, সমুন্নত সভ্যতার প্রতিনিধি হিসাবে অনুন্নত জাতিকে উদ্ধার করতে চলেছেন, পাদ্রিরা যেমন পরিত্রাতা যিশুর সাম্রাজ্য বিস্তারে দেশের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে অস্বাস্থ্যকর দুর্গম জায়গায় যান, ঠিক তেমনি। রোমকরা তাদের অলিম্পাসের দেবকুলের সমান্তরাল ডিভাইন স্টেইট বা পবিত্র সাম্রাজ্যের বীরদের আইকন বা মূর্তি বানিয়ে নতুন দেবকুল তৈরি করেছিল। একই ভাবে আইকনিক বা মূর্তিনির্মিতির লক্ষ্যে ইংরেজও ভারত সাম্রাজ্যে তার সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের নতুন দেবকুল নির্মাণ করেছিল।

এদেশে উপনিবেশবাদী দেবকূল প্রতিষ্ঠার অনুকূল বাতাবরণ তৈরি ছিল। এই অনুকূল বাতাবরণে গোটা উনিশ শতক জুড়ে কলকাতার হোয়াইট টাউনের পরিসরে কলোনিয়্যাল অলিম্পাস বা উপনিবেশবাদী দেবকুলের বহু ইংরেজ বীর পুরুষের মূর্তি ইংল্যান্ড থেকে এনে স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি টাইপ বা চরিত্র নিয়ে এক একটি আর্কেটাইপ বা আদি প্রতিমা তৈরির ব্যাপার লক্ষ করা যায়। এগুলির বিশ্লেষণ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, মূর্তি প্রতিষ্ঠা ইংরেজের রাজনীতিরই অঙ্গ ছিল এবং সুপরিকল্পিতভাবেই মূর্তিগুলি স্থাপন করা হয়েছিল। কোনো বিশেষ পরিবেশে বেদির উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত মহিমাব্যঞ্জক ব্যক্তিমূর্তি বিজিত জাতির চোখের সামনে রেখে বিজেতার সর্বাত্মক ঐশীক্ষমতা বিষয়ে নিরন্তন অভিভাবন দেওয়া ও মূর্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল। উপনিবেশবাদী ইংরেজ যে এই অভিভাবনে কতখানি সফল হয়েছিল, তা আঁচ করা যায় আরেক ইংরেজ রাজকর্মচারী আর্নেস্ট বিনফিল্ড হ্যাভেলের লেখা "The New Indian School of Painting" নামে লন্ডনের Studio পত্রিকায় জুলাই উনিশ শ আটে প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে। হ্যাভেল লিখেছিলেন:

> An intimate acquintance with the great manufactory of text books (the biggest establishment of its kind in word) The calcutta university, and the methods of manufacture, have given me a profund distrust of information contained in them. It is always safe to assume that a text book is wrong until you know the contrary. As for Julius Caesar's notes on the habits and customs of the ancient Britons, what will posterity know of Indian civilization and culture, if 2000 years hence Indian school books only teach the young what Clive and Macaulay though of them? .... We have been civilizing India in the same way for more than 50 years and have succeeded in pursuading educated Indians that they have no art of their won, though the evidences of its existence are many and great, indeed very much extensive than those of Ancient British Art. Twenty years ago I was sent to India to instruct Indians in art, and having instructed them and myself to the of my ability, I return filled with amazement at the insularity of the Anglo-saxon mind, which has taken more a century to discover that. We have far more to learn from India in art than India has to learn from Europe.[১২]

কর্নওঅলিসের মূর্তি স্থাপনের মাধ্যমেই কলকাতায় কলোনিয়াল অলিম্পাসের সূত্রপাত হয়, এই নতুন আইকনোগ্রাফির বা মূর্তিতত্ত্ব ও মূর্তি লক্ষণের। তার মূর্তির পাদপীঠলেখ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রোমকরা যেমন উন্নত সভ্যতার অধিকারে ও ঈশ্বরের বিধানে বর্বর ব্রিটেনদের সভ্য করে তুলতে ব্রিটেনে গিয়েছিল, তেমনি ইংরেজ তার উন্নত সভ্যতার অধিকারে বর্বর ভারতীয়দের উদ্ধার করতেই এসেছিল। এটা লক্ষণীয় যে, সামরিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করার লক্ষ্যে রোমকরা তাদের সাম্রাজ্য জুড়ে যে ব্যাপক যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, ইংরেজ এদেশে এসেই তা করেছিল।

কলোনিয়্যাল অলিম্পাসে হেস্টিংসকে বিজিত জাতির জ্ঞানদাতা হিসাবে দর্শানো হয়েছে। কর্নওঅলিসকে জেনারেল হিসাবে ও হেস্টিংসকে জ্ঞানী হিসাবে দর্শানোর পিছনেও এই নব্য দেবকুলের নতুন নতুন দেবতা তৈরির প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। তৃতীয় মূর্তিটি উইলিয়াম ক্যাভেনটিশ বেন্টিঙ্কের। আঠারোশ আটাশে ইনি গর্ভনর জেনালের অব ফোর্ট উনলিয়াম ইন বেঙ্গল হন ও আঠারো শ তিরিশের চার্টার অনুসারে গভর্নর জেনারেল অব ইন্ডিয়া। মূর্তির পাদপীঠের পিছনে তাঁর বিষয়ে বলা হয়েছে,

> Who infused into oriental despotism the sprite of British freedom .... Who allowed liberty of the expression of public opinion ... Whose constant study it was to elevate the moral and intellectual character of the nation committed to his charge. The monument was erected by men, who differing from each other in race, in language, and in religion cherish with equal veneration and gratitude the memory of his wise, upright and parental administration. [১৩]

কলকাতায় স্থাপিত এই কলোনিয়্যাল অলিম্পাস বস্তুত কলোনিয়্যাল সাইকিরই বিবর্তনের ইতিহাস। এর মধ্যে বিজিতের সামনে বিজেতার চূড়ান্ত দম্ভ তুলে ধরার উদ্দেশ্য তো ছিলই, সেই দম্ভ প্রকাশের ভিতর দিয়ে রোমকদের অধীনতাকালে অর্জিত রোমক টাইপ, অতিক্রম করে ব্রিটিশ টাইপে উত্তরণের ইতিহাসও আমরা প্রত্যক্ষ করি।

মেসোপটোমিয়া থেকে ব্রিটেন অবধি ছিল রোমকদের ইউনিভার্সাল স্টেইট। উপনিবেশবাদী ইংরেজের সাম্রাজ্য ছিল আরো ব্যাপক, দূর-দূরান্তে সেই সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেতো না। রোমকদের মতো ইংরেজরাও ভেবেছিল তার সাম্রাজ্যে ঈশ্বরের বিধান অক্ষয়। এই সাম্রাজ্যের উপনিবেশে সেইইসব উপনিবেশের স্ব স্ব কলোনিয়্যাল অলিম্পাস ছিল তার শক্তির উৎস। ইংরেজ এ দেশে থাকুক, তার শ্রীবৃদ্ধি হোক, ঈশ্বরের এই বিধান, এমন মানসিকতা তৈরিতে ইংরেজ সফল হয়েছিল। পাথরে ধাতুতে তৈরি চাক্ষুষ দেবকুলের সঙ্গে বাংলার বুদ্ধিজীবীরাও ইংরেজ শাসনকে দেখেছিলেন ঐশী বিধান হিসাবে, পরিত্রাতারূপে। রাজা রামমোহন রায়ের আরজি ছাড়াও সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে ইংরেজের অনুকূল বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ভাবোদ্‌গারের বান ডেকেছিল। সংবাদ প্রভাকরের ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কাছে ভিক্টোরিয়া ছিলেন "শ্রী শ্রীমতি বিশ্বমাতা রাজ্যেশ্বরী, শ্রী শ্রীমতি জননী। তাঁর মতে, ব্রিটিশ অধিকার এদেশের পক্ষে ছিল সুখের আধার। বাঙালি মহাশয়দের তিনি বলেছিলেন যুদ্ধ করতে হবে না, অস্ত্র ধরতে হবে না, কেবল একান্ত চিত্তে রাজপুরুষদের মঙ্গলার্থে স্বস্ত্যয়ন করুন। ঈশ্বরের কাছে তিনি ইংরেজের জয় ভিক্ষা করেছিলেন। ইংরেজের রাজলক্ষ্মী যেন স্থির রয়, এই প্রার্থনা সিপাহি বিদ্রোহের কালে বহু বাঙালি বুদ্ধিজীবী উচ্চৈঃস্বরে করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠে' সত্যানন্দ বলেছিলেন, বণিক ইংরেজকে রাজ্য শাসনের ভার নিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যই সন্তান বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ইংরেজদের মতো পরাক্রম মিত্র রাজাকে পরাস্ত করে এমন শক্তি নেই। 'দেবী চৌধুরাণী'তেও ইংরেজ রাজ্যশাসনের ভার নেবার পর ভবানী ঠাকুরের কাজ ফুরোলো আর দেবী চৌধুরানীর আচ্ছাদন ফেলে প্রফুল্ল হেঁসেলে ঢুকলো সপত্নীর সঙ্গে সংসার করতে। ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে আদি ব্রাহ্ম সমাজে পঠিত শোক প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, ভারতেশ্বরী মহারানী যে মহান পুরুষের নিয়োগে এই পার্থিব রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাহার প্রাসাদে সুচিরকাল জীবিত থাকিয়া অনিন্দিতা রাজ্যশ্রীকে দেশে কালে ও প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়ের মধ্যে সুদৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাঁর মৃত্যুতে আমরা শোকাভিভূত। বস্তুকলোনিয়াল অলিম্পাস কলকাতার হোয়াইট টাউনের চৌহদ্দিতে কয়েকটি পাথরের ধাতুতে গড়া মূর্তি সর্বস্ব ছিল না, কলকাতার ব্লাক টাউনে

বাঙালির মানসপটে অধিষ্ঠানের ভিতর দিয়েই ঔপনিবেশিক ইংরেজের কলোনিয়্যাল অলিম্পাস তৈরির উদ্দেশ্য সাধিত ও সার্থক হয়েছিল।

উনিশ শ তেত্রিশে কলকাতায় 'ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের নামের সঙ্গে 'ইন্ডিয়ান' শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে গ্ল্যাডস্টোন-সলোমন (১৮৮০-১৯৬৫) আর্ট স্কুলে এক সভা আহ্বান করেন। তিনি সভায় বলেন যে, বাংলার মানুষদের 'ইন্ডিয়া'র প্রতিনিধিত্ব করার কোনো অধিকার নেই। এর প্রতিবাদে তিনি অল ইন্ডিয়া আর্ট একাডেমি সংগঠনেরও প্রস্তাব দেন। একই সঙ্গে তিনি বাংলার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার জন্য সরকারেরও নিন্দা করেন যেহেতু ঐ আকাডেমির উদ্যমের সঙ্গে বহু রাজপুরুষ জড়িত ছিলেন। বড়লাট লর্ড উইলিংটন, বাংলার লাট স্যর জন অ্যান্ডার্সনের কাছে দিল্লি থেকে জরুরি বার্তা পাঠিয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের নাম থেকে 'ইন্ডিয়ান' শব্দটি বাদ দিতে বলেন। অতঃপর এই প্রতিষ্ঠানের নাম থেকে 'ইন্ডিয়ান' শব্দ বর্জন করে এটির নামকরণ করা হয় "অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস"। দি ইনডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির মতো এই প্রতিষ্ঠানটিও ছিল সরকারি অনুগ্রহে লালিত। কাইজার-ই-হিন্দ উপাধি প্রাপ্ত ইংরেজ উইলিয়াম এওয়ার্ট গ্লাডস্টোন-সলোমন কলকাতার অর্থাৎ বাংলার একটি সংস্থার নামের সঙ্গে 'ইন্ডিয়ান' শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, কারণ তাঁর এই ভাবনায় মানসিকভাবে শতবর্দ্ধ বোম্বের শিল্পী সমাজ ও বিদ্বজনসমাজ শামিল হয়েছিলেন। হ্যাভেল ও গ্ল্যাডস্টোন-সলোমন বেশ কজন দোহার পেয়েছিলেন, যাঁরা তাঁদের প্রতিটি কথায় দোহার্কি দিতে এগিয়ে আসতেন। গ্ল্যাডস্টোন-সলোমনের সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন ওসওয়াল্ড কোল্ডরে, স্যামুয়েল টি শেপার্ড, কনহাইয়ালাল বকিল এবং দৈনিক টাইমস অফ ইন্ডিয়া ও বোম্বে ক্রনিকল। যেমন বোম্বে আর্ট সোসাইটির তেমনি দি ইন্ডিয়ান সোসাইট অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট ও অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের তাৎকালিক কর্তৃপক্ষ ছিলেন উপনিবেশবাদী সরকারের ধামাধরা। লাটসাহেব, বণিক, রাজকর্মচারী এবং তাদের লেজুড় দেশি রাজন্যবর্গ সেই সব সংস্থা আলো করতেন। অ্যাকাডেমির বার্ষিক প্রদর্শনীগুলিতে এই সব সেলিব্রিটি বা ডাকসাইটেদের সমাগম গত। সরকারি দাক্ষিণ্যও এগুলির প্রতি অকাতরে বর্ষিত হতো। লাটসাহেবদের নজরে পড়বার জন্য রাজা ও জমিদাররা প্রচুর শিল্পকর্ম কিনতেন। শিল্পকর্ম বিক্রির হিড়িক পড়ে যেত।

উপমহাদেশের যশাকাঙ্ক্ষী বহু শিল্পী তখন সরকারি প্রসাদে ধন্য হতে এতই ব্যাকুল যে, তাঁরা ভেবে দেখেননি যে এ দেশের কোনও আকাঙ্ক্ষার নেতৃত্বই ইংরেজ রাজকর্মচারীদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। তাঁরা ভেবেও দেখেননি যে, আঠার শতক অবধি যারা ছিল আর্টলেস আইল্যান্ডার তারাই এদেশে শিল্প শিক্ষা দিতে এসেছিল। ইংরেজ যে অ্যাকাডেমিক আর্টের ধ্বজাধারী ছিল, সেই অ্যাকাডেমিক আর্টের পরম্পরা ইংরেজের নিজস্ব ছিল না। উইলিয়াম হোগার্থ এর (১৬৯৭-১৭৬২) আবির্ভাবের আগে অবধি ইংরেজরা সামান্য প্রতিকৃতি আঁকাতে ইউরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে শিল্পীদের ভাড়া করে আনত, খেতাব দিয়ে ভূষিত করত। ইংরেজ যদি ইতালির ও ফরাসি দেশের শিল্পশিক্ষা ব্যবস্থার উত্তরাধিকার নিজের উত্তরাধিকার বলে এ কারণে দাবি করতে পারে যে ইতালি ও ফরাসি এবং ইংল্যান্ড একই মহাদেশভুক্ত তাহলে ভারতও চীন জাপানের পরম্পরাকে নিজের বলে দাবি করতে পারে। অথচ গ্ল্যাডস্টোন-সলোমন বাংলা ঘরানার ছবিতে জাপানি উপাদানের অন্তীভবনের নিন্দা করেছিলেন, বিট্রিশ ইন্ডিয়াভুক্ত বাংলার একটি সংস্থার নামের সঙ্গে 'ইন্ডিয়ান' শব্দ ব্যবহার করায় তিনি আপত্তি করেছিলেন এবং অজন্তা ও মুঘল চিত্রকলাকে পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হিসাবে তিনি স্বীকার করেননি। তিনিই বলেছিলেন যে অজন্তার উত্তরাধিকার বোম্বে দাবি করতে পারে, বাংলা তা পারে না; যেহেতু বাংলা থেকে অজন্তা হাজার মাইল দূরবর্তী। তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন যে বাংলা ও বোম্বে একই দেশভুক্ত অথচ তিনিই ফরাসি দেশের শিল্পশিক্ষার পরম্পরাকে ব্রিটিশ পরম্পরা বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন! ইম্প্রেশনিস্ট ও পোস্টইম্প্রেনিস্ট ছবিতে জাপানি প্রভাবের সমালোচনাও তিনি করেননি।

আমাদের শিল্পীরাও এতই কূপমণ্ডুক ছিলেন যে তাঁরা খবরই রাখতেন না, যখন হ্যাভেল ও গ্ল্যাডস্টোন-সলোমনের মিছিলে তাঁরা শামিল হয়ে যে অ্যাকাডেমিক আর্টের পক্ষে-বিপক্ষে লড়ছিলেন তখন ইউরোপের দেশে দেশে সেই অ্যাকাডেমিক আর্ট কবেই খারিজ হয়ে দৃশ্যশিল্পে কিউবিজম থেকে এক্সপ্রেশনিজম,

অ্যাবস্ট্রাকশন অবধি আমূল বিপ্লব ঘটে গেছে। এ সবের কোনো খবরই তাঁরা রাখতেন না। আর্ট স্কুলের ইংরেজ অধ্যক্ষরাও সে-সব কথা বলতেন না। তাঁরা যে ভারতীয় শিল্পী সমাজের ঐক্য রুখতে বিভেদপন্থার আশ্রয় নিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ কী? দুঃখের বিষয় আমাদের অধিকাংশ শিল্পী নিজের বুদ্ধিতে ভাবেননি এবং সরাসরি পশ্চিমা শিল্পকলার হালহকিকত জানতে চাননি।

যদিও বোম্বের শিল্পবিদ্যালয়টিকে জাতীয় শিল্পবিদ্যালয় হিসাবে গড়ে তুলবার জন্য জামশেদজি জিজিভাই বিপুল পরিমাণ অর্থ অনুদান হিসাবে দিয়েছিলেন, কিন্তু এই বিদ্যালয়টিও গোড়ায় উপনিবেশ প্রসারকল্পে নির্মিত সহায়ক এবং হস্তকলার বিবর্ধন সহায়ক বিদ্যালয় বা স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট হিসাবেই পরিকল্পিত হয়েছিল।[১৪]

উপসংহার

বিখ্যাত দুই ব্রিটিশ চিত্রশিল্পী টমাস ড্যানিয়েল (Thomas Deniell, 1740-1840) ও উইলিয়াম ড্যানিয়েলের (William Daniell, 1769-1840) আগমনের ছয়-সাত বছর আগে বাংলায় ৭৬-এর মন্বন্তর হয়েছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেন যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী রিচার্ড বেচার ইংল্যান্ডে কর্তৃপক্ষের কাছে লিখেছিলেন যে পূর্বে বহু অত্যাচারী নবাবের আমলেও যে দেশ অতুল সুখ ও সম্পদের অধিকারী ছিল, কোম্পানি দেওয়ানি গ্রহণ করার পর প্রজা সাধারণের এমন দুর্দশা আগে কখনও হয়নি। এই বইয়ে আরেকটি তথ্যে জানা যায় যে, অপর এক ইংরেজ কর্মচারীর মতে বাংলার দুরবস্থা ছিল কল্পনার ও বর্ণনার অতীত। বহু স্থানে মৃতের মাংস খেয়ে লোকে জীবন ধারণ করেছে। কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীরা চাল কিনে মজুত করে দেশের লোককে চূড়ান্ত দুর্দশায় ফেলেছিল। অথচ এই দুর্ভিক্ষের বা সামাজিক অবস্থার কোনো ছায়া ড্যানিয়েলদের কিংবা অন্য ইংরেজ চিত্রশিল্পীর চিত্রশিল্পে নেই।[১৫]

ম্যাদাম বেলনোস তার আঁকা ছবিতে এদেশি মানুষের নানা কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের চিত্রিত বর্ণনা দিয়েছেন। এমিলি ইডেন তার চিত্রশিল্পে এদেশি খেদমতগারদের মডেল হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও অন্যান্য বিদেশি চিত্রশিল্পীরা এদেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু কোথাও কোনো চিত্রশিল্পীর চিত্রে দেশের ইতিহাস এবং ইংরেজ শাসকের কর্মকাণ্ডের ফলে উদ্ভূত দুর্দশার কোনো বিবরণ পাই না। একমাত্র ব্যতিক্রম উনিশ শতকের শেষে আগত রুশ চিত্রশিল্পী ভেরেশ্চাগিন (Vasily Vasilyevich Vereschagen, 1842-1904),[১৬] যিনি ইংরেজ অত্যাচারের একটি চিত্র এঁকেছিলেন। চিত্রের বিষয় ইংরেজ সৈন্য কর্তৃক বিদ্রোহী সিপাহিদের কামানের তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়ার দৃশ্য। যার সঙ্গে একমাত্র গোইয়ার (Francisco Goya, 1746-1828) আঁকা[১৭] "The third may-1908" ছবিটির তুলনা করা চলে। অবশ্য বাংলার দুই মহান চিত্রশিল্পী শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬) এবং চিত্তপ্রসাদ (১৯১৫-১৯৭৮) সরাসরি ইংরেজবিরোধী চিত্র না আঁকলেও ইংরেজ অপশাসনের দ্বারা সৃষ্ট ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের উপর দুটো সিরিজ চিত্র এঁকেছিলেন। জয়নুলের 'দুর্ভিক্ষ চিত্রমালা' এবং চিত্ত প্রাসাদের 'Hungry Bengal'।[১৮]

প্রভূত দক্ষতা সত্ত্বেও ড্যানিয়েল ও অন্যান্য বিদেশি চিত্রশিল্পীদের চিত্রশিল্প ইতিহাসের যে সঙ্কটময় মুহূর্তগুলো তারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন শুধু তার উপরিতলের (Superficial) কিছু কিছু দৃশ্য তারা নথিবদ্ধ করেছিলেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে এরা সকলেই ছিলেন উপনিবেশবাদী জাতির প্রতিভূ। এরা কেউই উপনিবেশের প্রজার প্রতিনিধিত্ব করেননি। নতুন দেশের সঙ্গে পরিচয় কালে অবশ্যই তারা এই নতুন দেশের সমস্ত কিছুই অবলোকন করেছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ছবি আঁকার সময়ে তারা সচেতনভাবে বিষয় নির্বাচন করেছিলেন যাতে তাদের ছবিতে কোনোভাবেই উপনিবেশবাদের কোনো স্বার্থই আহত না হয়। তাদের ছবি এদেশের ভূদৃশ্য, স্থাপত্যকলা, নর-নারীর দেহ সৌন্দর্য্য ইত্যাদির চাক্ষুষ বর্ণনা ইউরোপের মানুষের কাছে পৌঁছে দিলেও তাদের স্বজাতির শাসকদের অপশাসনে এই দেশ কোন অবস্থায় পৌঁছেছিল তার কোনো বার্তা এই সকল ছবি ইউরোপে জানায়নি। অপরপক্ষে ইংল্যান্ডে ও ফ্রান্সে তখন গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা যাঁরা বলেছিলেন,

তাঁরাও তখন তাদের স্বজাতির ঔপনিবেশিক চরিত্র সম্পর্কে নিশ্চুপ ছিলেন। ব্রিটিশ শিল্পীরা এদেশকে দেখেছিলেন পিকচারেক্স (Picturesque) হিসাবে।[১৭] অতীত গৌরবে সমৃদ্ধ এক মোহময় সৌন্দর্য লিপ্ত প্রাচ্য দেশকেই তাঁরা দেখেছিলেন। তাঁদের দৃশ্যশিল্পে ব্রিটিশ আগমনের প্রতিরোধ নেই, বরং ব্রিটিশরা যে স্বাচ্ছন্দ্যে এই দেশে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চলেছে তার প্রতীকী বর্ণনা, যেমন গঙ্গাবক্ষে ব্রিটিশ রণতরী ও বাণিজ্যতরীর বর্ণাঢ্য সমাবেশ, একদিকে যেমন ভগ্ন অবহেলিত প্রাচীন স্থাপত্য শৈলীর ইমারত তেমনি অপরদিকে আধুনিক স্থাপত্য শৈলীতে ব্রিটিশ ইমারত এবং তার দ্বারা পরিবর্তনশীল দিগন্ত রেখা, ব্রিটিশদের স্বাগত জানাবার জন্য অপেক্ষমাণ প্রজা, হাতি ও ঘোড়ার বহর, শিবিকা ও যানবাহনের ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্যে এই দেশে ব্রিটিশের প্রতিরোধহীন আধিপত্য বিস্তারের ইঙ্গিত গোপন থাকেনি।[২০]

তথ্য নির্দেশ

১. *The Encyclopedia Americana*, International Edition Vol-7, Grolier incoporated, U.S.A. 1980, p. 298.

২. *Encycloipedia Britannica,* Vol-6, Encyclopedia Britannica, INC, London, 1973, p. 85,86.

৩. এবনে গোলাম সামাদ, *ইসলামী শিল্পকলা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮), পৃ. ১১৬।

৪. নন্দলাল বসু, *শিল্পকথা* (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫১), পৃ. ৩৬।

৫. *Arts of Bangal, White Chapel Art Gallery,* London, 1979, p. 10

৬. "অথ বটতলা সম্বাদ" *দৈনিক বসুমতি* (কলিকাতা, ১৯৯২)

৭. সুকুমার সেন, *বটতলার ছাপাছবি* (কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৮৯)।

৮. Chakrabarti, H. *Europeon Artists and India 1700-1900,* Victoria Memorial, Calcutta, 1987.

৯. ড. অনিমা মুখোপাধ্যায়, *আঠারো শতকের বাংলা পুথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গ* (কলিকাতা: সাহিত্য লোক), ১৯৮৭, পৃ. ১২৭।

১০. তদেব, পৃ. ১২৭।

১১. শোভম সোম, *শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত* (নিউ দিল্লী: তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ১৯৯৮), পৃ. ৪৬-৬৬।

১২. শোভন সোম, *ওপেনটি বাইস্কোপ* (কলিকাতা: ক্যাম্প, ১৯৯৩), পৃ.৭৮।

১৩. তদেব, পৃ. ৮০।

১৪. শোভন সোম, *শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত* (নিউ দিল্লী: তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ১৯৯৮), পৃ. ১২৭-১২৯।

১৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলার ইতিহাস*, তৃতীয় খন্ড (কলিকাতা: জেনারেল, ১৯৮১), পৃ. ৮।

১৬. প্রদ্যুৎগুহ, *কোম্পানী আমলের বিদেশী চিত্রকর* (কলিকাতা: অয়ন, ১৯৭৮)

১৭. Myers, B.L. *Goya,* Paul Hamlyn Ltd. Middlesex, 1968, p. 37.

১৮. বিনয় ঘোষ, *যোগসূত্র* (কলকাতা: অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৯৯১), পৃ-৯৩-৯৪।

১৯. Sutton T (F.S.A) *The Daniells, Artist and Travellors,* The Bodley Head, London, 1954

২০. *Land Scape Painting in The Victoria Memorial,* (Exhibition Catalogue), Calcutta, 1991.

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ৯ম সংখ্যা ১৪০৮

শিবগঞ্জ থানার হাট-বাজারের উৎপত্তি ক্রমবিকাশ ও বিস্তারণের ধরন

মোঃ কামরুজ্জামান
মোঃ একরামুল হক
মোঃ আবু হানিফ শেখ*

Abstract: The periodic rural market is known as *hat* and the regular market as bazar in Bangladesh. The rural markets (both periodic and regular) are the important media of the marketing system in both the underdeveloped and developing countries of the world. The present study deals with the origin, growth and distibutional pattern of the hat-bazars of Shibgonj thana under Chapai-Nawabgonj district of Bangladesh. The study area is located in the north-western part of Bangladesh. In rural Bangladesh, these hat-bazars are not only sources of economic activities but also serve as the social, political and cultural venues of the rural people. The present study reveals that the hat-bazars of this area are regarded as the important elements for the upliftment of the rural areas and the development of the country as a whole.

ভূমিকা

গ্রামীণ হাট-বাজার সামগ্রিকভাবে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের বিপণন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। প্রথমে মানুষের চাহিদা ছিল কম। ফলে তাদের উৎপাদিত পণ্য তারা নিজেরাই ভোগ করত। কিন্তু সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে মানুষের মধ্যে পণ্য বিনিময় আরম্ভ হয় এবং ধারণা করা হয় যে, পণ্য সামগ্রীর অসম বণ্টন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা হ্রাস থেকেই সম্ভবত পণ্যের বিনিময় ব্যবস্থার উদ্ভব হয় (বাকী, ১৯৯৮)।[১] গ্রামীণ হাট-বাজারগুলি গ্রাম অঞ্চলে কেন্দ্রীয় স্থান হিসাবে কাজ করে থাকে। এগুলি তাদের চতুষ্পার্শ্বের পশ্চাৎ ভূমির জন্য বিভিন্ন প্রকার পণ্য সরবরাহ ও পরিচর্যা করে থাকে এবং একই সঙ্গে অর্থনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কালক্রমে গ্রামীণ হাট-বাজারগুলো নগর জনপদের সূচনা করে। গ্রামনির্ভর বাংলাদেশে গ্রামীণ হাট-বাজার শুধু যে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উৎসস্থল তা নয়, এই কেন্দ্রগুলি গ্রামীণ জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং

* মোঃ কামরুজ্জামান, প্রভাষক, ভূগোল বিভাগ, ময়মনসিংহ টিটি কলেজ; মোঃ একরামুল হক, প্রফেসর, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; ড. মোঃ আবু হানিফ শেখ, প্রফেসর, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১ এখানে হাট-বাজারকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। হাট বলতে সপ্তাহের পূর্ব নির্ধারিত বিশেষ দিনে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে তুলনামূলকভাবে অধিক জনসমাগমকে বুঝায়। আর বাজার হলো বিনিময় কেন্দ্র যা প্রত্যেক দিন অনুষ্ঠিত হয়। সাময়িক গ্রামীণ বাজারকে বাংলাদেশে হাট বলা হয়।

সাংস্কৃতিক মিলনকেন্দ্রও বটে। সুতরাং গ্রামীণ হাট-বাজারগুলো সার্বিকভাবে গ্রামীণ উন্নয়ন তথা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত।

হাট বাজারের উৎপত্তি সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধারণা

প্রাথমিক পর্যায়ে হাট-বাজারের সূচনা হয় উদ্বৃত্ত উৎপাদনের সূত্র ধরে। বেরীর মতানুযায়ী হাট-বাজারের শুরুতে তিনটি পর্যায়ক্রমিক অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমে শিষ্টাচার পালনের কারণে বিনিময় প্রথার প্রচলন; পরবর্তী কালে পণ্যের বদলে পণ্যের বিনিময় এবং সর্বশেষে অর্থের সহায়তায় বিনিময় প্রথা প্রচলন (বেরী, ১৯৭৭, পৃ. ১০৬)। পক্ষান্তরে চিশমের মতে সম্পদের অসম বিন্যাস ছাড়াও স্বয়ংসম্পূর্ণতা হ্রাসের কারণে পণ্য বিনিময় ব্যবস্থার সূত্রপাত হয় (বাকী, ১৯৯৮)। অর্থাৎ মানুষের নানা রকমের চাহিদা রয়েছে যার অনেকগুলোই সে নিজে তৈরি করতে পারে না। স্থানীয়ভাবে সব পণ্যই এক স্থানে উৎপন্ন হয় না। ফলে চাহিদা পূরণের জন্য আন্তঃবিনিময় সম্পর্কের উদ্ভব হয় (বাকী, ১৯৯৮)।

আন্তঃসম্প্রদায় পর্যায়ে ধর্মীয় উপহার বিনিময়ের ঐতিহ্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বলে মনে করা হয় (বাকী, ১৯৯৮)। হোয়েবেল এর মতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিনিময়ের মাধ্যমে ব্যবসার সূচনা হয়েছে (বাকী, ১৯৯৮)। বি. ডাবলু হোডারের মতে, আফ্রিকার ইউরোবাল্যান্ডে বিভিন্ন গোত্রের লোকজন বসবাস করতো এবং তারা একে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল; ফলে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের লোকেরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি যেমন, কৃষিজাত দ্রব্যাদি, শিকারিদের পশুর মাংস ও চামড়া, মৎস্যজীবীদের মাছ প্রভৃতি নিয়ে তাদের এলাকার সীমান্তবর্তী স্থানে মিলিত হতো। সম্ভবত এইভাবে ইউরোবাল্যান্ডে বিনিময় কেন্দ্রের উৎপত্তি ঘটে (ডব্লিউ. বি. হোডার, ১৯৬৫)। বাংলাদেশে পঞ্চদশ শতকের মধ্যযুগীয় সাহিত্যেও হাট-বাজারের উল্লেখ আছে (বাকী, ১৯৯৮)। বর্তমানে যে সমস্ত শহর বা জায়গার নামের সাথে গঞ্জ বা হাট যুক্ত আছে সেসব জায়গা প্রাচীন বিনিময় কেন্দ্র বা হাটের স্বাক্ষর বহন করে, যেমন – জয়পুরহাট, লালমনিরহাট, বাগেরহাট, রামচন্দ্রপুরহাট, নারায়ণগঞ্জ, ভৈরব বাজার ইত্যাদি (হক, ১৯৮৫)। গ্রাম বাংলায় স্থানীয় পর্যায়ে জমিদার ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাবেও হাট-বাজার গড়ে ওঠেছে (প্যাটেল, ১৯৬৩. হক ১৯৮৫)। তবে বর্তমান সময়ে স্থানীয় প্রয়োজনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্ট হাট-বাজারের প্রতিষ্ঠা বেশি পরিলক্ষিত হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

শিবগঞ্জ থানার হাট-বাজারের উৎপত্তি, উৎপত্তির কারণ, ক্রমবিকাশ এবং বিস্তারণ ধরন সম্পর্কে ধারণা প্রদান করাই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য।

উপাত্ত, উৎস ও গৃহীত পদ্ধতি

বর্তমান নিবন্ধটি প্রাথমিক ও দ্বিতীয় উভয় পর্যায়ের তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্তগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে সরেজমিন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। দ্বিতীয় পর্যায়ের উপাত্তগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে বিভিন্ন অফিস, আদালত এবং প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও জার্নাল থেকে। সংগৃহীত তথ্যাদি গবেষণার প্রয়োজনে সারণিকরণ, মানচিত্র অঙ্কন এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হাট বাজারের পারিসরিক বণ্টন দেখানোর জন্য নিকটতম প্রতিবেশী সূচক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। হাট-বাজারের সেবা এলাকা নির্ধারণের জন্য প্রত্যেকটি হাটের প্রবীণ দোকানদারদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

ভৌগোলিক পটভূমি

শিবগঞ্জ রাজশাহী বিভাগের নবাবগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি বড় থানা। থানা সদরটি রাজশাহী বিভাগীয় শহর থেকে ৬৮ কি.মি. এবং নবাবগঞ্জ সদর থেকে ২০ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এর অবস্থান ২৪°৩৪′ উত্তর থেকে ২৪°৫২′ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°০১′ পূর্ব থেকে ৮৮°১৮′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। শিবগঞ্জ থানার

উত্তরে ভোলাহাট থানা এবং ভারতের ইংলিশ বাজার থানা, দক্ষিণে নবাবগঞ্জ থানা এবং ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলা, পূর্বে নবাবগঞ্জ ও গোমস্তাপুর থানা এবং পশ্চিমে ভারতের মালদহ জেলা অবস্থিত (মানচিত্র ১)। থানাটির আয়তন ৫২৫.৮৩ ব. কি. মি. (২০২.৮৬ বর্গমাইল)। এই থানার মধ্য দিয়ে উত্তর দক্ষিণ বরাবর পাগলা নদী, পশ্চিম এবং দক্ষিণ পশ্চিমে পদ্মা নদী অববাহিকা এবং পূর্বে মহানন্দা নদী অবস্থিত। কথিত আছে যে, শেরশাহের নামানুসারে থানাটির নাম ছিল শেরগঞ্জ। তাছাড়া শিবরঞ্জন মুখোপাধ্যায় নামে এক প্রভাবশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নামানুসারেও শিবগঞ্জ থানার নামকরণ হতে পারে। আবার এই থানায় শিব পূজার বহুল প্রচলন ছিল এবং সেই সূত্র ধরে শিবগঞ্জ নামকরণ করা হয় বলে অনেকের ধারণা।

শিবগঞ্জ থানার হাট-বাজার গড়ে ওঠার কারণ

কোনো অঞ্চলে হাট-বাজার গড়ে ওঠার পিছনে সেই অঞ্চলের অবস্থান, মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিয়ামকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। তবে, বক্ষমাণ সমীক্ষিত এলাকায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, জনসংখ্যার চাপ ও সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কারণ ও প্রতিষ্ঠাকালসহ সমীক্ষিত এলাকার হাট বাজারের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো :

সারণি ১

হাট বাজার গড়ে ওঠার কারণ ও প্রতিষ্ঠাকাল

বছর	ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা	শতকরা	জনসংখ্যার আধিক্য	শতকরা	উন্নত যোগাযোগ	শতকরা
১৮০০-১৯৫০	৬	১২.৫০	১	২.০৮	৩	৬.২৫
১৯৫১-৭০	৩	৬.২৫	৫	১০.৪০	২	৪.১৬
১৯৭১-২০০০	৪	৮.৩৩	১৭	৩৫.৪১	৭	১৪.৫৮
মোট	১৩	২৭.০৮	২৩	৪৭.৮৯	১২	২৪.৯৯

উৎস: প্রত্যক্ষ জরিপ, ২০০০ইং।

উপরোক্ত সারণি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রায় অর্ধেক হাট-বাজার এই এলাকার জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে এবং বাকিগুলো অন্যান্য কারণে গড়ে ওঠেছে। তবে, জনসংখ্যা চাপের সঙ্গে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী চেষ্টার সম্পর্ক রয়েছে। কেননা, জনঘনত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিবর্গ হাট-বাজার স্থাপনে এগিয়ে আসে। উপরোক্ত সারণি থেকে আরও দেখা যায় যে, ১৯৫০ সালের আগে অধিকাংশ হাট-বাজার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠেছে, কিন্তু স্বাধীনতার পরে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের পর থেকে জনসংখ্যার আধিক্য, অবস্থানগত সুবিধা, সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং উৎসাহী জনসাধারণের সহযোগিতায় বেশি হাট-বাজার গড়ে উঠেছে।

ইউনিয়নভিত্তিক হাট-বাজারের সংখ্যা, হাট বার ও প্রতিষ্ঠাকাল

শিবগঞ্জ থানায় মোট ৪৮টি হাট বাজার আছে। এর মধ্যে দৈনিক ৫টি সকাল বিকাল বসে। নিম্নে ছকের মাধ্যমে ইউনিয়ন ভিত্তিক হাট-বাজারের নাম, বার ও প্রতিষ্ঠাকাল দেখানো হলো:

সারণি ২

ইউনিয়ন ভিত্তিক হাট-বাজারের সংখ্যা ও প্রতিষ্ঠাকাল

ইউনিয়ন/পৌরসভা	হাট-বাজারের নাম	হাট বার	প্রতিষ্ঠাকাল
শিবগঞ্জ	১. শিবগঞ্জ দৈনিক বাজার	সোম-শুক্রবার (প্রত্যহ)	১৮৯০
কানসার্ট	২. কানসার্ট	শনি-মঙ্গলবার	১৮৪০
	৩. বাঘীতলা	সোম-শুক্রবার	১৯৪৭
মনাকষা	৪. মনাকষা (দৈনিক বাজার)	রবি-বৃহস্পতিবার	১৯৩৫
	৫. পারচৌকা	শনি-বুধবার	১৯৯২
	৬. শাহাপুর	শুক্র-সোমবার	১৯৭৫
	৭. বাখর আলী	শনি-মঙ্গলবার	১৯৮৫
	৮. তারাপুর	শনি-বুধবার	১৯৮৪
নয়ালভাঙ্গা	৯. রানীহাটি (দৈঃ বাজার)	শনি-মঙ্গলবার	১৯৪৫
	১০. ভোলাহাট	সোম-শুক্রবার	১৯৭০
চক্কীর্তি	১১. চক্কীর্তি	বুধ-বৃহস্পতিবার	১৯৫২
	১২. চাঁদপুর	বুধ-শুক্রবার	১৯৭৬
	১৩. লহলামারি	সোমবার	১৯৯৪
মোবারকপুর	১৪. লামোট্রিকরী	সোম-বুধবার	১৯৬৩
	১৫. তীরমোনী	বুধবার	১৯৬৫
দাইপুকুরিয়া	১৬. কর্ণখালি	শনি-মঙ্গলবার	১৯৮০
	১৭. মির্জাপুর	শনি-মঙ্গলবার	১৯৬৫
	১৮. কামালপুর	শনি-মঙ্গলবার	১৯৮৮
	১৯. বাঘবাড়ি	সোমব-শুক্রবার	১৯৮০
	২০. কাইসাবাড়ি	বুধবার	১৯৮৫
	২১. আড়ঘাড়া	রবিবার	১৯০০
শাহাবাজপুর	২২. ধোবড়া	সোম-শুক্রবার	১৯৭৫
	২৩. শাহাবাজপুর	রবি-বুধবার	১৯৫২
	২৪. তৈলকুপি	শনি-মঙ্গলবার	১৯৮৭
	২৫. দিলালপুর	শনিবার	১৯৯৪
	২৬. ছিড়াকুল	বৃহস্পতি-মঙ্গলবার	১৯৯১
	২৭. হাজারদিঘী	সোম-শুক্রবার	১৯৮৩
শ্যামপুর	২৮. চামারহাট	রবি- বৃহস্পতিবার	১৯৬৮
	২৯. কয়লাদিয়ার	শনি-বুধবার	১৯৭৫
	৩০. ভবানীপুর	মঙ্গলবার	১৯৮০
বিনোদপুর	৩১. কালিগঞ্জ	শনিবার	১৯৮২
	৩২. খাসেরহাট	বুধবার	১৯৪৭
পাঁকা	৩৩. লক্ষীপুর	বুধ-রবিবার	১৯৭৭
দুর্লভপুর	৩৪. দুর্লভপুর	বুধবার	১৯৭২
	৩৫. দাদনচক	শনি-মঙ্গলবার	১৯৬৫
	৩৬. জগন্নাথপুর	সোম-শুক্রবার	১৯৮০
	৩৭. আটরশিয়া	বুধ-রবিবার	১৯৮১
ছত্রাজিতপুর	৩৮. ছত্রাজিতপুর	বৃহস্পতিবার	১৯৫০
উজিরপুর	৩৯. উজিরপুর	শনি-মঙ্গলবার	১৯৯০
	৪০. রাধাকান্তপুর	শুক্র-মঙ্গলবার	১৯৪০
	৪১. চকবহরম	শনি-সোমবার	১৯৭১
	৪২. চরখাডাঙ্গা	শনি-বুধবার	১৯৮৫
মোড়াপাখিয়া	৪৩. গোলাপের হাট	শুক্রবার-সোমবার	১৯৮০
ধাইনগর	৪৪. নাক্কাটিতলা	শুক্রবার-সোমবার	১৯৪৭
	৪৫. পোল্লাডাঙ্গা	শুক্রবার	১৯৮৭
	৪৬. লাঘাট্টা	মঙ্গলবার	১৯৯৩
	৪৭. রানীনগর	রবি-বুধবার	১৯৭৫
	৪৮. চৈতন্যপুর	রবি-বুধবার	১৯৭১

উৎসঃ শিবগঞ্জ টি.এন.ও. অফিস ও প্রত্যক্ষ জরিপ, ২০০০।

বিভিন্ন সময়ে হাট বাজারের বিকাশ ধারা

শিবগঞ্জ থানায় প্রথম কখন হাট-বাজার গড়ে ওঠে তার সার্বিক লিখিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে এটা অনুমেয় যে, শিবগঞ্জ থানার কানসার্ট ইউনিয়নে সড়ক ও নদী পথের ভালো সংযোগের কারণে সম্ভবত কানসাট হাটটি ১৮৩০ সালে গড়ে ওঠে যা সমীক্ষিত অঞ্চলে প্রথম রেজিস্ট্রিকৃত হাট বলে বিবেচিত। এছাড়াও শিবগঞ্জ, মনাকষা, রানীহাটি, আড়গাড়া, খাসের হাট ও চক্কীর্তিতেও অরেজিস্ট্রিকৃত বিপণন কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল। তার পর থেকে ক্রমান্বয়ে হাট-বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে (চিত্র ২ এবং সারণি ১ ও ২)।

সারণি ৩

হাট বাজারের বিকাশ ধারা

সাল	হাট-বাজারের সংখ্যা	নতুন হাট-বাজার বৃদ্ধির সংখ্যা	শতকরা বৃদ্ধির হার
১৮০০-১৮৫০	১	-	-
১৮৫১-১৯০০	৩	২	৪.১৬
১৯০১-১৯৫০	১০	৭	১৪.৫৮
১৯৫১-১৯৬০	১২	২	৪.১৬
১৯৬১-১৯৭০	১৮	৬	১২.৫০
১৯৭১-১৯৮০	৩১	১৩	২৭.৮
১৯৮১-১৯৯০	৪১	১০	২০.৮৩
১৯৯১-২০০০	৪৮	৭	১৪.১৮

উৎস: প্রত্যক্ষ জরিপ, ২০০০।

উল্লিখিত সারণি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, সমীক্ষিত এলাকায় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ ১৯৭১ সাল ও তার পরবর্তী সময়কাল থেকে প্রায় ৬০% হাট বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্ভবত লোকসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধিই হাট-বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধির মূল কারণ। কেননা, ১৯৭৪ সালে জনসংখ্যা ছিল ২,৮৭,৮৪৬ জন এবং ১৯৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪,২২,৩৪৭ জন অর্থাৎ জনসংখ্যা উক্ত সময়ে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধরনের চিরাচরিত পরিবর্তন ছাড়াও অবকাঠামোগত এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনও এই বৃদ্ধির সহায়ক নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে।

শিবগঞ্জ থানার হাট-বাজারের শ্রেণীবিভাগ

কোনো অঞ্চলের সকল হাট-বাজার সমান তাৎপর্যপূর্ণ বা গুরুত্বপূর্ণ নয়। হাট-বাজারের গুরুত্ব নির্ভর করে তার পণ্য ও পরিমাণ, পরিচর্যার ধরন ও পণ্যের প্রসার, হাটের কাঠামোগত সুবিধা, সম্পূরক এলাকার আয়তন ইত্যাদির উপর। বর্তমান শিবগঞ্জ থানার হাট-বাজারের শ্রেণীবিভাগ করার জন্য ৮টি চলক ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন – সেবা এলাকা, পণ্য ও পরিচর্যার সংখ্যা, হাট-বাজারের আয়তন, আট বছরের গড় ডাক মূল্য, সাপ্তাহিক হাট-বাজারের ব্যাপ্তিকাল, কাঠামোগত সুবিধা ইত্যাদি (পরিশিষ্ট সারণি ১)। এ লক্ষ্যে প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য বা নির্দেশকের মান অনুযায়ী পয়েন্ট আরোপ করা হয়েছে, যেমন– পণ্য, ও পরিচর্যার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে শিবগঞ্জ হাট-বাজার সর্বাধিক ২৮টি পয়েন্ট পেয়েছে। কাঠামোগত সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ১১টি সুযোগ-সুবিধাকে বিবেচনায় আনা হয়েছে। এ সুবিধাগুলি হয়েছ – টেলিফোন, বিদ্যুৎ, পানি সরবরাহ, নলকূপ, পাকা ড্রেন, কাচা ড্রেন, পাকা ফুটপাত, আধাপাকা ফুটপাত, পাকা সেড, সেমি পাকা সেড ও পাকা রাস্তা (পরিশিষ্ট সারণি ২) শিবগঞ্জ হাট-বাজারে এই ১১টি সুযোগ সুবিধা আছে। এভাবে পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে শিবগঞ্জ

থানার হাট-বাজারগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, সমীক্ষিত অঞ্চলে প্রথম শ্রেণীর ৭টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর ১০টি, তৃতীয় শ্রেণীর ১৩টি এবং চতুর্থ শ্রেণীর ১৮টি হাট বাজার রয়েছে (পরিশিষ্ট সারণি ১)। সারণিতে আরও লক্ষণীয় যে, ৪র্থ শ্রেণীর হাট-বাজারের আধিক্য চিরায়ত পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। আর ১ম শ্রেণীর হাট বাজারের সংখ্যা অল্প হলেও সমীক্ষিত এলাকাতে আধুনিক পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। আরও উল্লেখ্য যে, এরূপ চিত্র সমীক্ষিত অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর হাট বাজারের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন

সময়ের সাথে সাথে হাট-বাজারগুলির আকার ও আয়তন পরিবর্তন হতে থাকে। স্থানীয় দোকানদার, হাট-বাজারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের, কর্মচারী ও হাট বাজারের নিকটবর্তী প্রবীণ লোকজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে জানা যায় যে, এইসব পরিবর্তনের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে উন্নত প্রযুক্তি, অবকাঠামোগত পরিবর্তন ও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন। উল্লেখ্য যে উৎপত্তি কালীন সময়ে প্রত্যেক হাট-বাজার একটি অথবা দুটি স্থানীয় দোকান বা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে এ সমস্ত হাট-বাজারের দোকান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়তে থাকে। পরিশিষ্ট সারণি নং ৩ থেকে লক্ষ করা যায় শিবগঞ্জ হাটে ১৯৫০ সালে ২০টি স্থায়ী দোকান ও ৫টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ছিল। এ সময়ে হাট-বাজারগুলো এলাকার কাঁচা রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত ছিল, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ছিল না, বাস চলাচল করতো না, তবে চিত্তবিনোদনের জন্য একটি যাত্রা-প্যান্ডেল ছিল। পরবর্তী সময়ে রাস্তা-ঘাট, বিদ্যুৎ ও চিত্তবিনোদনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে শিবগঞ্জ থানার শিবগঞ্জ হাট-বাজারটি পৌরসভার একটি আধুনিক ও উৎকৃষ্ট হাট-বাজার। হাটটিকে বিভিন্ন ধরনের দোকান-পাট ও আলাদা পট্টি দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রতিদিন সকাল বিকাল বাজার ছাড়াও স্থায়ী দোকান ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে, পাকা ফুটপাত সহ হাট-বাজারের সুযোগ সুবিধার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা তৈরি হয়েছে। চিত্তবিনোদনের জন্য সিনেমা হল, ক্লাব, ভিসিপি, ভিসিআর ও টিভি সেট এবং অতি সম্প্রতি হাটে ডিস এন্টিনারও সংযোগ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে হাট-বাজারটি প্রায় ২৪ ঘন্টায় খোলা থাকে, তবে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত লোকজনের সমাগম পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর হাট-বাজার গুলিতেও বিভিন্ন সময়ে তাদের স্থানীয় দোকানের সংখ্যা প্রতিষ্ঠান বৈদ্যুতিক সংযোগ, বাস যোগাযোগ ও চিত্তবিনোদন ব্যবস্থা বৃদ্ধির প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর হাট-বাজারগুলি প্রয়োজনের সাথে সাথে উৎপত্তি লাভ করে এবং এদের কাঠামোগত ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলিও অপেক্ষাকৃত কম হয়ে থাকে। পরিশিষ্ট ৩-এ লক্ষ করা যায় চতুর্থ শ্রেণীর হাটে (পাল্লা ভাঙ্গা) ১০টি স্থায়ী দোকান ও ১টি প্রতিষ্ঠান, পাকা সড়ক, বৈদ্যুতিক সংযোগ এবং বাস যোগাযোগ নেই এবং চিত্তবিনোদনের তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই (পরিশিষ্ট সারণি ৩)। এগুলি নিম্নমানের হাট-বাজার যা চতুর্থ শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত।

হাট-বাজারের বিস্তারণ বিন্যাস

শিবগঞ্জ থানার হাট-বাজারসমূহের পারিসরিক বিস্তারণ ধরন পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েক জন ভূগোলবিদ হাটের পারিসরিক বিস্তারণ পরিমাপের জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এই পদ্ধতিকে বলা হয় "Nearest Neighbour Analysis" পদ্ধতি, যার মান "Rn" দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

উপরোক্ত ফরমুলায় "Rn"-এর মান হয়েছে ১.৪৯ (পরিশিষ্ট সারণি ৪) যা শিবগঞ্জ থানার হাট-বাজারগুলির বিস্তারণ প্রায় বিক্ষিপ্ত আকারের নির্দেশ করে (আবু তাহা ১৯৮৯; সুলতানা, ১৯৮২) এরূপ বিস্তারণ প্যাটার্ন এই অর্থই নির্দেশ করে যে, শিবগঞ্জ থানার হাট-বাজারগুলি এলোমেলো ও রীতিবদ্ধ পরিকল্পনা ছাড়াই গড়ে উঠেছে (চিত্র নং ৩)। অবশ্য এটা একমাত্র এই এলাকার চিত্র বা প্যাটার্ন নয়, বরং পৃথিবীর অনেক অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের গ্রামীণ হাট-বাজারের বিস্তারণের ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য। যেমন,

বাকী ঢাকা উপজেলার উপর (বাকী, ১৯৮০) দীক্ষিত আমল্যান্ড কানপুর, ভারত (দীক্ষিত ১৯৮৩), হক, নবাবগঞ্জ উপজেলার উপর (হক, ১৯৮৫) এবং সুলতানা, সাভার উপজেলার (সুলতানা, ১৯৮৬) উপর কাজ করে এরূপ বিস্তারণ লক্ষ করেছেন। শিবগঞ্জ থানার হাট-বাজার গুলি বিক্ষিপ্ত ধরনের হওয়ার পিছনে প্রাকৃতিক ও মানবিক কারণও রয়েছে। ভূমিরূপ, বন্যামুক্ত ও বন্যাযুক্ত অঞ্চল, জনসংখ্যার ঘনত্ব, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার বিভিন্নতা এরূপ বণ্টন প্যাটার্নের জন্য দায়ী।

শিবগঞ্জ থানার হাট বাজারের সেবা এলাকা

প্রত্যেক কেন্দ্রীয় স্থানের বা হাট বাজারের একটি সম্পূরক অঞ্চল বা পরিচর্যা অঞ্চল থাকে। সম্পূরক অঞ্চলের আয়তন হাটের কেন্দ্রীয় কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভর করে। হাট-বাজারে অবস্থানরত ব্যবসায়ী, দোকানদার, খরিদ্দার, চাকরীজীবী, প্রবীণ গ্রামবাসীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে হাট-বাজারের সেবা এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। গবেষণা এলাকায় শিবগঞ্জ সবচেয়ে বড় হাট-বাজার। এ হাটের সম্পূরক এলাকার আয়তন প্রায় ৬১.৯৩ বর্গমাইল (পরিশিষ্ট সারণি ৫ এবং চিত্র নং ৪)। তাছাড়া মনাকষা, খাসের হাট, রানীহাট্টি, আড়গাড়া প্রভৃতি হাটের সম্পূরক এলাকাও বেশ বড়। কারণ অনেক দূর থেকে লোকজন কেনা বেচার নিমিত্তে এইসব হাট বাজারে এসে থাকে। যেমন–সুদূর ভারত থেকেও এই সব হাট-বাজারে গরু ছাগল বিক্রয়ের জন্য লোকজন আসে, আবার রাজশাহী, নাটোর, পাবনা প্রভৃতি স্থানের লোকজনও গরু, মহিষ, ছাগল ক্রয় করতে আসে। বিশেষ করে শিবগঞ্জ ও কানসাট হাটে আম ও গুড়ের মৌসুমে বাহির থেকে প্রচুর সংখ্যক পাইকার, আড়তদার ও ফড়িয়ার সমাগম ঘটতে দেখা যায় এবং অনেক আড়তও গড়ে ওঠেছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের হাট-বাজারগুলির সম্পূরক অঞ্চলের আয়তন, উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী, ক্রেতা, বিক্রেতার গমনাগমন, স্থানীয় দোকানের সংখ্যা ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত কম হয়ে থাকে। চতুর্থ শ্রেণীর হাট-বাজারগুলির সম্পূরক এলাকার আয়তনের (প্রায় ৩ বর্গ মাইল) মধ্যে সব রকমের প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়া যায় না (পরিশিষ্ট সারণি ৫)। কেবলমাত্র উৎপন্ন পণ্য সামগ্রী ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সমারোহ দেখা যায়। এসব হাটে যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয় এবং সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন হাট বসে থাকে।

শিবগঞ্জ থানার হাট-বাজারসমুহের কালিক বিন্যাস

গ্রামীণ হাট-বাজারসমূহের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার সাময়িকতা বা পেরিয়ডিসিটি। এই পেরিয়ডিসিটি হাটের সেবা এলাকার চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। হাট-বাজারের কালিক বিন্যাস হচ্ছে হাট-বাজারের সময় সংক্রান্ত বণ্টন। সুলতানা তার গবেষণায় দেখিয়েছেন হাট-বাজারগুলোতে তিন ধরনের পিরিয়ডিসিটি রয়েছে (সুলতানা ১৯৮২)। বর্তমান গবেষণায়ও তিন ধরনের সাময়িকতা লক্ষ করা যায়।

ক) সপ্তাহে হাট-বাজার অনুষ্ঠানের সংখ্যা

সপ্তাহে হাট-বাজারের অনুষ্ঠানের সংখ্যা বলতে বুঝানো হচ্ছে, সপ্তাহে কতবার হাট-বাজার অনুষ্ঠিত হয়। শিবগঞ্জ থানায় সাধারণত তিন ধরনের হাট-বাজার লক্ষ করা যায়। যেমন সপ্তাহে একদিন, সপ্তাহে দুদিন এবং দৈনিক বাজার (চিত্র-৫)। নিম্নের সারণিতে সপ্তাহে হাট-বাজারের অনুষ্ঠানের ধরন ও সংখ্যা দেখানো হলো:

সারণি ৪

হাট-বাজারের ধরন ও সংখ্যা

হাট-বাজারের ধরন	হাট বাজারের সংখ্যা	শতকরা হার
সপ্তাহে একদিন	৮	১৬.৬৬
সপ্তাহে দুদিন	৩৫	৭২.৯
দৈনিক	৫	১০.৪১

উৎস: প্রত্যক্ষ মাঠ জরিপ, ২০০০।

উল্লিখিত সারণিতে দেখা যায় যে, সপ্তাহে দুইদিন অনুষ্ঠিত হাটের শতকরা হার বেশি অর্থাৎ প্রায় ৭৩%। এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ফলশ্রুতিতে চাহিদা বৃদ্ধির কারণই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

খ) হাট-বাজার অনুষ্ঠানের সময় ও স্থায়িত্ব

হাট-বাজার অনুষ্ঠানের সময় ও স্থায়িত্ব বলতে বুঝানো হচ্ছে দিনের কোন সময় হাট-বাজার অনুষ্ঠিত হয় এবং তার স্থায়িত্বকাল কতক্ষণ। বর্তমান গবেষণা এলাকায় চার ধরনের দৈনিক সময় ও স্থায়িত্বকালের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। নিম্নের সারণিতে হাট-বাজার অনুষ্ঠানের দৈনিক সময় ও স্থায়িত্বকাল দেখানো হলো:

সারণি ৫

হাট-বাজার অনুষ্ঠানের সময় ও স্থায়িত্বকাল

অনুষ্ঠানের সময়	স্থায়িত্বকাল (ঘণ্টায়)	হাটের সংখ্যা	শতকরা হার
দুপুর থেকে বিকাল	২-৪	১৫	৩১.২৫
দপুর থেকে সন্ধ্যা	৫-৭	১৮	৩৭.৫০
সকাল থেকে সন্ধা	৮-১০	৯	১৮.৭৫
সকাল থেকে সন্ধ্যা রাত্রি	১১-১৩	৬	১২.৫০
মোট	২৬-৩৪	৪৮	১০০.০০

উৎস: প্রত্যক্ষ জরিপ, ২০০০।

গ) হাট অনুষ্ঠানের জন্য সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন

হিল এবং স্মিথের আফ্রিকার গ্রামীণ হাটের অভিজ্ঞতার আলোকে উপস্থাপিত ধারণার উপযোগিতা শিবগঞ্জ থানায় খুঁজে দেখা হয়েছে (হিল এন্ড স্মিথ, ১৯৭২)। তাদের মতে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে শুক্রবারে হাট-মিলিত হবার প্রবণতা বেশি। নিম্নের ছকে শিবগঞ্জ থানার হাট-বার অনুষ্ঠানের ধরন দেখানো হলো:

সারণি ৬

শিবগঞ্জ থানার হাট-বার অনুষ্ঠানের ধরন ও শতকরা হার

হাট বার	হাটের সংখ্যা	শতকরা হার
শনিবার	১৪	১৭.২৮
রবিবার	১০	১২.৩৪
সোমবার	১৩	১৬.০৪
মঙ্গলবার	১২	২৪.৮১
বুধবার	১৩	১৬.০৪
বৃহস্পতিবার	৬	৭.৪০
শুক্রবার	১৩	১৬.০৪
মোট	৮১	১০০.০০

উৎস: প্রত্যক্ষ মাঠ জরিপ, ২০০০।

গবেষণা এলাকায় শনিবারের হাটের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ১৪ দিন, যা মোট হাট অনুষ্ঠানের ১৭.২৮% এবং সবচেয়ে কম হাট অনুষ্ঠানের সংখ্যা বৃহস্পতিবার মাত্র ৬ দিন যা ৭.৪% (চিত্র ৬)। তবে উল্লেখ্য যে, শুক্রবার ও রবিবারের পরের দিন হাটের সংখ্যা বেশি অর্থাৎ শনিবার ও সোমবার। সুতরাং বলা যায় হিল ও স্মিথ (হিল

অ্যান্ড স্মিথ ১৯৭২)-এর ধর্মীয় ধারণার সঙ্গে এই এলাকার হাট বসার অর্থাৎ হাটের ঘটন সংখ্যার তেমন সামঞ্জস্য নেই।

উপসংহার

গবেষণা এলাকার হাট-বাজারগুলি অতীতে অত্যন্ত অপরিকল্পিতভাবে স্থানীয় জমিদার ও প্রভাবশালী লোকদের ইচ্ছানুযায়ী গড়ে উঠেছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের ও রেষারেষির ফলে অল্প ব্যবধানে দুই বা ততোধিক হাট-বাজার গড়ে ওঠার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে; যেমন কনাখালী ও মির্জাপুর হাটদ্বয়। বর্তমানে জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভূমির অবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থাও হাট-বাজার গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অন্যতম নিয়ামক হিসাবে কাজ করছে। নিকটতম প্রতিবেশী সূচক পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শিবগঞ্জ থানার হাট-বাজারগুলো প্রায় বিক্ষিপ্ত আকারে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ বলা যায় শিবগঞ্জ থানার প্রাকৃতিক অবস্থার বিভিন্নতাসহ অর্থনৈতিক অবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ভিন্নতার কারণে উক্ত থানার হাট-বাজার বিস্তারণের ধরন বিক্ষিপ্ত হয়েছে, যা আজও উন্নয়ন পরিকল্পনা মাফিক নয়। যেহেতু এই সমস্ত গ্রামীণ হাট-বাজার সমূহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের সাথে জড়িত, বিধায় এগুলো পরিকল্পনা মাফিক গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয়।

তথ্যনির্দেশ

১ Baquee, A.H.M. (1980) "Spatial Analysis of Rural Market in Dhaka District", *Oriental Geographer*, Vol. 24. No. 1 & 2 pp. 57-61.

২ Baquee, Md. Abdul (1998) *Grameen Bashati (Rural Settlement: Characteristics, Development & Planning Issues),* (Dhaka: The Bangla Prokashane), p. 341.

৩ Berry, B.J.L. (1977) *Geography of Market Centers and Retail Distribution*, (New Jersy: Prentice Hall Inc.)

৪ Dixit, R.S. (1983) "Spatial Distribution of Market Centers in the Umland of Kanpur Metropolis" *Geographical Review of India*, Vol. 45, No. 1 pp. 39-53

৫ Haque, M.E. (1985) *Functional Role of the Periodic Rural Markets of Nawabgonj upazila* (Unpublished M.Phil Thesis), (Rajshahi University: Institute of Bangladesh Studies).

৬ Hill, P. & Smith, R.H.T. (1972) "The Spatial and Temporal Synchronization of Periodic Markets, Evidences from Four Emirates in Northern Nigeria." *Economic Geography,* No. 48, pp. 345-355.

৭ Hodder, B.W. (1965) "Distribution of Markets in Yorubaland" *Scottish Geographical Magazine*, of the Royal Scottish Geographical Society, Vol. 81, No. pp. 48-56.

৮. সুলতানা, রাজিয়া (১৯৮২) "বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট-বাজারের স্থানিক বিশ্লেষণ", *ভূগোল পত্রিকা* : সংখ্যা-১, পৃ. ১৩-২০।

৯ Patel, A.M. (1963) "The Rural Markets of Rajshahi District" *Oriental Geographer*, Vol. VII. No. 2. pp. 140-151.

১০. Sultana, R. (1986) "Some Geographical Aspects of Rural Markets in Savar Upazila", *Journal of the Bangladesh National Geographical Association*, Vol. 13 & 14, No. 1 & 2.

১১. তাহা, আবু (১৯৮৯) *জনসংখ্যা ও জনপদ ভূগোল*, (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: পাঠ্য পুস্তক প্রকাশনা বোর্ড), পৃ. ৩০৮-৩৫৩।

সারণি ১
হাট-বাজারের কাঠামোগত সুবিধা

হাটের নাম	টেলি ফোন	বিদ্যুৎ	পানি সরবরাহ				রাস্তা					মোট
			ট্যাপ	নলকূপ	পাকা ড্রেন	কাঁচা ড্রেন	পাকা ফুটপাত	আধাপাকা ফুটপাত	পাকা সেড	সেমি পাকা সেড	পাকা রাস্তা	
কর্ণখালী				১								১
মির্জাপুর				১						১	১	২
কামালপুর				১		১						২
বাগবাড়ি				১						১		২
কায়সাবাড়ি				১								১
আড়গারা				১		১				১		৫
ধোবড়া			১	১						১		৩
শাহবাজপুর			১	১		১				১		৫
তৈলকুপি				১		১						২
দিলালপুর			১	১								২
সিডা স্কুল				১								১
হাজারদিঘী			১	১		১						৩
লামোট্রিকরী			১	১		১				১	১	৫
তীরমোহনী			১	১								২
চাদপুর			১	১		১						৩
লহরামাড়ী			১	১								২
চক্কীর্তি	১		১	১	১	১				১		৭
বাগীতলা	১		১	১		১				১		৬
কানসার্ট	১		১	১		১				১	১	৯
চামারহাট				১		১				১		৪
কালাদিঘিয়া			১	১								২
ভবানীপুর				১								১
কালীগঞ্জ				১								১
খাসের হাট	১	১		১		১		১	১	১		৭
লক্ষীপুর			১	১								১
মনাকষা	২৬	১		১	১	১						৯
পাড়চৌকা			১	১								১
শাহপুর				১		১						১
তারাপুর				১								১
বাখরআলী		১	১	১		১						৩
দুর্লভপুর		১	১	১								২
দাদনচক		১	১	১								২
জগন্নাথপুর				১								১
আটরশিয়া				১								১
শিবগঞ্জ	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১১
ছত্রাজিতপুর	১	১		১		১		১		১		৬
উজিরপুর		১		১		১			১		১	৪
রাধাকান্তপুর		১		১		১			১		১	৪
চকবহরম		১		১		১		১		১		৫
চর কাটেঙ্গা				১								১
গোলাপের হাট		১		১	১							৩
নাকটিতলা				১		১		১		১		৪
পোল্লাড়াঙ্গা				১								১
লাখট্ট				১								১
রাণীনগর				১								১
চৈতন্যপুর				১	১							২
রাণীহাটী	১	১		১		১		১	১	১	১	৮
ভোলাহাট				১								১

উৎস : প্রত্যক্ষ জরিপ, ২০০০।

চিত্র ১

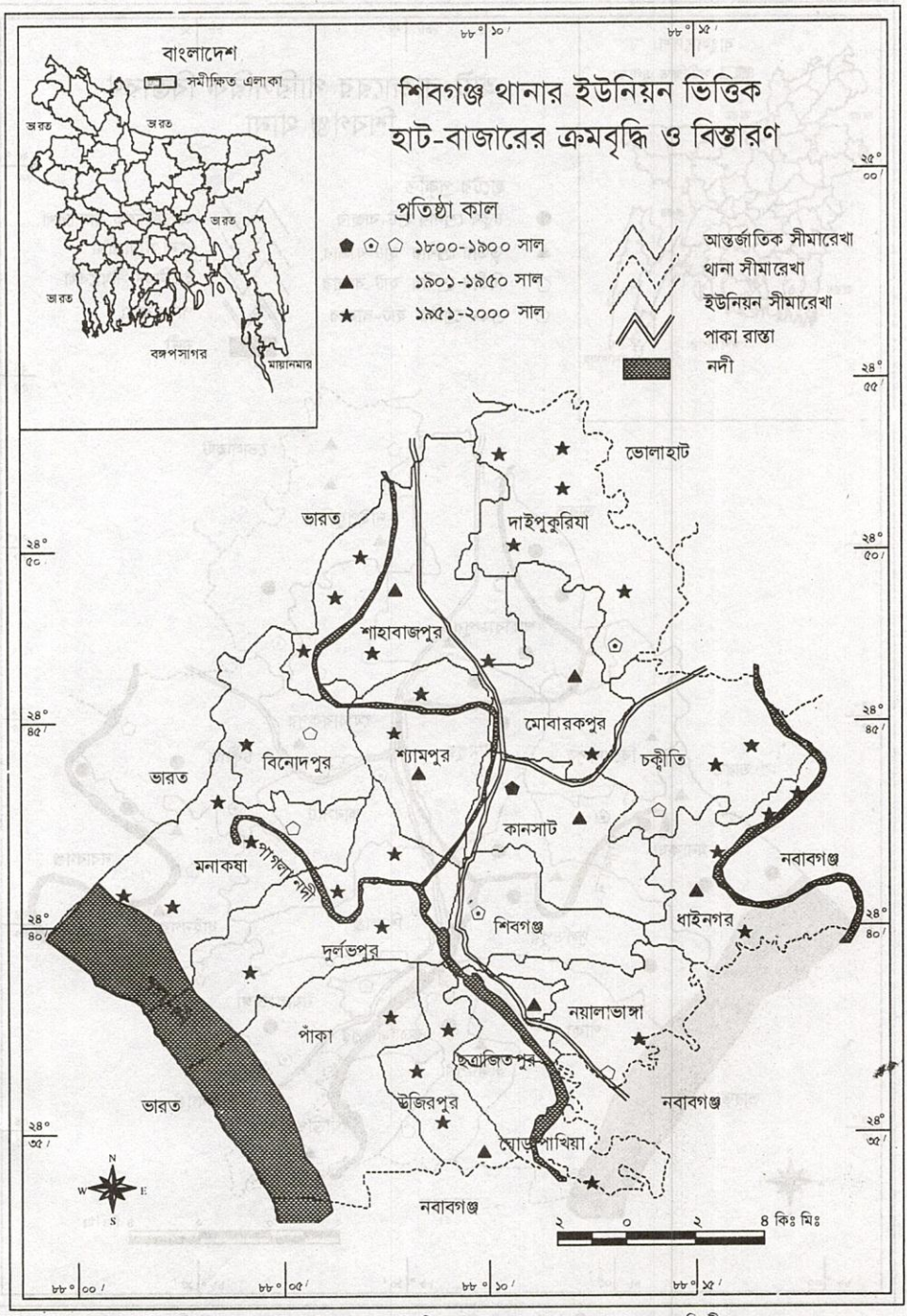

উৎস: প্রত্যক্ষ জরিপ ২০০০ ইং

চিত্র ২

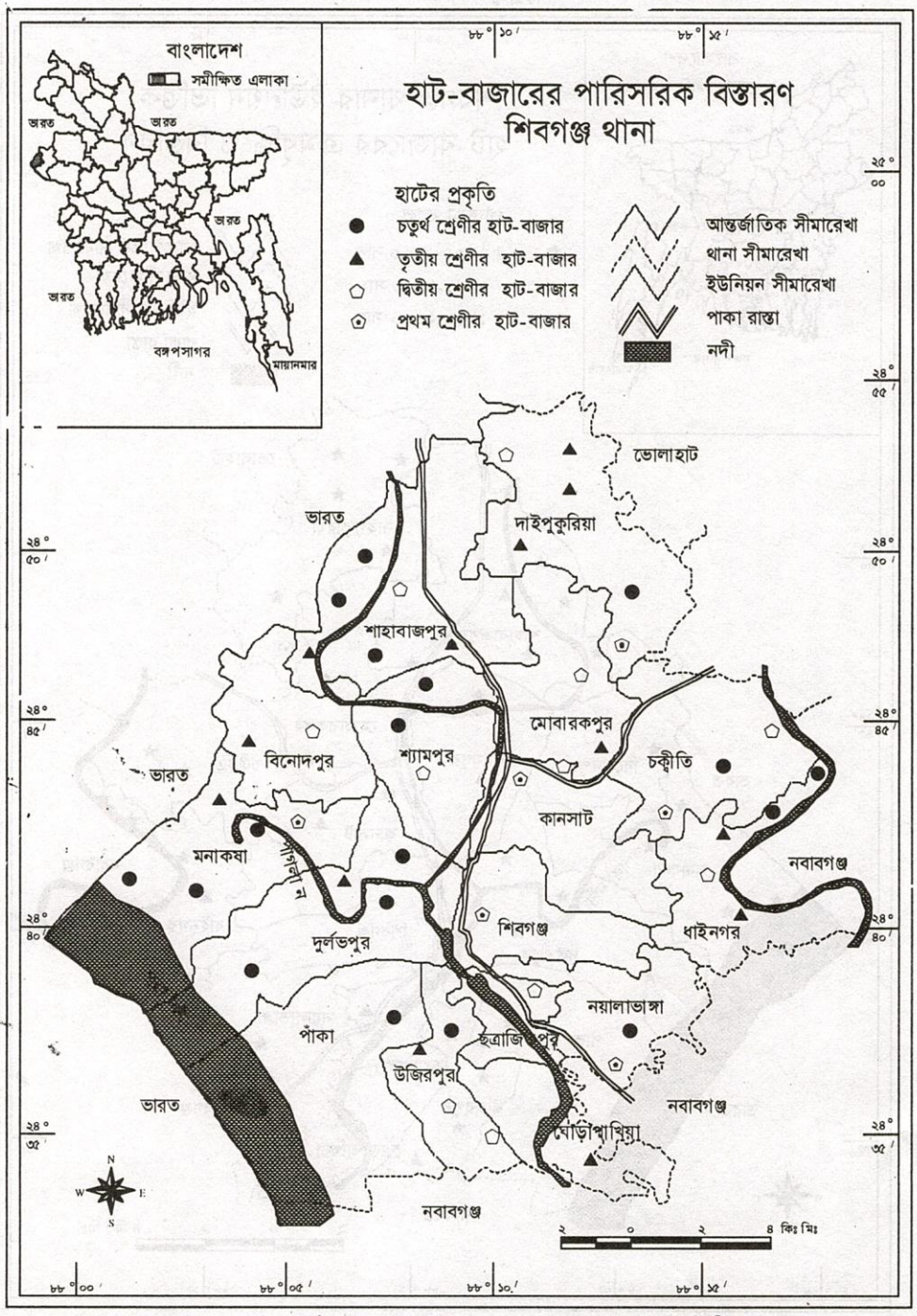

উৎস: প্রত্যক্ষ জরিপ ২০০০ ইং

রেজিস্ট্রীকৃত ১৮৫০ সালের পর থেকে রেজিস্ট্রীকৃত

১৯০০ সালের পর থেকে রেজিস্ট্রীকৃত

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ৯ম সংখ্যা ১৪০৮

সাঁওতালদের চিরায়ত রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থা

মোঃ আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী*

Aabstract: The political and admininstrative organizations of the *Santal* community consists of some headmen. In this article the author tired to discuss the works and duties of the headmen in their own society.

ভূমিকা

আবহমানকাল থেকে প্রচলিত সাঁওতালদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও প্রথাবদ্ধ। তাদের রাজনৈতিক সংগঠনের কাঠামো ও ক্রিয়াকলাপের বিশ্লেষণ থেকেই তাদের রাজনৈতিক সত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব। এই রাজনৈতিক সংগঠনগুলো গড়ে ওঠে মূলত ভূখণ্ড বা এলাকা ভিত্তিতে, যদিও এগুলোর সংগঠনিক কাঠামোর পশ্চাতে জ্ঞাতিসম্পর্ক ও টোটেমিক পরিচিতিও ক্রিয়াশীল দুটি উপাদান। সাঁওতালদের রাজনৈতিক সংগঠন ও নেতৃত্বের মূলত পাঁচ স্তর বিশিষ্ট একটি কাঠামো লক্ষ করা যায়। এগুলো হচ্ছেঃ (১) পাড়া সংগঠন, (২) গ্রাম পঞ্চায়েত, (৩) বাইশি মোড়ল, (৪) পরগণা মাঝি ও (৫) দেশ মাঝি।

সাঁওতাল গোষ্ঠীসমূহের অভ্যন্তরে ক্ষমতা অর্জন, অনুশীলন ও সিদ্ধান্ত প্রদান অর্থাৎ সমাজ অভ্যন্তরস্থ নেতৃত্ব কর্তৃত্বের বিষয়গুলো নির্ধারিত হয়ে থাকে প্রধানত তাদের ঐতিহ্যগত ধারা ও নানা ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক প্রত্যয়ের ভিত্তিতে। তাদের চিরায়ত সমাজ ব্যবস্থা ও প্রচলিত কাহিনী-কল্পনার ব্যাখ্যা থেকেও তাদের আন্তঃসম্প্রদায় রাজনৈতিক আচরণের প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়।

সাঁওতালরা 'হড়' নামে নিজেদের অভিহিত করে থাকে। 'হড়' শব্দটির অর্থ মানুষ এবং 'হড় হোপেন' বলতে মানব জাতিকে বোঝায়। আর তাদের মানব জাতির উৎপত্তির কাহিনীর মধ্যেই অনুসন্ধান করতে হবে নিজ সম্প্রদায় অভ্যন্তরস্থ রাজনৈতিক সম্পর্ক, সংগঠন ও আচরণের উৎস প্রভৃতি। তাদের সৃষ্টিতত্ত্বের পৌরাণিক বিবরণ অনুসারে সাঁওতালদের আদি পিতা পিলচু হড়ম ও আদি মাতা পিলচু বুড়হি সাতজন পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। এ থেকে সাঁওতালদের সাতটি মূল টোটেমিক গোত্রের উদ্ভব হয়। পরবর্তী কালে আরো পাঁচটি গোত্রের উদ্ভব ঘটে। এছাড়া আরো প্রায় দুইশত উপগোত্র গোষ্ঠী রয়েছে। সাঁওতালদের সৃষ্টিতত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, তারা প্রাচীন কালে 'পূর্বদেশ' থেকে আসাম উপত্যকা হয়ে বাংলাদেশ ও বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে আগমন করেছে। এ ক্ষেত্রে সাঁওতালরা হাজারীবাগ থেকে মানভূম ও মানভূম থেকে সাঁওতাল পরগনায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল (Dalton, 1872:206)।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী এলাকার সমতল ও আধা-সমতল ভূমিতে বসবাসরত সাঁওতাল জনগোষ্ঠী তাদের চিরায়ত জীবনযাপন প্রণালি এবং নিজস্ব গোষ্ঠীগত ঐতিহ্য অনেকাংশে অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই জনগোষ্ঠী বরাবরই স্বতন্ত্র লোকালয়ে বসবাস করতে ভালোবাসে। বহুকাল ধরে প্রচলিত স্বতন্ত্র প্রকৃতির জীবনধারা থেকে গড়ে উঠেছে তাদের নিজস্ব সমাজ, প্রথা, প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক আচরণ ও ধ্যান ধারণা। অন্য কথায় উৎপাদন কৌশল ও উৎপাদন সম্পর্ক, সম্পত্তি ব্যবস্থা, প্রকৃতির সাথে যোগসূত্র, আত্মীয়তার সম্পর্ক, আধ্যাত্ম ধারণা প্রভৃতির আলোকে নির্মিত হয়েছে তাদের সমাজ ও রাজনীতি। আর এই ঐতিহ্যগত উপাদানগুলোকে কেন্দ্র করেই সাঁওতাল সমাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। মূলত সাঁওতালদের সমাজ-অভ্যন্তরস্থ একান্ত নিজস্ব রাজনীতি বিকশিত হয়েছে তাদের প্রথাগত সমাজ সংস্কৃতির মৌলিক ধারণাকে কেন্দ্র করে।

---

* ড. মোঃ আব্দুর রশীদ সিদ্দিকী, প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দোগাছী বরেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য সাঁওতালদের চিরায়ত রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিবর্তন সম্পর্কে আলোকপাত করা। প্রবন্ধটি রচনার জন্য সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সর্বাগ্রে গবেষণা এলাকার কতিপয় নবীন ও প্রবীণ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সরেজমিনে তথ্য আহরণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বই-পুস্তক, নথিপত্র বা পামাণ্য দলিলপত্রও ব্যবহার করা হয়েছে।

সাঁওতালদের চিরায়ত রাজনৈতিক সংগঠন

(১) পাড়া সংগঠনের কাঠামো ও ক্ষমতার পরিধি

সাঁওতালি বা অস্ট্রো-মুণ্ডারি ভাষায় 'পাড়হা' শব্দটি রূপান্তরিত হয়ে পাড়াতে পর্যবসিত হয়েছে। সুতরাং পাড়া সংগঠন সাঁওতালি ঐতিহ্যের একটি মৌলিক দিকের পরিচায়ক। সাঁওতালদের প্রত্যেকটি পাড়ার একটি সুনির্দিষ্ট নেতৃত্বের ধরন বা রাজনৈতিক কাঠামো বিদ্যমান রয়েছে। একটি পাড়ায় ৪০/৫০টি বা ততোধিক পরিবার থাকতে পারে। পাড়া সংগঠনের শীর্ষ ব্যক্তি হলো 'পাড়ামাঝি'। একজন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি পাড়ার 'মাঝি হড়ম' বা 'পাড়ামাঝি' হিসেবে পরিগণিত হন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য ছয় জন সহযোগী থাকেন। মাঝি হড়ম এ সমস্ত উপনেতাদের নিয়ে পাড়ার নেতৃত্ব প্রদান, সামাজিক ও রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করেন। তারা পুরাতন প্রথা অনুযায়ী সমাজের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন ও অভিভাবকত্ব করে থাকেন। এঁরা সমাজের প্রবীণ ব্যক্তিত্ব। সাঁওতাল পরিবার যেমন খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংঘবদ্ধ এবং একজন কর্তা/অভিভাবক থাকেন, তেমনি গোটা সাঁওতাল পল্লিও একটি পরিবারের মতো, যা এক বা একাধিক নেতার অধীনে থাকে।

সাঁওতাল পল্লিগুলোতে পাড়া সংগঠন থাকলেও তা আজ প্রায় অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে। তবে এখনো মাঝি-মোড়ল আছে, যারা কিছু কিছু সামাজিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সাঁওতালদের নিজস্ব চিরাচরিত সামাজিক কাঠামো যে ক্রমান্বয়ে ভেঙে পড়ছে তা অবিসংবাদিতভাবে বলা যায়। সাম্প্রতিক কালে সাঁওতাল পল্লিতে পুরাতন সামাজিক সংগঠনগুলোর পাশাপাশি কিছু নতুন সংগঠন গড়ে উঠেছে। যেমন যুব ক্লাব, সমবায় সমিতি, মহিলা সমিতি, সিনা, রক্ষাগোলা প্রভৃতি। বিস্তারিত ব্যাখ্যা না করে বলা যায় যে, এ আর্থ-সামাজিক সংগঠনগুলোর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠছে স্থানীয় নতুন নেতৃত্ব। এ সমস্ত সংগঠনের যুবক নেতারা পল্লির অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিচার, সালিস, আপোস, সমঝোতা, মধ্যস্থতা করে থাকে এবং তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তও দিয়ে থাকে। যা হোক, পাড়া সংগঠনের একটি রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কাঠামো সাঁওতাল সমাজ ব্যবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। এ সংগঠনের আওতায় সমাজ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। এই পাড়ার প্রধান ব্যক্তি হলেন 'মাঝি হড়ম'। তার রয়েছে ছয়জন সহযোগী। যারা দৈনন্দিন কাজে মাঝি হড়মকে সাহায্য করে থাকে। এরা হলো: যোগমাঝি, নায়েক, কুড়ম নায়েক, পরাণিক, যোগপরাণিক ও গোড়েত (Dalton, 1872:213)। নিম্নে মাঝি হড়ম ও তার ছয়জন সহযোগীর চিরাচরিত ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

(ক) মাঝি হড়ম

মাঝি হড়ম হচ্ছেন পাড়া সংগঠনের ক্ষমতার কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি সমস্ত পার্থিব ক্ষমতা (Profane power) ও কর্তৃত্বের উৎস ও নিয়ামক। সাধারণত পাড়ার প্রধান প্রতিষ্ঠাতা পরিবার বা গোত্রের ভিতর হতেই একজন প্রবীণ ব্যক্তি মাঝি হড়ম হিসেবে সমাজে নেতৃত্ব প্রদান করেন। এ কারণেই পাড়ার মাঝিথান বা প্রধান বিচারস্থল হিসেবে মাঝির পূর্ব পুরুষদের স্মৃতি বিজড়িত কোনো একটি স্থান বিবেচিত হয়। মাঝিকে কখনো স্থানীয়ভাবে বা প্রচলিত অর্থে মণ্ডল হিসেবেও অভিহিত করা হয়। মাঝি হড়ম সমাজের যাবতীয় ধর্মীয় আচার-উৎসব, সামাজিক অনুষ্ঠান ও জীবন সংকটকালীন নানা অবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকেন এবং যথাযথভাবে ভূমিকা পালন করেন। তিনি পাড়ার বিরোধ ও সমস্যা নিষ্পত্তিতে নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি প্রয়োজনবোধে সভা আহ্বান করতে পারেন অথবা আন্তঃপাড়ার সমস্যার ক্ষেত্রে পরগনা মাঝি বা বাইশি মোড়লের সাথে পরামর্শ বা যোগাযোগ করে থাকেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তিনি পাড়ার বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি পাড়ার মুখপাত্র হিসেবে অন্য পাড়ায় বা ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করেন। তার এ সমস্ত কাজে সহযোগিতা করার জন্য নানা পদমর্যাদার কয়েকজন কর্মকর্তা রয়েছেন—যাদের কথা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এসব কিছু মিলে একজন মাঝি হড়ম শুধু ব্যক্তি মানুষ বা সাধারণ নেতাই নন বরং সাঁওতাল সমাজ ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে একটি প্রতিষ্ঠান রূপে পরিগণিত হন।

(খ) নায়েক

গুরুত্বের দিক থেকে পাড়ার মাঝি হড়মের পরেই নায়েকের অবস্থান। নায়েক মূলত একজন পুরোহিত বা ধর্মীয় আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। মাঝি যেমন পার্থিব বিষয়সমূহ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন, তেমনি পাড়ার ধর্মীয় ও অলৌকিক বিষয়সমূহের উপর কর্তৃত্ব করার দায়িত্ব নায়েকের। তার ক্ষমতার ক্ষেত্রটি মূলত ধর্মীয় বিশ্বাসের জগত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাঝি নায়েককে মনোনীত করে থাকেন। নায়েক বিভিন্ন বোঙ্গাকে (ভূত) পরিতৃপ্ত করার জন্য আচার-উৎসবে নেতৃত্ব প্রদান করে থাকেন। যাহের থান বা গ্রামের পবিত্র মণ্ডপে বোঙ্গাদের সন্তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন প্রাণী উৎসর্গের কাজও তিনি করে থাকেন। তিনি ধর্মীয় উৎসবসমূহ পরিচালনা ও নেতৃত্ব প্রদান ছাড়াও অনেক সময় ওঝা বা চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ভূত বা বোঙ্গা প্রভৃতির আছড় থেকে রক্ষা করার জন্য তাবিজ-কবজও প্রদান করেন। উল্লেখ্য, নায়েক ও মাঝি সামাজিক জীবনের দুটি বিপরীত ক্ষেত্র নিয়ে ব্যাপৃত থাকেন। মাঝি জাগতিক বিষয়াবলি আর নায়েক অলৌকিক ও ধর্মীয় বিষয়াবলি অনুশীলন করেন। বস্তুত এরা পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন, এভাবে ঐতিহ্যগত বিষয়সমূহের ধারাবাহিকতা ও সামাজিক সংহতিকে রক্ষা করে থাকেন।

(গ) যোগমাঝি

যোগমাঝি পাড়া সংগঠনের কাঠামোতে এক ব্যতিক্রমী স্থান দখল করে আছে। তার দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বতন্ত্র ধরনের। ক্ষমতা ধারণের দিক থেকে তার অবস্থান পাড়া সংগঠনের তৃতীয় স্তরে। তিনি সামাজিক উৎসব ও অনুষ্ঠানাদির আয়োজনে প্রধানের ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া তার কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে সামাজিক সংঘাত প্রতিরোধ করা, অবৈধ যৌন সম্পর্কের বিষয়ে অনুসন্ধান করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এ রূপ নারী-পুরুষদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করা অথবা তাদের মাঝি হড়মের সম্মুখে উপস্থিত করার দায়িত্ব তার। অন্য দিকে সোহ্‌রাই উৎসবে সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও অংশগ্রহণকারী নারী-পুরুষদের পানাহার ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করাও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। বিবাহ অনুষ্ঠান, সন্তানদের নামকরণ অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে যোগমাঝি উপস্থিত থেকে গ্রাম দেবতা বা বোঙ্গাগণের সন্তুষ্টি বিধানার্থে উপযুক্ত উৎসর্গাদি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করেন। তাই দেখা যায় যে, যোগমাঝি যুগপৎভাবে ঐতিহ্যগত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানসমূহের পরিচালনা করেন। এবং এর মাধ্যমে ঐতিহ্যগত সামাজিক বন্ধন ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে যোগসূত্র অক্ষুণ্ন রাখার দায়িত্ব পালন করেন।

(ঘ) কুড়ম নায়েক

নায়েকের অনুপস্থিতিতে কুড়ম নায়েক তার পক্ষে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

(ঙ) পরাণিক

মাঝিহড়মকে নানা আনুষ্ঠানিক কাজে সাহায্য করাই তার প্রধান দায়িত্ব। মাঝি হড়মের অনুপস্থিতিতে বা অসুস্থতার সময়ে পরাণিক তার দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

(চ) যোগপরাণিক

সামাাজিক বা ধর্মীয় উৎসব সরেজমিনে পরিচালনার দায়িত্ব মূলত যোগপরামানিকের। আবার উৎসব চলাকালীন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তাকেই মাঝি হড়মের নিকট জবাবদিহি করতে হয়।

(ছ) গোড়েত

একজন গোড়েতের দায়িত্ব কিছুটা চৌকিদারের ন্যায়। মাঝি হড়মের নির্দেশ মতো এলাকাবাসীকে প্রয়োজনের সময়ে খবর দিয়ে সমবেত করার দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত থাকে।

উল্লেখ্য, সাঁওতাল সমাজে একজন মাঝি হড়ম বা প্রথাগত নেতা/মণ্ডল মাথায় পরিধান করে থাকেন দ্যেঢ়হি বা পাগড়ি হলো নেতৃত্বের প্রতীক। আর ঠেঙ্গা হচ্ছে কতৃত্বের প্রতীক। এরূপ একজন চিরায়ত নেতা কেবল সামাজিক দিক নির্দেশনা দানই করেন না–তিনি সমাজের বিচারপতিও বটে। আর 'মাঝিথান' হলো এই মাঝি/মোড়লের বিচারের আসন। সাধারণত পাড়ার প্রতিষ্ঠিত পরিবারের ভিটে-মাটিতেই তৈরি হয় মাঝিথান নামক উন্মুক্ত বিচারের স্থল। মাঝিথানে বসেই নিস্পত্তি করা হয় সামাজিক বিরোধ-বিদ্বেষ, এখানে আলাপ-আলোচনা করা হয় বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে। তাই দ্যেঢ়হি, ঠেঙ্গা, মাঝিথান এই ত্রয়ীয় উপাদানের মধ্য দিয়ে সাঁওতাল সমাজের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব অভিব্যক্ত হয়। আর অবসম্ভাবীরূপে এর সাথে যুক্ত হয় প্রবীণত্ব। চিরায়ত রীতি অনুসারে কেবল বর্ষীয়ান ব্যক্তিগণই সমাজের নেতা বা মাঝি/মোড়ল হতে পারেন (সরেন, ১৯৯৮)।

(২) গ্রাম পঞ্চায়েত

পাশাপাশি কয়েকটি পাড়ার মাঝি হড়মদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে গ্রাম পঞ্চায়েত। মাঝি হড়মদের কর্তৃত্ব ও কর্মপরিধি নিজস্ব পাড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। পাড়ার পরিসীমার মধ্যে মাঝি হড়ম যদি কোনো সমস্যা নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হন বা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারেন, সেক্ষেত্রে কয়েকটি পাড়ার সমন্বয়ে গঠিত গ্রাম পঞ্চায়েত সে বিষয় বিবেচনা করেন। পাশাপাশি কয়েকটি পাড়ার মাঝি হড়মদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এ গ্রাম পঞ্চায়েত বড় বড় সমস্যা সমাধান করা ছাড়াও আন্তঃপাড়ার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অথবা কোনো সমন্বিত উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্দোগ গ্রহণ করার কাজে ভূমিকা গ্রহণ করে। গ্রাম পঞ্চায়েত বস্তুত এক ধরনের প্রবীণতান্ত্রিক (Gerentocratic) সংগঠন।

(৩) বাইশি মণ্ডল

কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতভুক্ত এলাকার সমন্বয়ে যে মনস্তাত্ত্বিক ও ভূখণ্ডগত কর্তৃত্ব অঞ্চল বা এলাকা গড়ে ওঠে তার জন্য একজন নেতা থাকেন, তাকে অভিহিত করা হয় 'বাইশি মণ্ডল' হিসেবে। একটি পাড়া বা গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতারা যখন কোনে স্থানীয় সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হন বা কোনো বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হয়, তখন বাইশি মণ্ডলের কাছে বিবিচেনার জন্য বিষয়টি পেশ করা হয়। বাইশি মণ্ডলের অস্থায়ী পরিষদ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি/মাঝি হড়দের সমন্বয়ে গঠিত হয়। 'বাইশি' শব্দটি প্রতীক ধর্মী। অনেকগুলো স্থানীয় পঞ্চায়েতের একত্র সমাবেশকে বুঝানোর জন্য এটা ব্যবহৃত হয়। বাইশি সংগঠন দৃশ্যত একটি বিচার সংক্রান্ত সংগঠন হলেও এর রাজনৈতিক তাৎপর্য বিদ্যমান। নানা সময়ে তাদের নিজেদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এই বাইশি মণ্ডল প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

(৪) পরগনা মাঝি

সাঁওতালি সমাজ সংগঠন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের চতুর্থ স্তর পরগনা মাঝি। কয়েকজন বাইশি মোড়লের উর্ধ্বে থাকেন একজন পরগনা মাঝি। এইটি মূলত আনুষ্ঠানিক একটি পদ।

(৫) দেশ মাঝি

চিরায়ত সাঁওতাল নেতৃত্বের এটি হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তর। এই পদটি প্রধানত আনুষ্ঠানিক ও নামমাত্র পদ। দেশ মাঝি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ও তার অন্তর্ভুক্ত সাঁওতালদের শীর্ষ নেতা ও সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত। যেমন সমগ্র রাজশাহী অঞ্চলের জন্য বহু বছর ধরে একজন 'দেশ মাঝি' রয়েছেন। বস্তুতএই 'দেশ মাঝি' ও 'পরগনা মাঝি' পদদ্বয়ের আর বাস্তব অস্তিত্ব নেই। বস্তুত দেশ মাঝি ও পরগনা মাঝির পদ উপযুক্ত ব্যক্তির অভাবে ও পরিস্থিতিগত কারণে শূন্য থেকে যায়। এ আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, সাঁওতালদের রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ প্রধানত ভূখণ্ডগত সত্তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।

সাঁওতালদের প্রথাগত রাজনীতির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী Aiyappan বলেন, তারা তিন ধরনের নেতাকে অনুসরণ করে থাকে। এগুলো হচ্ছে ঐশ্বরিকভাবে ক্ষমতাশীন নেতা, ধর্মীয় গুরু ও উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নেতা। তাদের বিশ্বাস এই তিন ধরনের নেতাদের অমান্য করলে অমঙ্গল হবে (Aiyappan, 1979)। সাঁওতাল সমাজ-ব্যবস্থা এ ধরনের চিরায়ত নেতৃত্বের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হলেও বর্তমানে স্থানীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কতক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তাদের চিরাচরিত নেতৃত্বকে নতুন নেতৃত্ব অতিক্রম করে যাচ্ছে বা পরিবৃত্ত করে ফেলছে। নিজ সম্প্রদায়ের নেতাকে মান্য করা সাঁওতালদের চরিত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তা সত্ত্বেও এরূপ পুরাতন মূল্যবোধ ভেঙে পড়ছে।

সাঁওতাল সমাজে আজ আর ঐসব নেতার প্রভাব প্রতিপত্তি নেই বললেই চলে। কারণ সাঁওতাল পল্লিগুলোতে নতুন নেতাদের আবির্ভাব ঘটছে। এসব নতুন নেতা চিরায়ত নেতৃত্বের প্রাধান্য বা মূল্য দিতে চায় না।

চিরায়ত সামাজিক সংগঠনগুলোকে উপেক্ষা করার প্রবনতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এ জনগোষ্ঠী নতুন নেতাদেরকে প্রবীণ নেতাদের চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় দেখা যায় যারা কিছুটা শিক্ষিত তারা বাইরের বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। তারাই নতুন ক্ষমতার সৃষ্টি ও অনুশীলন করছে। যার

ফলে প্রবীণ ব্যক্তি মাঝি-মোড়লগণ কিছুটা ছায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন। তাছাড়া জনগণও নতুন নেতাদের মতামত তথা সিদ্ধান্তের প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে।

উপরন্তু,খ্রিস্টান মিশনারি ও বিভিন্ন এন.জি.ও., যেমন– কারিতাস, কেয়ার, ব্র্যাক, প্রশিকা, সিডা প্রভৃতি বেসরকারি সাহায্যদাতা সংস্থার কর্মকর্তাদের ঘনঘন আগমন এবং তাদের সমাজে নেতৃত্ব তথা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আধুনিক ধ্যান ধারণা নবীন যুবকদেরই বেশি গুরুত্ব দিতে দেখা যাচ্ছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাঁওতাল পল্লিগুলোতে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছে। যারা এই সংগঠনগুলোর সাথে বেশি জড়িত, তারাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। এসব নেতাকে সাধারণ মানুষ অধিক মান্য করে। কারণ তারা খ্রিস্টান মিশনারি এবং বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থাগুলোর পছন্দনীয় ব্যক্তি। সাধারণ মানুষ যদি কোনো সাহায্য বা ঋণ নিতে চায়, তবে ঐসব নেতার শরণাপন্ন হতে হয়। আর আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করার মধ্য দিয়েই তারা এ জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। পাড়ার যারা প্রবীণ মাঝি-মোড়ল আছেন তারা এ ধরনের সাহায্য করতে পারে না। এসব প্রবীণ নেতার সাথে বাইরের ঐসব মহলের যোগাযোগ নেই। তাই জনগণ প্রবীণদের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। তবে এক্ষেত্রে ধর্মান্তরিত সাঁওতালরাই সর্বাধিক অগ্রগামী। প্রবীণ ও যুবক নেতাদের মধ্যে স্থানীয় নেতৃত্ব ও ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে এক ধরনের অদৃশ্য প্রতিযোগিতা বা বিরোধ তৈরি হচ্ছে। যারা প্রবীণ তারা চায় প্রথাগতভাবে সমাজের নেতৃত্ব দিতে। পক্ষান্তরে, নতুন নেতারা ক্ষমতা নিজেদের হাতে রেখে তা প্রয়োগ করে প্রবীণ নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বা পাশ কাটিয়ে কার্যাদি সম্পন্ন করার চেষ্টা করে। ফলে, এ দুই শ্রেণীর নেতাদের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে, ক্ষমতার বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠছে (হাসদা, ১৯৯৮)।

স্থানীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা

ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সর্বনিম্ন স্তর। সাঁওতাল পল্লির যারা মাঝি-মোড়ল পূর্বে তারাই কেবল ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতো। কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে বা গোষ্ঠীগত স্বার্থের প্রশ্নে মাঝি-মোড়লগণ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের সাথে যোগাযোগ করতো। পাড়ার মাঝি-মোড়লের অনুমতি ছাড়া কোনো সাধারণ সাঁওতাল ঐ সব ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে পারতো না। ক্ষেত্র বিশেষে প্রবীণ নেতাদের সাথে পরামর্শ করে কিংবা তাদের সাথে করে নিয়ে যেত। কিন্তু বিগত দুই কিংবা আড়াই দশকের মধ্যে এ ধারার ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সাম্প্রতিক কালে কিছু সাঁওতাল ধর্মান্তরিত ও শিক্ষিত হবার ফলে নতুন এক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে। তারা চিরায়ত মাঝি-মোড়লদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে গুরুত্ব কম দেয়। পাড়ার কোনো সমস্যা হলে বা কোনো বিরোধ সৃষ্টি হলে প্রবীণ নেতাদের উপেক্ষা করে নবীণ ধর্মান্তরিত যুবক নেতারা সেখানে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। তারা নিজেদের মতামতকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই প্রবীণ নেতারা যদি কোনো সমস্যা সমাধান করতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা পল্লির প্রবীণ মাঝি-মোড়লদের এড়িয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে যোগাযোগ করে থাকে। ফলে এই নতুন নেতাদের সাথে প্রবীণ নেতার দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রবীণ নেতারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের সমীহ করে চলে। কিন্তু শিক্ষিত, ধর্মান্তরিত যুবক নেতাদের মধ্যে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়। তাদের চিন্তা-চেতনায় চেয়ারম্যান-মেম্বার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, কাজেই সেখানে তাদের সাথে কথা বলার অধিকার সকলের রয়েছে। সুতরাং প্রবীণ ও নবীন নেতাদের মধ্যে পল্লির নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে একটি অদৃশ্য বিরোধ বিদ্যমান। নতুন যুবক নেতারা সব সময়ে নিজেদের কর্তৃত্বকে যেমন এলাকার বাসিন্দাদের উপর চাপিয়ে দিতে চায়, তেমনি তারা বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ রাখতে তৎপর।

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ

বিগত তিন দশকের তথ্যানুসন্ধান করে দেখা যায় যে, সাঁওতালরা ক্রমশ তাদের চিরায়ত সামাজিক কর্তৃত্বের পরিমণ্ডল অতিক্রম করে বাইরের ভিন্ন ধারার রাজনীতির সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অন্যতম দিক হচ্ছে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। এসব নির্বাচনে নানা সময়ে

অংশগ্রহণ করে তারা নিজেদেরকে কিছু সচেতন করেছে। সাঁওতালদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনে নির্বাচনের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু ক্রমশ বাইরের জগতের সাথে পরিচয় তথা সম্প্রদায় বহির্ভূত নানা ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মেলামেশার ফলে তাদের রাজনৈতিক আচরণে কিছুটা পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে।

স্থানীয় নির্বাচনের ব্যাপারে সাধারণ সাঁওতাল ভোটার এখনো তাদের পাড়ার মাঝি-মোড়লদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য ঘরোয়া বৈঠক, পাড়ায় প্রাক-নির্বাচনী সভা, পারস্পরিক মত বিনিময় ইত্যাদি কাজ করে থাকে। সাঁওতালরা স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনের সময়ে ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে যায়। তবে তারা কার পক্ষে ভোট প্রদান করবে তা নিজে ব্যক্তিগতভাবে নির্ধারণ করে না বলা চলে। চিরায়ত সাঁওতালরা এ ব্যাপারে পাড়ার মাঝি-মোড়লদের সঙ্গে পরামর্শ করে থাকে। প্রয়োজন বোধে পাড়ার সবাই একত্রে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। অনেক সময়ে পার্শ্ববর্তী পাড়ার মোড়লদের সাথেও আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। দরকার হলে ভোটারগণ (সাঁওতাল) বাইশি মোড়লের পরামর্শও নিয়ে থাকে। অনেক সময়ে আত্মীয়-স্বজনদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকে। সাধারণত চিরায়ত সাঁওতালরা বরাবরই পাড়ার মাঝি বা মোড়লদের সাথে পরামর্শ করে একটা অভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। নবীন নেতারা এবং ভোট প্রার্থীগণ অনেক ক্ষেত্রে প্রলোভন দেখিয়ে ভোটে অংশগ্রহণ করার জন্য তাদের উৎসাহিত করে থাকে। সাধারণ ভোটারদেরকে অনেক ক্ষেত্রে পিড়াপিড়ি করে বা ভোটের গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়। তবে নবীন নেতারাও অনেকেই ভোট সম্পর্কে তেমন ওয়াকিবহাল নয় বা এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ।

পক্ষান্তরে, খ্রিস্টান সাঁওতালরা সাধারণত তাদের ধর্মযাজকের (ফাদার) কাছে এ সম্পর্কে শলা-পরামর্শের জন্য শরণাপন্ন হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিবেচনা করে তারা অখ্রিস্টান মোড়ল-মাঝিদের সাথেও পরামর্শ করে থাকে। তবে সাঁওতালরা সাধারণত স্থানীয় নির্বাচনের বিষয়গুলো নিয়ে পড়শি হিন্দু কিংবা মুসলমানদের সাথে আলোচনা করে না। অনেক সময়ে বাইরের হিন্দু বা মুসলমান প্রার্থীগণ এসে এদের মধ্যে কাউকে প্রভাবিত করে নিজ দলে জড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে, কখনো তারা এ ক্ষেত্রে সফলও হয়। অনেকে আবার চাপ প্রয়োগ করে বা ভীতি প্রদর্শন করে থাকে। কখনো নানা ভাবে প্রলুব্ধ করে নিজেদের পক্ষে টেনে নেয়, এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। স্থানীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক সময়ে সাময়িক মত-বিরোধ সৃষ্টি হয়। যারা প্রবীণ বা মাঝ-বয়সী তারা হয়তো একটি দল বা পক্ষকে সমর্থন করছে, অন্য দিকে যারা তরুণ, শিক্ষিত যুবক তারা হয়তো অন্য দলের পক্ষে কাজ করে। ফলে পরস্পর-বিরোধী দল দুটোর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ধর্মান্তরিত সাঁওতালদের খ্রিস্টান মিশনারির ছত্রছায়ায় থেকে এরূপ কাজ করতে দেখা যায়। কারণ প্রয়োজন বোধে বুদ্ধি ও অর্থ দু'ধরনের সাহায্যই পাবে বলে তাদের ধারণা। তবে চিরায়ত সাঁওতালরা তাদের কাছে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না। যেহেতু সাঁওতাল পল্লির অধিকাংশ বাসিন্দা দরিদ্র, তাই তাদের সমাজের প্রভাবশালীদের কথামতো চলতে হয়। বিরোধিতা করলে জমি বর্গা থেকে শুরু করে অন্য অনেক দিক থেকেই তারা বঞ্চিত হতে পারে; আর্থিক অভাবের সময়ে সাহায্য পাবে না, তাই এ পল্লির নেতৃত্ব, রাজনৈতিক কার্যকলাপ অনকাংশে অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে; স্থানীয় রাজনৈতিক তৎপরতা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। যার জন্য এ জনগোষ্ঠী নির্বাচনসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিত্তবান বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সিদ্ধান্তের বাইরে কমই যেতে পারে। তবে সব চেয়ে বড় কথা, ভোটের গুরুত্ব বোধগম্য হোক বা না হোক, ইদানীং অধিকাংশ ভোটারই স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকে।

গত তিন দশকে কয়েকজন সাঁওতাল নেতা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। দেখা যায় যে, একজন শিক্ষিত সাঁওতাল যুবক ১৯৬২ সালে সর্বপ্রথম স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নীরবতা ভঙ্গ করেন (সরেন, ১৯৯৮)। সে নির্বাচনে তার নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে অকুণ্ঠ ও একক সমর্থন করে এবং তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তাই এই নির্বাচনী তৎপরতায় এলাকার সাঁওতালরা সর্বপ্রথম আধুনিক একটি রাজনৈতিক প্রথার সাথে সরাসরি জড়িত হয়ে পড়ে। বলা যায়, এটি ছিল তাদের জন্য একটি নবতর রাজনৈতিক দীক্ষা। এ ঘটনার মধ্যে দিয়ে অনেকেরই বিভিন্ন আধুনিক রাজনৈতিক তৎপরতার সাথে কিঞ্চিৎ পরিচয় হয়। যেমন–প্রচারণা করা, শোভাযাত্রা করা, আলোচনায়

অংশ নেওয়া, ভোট কেন্দ্রে যাওয়া এবং অনেকের জন্য প্রথম বারের মতো ভোট দানের অভিজ্ঞতা অর্জনের মতো ঘটনাগুলো ঘটে। এই ঘটনা ছিল এই সম্প্রদায়ের/জনগোষ্ঠীর জন্য একটি অভিনব বিষয়।

এরপর ১৯৬৬ সালে অপর একজন নেতা নিজ গ্রামে (ওয়ার্ডে) মেম্বার হিসেবে নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হবার পর এ সম্প্রদায়ের কয়েকজন নেতা বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে পরপর অংশগ্রহণ করেন। এই নির্বাচনী উপলক্ষগুলোকে কেন্দ্র করে সাঁওতালদের মধ্যে ১৯৬২ সালে যে নতুন রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ (Political socialization) শুরু হয়েছিল, তা আরো স্বচ্ছ এবং বিস্তৃত রূপ লাভ করতে থাকে। ফলে তারা দুই দশকের বেশি সময় ধরে এই এলাকার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে দেয় এবং একাধিকবার স্থানীয় নেতাকে নির্বাচিত করে নিজেদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পরিচয় প্রদান করে। সর্বশেষ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সাঁওতালরা আরো এক ধাপ এগিয়ে যায়। দুজন অভিলাষী নেতৃস্থানীয় সাঁওতাল ব্যক্তি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। এই প্রথম (১৯৯৭) একই স্থানের এবং একই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের দুজন ব্যক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এ দুজন প্রার্থীকে কেন্দ্র করে সাঁওতালরা দুটি নির্বাচনীদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে বিভাজন স্থায়ী না হলেও তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচনী তৎপরতা হিসেবে যথেষ্ট তীব্রতর রূপ ধারণ করে।

পাড়ায় স্ব-স্ব প্রার্থীকে কেন্দ্র করে সমর্থক ও কর্মীরা তৎপর হয়। বাড়ি বাড়ি প্রচারণা চালানো হয়, ঘরোয়া সভা, সমাবেশ চলে কয়েক সপ্তাহ ধরে। নানা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদান, পোস্টার লাগানো প্রভৃতি তৎপরতায়ও কোনো অভাব পরিলক্ষিত হয়নি। এইসব নির্বাচনী তৎপরতার আরেকটি পার্শ্বচিত্র রয়েছে। অভিন্ন জনগোষ্ঠীর দুজন প্রার্থী হবার সুযোগে অ-সাঁওতাল প্রার্থীগণ সাঁওতালদের মধ্যে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে। তারা কিছু সাঁওতাল ভোটারকে নানা ভাবে প্রলুব্ধ করে নিজের দলে টেনে নেয়। তাদেরকে অর্থ দিয়ে, বিশেষভাবে হাড়িয়া/পচানি প্রভৃতি প্রদান করে সাঁওতাল প্রার্থীদের পরিবর্তে নিজের পক্ষে সমর্থন আদায় করে। একই সম্প্রদায়ের দুজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ফলে নিজেদের মধ্যে সাময়িকভাবে মতপার্থক্য ও কিছুটা বৈরিতার সৃষ্টি হয়। এই অবকাশে বিশেষভাবে মুসলমান প্রার্থীগণ লোভী বা অসচেতন সাঁওতাল ভোটারদের প্রলুব্ধ করে অথবা নানা ভয়ভীতি প্রদান করে নিজের পক্ষে ভোট আদায় করে নেয়। এর ফলে উভয় সাঁওতাল প্রার্থী পরাজিত হয় এবং ভিন্ন গ্রামের অ-সাঁওতাল প্রার্থী (মুসলমান) নির্বাচনে জয়লাভ করে।

উভয় সাঁওতাল প্রার্থীর এই পরাজয়কে সমর্থক সাধারণ ভোটাররা এবং প্রার্থীদ্বয় একটি নতুন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তথা শিক্ষা বলে মনে করে। তাই অল্প সময়ের মধ্যে আবার তাদের মধ্যে রাজনৈতিক একীভূতকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়, শীঘ্র সামাজিক সংহতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে একদিকে উভয় প্রার্থী যেমন সকল বয়সী ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যাবার চেষ্ট করে, তেমনি অ-সাঁওতাল প্রার্থীরাও সকল ভোটারকে ভোটদানে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে কম সংখ্যক ভোটারই ভোটদানে বিরত থাকে। এসব স্থানীয় নির্বাচনে ভোট প্রদানের মাধ্যমে একদিকে তাদের মধ্যে যেমন আধুনিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ধারণার ক্রমবিকাশের একটি চিত্র ফুটে ওঠে তেমনি তাদের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যারা বরাবর নির্বাচনী প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, তারা সকলেই খ্রিস্টান সাঁওতাল। কোনো অখ্রিস্টান সাঁওতাল এসব নির্বাচনে প্রার্থী হয়নি। এমনকি সর্বশেষ নির্বাচনে যে দুজন সাঁওতাল প্রার্থী পরস্পরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়, তারা উভয়ই খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত। লক্ষণীয় সমর্থক বা কর্মী হিসেবে অনেক চিরায়ত সাঁওতাল কাজ করলেও সরাসরি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। কারণ, যারা চিরায়ত সাঁওতাল তারা এমনিতেই নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে অজ্ঞ কিংবা আগ্রহহীন, এরা অন্তর্মুখী এবং বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ কম। কিন্তু খ্রিস্টান মিশনারির সংস্পর্শে আসার ফলে ধর্মান্তরিত সাঁওতালরা বাইরের জগতের সাথে পরিচিত হয়ে উঠেছে। সেই সাথে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয় সম্পর্কে অবগত হবার সুযোগ লাভ করে। এর ফলে তাদের রাজনৈতিক পুনঃসামাজিকীকরণ (political resociaoization) হয়। অর্থাৎ চিরায়ত রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার বাইরে এসে নতুন ধারণা অর্জন করে। তদুপরি, জানা যায় রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করার জন্য মিশনারির লোকজনেরা ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের নানাভাবে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে, যাতে করে এই ব্যক্তিরা সমাজে ক্রমশ নেতা বা মুখপাত্র হিসেবে পরিচিতি ও কালক্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়।

উপসংহার

একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে পাড়া সংগঠনের কাঠামোগত ও ক্ষমতার পরিধির গুরুত্বপূর্ণ রদবদল ঘটছে ও সংকুচিত হয়ে পড়ছে। পূর্বে উল্লেখিত সাংগঠনিক কর্মকর্তাদের পদগুলো তাত্ত্বিকভাবে বিদ্যমান থাকলেও বাস্তবে কয়েকটির অস্তিত্ব নেই। আধুনিক রাষ্ট্রীয় রাজনীতির বিস্তার, মিশনারিদের তৎপরতা ও সাঁওতাল জনসংখ্যা অভাবনীয় হ্রাস এবং সর্বোপরি, ভূপ্রাকৃতিক ও পরিবেশগত পরিবর্তন চিরায়ত সাঁওতালি রাজনৈতিক কাঠামোকে বদলে দিচ্ছে। বিশেষভাবে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তকরণ, পাড়ায় পাড়ায় নতুন গির্জা সৃষ্টি পাড়া সংগঠনের কর্তৃত্বকে খর্ব অথবা বিকৃত করে ফেলছে। মাঝি ও তার কর্মকর্তাগণ ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ছে। পাড়া সংগঠনটি ক্রমান্বয়ে অকেজো হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ এই প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থহীন বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে। দারিদ্র্যের কারণে অথবা উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় অনেক সাঁওতাল স্বেচ্ছায় অথবা প্রলুব্ধ হয়ে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করছে। নবদীক্ষিত খ্রিস্টানগণ চিরন্তন সাঁওতালি সমাজের পাশাপাশি মিশনারিদের পরামর্শমতো নয়া সমাজ জীবন গড়তে সচেষ্ট। এতে সাঁওতালি রাজনৈতিক সংগঠন বিশেষভাবে পাড়া সংগঠন ও অন্যান্য সামাজিক উত্তাধিকারের ভিত ধসে পড়ছে। ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ছে মাঝি হড়ম, তার কর্তৃত্বের পরিধি সংকুচিত হতে হতে প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে সমাজে খ্রিস্টীয়করণের প্রক্রিয়া ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে এবং ঐতিহ্যগত ধ্যানধারণাসমুহও বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় ধর্মত্যাগী সমাজে ভাঙন সৃষ্টিকারীদের নিয়ন্ত্রণ করার কোনো উপায় পাড়া সংগঠন কিংবা মাঝি হড়মের আয়ত্তে নেই। অন্যভাবে বলা যায়, এ ধরনের পরিস্থিতিতে সাঁওতালি বিচার ব্যবস্থা অনুসারে 'বিৎলাহা' বা সমাজচ্যুত করণের যে প্রাচীন রীতি প্রচলিত ছিল তা প্রয়োগ করার ক্ষমতা অথবা সুযোগ কোনোটাই পাড়া সংগঠনের আর নেই। ফলে সমাজের স্বকীয় প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। তাদের শাস্তি দেবার মতো ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সাঁওতালি রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর শেষ হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, গির্জাকে কেন্দ্র করে ভিন্ন সমাজ সংগঠন, নেতৃত্ব, রাজনৈতিক চেতনা বিকশিত হচ্ছে। তাই একদিকে বিলীয়মান চিরন্তন রাজনৈতিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান, অন্যদিকে বিকাশমান খ্রিস্টীয় ও আধুনিক ভাবাদর্শ–এই দুই বৈপরীত্যপূর্ণ চেতনার অদ্ভুত মিশ্রণজনিত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মূলত এর মধ্য দিয়ে সাঁওতালি চিরায়ত সংগঠনগুলো ভেঙে পড়ছে। ক্রমশ মাঝি হড়মের পদটি একটি প্রতীকী পদে পরিণত হচ্ছে (Ali,1989:139)।

বিভিন্ন নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিগত সিকি শতাব্দীকালে সাঁওতালদের মধ্যে নতুন রাজনৈতিক সচেতনতার যেমন সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি চিরায়ত নেতৃত্ব ম্লান হয়ে পড়েছে এবং প্রধানত ধর্মান্তরিত যুবকরা নেতৃত্বের পুরোভাগে এসে উপস্থিত হচ্ছে। এভাবে সাঁওতালি রাজনৈতিক সংগঠনের কাঠামো ও কার্যধারাগত পরিবর্তন হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে নেতৃত্ব তথা সামাজিক কর্তৃত্ব, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রবীণ সাঁওতাল নেতাদের হাত থেকে উদীয়মান (ধর্মান্তরিত) নেতাদের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে সাধারণ সাঁওতালরাও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে ক্রমশ অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

তথ্যপঞ্জি

Ali, Ahsan (1989) *Social Change Among the Santals of Bangladesh:A Study of Cultural Isolation* (Unpublished Ph.D. Thesis),Dept. of Anthropology, Calcutta University.

Aiyappan, A.(1979) 'Some Patterns of Tribal Leadership' *The Santal, Education and Tribal Policy*,Vol. 5, ed. by J. Troisi, Indian Social Institute.

Culshaw,W.J.(1949) *Tribal Heritage*, London: Lutterworth Press.

Dalton, E. E.(1872) *Descriptive Ethnology of Bengal*, Calcutta.

কবিরাজ সরেনের সাক্ষাৎকার, ১৩.৮.১৯৯৮।

চুরকা সরেন মাঝির সাক্ষাৎকার,২০.৮.১৯৯৮।

সুনীল হাসদার সাক্ষাৎকার, ১৯.৮.১৯৯৮।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ৯ম সংখ্যা ১৪০৮

খুলনা মহাসগরীর মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস প্রদানে নগরবাসীর অংশগ্রহণ

মোঃ গোলাম মরতুজা*

Abstract: The city planning, development and management authorities of Khulna City, can not cope to deliver the required services to the city dwellers in accordance with their demands due to certain financial, institutional and other pertaining administrative constraints. There is an urgent need to bring a good cross-section of organizations and people from the government, NGOs, private sector, educational institutions, donor agencies, media and civil societies, and so on in one platform for discussing constaints, opportunities and challenges in addressing issues in delivering urban services. The City Corporation has already set up an example of working with different local and national NGOs in managing households' solid waste in different wards of Khulna as development partners. In this article the example of people's participation has been discussed.

১. ভূমিকা

সুবিধাভোগী হিসাবে জনগণ যে কোনো প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে । জনগণের উন্নয়নের জন্যই জনগণের চাহিদার অনুযায়ী সব পরিকল্পনা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় ।

প্রচলিত সরকারি প্রতিষ্ঠানের বাইরে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ম উদ্যোগ ও অভিজ্ঞতাসমূহকে পরিকল্পনা ও উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় পরিপূরক হিসেবে কাজে লাগানোও প্রয়োজন । জনগণ, গোষ্ঠী, সিভিল সোসাইটি, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে পরিকল্পনানুযায়ী কাজে লাগাতে হবে । ফলশ্রুতিতে জনগণের চাহিদা, প্রকল্পের মালিকত্ব এবং প্রকল্প সুষ্ঠু বাস্তবায়নে ও ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব । এই প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকল্পের প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে সম্যক তথ্যও নিশ্চিত করা সম্ভব ।

অংশীদারিত্ব বা পার্টনারশিপের সংজ্ঞা বিস্তৃত । পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এর প্রয়োগও ব্যাপক । সংক্ষিপ্ত আকারে বোঝায় যে, অংশগ্রহণ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা বা স্ট্যাকহোল্ডারগণ কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত হয় । আবার এটাও বলা যেতে পারে যে, কোনো প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব বা কর্তব্য অর্পণ করা । ফলে ঐসব জনগণ কোনো প্রকল্পের মালিকত্বের মনোভাব অর্জনে সমর্থ হয় । এই অংশীদারিত্ব সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাসেবার মনোভাবের দ্বারাই রূপায়িত হয় । এই অংশীদারিত্বে সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কোনো অবকাঠামোর ব্যবহারকারীগণ, গোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠন, এনজিও, ইত্যাদি সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে । সাম্প্রতিক কালে, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষকগণ, সাংবাদিকগণ, বিভিন্ন ডোনার প্রতিষ্ঠান মিউনিসিপ্যাল

* ড. মোঃ গোলাম মরতুজা, প্রফেসর, নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

সার্ভিস প্রদানে পার্টনারশিপের ব্যাপক প্রয়োগ সম্পর্কে সুপারিশ এবং ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করছে । নিম্ন চিত্রে অংশীদারিত্বে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের/স্ট্যাকহোল্ডারদের পারস্পরিক যোগাযোগের বিবরণ দেওয়া হলো:

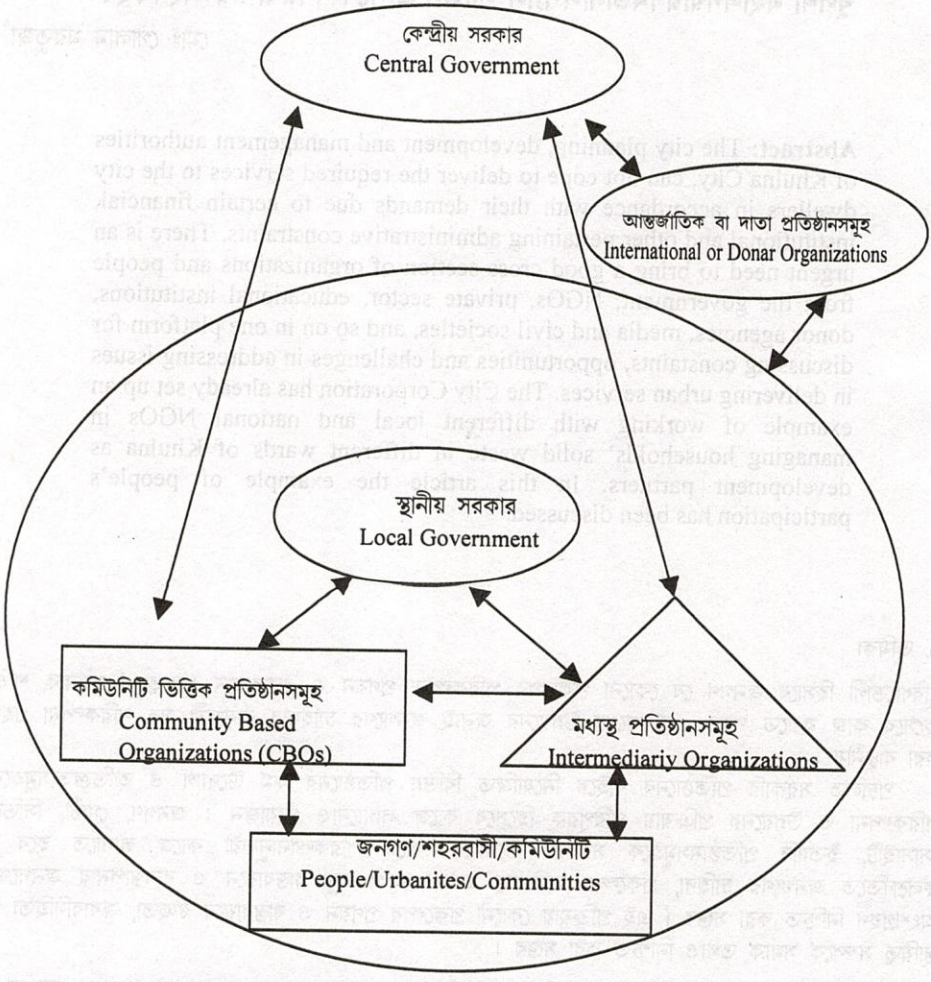

পার্টনারশিপ উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা/যোগাযোগ

মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস প্রদান বা নাগরিক সুবিধাদি প্রদান প্রকল্পে অংশগ্রহণের সংজ্ঞা নিম্নরূপ কোনো শহর বা নগরীতে বসবাসকারী জনগণ কোনো নাগরিক সুযোগ-সুবিধাদি ভোক্তা এবং উৎপাদক হিসেবে তথা সার্ভিস প্রদানে পরিকল্পনা প্রণয়ন, কাজের মান ও রক্ষণাবেক্ষণ করণে সক্রিয় ভূমিকা পালন নিশ্চিত করে । বর্তমানে বিশ্বে নগর স্থানীয় সরকার মিউনিসিপাল সার্ভিস প্রদানে একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে না । পার্টনারশিপ বা অংশীদারত্বের নিরিখে নগরে কর্মরত স্থানীয় সরকার, গোষ্ঠী ভিত্তিক সংগঠন, এনজিও, এবং সর্বোপরিভাবে জনগণই তাদের স্ব স্ব যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নাগরিক সুযোগ-সুবিধাদি প্রদান করে থাকে। এটি একটি প্রক্রিয়া। সমাজে কর্মরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একই লক্ষ্য অর্জনে তথা সামগ্রিকভাবে পরিবেশ উন্নয়ন ও জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে ।

আলোচ্য প্রবন্ধে পার্টনারশিপ বা নাগরিক সুযোগ-সুবিধাদি প্রদানে জনগণের অংশগ্রহণ প্রেক্ষিত খুলনা মহানগরী শিরোনামে আলোচনার অবতারণার সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়াই মূল লক্ষ্য ।

১. পরিপ্রেক্ষিত খুলনা মহানগরী

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত খুলনা বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম নগরী । এ নগরী ভৈরব ও রূপসা নদীর তীরে অবস্থিত । এ মহানগরীর ৪৫.৬৫ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকায় ১০ লক্ষের মতো লোক বসবাস করে । প্রশাসনের সুবিধার্থে মহানগরীটিকে ৩৭টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়েছে । ১৯৮৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর খুলনা মিউনিসিপালিটিকে কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৪ এর মাধ্যমে খুলনা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয় পরবর্তী কালে ১৯৯০ সালে খুলনা সিটি কর্পোরেশন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সাম্প্রতিককালে চিংড়ি রপ্তানিসহ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা মেডিকেল কলেজ ইত্যাদি এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপনের ফলে এ শহরের সার্বিক আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে । এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান এ নগরীরতে বসবাসরত ক্রমবর্ধমানশীল জনগোষ্ঠীর নাগরিক সুযোগ-সুবিধাদির চাহিদার নিরিখে সুযোগ-সুবিধা সরবরাহে ততটা ইতিবাচক ভূমিকা পালনে সমর্থ হচ্ছে না। ফলে, নাগরিক সুযোগ-সুবিধাদির চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যে পার্থক্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । এ পরিপ্রেক্ষিতে, নগরে বসবাসরত দরিদ্র পরিবারসমূহের দুঃখ-কষ্ট ও ভোগান্তি বাড়ছে এবং জীবনযাত্রার মান ব্যাহত হচ্ছে । এ ব্যাপারে শুধুমাত্র খুলনা সিটি কর্পোরেশনকে চিহ্নিত করে সমস্যার সমাধান করা যাবে না ।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন শুধুমাত্র তার বাধ্যতামূলক কাজ অর্থ্যাৎ কিনা শহর পরিষ্কারকরণ বা কনজার্ভেন্সি সার্ভিসে সীমাবদ্ধ না রেখে ইতোমধ্যেই নানাবিধ নাগরিক সুযোগ-সুবিধাদি প্রদানে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করেছে । তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিভিন্ন রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার বা মেরামত করণ, পয়ঃপ্রণালী, স্ট্রিট লাইট, কবরস্থান, শ্মশান ঘাট, সুপার মার্কেট, আধুনিক কসাইখানা, জিয়া হল, ট্রাক টার্মিনাল, অ্যাশফেল্ট প্ল্যান্ট, কলেজিয়েট গার্লস স্কুল, বায়তুর নূর জামে মসজিদ, ওয়ার্ড কমিশনারদের অফিস, গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন । তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (ইউ,এস,এ,আই,ডি) সহায়তায় খুলনা শহরের পরিবেশ ম্যাপিং এবং ওয়ার্কবুক ও খুলনা শহরের পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অ্যাকশান প্ল্যান প্রণীত হয়েছে । বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় সিটি ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি শীর্ষক কাজও চলছে । বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস প্রজেক্টের (এম,এস,পি) কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে । এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় আর্বান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রজেক্টের কাজও চলছে । জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির উদ্যোগে আর্বান বেসিক সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট এবং আর্বান পোভার্টি এলিভেশন প্রজেক্টের কাজ যথাক্রমে চালু আছে ।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এসব প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে ।

২. নাগরিক সুযোগ-সুবিধাদি প্রদানে অংশীদারিত্ব উন্নয়নে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়াদি

জনগণের অংশীদারিত্ব মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস প্রদানে নিম্নের বর্ণিত বিষয়াদির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা একান্তভাবে প্রয়োজন ।

- অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের স্ব স্ব ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা ;
- কমিউনিটির জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং স্ব স্ব যোগ্যতা, দুর্বলতা, দক্ষতা, ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয় ;

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তথা খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন অংশীদারিত্ব প্রক্রিয়ায় সক্রিয় বলিষ্ঠ ও অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করা ;
- ছোট প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাকে কোনোক্রমেই ছোট করে না দেখা ;
- পারস্পারিক লাভ বা উপকারের ভিত্তিতেই সফলজনক অংশীদারিত্ব গড়ে উঠতে পারে;
- সিদ্ধান্ত প্রদানে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবর্গের সমান অধিকার নিশ্চিতকরণ ;
- পারস্পরিক বিশ্বস্ততা ও খোলামেলা পরিবেশের ভিত্তিতে পার্টনারশিপ গড়ে তোলা ;
- শুধুমাত্র উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে অংশীদারিত্বের আদর্শে নিয়ে আসা নীতি নয় বরং সমাজের উপযুক্ত ব্যক্তিকে সন্নিবেশিত করাই মূল লক্ষ্য ;
- কমিউনিটিতে বসবাসরত ব্যক্তির কমিটমেন্ট, সময় প্রদান, যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতাই আদর্শ প্রতিনিধিত্বের মাপকাঠি হওয়া উচিত, বিশেষত নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে ;
- নগরে বসবাসরত পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকা প্রয়োজন। এই পরিষদ জনগণের অংশীদারিত্বে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান তথা সামগ্রিক পরিবেশ উন্নয়নে বিভিন্ন উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ;
- কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানকে সর্বপ্রথম জনগণের অংশীদারিত্বে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে এবং পরবর্তীতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও অনুকরণীয় কাজে আবর্তন হতে পারে ; এবং
- জনগণের অংশীদারিত্বে নাগরিক সুযোগ-সুবিধাদি প্রদান কাজের স্থায়িত্ব, ধারাবাহিকতা, গতি, শিক্ষণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে যথাযথ তদারকি নিশ্চিতকরণ।

৩. একটি চলতি প্রকল্পের সফলতা এবং শিক্ষণীয় বিষয়াদি (কেস স্টাডি)

৩.১ প্রকল্প বিবরণ

কমিউনিটি পর্যায়ে বাড়ির বর্জ্য-আবর্জনা ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত খুলনা শহরে একটি পাইলট প্রকল্প ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে শুরু হয় এবং ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে শেষ হয়। এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ১৩.৫ মিলিয়ন টাকা। প্রকল্পের কাজ ৬টি ওয়ার্ডে বিস্তরণ করা হয়। প্রকল্পের কাজ খুলনা মহানগরীতে বিল্ট-আপ এরিয়া, পেরি-আর্বান এরিয়া এবং বস্তি এলাকার বাস্তবায়ন করা হয়। এই প্রকল্পের দ্বারা ১২ শত পরিবারের বেশি বাড়ির ময়লা আবর্জনা নেওয়া এবং সু-পরিত্যাগের ব্যবস্থাও করা হয়। সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এবং বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় যথাক্রমে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রদীপন নামক একটি স্থানীয় এনজিও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল :

- নগরের ময়লা আবর্জনা ও পানি সরবরাহ সম্পর্কে একটি কৌশলগত ধারণা লাভ করা এবং এ বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যার নিরসনকল্পে যথাযথ পন্থা চিহ্নিত করা যা কমিউনিটি বা জনগণের ব্যয়ভার ও অংশগ্রহণ দ্বারা বাস্তবায়ন করা সম্ভব ;
- মিউনিসিপাল সার্ভিস প্রদানে জনগণের অংশীদারিত্বের নিমিত্তে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শর্তাবলি এবং প্রশাসনিক পরিবর্তনের সুপারিশমালা নিরুপণ করা ;
- ময়লা আবর্জনা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে মিউনিসিপ্যাল অথরিটির বা সিটি কর্পোরেশনের সহিত কমিউনিটির যোগসূত্রের স্থাপন বিষয়াদি চিহ্নিতকরণ ; এবং
- এই পাইলট প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে নগর ভিত্তিক ময়লা আবর্জনা ব্যবস্থাপনায় বড় আকারের বিনিয়োগ প্রকল্প চিহ্নিতকরণ।

প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন পার্টনারদের ভূমিকা ছিল নিম্নরূপ :

জনগণ বা কমিউনিটি	:	ময়লা আবর্জনার প্রাথমিক সংগ্রহের পদ্ধতির ব্যবস্থাপনা এবং সার্ভিস প্রদানের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন ।
খুলনা সিটি কর্পোরেশন	:	প্রশাসনিক সহায়তা ও সহযোগিতা, ময়লা আবর্জনার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার যোগসূত্র স্থাপন ।
প্রদীপন	:	প্রকল্পের যাবতীয় কাজ সু-সম্পন্ন করা ।
সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট	:	ব্যবস্থাপনা ও অর্থ যোগান ।
বিশ্ব ব্যাংক	:	কৌশলগত তদারকিকরণ এবং কারিগরি সহয়তা প্রদান ।

৩.২ প্রকল্পের সফলতা

- সি,বি,ও-এনজিও-খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে কর্ম সম্পর্ক বা ওয়াকিং রিলেশনশিপ স্থাপন ও উন্নয়ন সাধন ;
- নাগরিক সুযোগ-সুবিধাদি প্রদান শুধুমাত্র সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার দায়িত্ব বা কাজ নয় বরং সামগ্রিকভাবে নগরবাসীরও দায়িত্ব-এই ধারণা অনুধাবন করার মনোবৃত্তি বৃদ্ধিকরণ ;
- কমিউনিটি পর্যায়ে ময়লা আবর্জনা ব্যবস্থা কমিটি স্থাপন ;
- পরিবেশ উন্নয়নে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে ওয়ার্ড কমিশনারদেরকে ওয়ার্ড পর্যায়ের ময়লা আবর্জনা ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নির্ধারণকরণ ;
- অন্যান্য সি,বি,ও কর্তৃক বাড়ির ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে উৎসাহ প্রাপ্তি ও অংশগ্রহণ ;
- মিউনিসিপাল সার্ভিস প্রদানে কমিউনিটি পর্যায়ে দক্ষ জনশক্তি উৎপাদন / বৃদ্ধি
- মিউনিসিপাল সার্ভিস প্রদানের নিশ্চয়তা থাকবে তার জন্য জনগণ সার্ভিস চার্জ দিতে আগ্রহী;
- নগরীর সামগ্রিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধিকরণ ; এবং
- স্থানীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন ।

৩.৩ প্রকল্পের শিক্ষণীয় বিষয়াদি

- জনগণের অংশীদারিত্বে মিউনিসিপাল সার্ভিস প্রদান কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকল্প কাজ চালু রাখা ;
- কমিউনিটির কিছু সংখ্যক লোক সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে চায় না ;
- জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পারস্পরিক মত বিনিময় এবং যোগসূত্র স্থাপন করা এবং
- এলাকা ভিত্তিক ময়লা আবর্জনা ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য ।

৪. অংশীদারিত্ব উন্নয়নে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং করণীয় কাজ

খুলনা মহানগরীতে বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস প্রদানে জনগণের অংশগ্রহণ একান্তভাবে বাঞ্ছনীয় । এসব সার্ভিস প্রদানে জনগণের অংশগ্রহণের দ্বারাই সামগ্রিকভাবে খুলনা শহরের পরিবেশ উন্নয়নে এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু অবকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব । এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে।

- মিউনিসিপাল সার্ভিস প্রদানে শহরবাসীর বা জনগোষ্ঠীর ভূমিকার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

- সামগ্রিকভাবে শহর ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত শহরবাসীর বা জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মভিত্তিক কার্যকরি কর্মপন্থা ও পরিকল্পনা গ্রহণ;
- কমিউনিটি পর্যায়ে মিউনিসিপাল সার্ভিস প্রদানে দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ব্যয় সংকুলান কমিউনিটি ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ;
- যাবতীয় প্রকল্প মালিকত্ব অধিকার অর্জনের মনোভাব এবং এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- কমিউনিটি পর্যায়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন ।

৫. উপসংহার

উপরে বর্ণিত চ্যালেঞ্জসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক অঙ্গীকার, কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রয়োজন এবং সর্বোপরিভাবে নগরবাসীর দৃঢ় সমর্থন প্রয়োজন । খুলনা নগরীকে আজকের এবং আগামী দিনের জন্য বসবাসের, কাজের এবং বিনিয়োগের উপযুক্ত জায়গা নিশ্চিতকরণ একান্ত প্রয়োজন । এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে আমাদের সকলকে এই ধারণা গ্রহণ করতে হবে যে, এই নগরী আমাদের সকলের । নগর রক্ষণাবেক্ষণ যাবতীয় কাজসমূহ শুধু সিটি কর্পোরেশনের একার উপরই ন্যস্ত নয় এটা প্রত্যেকের কাজ–গোষ্ঠীর কাজ–সকল স্তরের নগরবাসীর কাজ নগরীর একটি সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের স্বার্থে ।

তথ্যনির্দেশ

1. United Nations Centre for Humen Settlements (Habitat) Community Development Programme for Asia and Citynet, Regional Network of Local Authorities for the Management of Human Settlements, (1997), Partnership for Local Action: *A Source Book on Participatory Approaches to Shelter and Human Settlements Improvement for Local Government Officials*, Japan.
2. United Nations Centre for Humen Settlements (Habitat) Community Development Programme for Asia and Citynet, Regional Network of Local Authorities for the Management of Human Settlements, (1998), *New Directions for Community Participation in Asian Cities: Proceeding of the Expert Group Meeting on the Future of Community Participation in the Asian Economic Context, Fukuoka, Japan, 26-28 March 1998.*
3. Centre for Bangladesh Culture, (1991), *Portcity Khulna.* Dhaka: Bangladesh.
৪. মোঃ নুরুল ইসলাম, (১৯৮২), *খুলনা জেলা,* খুলনা জেলা পরিষদ, খুলনা ।
৫. Urban and Rural Planning Discipline, (1999), *Environmental Maps and Workbook for Khulna City, Bangladesh.* Khulna University, Khulna.
৬. K.G.M. Latiful Bari (ed), (1978), *Bangladesh District Gazetters, Khulna*: Dhaka: Bangladesh, Government Press.
৭. Kamal Siddiqui, Jamshed Ahmed, Abdul Awal and Mustaque Ahmed, (2000), *Overcoming the Governance Crisis in Dhaka City*, Dhaka: The University Press Limited.
8. মোঃ শফিকুর রহমান, কাজী কায়েছে আযম ও মোঃ শাহ নাজিম-উদ-দৌলা, (১৯৯৮), ময়লা আবর্জনা অপসারণে পৌরসভার ভূমিকা - *The Journal of Local Government.* Vol. 27. No. 2 Dhaka: National Institute of Local Government.

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ৯ম সংখ্যা ১৪০৮

সংবাদপত্রে জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদ : রাজশাহীর সংবাদপত্রের উপর একটি সমীক্ষা

মোঃ খাদেমুল ইসলাম*

Abstract: Local newspapers can play important role in creating awareness about population and family planning like national newspapers. The purpose of this paper is to find out the volume of news published about population problem and family planning and the importance are given to publish these news in the daily newspapers published from Rajshahi. This article also tried to assess the understanding, awareness, knowledge and interests of journalists working in the daily newspapers of Rajshahi in regard to population and family planning.

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশ্বের নবম জনবহুল দেশ। জনসংখ্যা ১২ কোটি ৯২ লক্ষ ৪৭ হাজার ২৩৩ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বছরে ১.৪৮ শতাংশ। এদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮৩৪ জন মানুষ বাস করে (*BBS, 2001 a*)। বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। জিডিপি'র ১৯.১১ শতাংশ আসে কৃষি খাত থেকে *(দৈনিক ইত্তেফাক, জুন ৮, ২০০১ : ২)*। মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয় ৩৭০ মার্কিন ডলার (*The State of the World's Children, 2001 : 78*)। শিক্ষিতের হার ৫৬ শতাংশ (*The State of the World's Children, 2001 : 90*)। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৭৬.৬১ শতাংশ গ্রামে এবং ২৩.৩৯ শতাংশ শহরে বসবাস করে। বর্তমানে এদেশে ১০৩.৮ জন পুরুষের অনুপাতে মহিলার সংখ্যা ১০০ জন। পুরুষের সংখ্যা ৬ কোটি ৫৮ লক্ষ ৪১ হাজার ৪১৯ জন আর নারীর সংখ্যা হলো ৬ কোটি ৩৪ লক্ষ ৫ হাজার ৮১৪ জন (*BBS, 2001 b*)।

সম্পদের অপ্রতুলতা এবং জীবনধারণের ন্যূনতম স্তরের অর্থনৈতিক অবস্থা জনসংখ্যা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে সরাসরি ব্যাহত করে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। দেশের ৫১.১ শতাংশ জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে *(দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম: বাংলাদেশ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন-২০০০)*। ৫ বৎসরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুহার ৮৯ শতাংশ (*The State of the World's Children, 2001: 78*)। বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন সূচক (এইচডিআই) হলো দশমিক ৪৭০ এবং বিশ্বের ১৬২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩২ (*মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন-২০০১*)।

প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ জন্মহার হ্রাসের ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে। জন্মরোধক ব্যবহারের হার সিপিআর (Contraceptive Prevalence Rate) ১৯৭৫ সালের শতকরা ৭ ভাগ থেকে বর্তমানে ৫৪ ভাগে উন্নীত হয়েছে (*The State of the World's Children, 2001 : 102*)। মোট প্রজনন হার টিএফআর (Total Fertility Rate) বা মহিলা প্রতি গড় সন্তান জন্মদানের হার ১৯৬০ সালের

* মোঃ খাদেমুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৬.৭ থেকে ১৯৯৯-২০০০ সালে ৩.৩-এ নেমে এসেছে (*BDHS 1996-97*)। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করলেও চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করতে পারেনি। তাই সরকার জনসংখ্যা সমস্যাকে এখনো এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করছেন।

জনসংখ্যা রোধ এবং ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের ক্ষেত্রে প্রধান সহায়ক শক্তি হিসেবে সংবাদপত্র যে উৎকৃষ্ট মাধ্যম তা গত শতকে বিভিন্ন দেশে প্রমাণিত হয়েছে। সংবাদপত্রের যোগাযোগের ব্যাপ্তি যথেষ্ট। ফলে সংবাদপত্রে প্রকাশিত জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য জনমনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে (*নিরীক্ষা*, ১৯৯৭)।

জনমত গঠনে সাংবাদিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একটি সহায়ক, আগ্রহী এবং তথ্যবহুল সংবাদমাধ্যম পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে। পাশাপাশি তথ্যে অপরিপূর্ণ, কম আগ্রহী এবং বিদ্বেষী একটি সংবাদমাধ্যম পরিবার পরিকল্পনা বিস্তারে শক্তিশালী প্রতিবন্ধক হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। এজন্য ১৯৯৪ সালের ৫ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর মিশরের রাজধানী কায়রোতে অনুষ্ঠিত 'জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বের জনসংখ্যা কমানোর জন্যে এবং এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম যেমন : রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র প্রভৃতির কার্যকর ব্যবহারের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (*International Conference on Population and Development, 1994*)। সুতরাং জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সাংবাদিকদের উপলব্ধির অগ্রগতি সাধন প্রয়োজন। উপলব্ধির এই অগ্রগতি সাধন যেমন জাতীয় পর্যায়ের সাংবাদিকদের প্রয়োজন তেমনি মফস্বল সাংবাদিকদেরও। মফস্বল সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রের নানারকম সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তাদের উপলব্ধি, জ্ঞান, সচেতনতা, মনোভাব, আগ্রহ কেমন তা যেমন জানা প্রয়োজন একই সঙ্গে এইসব সংবাদপত্রে কি পরিমাণ জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদ ছাপা হচ্ছে, কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হচ্ছে তাও জানা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে রাজশাহীর সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জ্ঞান, উপলব্ধি, সচেতনতা, মনোভাব, আগ্রহ যাচাইয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। একইসাথে রাজশাহীর সংবাদপত্রে কি পরিমাণ এ বিষয়ক খবর ছাপা হচ্ছে, কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হচ্ছে তাও বের করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রাজশাহীর দৈনিক পত্রিকাসমূহের মধ্যে দৈনিক বার্তা, দৈনিক সোনালী সংবাদ, দৈনিক সোনার দেশ, দৈনিক সানসাইন, দৈনিক উপচার এবং দৈনিক লাল গোলাপ উল্লেখযোগ্য। পত্রিকাগুলোর মধ্যে দৈনিক বার্তা, দৈনিক সোনালী সংবাদ ও দৈনিক সোনার দেশ নিয়মিত বের হয়। বাকি সব পত্রিকা অনিয়মিতভাবে বের হয়। এই গবেষণায় সেইসব দৈনিক পত্রিকাকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেসব পত্রিকা নিয়মিত বের হয়। এছাড়াও পত্রিকা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয়কে বিবেচনায় আনা হয়েছে সেটা হলো প্রচার সংখ্যা। রাজশাহীর দৈনিক পত্রিকাসমূহের মধ্যে দৈনিক সোনালী সংবাদের প্রচার সংখ্যা সর্বাধিক (গড়ে দৈনিক ৫০০০ কপি), প্রচার সংখ্যার দিক দিয়ে ২য় স্থানে রয়েছে দৈনিক সোনার দেশ (দৈনিক ২০০০ কপি) এবং ৩য় স্থানে রয়েছে দৈনিক বার্তা (দৈনিক ১৫০০ কপি) (*মিথস্ক্রিয়া, ১৯৯৯ : ৩৫*)। উপর্যুক্ত দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এই গবেষণায় নমুনা হিসেবে দৈনিক সোনালী সংবাদ, দৈনিক সোনার দেশ এবং দৈনিক বার্তাকে বাছাই করা হয়েছে। এই তিনটি পত্রিকায় ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত মোট ছয় মাসের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বিশ্লেষণের একক হিসেবে এই গবেষণায় ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে প্রকাশিত পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদকে কলাম ইঞ্চিতে প্রকাশ করা হয়েছে। আবার, জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদকে কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছে—তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা হয়েছে। ক) সংবাদের পৃষ্ঠাগত অবস্থান, খ) সংবাদের শিরোনামের আকার, গ)

সংবাদের সাথে ছবির ব্যবহার, ঘ) সংবাদের ধরন প্রভৃতি। আর এক্ষেত্রে সংবাদগুলোকে সংখ্যায় এবং শতাংশে প্রকাশ করা হয়েছে।

এছাড়া জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়টাকে রাজশাহীর সাংবাদিকরা কিভাবে দেখেন অর্থাৎ এ বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি? এ সম্পর্কিত রিপোর্ট করতে তারা কতটুকু আগ্রহী, এ বিষয়ে তাদের জ্ঞান এবং উপলব্ধি বের করার জন্য লিখিত প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত তিনটি পত্রিকার সম্পাদক এবং রিপোর্টারদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে গণমাধ্যম ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা মনে করতেন, গণমাধ্যমের সংখ্যা যত বাড়বে, গণমাধ্যম বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে বেশি ভূমিকা পালন করতে পারবে। পরবর্তী কালে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, গণমাধ্যমের বিস্তার বড় কথা নয়, বড় বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ওইসব গণমাধ্যমে কি তত্ত্ব, তথ্য, সত্য প্রচার করা হচ্ছে তা। তাই বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাজশাহীর সংবাদপত্রের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে হলে আমাদের দেখতে হবে জনসংখ্যা সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলো রাজশাহীর সংবাদপত্রে কতটুকু আসছে, কি পরিমাণ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হচ্ছে তা। আর এসবের জন্য প্রয়োজন আধেয় বিশ্লেষণ করা।

আধেয় এবং তার প্রভাব নিয়ে বিগত দশকগুলোতে ব্যাপক আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা পরোক্ষভাবে এই বিষয়ে একমত যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সংবাদপত্রের ভূমিকা মূল্যায়নের জন্য আধেয় বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অবশ্য একথা প্রায় সকল যোগাযোগ তত্ত্ববিদই স্বীকার করেন যে, আধেয় বিশ্লেষণের অন্যতম দুর্বলতার দিক হলো যে, তা যে কোনো আধেয়কেই শেষাবধি কতিপয় সংখ্যার পর্যায়ে অবনমিত করে, যা আধেয়ের প্রভাব বিচারে সব সময়ই সহায়ক নয়। তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত আধেয় পরিমাপণের বিকল্প গড়ে না ওঠায় আধেয় বিশ্লেষণের উপযোগিতাকে কেউই বাতিল করে দিতে পারে না।

২. জনসংখ্যা যোগাযোগ বিষয়ক গবেষণা পর্যালোচনা

জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা এবং গণমাধ্যম বিষয়ক গবেষণার প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সফলতা অনেকাংশেই যোগাযোগের উপর নির্ভর করে। সেজন্য সরকার যোগাযোগ কৌশলের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রেডিও, টিভি, সংবাদপত্রসহ বিভিন্ন গণমাধ্যম জনসংখ্যা বিষয়ক সংবাদ এবং অনুষ্ঠান প্রচার ও প্রকাশ করছে। তাই এই কার্যক্রমের যথাযথ মূল্যায়ন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা এবং সংবাদপত্র বিষয়ক কয়েকটি গবেষণা এখানে পর্যালোচনা করা হলো : "সংবাদপত্রে জনসংখ্যা বিষয়ক খবর ও অন্যান্য" (*বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট*) শীর্ষক এক জরীপে দেখা যায় 'জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ' একটি প্রধান জাতীয় ইস্যু হলেও জনসংখ্যা বিষয়ক বিশেষ কোনো ঘটনা না ঘটলে এ জাতীয় খবর পরিবেশিত হয় না। জনসংখ্যা বিষয়ক খবর রিপোর্ট আকারে বেশি প্রকাশিত হয়। দেখা গেছে সাদামাটা খবরই বেশি ছাপা হয়। জনসংখ্যা বিষয়ক ব্যাখ্যামূলক ও অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট অপেক্ষাকৃত কম। ১৯৯৩ সালের ১ মার্চ থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত এই পনরো দিনকে সমীক্ষা সময় হিসেবে গ্রহণ করা হয়। "Bangladesh Journalists Reporting on Population and Family Planning : Study Results (*Khuda et al, 1994*) শীর্ষক এক গবেষণায় জনসংখ্যা বিষয়ে সাংবাদিকদের জ্ঞান, মনোভাব, উপলব্ধি, আগ্রহ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়। গবেষণায় দেখা যায় জনসংখ্যা সমস্যা বিষয়ে সাংবাদিকদের আগ্রহ তেমন নেই। তারা এ বিষয় নিয়ে লিখতে তেমন আগ্রহী নয় এবং এ বিষয়ে তাদের জ্ঞানও সীমিত। 'Communication and Mitivation in Family Planning' (*Von Euler, 1969*) শিরোনামে একটি গবেষণা ঢাকার লালবাগ ইউনিয়নে পরিচালিত হয়। এই গবেষণা থেকে দেখা যায় ৯০ শতাংশ উত্তরদাতা পরিবার পরিকল্পনা তথ্যে উৎস হিসেবে ক্লিনিক, বন্ধু-বান্ধব, সমাজকর্মী, প্রতিবেশী, বেতার,

টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। এই গবেষণা থেকে এটি বেরিয়ে আসে যে সমাজে নারীদের উপর পুরুষদের মাত্রাতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। পারিবারিক সিদ্ধান্তগুলো সাধারণত পুরুষরাই নিয়ে থাকে।

৩. রাজশাহীর সংবাদপত্রের জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদ

সংবাদপত্রের সবচেয়ে মূল্যবান হলো স্থান বা Space। একটি সংবাদ কি পরিমাণ জায়গা জুড়ে প্রকাশিত হয়েছে সেটার উপর সংবাদের গুরুত্ব নির্ভর করে। যে সংবাদ যত গুরুত্বপূর্ণ সে সংবাদ তত বেশি স্থান জুড়ে ছাপা হয়। একটি সংবাদ যে পরিমাণ জায়গা জুড়ে ছাপা হয় সেটা কলাম-ইঞ্চিতে পরিমাপ করা হয়।

সারণি ১

রাজশাহীর দৈনিকে জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদের আধেয়

(বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা শতকরা হার নির্দেশক)

সংবাদপত্রের নাম	পরিমাণ (কলাম-ইঞ্চি)
সোনালী সংবাদ	৪৫৬ (২৫.৯৭)
বার্তা	৪২০ (২৩.৯২)
সোনার দেশ	৮৮০ (৫০.১১)
মোট	১৭৫৬ (১০০)

নির্বাচিত সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক খবর সবচাইতে বেশি প্রকাশ করেছে দৈনিক সোনার দেশ (৫০.১১ শতাংশ)। তিনটি পত্রিকা মিলে এ সংক্রান্ত খবর ছেপেছে ১৭৫৬ কলাম ইঞ্চি। [সারণি ১ দ্রষ্টব্য]

সারণি ২

রাজশাহীর দৈনিকে বিভিন্ন ধরনের সংবাদের আধেয়

(বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা শতকরা হার নির্দেশক)

	বিভিন্ন ধরনের সংবাদ								
পত্রিকার নাম	রাজনীতি	অপরাধ	জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা	খেলাধুলা	বাণিজ্য	দুর্ঘটনা	প্রাকৃতিক দুর্যোগ	অন্যান্য	মোট সংবাদ
সোনালী সংবাদ	৯২৩৮ (৩৫.১১)	৮৯০৫ (৩৭.২৫)	৪৫৬ (২৫.৯৭)	৪০০০ (৩১.৪০)	১৯৭৪ (৩৯.৬০)	১৩৬৭ (৪০.৬০)	২৫০০ (৩১.১০)	৫৩২০ (৩৩.৫৭)	
বার্তা	৯০০০ (৩৪.৩০)	৮০০০ (৩৩.৬৭)	৪২০ (২৩.৯২)	৩৭৪০ (২৯.৩৬)	২০০০ (৪০.২১)	১০০০ (২৯.৭০)	২৪৩০ (৩১.৮০)	৬২১০ (৩৯.১৯)	
সোনার দেশ	৮০০০ (৩০.৪৯)	৭০০০ (২৯.২৮)	৮৮০ (৫০.১১)	৫০০০ (৩৯.২৪)	১০০০ (২০.১০)	১০০০ (২৯.৭০)	২০০০ (৩১.১০)	৪৩১৭ (২৭.২৪)	
মোট	২৬২৩৮ (১০০)	২৩৯০৫ (১০০)	১৭৫৬ (১০০)	১২৭৪০ (১০০)	৪৯৭৪ (১০০)	৩৩৬৭ (১০০)	৬৪৩০ (১০০)	১৫৮৪৭ (১০০)	৯৫২৫৭
বিভিন্ন ধরনের মোট সংবাদের সাথে প্রত্যেকটি সংবাদের শতকরা হার	২৭.৫৭	২৫.১০	১.৮৪	১৩.৩৭	৫.২২	৩.৫৩	৬.৭৫	১৬.৬২	

রাজশাহীর দৈনিক পত্রিকায় সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয় রাজনীতির খবর, যা মোট সংবাদের ২৭.৫৭ শতাংশ। এর পরের অবস্থানে রয়েছে অপরাধ বিষয়ক খবর (২৫.১০ শতাংশ)। জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক খবর মোট সংবাদের ১.৮৪ শতাংশ [সারণি ২ দ্রষ্টব্য], যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এ থেকে বলা যায়, রাজশাহীর সংবাদপত্রে জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক খবরের চেয়ে রাজনীতি, অপরাধ, খেলাধুলা বিষয়ক খবরকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৪. জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদের পৃষ্ঠাগত অবস্থান

সংবাদের পৃষ্ঠাগত অবস্থান থেকে বোঝা যায় ঐ সংবাদে কি পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাধারণত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো প্রথম পাতায় প্রকাশ করা হয়। প্রথম পাতার পর গুরুত্বপূর্ণ পাতা হলো শেষ পাতা। মধ্যবর্তী পাতাসমূহের গুরুত্ব মাঝামাঝি ধরনের।

সারণি ৩

রাজশাহীর দৈনিকে জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদের পৃষ্ঠাগত অবস্থান
(বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা শতকরা হার নির্দেশক)

	সংবাদপত্রের নাম			
পৃষ্ঠাগত অবস্থান	সোনালী সংবাদ	বার্তা	সোনার দেশ	মোট
প্রথম পৃষ্ঠা	১১ (২৫.০০)	১৭(২৬.৯৯)	১৮ (২১.৪৩)	৪৬ (২৪.০৮)
শেষ পৃষ্ঠা	০৭ (১৫.৯০)	২ (৩.১৭)	১৭ (২০.২৪)	২৬ (১৩.৬২)
মধ্যবর্তী পৃষ্ঠা	২৬ (৫৯.১০)	৪৪ (৬৯.৮৪)	৪৯ (৫৮.৩৩)	১১৯ (৬২.৩০)
মোট	৪৪ (১০০)	৬৩ (১০০)	৮৪ (১০০)	১৯১ (১০০)

রাজশাহীর দৈনিকগুলোতে জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদ সবচেয়ে বেশি ছাপা হয় মাঝের পাতায় (৬২.৩০ শতাংশ)। প্রথম পাতায় (২৪.০৮ শতাংশ) এবং শেষের পাতায় (১৩.৬২ শতাংশ)। [সারণি ৩ দ্রষ্টব্য]। এ থেকে বোঝা যায়, রাজশাহীর সংবাদপত্র জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদকে খুব গুরুত্ব দিয়ে ছাপে না।

৫. জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদের শিরোনামের আকার

সংবাদের গুর ত্ব বিচারের ক্ষেত্রে শিরোনামের আকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে সংবাদ যত গুরুত্বপূর্ণ সে সংবাদের শিরোনামের কলাম সংখ্যা তত বেশি হয়।

সারণি ৪

রাজশাহীর দৈনিকে জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদের শিরোনামের আকার
(বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা শতকরা হার নির্দেশক)

	সংবাদপত্রের নাম			
শিরোনামের আকার	সোনালী সংবাদ	বার্তা	সোনার দেশ	মোট
এক কলাম	২৪ (৫৪.৫৫)	৩০ (৪৭.৬২)	৪০ (৪৭.৬২)	৯৪ (৪৯.২১)
দুই কলাম	১৪ (৩১.৮১)	২৩ (৩৬.৫১)	৩৩ (৩৯.২৯)	৭০ (৩৬.৬৫)
তিন কলাম	৬ (১৩.৬৪)	১০ (১৫.৮৭)	১১ (১৩.১৯)	২৭ (১৪.১৪)
মোট	৪৪ (১০০)	৬৩ (১০০)	৮৪ (১০০)	১৯১ (১০০)

রাজশাহীর দৈনিকে বেশির ভাগ (৪৯.২১ শতাংশ) জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদ ছাপা হয় এক কলাম শিরোনামে [সারণি ৪ দ্রষ্টব্য]। অর্থাৎ এ বিষয়ক সংবাদ রাজশাহীর দৈনিকগুলোতে খুব সামান্যই গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়।

৬. জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদের সাথে ছবির ব্যবহার

সংবাদকে প্রাণবন্তভাবে তুলে ধরার জন্য শক্তিশালী একটি উপকরণ হলো ছবি। ছবির গুরত্ব বোঝানোর জন্য বলা হয়ে থাকে 'ছবি এক হাজার শব্দের চেয়ে শক্তিশালী'। তাছাড়া ছবি সংবাদপত্রের পাতাকে আকর্ষণীয় করে পাঠকের সামনে তুলে ধরে।

সারণি ৫

রাজশাহীর দৈনিকে জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদের সাথে ছবির ব্যবহার

ছবির ব্যবহার	সংবাদ পত্রের নাম			
	সোনালী সংবাদ	বার্তা	সোনার দেশ	মোট
সর্বমোট ছবি	৩	৬	৪	১৩
সর্বমোট জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদ	৪৪	৬৩	৮৪	১৯১
সংবাদ-ছবি অনুপাত	১৪.৬৭	১০.৫	২১	১৪.৬৯

রাজশাহীর সংবাদপত্রে জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদ ও ছবির অনুপাত ১৪.৬৯ [সারণি ৫ দ্রষ্টব্য]। এ থেকে বলা যায়, রাজশাহীর সংবাদপত্রে জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদকে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার চেষ্টা করে না।

৭. জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদের ধরন

বিজ্ঞাপন ছাড়া সংবাদপত্রের পাতায় যা ছাপা হয় তাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়: (১) সংবাদ; (২) মতামত। সংবাদকে আরো দুই ভাগে ভাগ করা যায় : (ক) সাদামাটা সংবাদ বা উপরিতল প্রতিবেদন; (খ) গভীরতল প্রতিবেদন। গভীরতল প্রতিবেদনকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হয়। ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন এবং অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। মতামতের মধ্য আছে সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় এবং চিঠিপত্র। এছাড়া সংবাদের আরো একটি ধরন আছে সেটা হলো ফিচারধর্মী প্রতিবেদন। রাজশাহীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদের ৭০.৬৭ শতাংশ সাদামাটা সংবাদ বা উপরিতল প্রতিবেদন। ফিচার ১৪.১৪ শতাংশ, সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় ১৪.১৪ শতাংশ, ব্যাখ্যামূলক সংবাদ ১.০৫ শতাংশ। লক্ষণীয়, কোনো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি। [সারণি ৬ দ্রষ্টব্য]।

সারণি ৬

রাজশাহীর দৈনিকে জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদের ধরন

(বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা শতকরা হার নির্দেশক)

সংবাদের ধরন	সংবাদ পত্রের নাম			
	সোনালী সংবাদ	বার্তা	সোনার দেশ	মোট
সাদামাটা বা উপরিতল প্রতিবেদন	৩২ (৭১.৭৩)	৪৬ (৭৩.০২)	৫৭ (৬৭.৮৫)	১৩৫ (৭০.৬৭)
ফিচার	৫ (১১.৩৬)	৭ (১১.১১)	১৫ (১৭.৮৬)	২৭ (১৪.১৪)
মতামত (সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়)	৭ (১৫.৯১)	৮ (১২.৭০)	১২ (১৪.২৯)	২৭ (১৪.১৪)
ব্যাখ্যামূলক	০	২ (৩.১৭)	০	২ (১.০৫)
অনুসন্ধানী	০	০	০	০
মোট	৪৪ (১০০)	৬৩ (১০০)	৮৪ (১০০)	১৯১ (১০০)

৮. সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার

জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সাংবাদিকদের উপলব্ধি, জ্ঞান, সচেতনতা এবং এ বিষয়ে রিপোর্ট করতে তাদের আগ্রহ এবং মনোভাব জানার জন্য নির্বাচিত তিনটি পত্রিকার তিনজন সম্পাদক এবং ৩৩ জন রিপোর্টারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ গবেষণায় মোট ৩৬ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে রিপোর্ট করার জন্য এসব পত্রিকায় আলাদা কোনো রিপোর্টার নেই। ফলে এ বিষয়ে রিপোর্ট করার জন্য যে কোনোও রিপোর্টারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। রিপোর্টারদের জনসংখ্যা সমস্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জ্ঞান খুবই সীমিত। যেমন: টিএফআর (Total Fertility Rate), সিবিআর (Crude Birth Rate), সিডিআর (Crude Death Rate), সিপিআর (Contraceptive Prevalence Rate) প্রভৃতি সম্পর্কে ৭০ শতাংশ সাংবাদিকের ভালো ধারণা নেই। যখন রিপোর্টাররা তাদের রিপোর্টে এই ধরনের টার্মগুলো ব্যবহার করেন তখন তারা অন্য কোনো রিপোর্ট অথবা ডকুমেন্ট থেকে ব্যবহার করেন। সাক্ষাৎকার থেকে দেখা যায়, নির্বাচিত তিনটি পত্রিকার সম্পাদক এবং রিপোর্টাররা বাংলাদেশ সরকারের জনসংখ্যা নীতি এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি সম্পর্কে জানেন কিন্তু বিস্তারিতভাবে ৮০ শতাংশ জানেন না। যদিও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সকল (১০০ শতাংশ) সাংবাদিক মনে করেন, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করে তবুও এ বিষয়ে রিপোর্টিংয়ে ৭৫ শতাংশ সাংবাদিকের আগ্রহ খুব কম। ৯০ শতাংশ সাংবাদিক মনে করেন, জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদের সংবাদমূল্য কম, পাঠকরা এ বিষয়ে জানতে খুব একটা আগ্রহী নয়, এ বিষয়ে সংবাদ ছাপালে পাঠক পড়ে না, তাই তারা জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদের চেয়ে বরং রাজনীতি, অপরাধ, খেলাধুলা, সন্ত্রাস, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি বিষয়ক রিপোর্ট করতে এবং পত্রিকায় প্রকাশ করতে বেশি আগ্রহী। তাছাড়া ৮৫ শতাংশ সাংবাদিক মনে করেন জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক রিপোর্ট করে বিখ্যাত সাংবাদিক হওয়া সম্ভব নয়। তাই তারা এ বিষয়ে রিপোর্ট করতে খুব একটা আগ্রহ দেখান না।

৯৫ শতাংশ সাংবাদিক পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন: খাবার বড়ি, কনডম, আইইউডি, ভ্যাসেকটমি, লাইগেশন ইত্যাদি সম্পর্কে জানেন কিন্তু এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কোনটা স্থায়ী, কোনটা অস্থায়ী সে সম্পর্কে ৬০ শতাংশ সাংবাদিকের পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই। এছাড়া এসব পদ্ধতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ৭০ শতাংশ সাংবাদিকের জ্ঞান খুবই সীমিত। এ বিষয়ে ১৫ শতাংশ সাংবাদিকের মধ্যে ভুল ধারণা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন : ২ শতাংশ সাংবাদিক মনে করেন, যে মহিলা খাবার বড়ি খাবেন তিনি সাপের বাচ্চা জন্ম

দিবেন, ৭ সাংবাদিকের মতে যিনি লাইগেশন করাবেন তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবেন, ২ শতাংশের মতে যিনি ভ্যাসেকটমি করাবেন মৃত্যুর পর মাটি তাঁর দেহ গ্রহণ করবে না, ২.৫ শতাংশের মতে ইনজেকশন নিলে রক্ত দূষিত হবে এবং তা মৃত্যুর কারণ হবে, ১.৫ শতাংশের মতে যে মহিলা জন্মরোধক ইনজেকশন নিবেন তাঁর সন্তান ধারণ ক্ষমতা কমে যাবে ইত্যাদি।

সাংবাদিকরা জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনার উপর গভীরতল প্রতিবেদন অথ্যাৎ ব্যাখ্যামূলক এবং অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করতে আগ্রহী হন না। তাদের মতে, এ ধরনের রিপোর্ট করতে যে সময়, শ্রম এবং অর্থের প্রয়োজন তা তাদের নেই। তার চেয়ে বরং তারা জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক প্রোগ্রাম রিপোর্ট, মিটিং সংবাদ, বক্তৃতা, বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন সংক্রান্ত সংবাদ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রিপোর্ট করে থাকেন।

উপরোক্ত ৩০ শতাংশ সাংবাদিক পরিবার পরিকল্পনা বিষয়টিকে অশোভনীয় বিষয় বলে মনে করেন। তাদের মতে জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জনগণ আপনা-আপনি পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে জানবে, সংবাদপত্রে এ বিষয়ে গুরুত্বসহ কোনো কিছু প্রকাশ করার দরকার নেই। অবশ্য ৮০ শতাংশ সাংবাদিকই মনে করেন জনসংখ্যা সমস্যার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব রয়েছে এবং এ বিষয়ে আরো বেশি সংবাদ, অধিক গুরুত্ব দিয়ে পত্রিকায় প্রকাশ করা উচিত।

৯. জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক রিপোর্ট করতে অসুবিধা

সাংবাদিকরা জানান জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে যেসব তথ্য তারা পান সেগুলোর সংখ্যা যেমন কম, ঠিক তেমনি তথ্যে অপরিপূর্ণ এবং গুণগত মানও ভালো নয়। এই সমস্ত তথ্য সরকারি বিভিন্ন সংস্থা যেমন: স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর থেকে আসে। এছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা থেকে কিছু কিছু তথ্য আসে যেগুলোর বেশির ভাগই পক্ষপাতদুষ্ট, অপরিপূর্ণ এবং অপ্রাসঙ্গিক। এই ধরনের তথ্যের সাহায্যে ভালো রিপোর্ট তৈরি করা যায় না। সাংবাদিকদের মতে, তাঁদের যদি সঠিক, পরিপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা হতো তবে তাঁরা জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে রিপোর্ট করতে আরো আগ্রহী হতেন।

৮৬ শতাংশ সাংবাদিক জানান, জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সাম্প্রতিক তথ্য পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে কয়েক বছর আগের তথ্য দিয়ে তাদের রিপোর্ট করতে হয়।

জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে রাজশাহীর দৈনিক পত্রিকা অফিসে যে রেফারেন্স বিভাগ রয়েছে, তা খুবই নিম্নমান সম্পন্ন। জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে রিপোর্ট করার জন্য অতিপ্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সেখানে নেই, ফলে এ বিষয়ে রিপোর্ট করতে অসুবিধা হয়।

১০.১ *আধেয় বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল*

(১) জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে রাজশাহীর দৈনিকে খুব সামান্য (১.৮৪ শতাংশ) খবর ছাপা হয় যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

(২) এ বিষয়ক খবরকে রাজশাহীর সংবাদপত্রে গুরুত্বসহ প্রকাশ করা হয় না।

(৩) জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক যেসব সংবাদ রাজশাহীর পত্রিকায় ছাপা হয় তাদের বেশির ভাগই সাদামাটা বা উপরিতল প্রতিবেদন। ব্যাখ্যামূলক এবং অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় না বললেই চলে।

১০.২ *সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত ফলাফল*

(১) অধিকাংশ সাংবাদিক মনে করেন জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করে জনগণকে সচেতন করার ক্ষেত্রে, জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা উচিত কিন্তু জনসংখ্যা সমস্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে তাদের জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

(২) জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সাংবাদিকদের জ্ঞানের অভাব তাদের করা রিপোর্টকে পরিপূর্ণ, আকর্ষণীয় করার ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে।

(৩) এ বিষয়ে রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের আগ্রহ খুবই কম।

(৪) জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে রিপোর্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব রয়েছে।

১১. সুপারিশ

(১) বর্তমানে বাংলাদেশ জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কিছুটা সফলতা অর্জন করলেও চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করতে পারেনি। তাই সংবাদপত্রে এ বিষয়ক সংবাদকে গুরুত্বসহকারে, আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেশন করা দরকার।

(২) জনসংখ্যা সমস্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সাংবাদিকদের জ্ঞানের অভাব এ বিষয়ক রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে বলে সাংবাদিকদের জন্য এবিষয়ক বিশেষ কর্মশালা, প্রশিক্ষণ এবং কোর্সের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৩) জনসংখ্যা সমস্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে নানান ধরনের তথ্য যাতে সাংবাদিকরা সহজেই পেতে পারে তার জন্য এ বিষয়ক একটি কেন্দ্রীয় ডাটা ব্যাংক স্থাপন করা যেতে পারে।

(৪) সাংবাদিকরা যাতে জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে রিপোর্ট করতে আগ্রহী হয় তার জন্য এ বিষয়ক বস্তুনিষ্ঠ, অনুসন্ধানী/ব্যাখ্যামূলক আকর্ষণীয় প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য সরকারিভাবে পুরস্কার প্রবর্তন করা যেতে পারে।

(৫) জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে ভালো জ্ঞান, শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে এমন ধরনের রিপোর্টার পত্রিকায় নিয়োগ দেওয়া এবং তাদের দ্বারা এ বিষয়ক রিপোর্ট করানো যেতে পারে।

(৬) বর্তমানে মানুষ শুধু ঘটনা জেনে সন্তুষ্ট নয়, ঘটনার পেছনের কারণও জানতে চায়। পাঠকের চাহিদা মেটানোর জন্য জনসংখ্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে শুধু উপরিতল প্রতিবেদন (Surface reproting) প্রকাশ না করে বরং গভীরতল প্রতিবেদন অর্থাৎ ব্যাখ্যামূলক এবং অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে পাঠককে ঘটনার পেছনের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিতে হবে।

১১. উপসংহার

একাবিংশ শতাব্দীতে এসেও জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ এদেশের দারিদ্র্য, ভূমিবণ্টন, নারী-বৈষম্য, নির্ভরশীলতা, শিক্ষা, পুষ্টি-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা, প্রতিবেশ, স্থানান্তর, খাদ্য পরিস্থিতি, বৈবাহিক অবস্থা, শিশু-মৃত্যু, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। ফলে এ সমস্যা সমাধানের জন্য জাতীয় পত্রিকার পাশাপাশি আঞ্চলিক পত্রিকাকে জনসংখ্যা সমস্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদকে গুরুত্বসহকারে তুলে ধরতে হবে। আর তা হলেই জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পত্রিকাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

তথ্যপঞ্জি

১. BBS (2001a). *The Preliminary Report of the Fourth Population Census- 2001*, Bangladesh Bureau of Statistics, Bangladesh Secretariat. Dhaka.

২. _____ (2001b). *The Preliminary Report of the Fourth Population Census- 2001*, Bangladesh Bureau of Statistics, Bangladesh Secretariat. Dhaka.

৩ BDHS 1996-97, *Bangladesh Demografhic and Health Survey.*

৪. *International Conference on Population and Development* (1994), Published by United Nations Department of Public Information.

৫. Khuda et al (1994). *Bangladesh Journalists Reporting on Population and Family Planning : Study Results*. Center for Communication Programs, Johns Hopkins School of Public Health III Market Place, Baltimore, Mayland, USA.

৬. *The State of the World's Children 2001*. Unicef

৭. Von Euler (1969). *Communicatin and Motivation in Family Planning*.

৮. *দৈনিক ইত্তেফাক* (জুন ৮, ২০০১), "জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৬.৪ শতাংশ"।

৯. *দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম : বাংলাদেশ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন-২০০০*, বিআইডিএস, ঢাকা।

১০. *নিরীক্ষা (১৯৯৭)*, ৭৬তম সংখ্যা, ঢাকা

১১. বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (১৯৯৩), *সংবাদপত্রে জনসংখ্যা বিষয়ক খবর ও অন্যান্য*।

১২. *মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন-২০০১*, ইউএনডিপি।

১৩. *মিথস্ক্রিয়া* (১৯৯৯), গণযোগাযোগ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ৯ম সংখ্যা ১৪০৮

বাংলাদেশে অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইন প্রণয়নের প্রবণতা: একটি পর্যালোচনা

মোঃ রুহুল আমিন*

Abstract: Generally the Supreme Power to make laws for a country belongs to Parliament. But Constitutions of some developing countries provide for provision of legislation by the head of the executive in some special situations— which is called Ordinance. The Ordinance making power of the president of Bangladesh provided in Article 93 of the constitution. The purpose of this article is to evaluate the circumstances under which the Ordinances were used during the First, Second, Third, Fourth and Fifth Parliaments and how far they were justified.

ভূমিকা

আধুনিক যুগে আইনসভা হলো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। তাই আইনসভার সংগঠন খুবই গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। আইনসভা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সর্বত্র শক্তি, উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছড়িয়ে দেয় এবং জাতীয় জীবনকে উজ্জীবিত করে তোলে। অতীতের স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে আইন পরিষদের স্থান ছিল গৌণ এবং রাজতন্ত্রে তা ছিল বৈঠকি আসর সাজাবার উপকরণ মাত্র। কিন্তু জনগণের প্রাধান্য স্বীকৃত হওয়ার পর থেকেই এর সুদিন ফিরেছে। আইনসভা একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন অর্থাৎ আইনসভা দেশের বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দাবি-দাওয়ার প্রেক্ষিতে আইন প্রণয়ন করার[১] চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে আইন সভার হাতে।[২] তবে কতিপয় রাষ্ট্রের (যেমন বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান) লিখিত সংবিধানে শাসন বিভাগকেও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।[৩] আইন পরিষদ যখন অধিবেশনে না থাকে তখন জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক যে আইন প্রণয়ন করা হয় তার নাম অধ্যাদেশ।[৪]

বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৩(১) উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত দুটি পরিস্থিতিতে অধ্যাদেশ প্রণয়ন করতে পারেন-

ক) যখন সংসদ ভেঙে যাওয়া অবস্থায় থাকে; এবং
খ) যখন সংসদ জীবিত আছে কিন্তু অধিবেশনে নেই।

এরূপ দুটি পরিস্থিতিতে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে বলে সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেরূপ প্রয়োজনীয় বলে মনে করবেন, সেইরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন এবং জারি হবার সময় হতে অনুরূপ প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদের আইনের ন্যায় সমান ক্ষমতাসম্পন্ন হবে।[৫]

---

* ড. মোঃ রুহুল আমিন, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

লক্ষণীয় যে, আইন বিভাগ আইন দ্বারা যা করতে পারে না রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশের মাধ্যমেও তা করতে পারবেন না। অধ্যাদেশের মাধ্যমে সংবিধান পরিবর্তন করা যায় না এবং পূর্বে জারিকৃত কোনো অধ্যাদেশকে পরবর্তী অধ্যাদেশের মাধ্যমে বলবৎ করা যায় না।[৬]

অধ্যাদেশ জারির পর যদি তা ইতিপূর্বে বাতিল করা না হয়ে থাকে তাহলে যখন সংসদে প্রথম বৈঠক বসবে তখন তা উক্ত বৈঠকে উপস্থাপিত হবে এবং উপস্থাপনের ৩০ দিনের মধ্যে তা পাস হতে হবে; অন্যথায় ৩০ দিন পরে অধ্যাদেশের কোনো কার্যকারিতা থাকবে না যদিও অনুরূপ বিধি অনিষ্পন্ন থেকে যেতে পারে। ৩০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই সংসদ অধ্যাদেশটিকে অননুমোদন করে প্রস্তাব পাস করতে পারে। এরূপ প্রস্তাব যেদিন পাস হবে সেদিন থেকে অধ্যাদেশটি অকার্যকর হবে।[৭]

বাংলাদেশে কি পরিস্থিতিতে অধ্যাদেশ জারি করা হয় এবং তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত তা মূল্যায়ন করাই এ গবেষণার লক্ষ্য। বাংলাদেশের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পার্লামেন্টের শাসনামলে প্রণীত অধ্যাদেশসমূহ বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্র। এই গবেষণায় ব্যবহৃত প্রাথমিক উৎসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: সরকারি অধ্যাদেশ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপরিষদ ও পার্লামেন্টের বিতর্ক, পার্লামেন্টের কার্যবাহের সারাংশ এবং নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট।

প্রথম পার্লামেন্টে অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন

বাংলাদেশের প্রথম পার্লামেন্ট মার্চ ১৯৭৩ থেকে ২৪ জানুয়ারি ১৯৭৫ পর্যন্ত সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার অধীনে ৭টি অধিবেশনে মিলিত হয়ে ১১৪টি কর্মদিবসে ৪০৭ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে। উক্ত পার্লামেন্ট ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ থেকে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতিক পদ্ধতির অধীনে ১টি মাত্র অধিবেশনে মিলিত হয়ে ২০ টি কর্মদিবসে মোট ৪৬.৫৪ ঘণ্টা সময় কর্মরত থাকে।[৮]

সারণি ১

প্রথম পার্লামেন্ট কর্তৃক পাসকৃত আইনে অধ্যাদেশের পরিসংখ্যান

অধিবেশন	সংসদে উত্থাপিত বিলের সংখ্যা	সংসদে পাসকৃত বিলের সংখ্যা	সংসদে অধ্যাদেশ থেকে পাসকৃত আইন
প্রথম অধিবেশন ৭.৪.১৯৭৩ - ১৯.৪.'৭৩	-	-	-
দ্বিতীয় অধিবেশন ২.৬.'৭৩ - ১৭-৭-'৭৩	১৫	১৪	১০
তৃতীয় অধিবেশন ১৫.৯.'৭৩- ২৬.৯.'৭৩	১৪	১৪	৮
চতুর্থ অধিবেশন ১৫.১'৭৪-৫.২.'৭৪	৩২	৩১	১৫
পঞ্চম অধিবেশন ৩.৬.'৭৪-২২.৭.'৭৪	২৮	২৮	৯
ষষ্ঠ অধিবেশন ১৯.১১.'৭৪-২৩.১১.'৭৪	১২	১২	১২
সপ্তম অধিবেশন ২০.১.'৭৫-২৮.১.'৭৫	৬	১	১
অষ্টম অধিবেশন ২৩.৬.'৭৫-১৭.৭.'৭৫	৩৮	৩৮	৩৪
মোট	১৪৫	১৩৮	৮৯

উৎস: Aminur Rahman, "Bangladesh Parliament: Its Working 1973-1982," Unpublished Ph.D. Thesis, Rajshahi University, Rajshahi 1996, p.143: Md. Abdul Halim, Constitution, Constitutional Law and Politics: Bangladesh Perspective- A Comparative Study of Problems of Constitutionalism in Bangladesh (Dhaka: Rico Printers, 1998), p. 229.

বাংলাদেশের প্রথম পার্লামেন্টে সংসদীয় শাসনামলে সরকারি উদ্যোগে মোট ১১৩টি সাধারণ বিলের নোটিশ পাওয়া গেলেও তন্মধ্যে ১০৭টি সংসদে উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত বিলগুলোর মধ্যে ২টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করে নেন এবং ৫টি বিল অনিষ্পন্ন থেকে যায়। ফলে পার্লামেন্টে মোট ১০০টি বিল পাস হয়।[৯]

সংসদীয় শাসনামলে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদের অধীনে সর্বমোট ৬০টি অধ্যাদেশ জারি করলেও তন্মধ্যে ৫৮টি অধ্যাদেশ বিল আকারে সংসদে উত্থাপিত হয়। ১টি অধ্যাদেশ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী প্রত্যাহার করে নেন এবং ২টি অধ্যাদেশ অনিষ্পন্ন থেকে যায়, ফলে প্রথম পার্লামেন্টে সংসদীয় শাসনামলে ১০০টি বিল গৃহীত হয়, যার ৫৫টি ছিল অধ্যাদেশ।[১০]

একদলীয় রাষ্ট্রপতিক শাসনামলে সংসদে সরকারি উদ্যোগে মোট ৩৮টি বিল উত্থাপিত হয় এবং সবগুলো বিলই পাস হয়। পাসকৃত ৩৮টি বিলের মধ্যে ৩৪টি ছিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পূর্বাহ্নে জারিকৃত অধ্যাদেশ। অধ্যাদেশগুলো বিল আকারে সংসদে উত্থাপিত হলেও, সেগুলো যেহেতু ইতিপূর্বে আইন হিসেবে বলবৎ হয়েছে, সেহেতু সেগুলোর উপর আলোচনা করা বা সংশোধনী আনার সুযোগ ছিল সীমিত।[১১]

অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে জরুরি নয় এমন কিছু আইনও সংসদকে পাস কাটিয়ে জারি করা হয়, যেমন—The Prime Minister's Remuneration and Privileges Bill, 1973, The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers Remuneration and Privileges Bill, 1973, এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়।[১২] এমনকি, পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু করার পরও গুরুত্বহীন বিষয়ে অধ্যাদেশ জারি করা হয়, যেমন- The Printing Pressess and Publications Declaration and Registration Ordinance, 1973, The Bangladesh Fisheries Development Corporation Ordinance, 1973, and the Bangladesh Cottage Industries Corporation Ordinance, 1973[১৩] এভাবে অধ্যাদেশ জারির প্রেক্ষাপটে বিরোধী দলীয় সাংসদরা সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। বিরোধী গ্রুপের নেতা আতাউর রহমান খান সমালোচনা করে ক্ষোভের সাথে বলেন, অধ্যাদেশগুলো জারি না করে সংসদের অধিবেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করা যেতে পারত। সংসদ ডাকার পর অধ্যাদেশ জারি করা ভালো দেখায় না। এ ধরনের কাজ যাতে পরবর্তীতে আর না হয় এবং সতর্কতা অবলম্বন করা হয় সেজন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি।[১৪]

দ্বিতীয় পার্লামেন্টে অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ নির্বাচিত বাংলাদেশের দ্বিতীয় পার্লামেন্ট ২৪ মার্চ ১৯৮২ দেশে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ভেঙে দেওয়া হয়। এই সময়কালে দ্বিতীয় পার্লামেন্ট মোট ৮টি অধিবেশনে ২০৬টি কর্মদিবসে মোট ৮৮৪ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে।[১৫]

সারণি ২

দ্বিতীয় পার্লামেন্ট কর্তৃক পাসকৃত আইনে অধ্যাদেশের পরিসংখ্যান

অধিবেশন	সংসদে উত্থাপিত বিলের সংখ্যা	সংসদে পাসকৃত বিলের সংখ্যা	সংসদে অধ্যাদেশ থেকে পাসকৃত আইন
প্রথম অধিবেশন ২.৪.'৭৯-৭.৪.'৭৯	-	-	-
দ্বিতীয় অধিবেশন ২১.৫.'৭৯-৩০.৬.'৭৯	৫	-	-
তৃতীয় অধিবেশন ২১.২.'৮০-৪.৪.'৮০	২৮	১৬	৬
চতুর্থ অধিবেশন	১৬	১০	৩

২২.৫.'৮০-২৬.৭.'৮০			
পঞ্চম অধিবেশন ২৮.১১.'৮০-৩১.১২.'৮০	১৭	১৪	৫
ষষ্ঠ অধিবেশন ১০.৪.'৮১-২.৫.'৮১	৭	৪	৩
সপ্তম অধিবেশন ২১.৪.'৮১-১০.৭.'৮১	৫	৪	-
অষ্টম অধিবেশন ১৫.১.'৮২-২.৩.'৮২	৯	১	-
মোট	৮৭	৪৯	১৭

উৎস: Aminur Rahman, "Bangladesh Parliament: Its Working 1973-1982,"Unpublished Ph.D.Thesis, Rajshahi University, Rajshahi 1996, p.193: Md. Abdul Halim, Constitution, Constitutional Law and Politics: Bangladesh Perspective- A Comparative Study of Problems of Constitutionalism in Bangladesh (Dhaka: Rico Printers, 1998), p. 233.

দ্বিতীয় পার্লামেন্টে সর্বমোট ১৪৬টি সাধারণ বিলের নোটিশ পাওয়া গেলেও ৮৭টি বিল সংসদে উত্থাপিত হয় এবং উত্থাপিত বিলগুলোর মধ্যে ৪৯ টি সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়, গৃহীত বিলগুলোর মধ্যে ১৭টি ছিল অধ্যাদেশ। উল্লেখ্য যে দ্বিতীয় পার্লামেন্ট আমলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২৭টি অধ্যাদেশ জারি করা হলেও ২৬টি অধ্যাদেশ অনুমোদনের জন্য বিল আকারে সংসদে উত্থাপিত হয়। উত্থাপিত বিলগুলোর মধ্যে ৯টি অধ্যাদেশ অনিষ্পন্ন থেকে যায়। অর্থাৎ সংবিধানের বিধানানুযায়ী আইনের মর্যাদা হারায়।[১৬]

দ্বিতীয় পার্লামেন্টে সরকার অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে সংসদকে পাস কাটিয়ে জরুরি নয় এমন বিষয়েও আইন প্রণয়ন করে, যেমন- The Assembly Members Privileges (Repeal) Ordinance, 1980, The Speaker & Deputy Speaker Remuneration and Privileges (Amendment) Ordinance, 1981[১৭] পার্লামেন্টের অধিবেশন বসার অল্পদিন পূর্বেও (সংসদ অধিবেশনের ৫ দিন পূর্বে) সরকার গুরুত্বহীন বিষয়ে অধ্যাদেশ জারি করে, যেমন-The Dock Workers Registration of Employment[১৮] নামক অধ্যাদেশটি জারি করা হয়।

দ্বিতীয় পার্লামেন্টে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ উক্ত অধ্যাদেশগুলো বিল আকারে সংসদে উপস্থাপন করে সেগুলো সাথে সাথে পাস করার অনুরোধ জানান এই বলে যে, সেগুলো যথাসময়ে গৃহীত না হলে তামাদি হয়ে যাবে। তাই সার্বিক মূল্যায়নে বলা যায়, এই বিলগুলো আলোচনার জন্য সাংসদরা সংসদে পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ পাননি। বিরোধী দলের সাংসদরা অধ্যাদেশ জারি করার প্রবণতার জন্য সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন, যেমন আওয়ামী লীগ দলীয় সাংসদ ইমাম উদ্দীন প্রামাণিক ক্ষোভের সাথে বলেন, অধ্যাদেশগুলো বিল আকারে সংসদে এত তাড়াহুড়া করে আনা হয়েছে যে, আমরা ভালোভাবে পড়েও দেখতে পারিনি। রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি করার অধিকার আছে বলেই যে কোনো সময়ে বিনা প্রয়োজনে তিনি সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করবেন এটা আমরা আশা করিনি।[১৯] এ. এস. এম. সোলায়মানও এই প্রক্রিয়ার কঠোর সমালোচনা করেন।[২০]

তৃতীয় পার্লামেন্টে অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন

৭ই মে ১৯৮৬ নির্বাচিত বাংলাদেশের তৃতীয় পার্লামেন্ট[২১] ৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭ ভেঙে দেওয়া হয়।[২২] এবং উক্ত সময়কালে এই পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতিক শাসন ব্যবস্থার অধীনে কর্মরত থেকে চারটি অধিবেশনে ৭৫টি কর্মদিবসে ৩৬৭.৪১ ঘন্টা সময় ব্যয় করে।[২৩]

সারণি ৩

তৃতীয় পার্লামেন্ট কর্তৃক পাসকৃত আইনে অধ্যাদেশের পরিসংখ্যান

অধিবেশন	সংসদে উত্থাপিত বিলের সংখ্যা	সংসদে পাসকৃত বিলের সংখ্যা	সংসদে অধ্যাদেশ থেকে পাসকৃত আইন
প্রথম অধিবেশন ১০.৭.'৮৬-২২.৭.'৮৬	-	-	-
দ্বিতীয় অধিবেশন ১০.১১.'৮৬	৪	১	-
তৃতীয় অধিবেশন ২৪.১.'৮৭-২৫.৩.'৮৭	২৬	২৫	৬
চতুর্থ অধিবেশন ১১.৬.'৮৭-১৩.৭.'৮৭	২৮	২৬	৬
মোট	৫৮	৫২	১২

উৎস: Khaleda Habib, *Bangladesh Elections, Parliament and the Cabinet 1970-91*, Dhaka, 1991, p.84: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ তৃতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম (জুলাই, ১৯৮৬), দ্বিতীয় (নভেম্বর, ১৯৮৬), তৃতীয় (১৯৮৭) ও চতুর্থ (বাজেট, ১৯৮৭) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ; Md. Abdul Halim, Constitution, Constitutional Law and Politics: Bangladesh Perspective-A Comparative Study of Problems of Constitutionalism in Bangladesh (Dhaka: Rico Printers, 1998), p. 229.

তৃতীয় পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতিক আমলে রাষ্ট্রপতি ৯৩(১) অনুচ্ছেদের অধীনে মোট ১৬টি অধ্যাদেশ জারি করেন। তন্মধ্যে ১৬টি অধ্যাদেশই বিল আকারে সংসদে উত্থাপিত হয়। তৃতীয় পার্লামেন্টে যে ৫২টি বিল গৃহীত হয় তার মধ্যে ১২টি ছিল অধ্যাদেশ।[২৪]

জরুরি বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে সরকার অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে জরুরি নয় এমন বিষয়েও রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়ন করেন, যেমন-The Prime Minister's Remuneration and Privileges (Amendment) Ordinance, 1986.[২৫]

এমনকি পার্লামেন্টের অধিবেশন বসার অল্পদিন পূর্বেও সরকার গুরুত্বহীন বিষয়ে অধ্যাদেশ জারি করেন, যেমন-The Bangladesh Shilpa Bank (Amendment) Ordinance, 1986, The Bangladesh Shilpa Rin Sangstha (Amendment) Ordinance, 1986. The Building Construction (Amendment) Ordinance, 1986,[২৬] এ বিষয়ে মাননীয় বিরোধী দলীয় সদস্য জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, এই তিনটি অর্ডিন্যান্স আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি যখন সংসদ সমন করেন, তার পর করা হয়েছে—এটা অবৈধ।[২৭] এর বিপরীতে মাননীয় মন্ত্রী জনাব ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ বলেন, যেহেতু এই বিলগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এইগুলো আনার প্রয়োজনীয়তা দেশের প্রেক্ষাপটে দরকার ছিল, সেজন্য পার্লামেন্ট আহ্বানের পরও এই বিলগুলো কার্যকর করার জন্য আনা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু যে কোনো বিল, অর্ডিন্যান্স ৩০ দিনের মধ্যে পার্লামেন্টে পাস করতে হবে, সেজন্য আজকে প্রথম দিনেই আমরা এগুলো উপস্থাপন করছি এবং এই পার্লামেন্ট চলাকালীন ৩০ দিনের মধ্যে এই অর্ডিন্যান্সগুলো পাস করার জন্য আমরা এই হাউসে প্রস্তাব রেখেছি।[২৮]

মির্জা সুলতান রাজা (বিরোধী দলীয় সদস্য) বলেন, সংসদের অধিবেশনের অনুপস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশের বলে আইন সংশোধন বা আইন জারি করতে পারেন। কিন্তু ক্ষমতার এই ধরনের প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত নয়। যেখানে দেশে একটা পার্লামেন্ট আছে এবং ৩০ থেকে ৪০ দিনের মধ্যে একটা পার্লামেন্ট বসবে, এবং

যেহেতু ঐ অর্ডিন্যান্স জারি করার সময়ে এমন কোনো পরিস্থিতি ঘটেনি, যা জারি না করলেও চলত না। একটা দেশের পার্লামেন্ট থাকলে সেই পার্লামেন্টকে এভাবে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে এই ধরনের আইন সংশোধন এবং আইন জারি করার মধ্য দিয়ে একটা জিনিস প্রমাণিত হয় যে, দেশের সরকারের গণতন্ত্র এবং পার্লামেন্টের উপর কতটুকু শ্রদ্ধা আছে। আমি অনুরোধ জানাবো যে, পার্লামেন্ট থাকা অবস্থায় এইভাবে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে আইনকে সংশোধন করার মধ্য দিয়ে বিশ্বের কাছে এই পার্লামেন্টকে হেয় না করাই বাঞ্ছনীয়।[২৯]

চতুর্থ পার্লামেন্টে অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন

৩ মার্চ ১৯৮৮ নির্বাচিত বাংলাদেশের চতুর্থ পার্লামেন্ট[৩০] ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ ভেঙে দেওয়া হয়।[৩১] এই সময়কালে পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতিক শাসন ব্যবস্থার অধীনে কর্মরত থেকে সাতটি অধিবেশনে ১৬৮টি কার্যদিবসে ৮০৫ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে।[৩২]

সারণি ৪
চতুর্থ পার্লামেন্ট কর্তৃক পাসকৃত আইনে অধ্যাদেশের পরিসংখ্যান

অধিবেশন	সংসদে উত্থাপিত বিলের সংখ্যা	সংসদে পাসকৃত বিলের সংখ্যা	সংসদে অধ্যাদেশ থেকে পাসকৃত আইন
প্রথম অধিবেশন ২৫.৪.'৮৮-১১.৭.'৮৮	৩৯	৩৮	৩৩
দ্বিতীয় অধিবেশন ১৬.১০.'৮৮-১৯.১০.'৮৮	৭	৭	৭
তৃতীয় অধিবেশন ১.২.'৮৯-২.৩.'৮৯	২১	২১	৯
চতুর্থ অধিবেশন ২২.৫.'৮৯-১০.৭.'৮৯	১৮	১৭	৪
পঞ্চম অধিবেশন ৪.১.'৯০-৮.২.'৯০	২৯	২৯	২৬
ষষ্ঠ অধিবেশন ৩.৬.'৯০-১.৮.'৯০	৩০	৩০	১০
সপ্তম অধিবেশন ২৫.৮.'৯০	-	-	-
মোট	১৪৪	১৪২	৮৯

উৎস: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ চতুর্থ জাতীয় সংসদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম (১৯৮৮-১৯৯০) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ; Md. Abdul Halim, Constitution, Constitutional Law and Politics: Bangladesh Perspective-A Comparative Study of Problems of Constitutionalism in Bangladesh (Dhaka: Rico Printers, 1998), p. 234.

চতুর্থ পার্লামেন্টে মোট ১৫৩টি সাধারণ বিলের নোটিশের মধ্যে ১৪৪টি মহান সংসদে উত্থাপনের জন্য জনাব স্পিকার কর্তৃক গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাবগুলোই সংসদে উত্থাপিত হয় এবং ১৪২টি সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়। যার মধ্যে ৫৩টি ছিল মৌলিক এবং ৮৯ টি ছিল অধ্যাদেশ। চতুর্থ পার্লামেন্ট আমলে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৯২টি অধ্যাদেশ জারি করেন। তন্মধ্যে ৯১টি অধ্যাদেশ অনুমোদনের জন্য বিল আকারে সংসদে উত্থাপিত হয়। এর মধ্যে ২টি অধ্যাদেশ অনিষ্পন্ন থেকে যায়। অর্থাৎ সংবিধানের বিধানানুযায়ী অধ্যাদেশগুলো আইনের মর্যাদা হারায়। ৮৯টি অধ্যাদেশ সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়।[৩৩]

অধ্যাদেশ জারির সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রপতি সংসদকে অবমূল্যায়ন করে জরুরি নয় এমন গুরুত্বহীন বিষয়েও অধ্যাদেশ জারি করেন, যেমন-The Supreme Court Judges Remuneration and Privileges (Amendment) Ordinance, 1987, The President's Pension (Amendment) Ordinance, 1987,

The Minister's, Minister's of State and Deputy Minister's Remuneration & Privileges Ordinance, 1988, The Prime Minister's Remuneration & Privileges (Amendment) Ordinance, 1988, The Vice-President Remuneration & Privileges (Amendment) Ordinance, 1988, উপ-প্রধানমন্ত্রীর পারিশ্রমিক ও বিশেষ অধিকার (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৮ উল্লেখ করা যায়। এভাবে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধির কঠোর সমালোচনা করে বিরোধী দলীয় সাংসদ জনাব শাহজাহান সিরাজ বলেন, সংসদ নেতা, মাননীয় মন্ত্রী যেভাবে প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীদের ঐচ্ছিক মঞ্জুরি বৃদ্ধির প্রস্তাব এনেছেন তাতে মনে হয়, কালকে হয়তো আমাদের সংসদ সদস্যদের জন্যও ঐচ্ছিক কোনো মঞ্জুরির ব্যবস্থা করা হবে। এর পরে যারা সংসদের দর্শক আছেন, তাদেরও হয়তো একটা ব্যবস্থা করা হবে।[৩৪] জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম বলেন, সংসদের কার্যক্ষমতা দিন দিন যেভাবে কমে যাচ্ছে, তাতে দিন দিন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং প্রেসিডেন্টের আনুতোষিক ভাতা এবং পেনশন ইত্যাদি যেভাবে বৃদ্ধি করা হচ্ছে, আমার মনে হয়, মাননীয় স্পিকার এসবের কোনো যুক্তি নেই। আর্থিক শক্তি না বাড়িয়ে সংসদের শক্তি বাড়ানোর জন্য প্রস্তাব রাখছি।[৩৫] এমনকি, পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু করার পূর্বে ও পরেও অধ্যাদেশ জারি করার নজির পরিলক্ষিত হয়। এই অধিবেশনের বিলগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সাধারণ বা মৌলিক বিল অপেক্ষা অধ্যাদেশের পরিমাণই ছিল বেশি। অধ্যাদেশগুলো বিল আকারে সংসদে উত্থাপন করে সংসদের অনুমোদন চেয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ বিলগুলো পাস করার তাগিদ প্রদান করেন। এবং দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সরকার অনায়াসে উক্ত অধ্যাদেশগুলোকে সংসদে বৈধ করে নেয়।[৩৬]

পঞ্চম পার্লামেন্টে অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন

পঞ্চম পার্লামেন্ট ৫ এপ্রিল ১৯৯১ থেকে ১৮ নভেম্বর ১৯৯৫ পর্যন্ত ২২টি অধিবেশনে মোট ৪০০ (সরকারি ৩৩৩+বেসরকারি ৬৭) কার্যদিবসে ১৮৩৪.১২ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে।[৩৭]

সারণি ৫

পঞ্চম পার্লামেন্ট কর্তৃক পাসকৃত আইনে অধ্যাদেশের পরিসংখ্যান

অধিবেশন	সংসদে উত্থাপিত বিলের সংখ্যা	সংসদে পাসকৃত বিলের সংখ্যা	সংসদে অধ্যাদেশ থেকে পাসকৃত আইন
প্রথম অধিবেশন ৫.৪.১৯৯১-১৫.৫.'৯১	২৩	১৮	১৮
দ্বিতীয় অধিবেশন ১.৬.'৯১-১৪.৮.'৯১	১১	১০	১০
তৃতীয় অধিবেশন ১২.১০.'৯১-৫.১১.'৯১	১১	৪	২
চতুর্থ অধিবেশন ১.৪.'৯২-১৮.২.'৯২	১৩	১৮	১৬
পঞ্চম অধিবেশন ১২.৪.'৯২-১৯.৪.'৯২	১	-	-
ষষ্ঠ অধিবেশন ১৮.৬.'৯২-১৩.৮.'৯২	২৬	১৮	৪
সপ্তম অধিবেশন ১১.১০.'৯২-৬.১১.'৯২	১৪	১৮	৪
অষ্টম অধিবেশন ৩.১.'৯৩-১১.৩.'৯৩	১০	১২	৪
নবম অধিবেশন ৯.৫.'৯৩-১৩.৫.'৯৩	৪	-	-
দশম অধিবেশন ৬.৬.'৯৩-১৫.৭.'৯৩	৯	৯	৩
একাদশ অধিবেশন ১২.৯.'৯৩-২৭.৯.'৯৩	৪	৬	৪
দ্বাদশ অধিবেশন ২১.১১.'৯৩-৮.১২.'৯৩	৫	৭	৪
ত্রয়োদশ অধিবেশন ৫.২.'৯৪-৭.৩.'৯৪	৬	২	২
চতুর্দশ অধিবেশন ৪.৫.'৯৪-১২.৫.'৯৪	২	৬	১
পঞ্চদশ অধিবেশন ৬.৬.'৯৪-১১.৭.'৯৪	৯	৭	-
ষোড়শ অধিবেশন ৩০.৮.'৯৪-১৪.৯.'৯৪	২	৪	-
সপ্তদশ অধিবেশন ১২.১১.'৯৪-৮.১২.'৯৪	৬	৭	১
অষ্টাদশ অধিবেশন ২৩.১.'৯৫-২৩.২.'৯৫	১১	৯	৩
উনিশতম অধিবেশন ২৪.৪.'৯৫-২৭.৪.'৯৫	২	১	১
বিশতম অধিবেশন ১৫.৬.'৯৫-১১.৭.'৯৫	৯	৮	১
একুশতম অধিবেশন ৬.৯.'৯৫-২৬.৯.'৯৫	৫	৮	২
বাইশতম অধিবেশন ১৫.১১.'৯৫-১৮.১১.'৯৫	১	১	-
মোট	১৮৪	১৭৩	৭১

উৎস: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম-বাইশতম (৫ এপ্রিল ১৯৯১ থেকে ১৮ নভেম্বর ১৯৯৫) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ; বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা ১-২২ (৫ এপ্রিল, ১৯৯১-১৫ মে, ১৯৯১); বিতর্ক, খণ্ড ২, সংখ্যা ১-৪৩ (১১ জুন, ১৯৯১-১৪ আগস্ট, ১৯৯১); বিতর্ক, খণ্ড ৩, সংখ্যা ১-১৪ (১২ অক্টোবর, ১৯৯১- ৫ নভেম্বর, ১৯৯১); বিতর্ক, খণ্ড ৪, সংখ্যা ১-২৭ (৪ জানুয়ারি, ১৯৯২-১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২); বিতর্ক, খণ্ড ৫, সংখ্যা-১-৬ (১২ এপ্রিল, ১৯৯২-১৯ এপ্রিল, ১৯৯২); বিতর্ক, খণ্ড ৬, সংখ্যা ১-৪১ (১৮ জুন ১৯৯২-১৩ আগস্ট ১৯৯২); বিতর্ক, খণ্ড ৭, সংখ্যা ১-২০ (১১ অক্টোবর ১৯৯২-৬ নভেম্বর ১৯৯২); বিতর্ক, খণ্ড ৮, সংখ্যা ১-৩২ (৩ জানুয়ারি ১৯৯২-১১ মার্চ ১৯৯৩); বিতর্ক, খণ্ড ৯, সংখ্যা ১-৫ (৯ মে ১৯৯৩-১৩ মে ১৯৯৩); বিতর্ক, খণ্ড ১০, সংখ্যা ১-৩১ (৬ জুন ১৯৯৩-১৫ জুলাই ১৯৯৩); বিতর্ক, খণ্ড ১১, সংখ্যা ১-১১ (১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩-২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩); বিতর্ক, খণ্ড ১২, সংখ্যা ১-১৪ (২১ নভেম্বর ১৯৯৩-৮ ডিসেম্বর ১৯৯৩); বিতর্ক, খণ্ড ১৩, সংখ্যা ১-১৯ (৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪-৭মার্চ ১৯৯৪); বিতর্ক, খণ্ড ১৫, সংখ্যা ১-২৫ (৬ জুন ১৯৯৪-১১ জুলাই ১৯৯৪); বিতর্ক, খণ্ড ২২, সংখ্যা ১-৩ (১৫ নভেম্বর ১৯৯৫-১৮ নভেম্বর ১৯৯৫)।

পঞ্চম পার্লামেন্টে সংসদীয় আমলে সর্বমোট ২২টি অধিবেশনে ২৭৮টি বিলের নোটিশ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সংসদে উত্থাপিত ১৮৪টি বিলের মধ্যে ১৭৩টি গৃহীত হয় এবং গৃহীত ১৭৩টি বিলের মধ্যে ১০২টি মৌলিক এবং ৭১টি অধ্যাদেশ। অধ্যাদেশগুলো ইতিপূর্বে আইন হিসেবে বলবৎ হয় এবং যা পরবর্তীতে শুধুমাত্র অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য সংসদে উত্থাপিত হয়।[৩৮]

অধ্যাদেশের সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রপতি যেসব গুরুত্বহীন বিষয়ে অধ্যাদেশ জারি করেন, সেগুলো হলো—The President's Remuneration and Privileges (Amendment) Ordinance, 1991, The Prime Minsters Remuneratin and Privileges (Amendment) Ordinance, 1991, The Speaker & Deputy Speaker's Remuneratin and Privileges (Amendment) Ordinance, 1991, The Minister's Minister's of State and Deputy Minister's Remuneration and Privileges (Amendment) Ordinance, 1991, The Supreme Court Judges Remuneration and Privileges (Amendment) Ordinance, 1991 ইত্যাদি।[৩৯]

এই ধরনের অধ্যাদেশ জারি করার ফলে বিরোধী দলের সংসদ সদস্যগণ সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। সংসদে বিরোধী দলীয় সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম বলেন, দেশবাসী যখন এক মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকটে নিমজ্জিত, কৃষক তার পাটের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম উর্ধ্বগতি, বাজারে চালের দাম ১০ টাকা কেজি, লবণের দাম ১০ টাকা, পিয়াজ ৫ টাকা, গ্রামগঞ্জে হাহাকার চলছে, অর্থনৈতিক সংকট মোচনের জন্য মানুষ শহরে ছুটছে, তাছাড়া উত্তরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছে। আজকে দৈনিক জনতা পত্রিকায় আছে যে, অভাবের তাড়নায় মা আসমা খাতুন তার সন্তানকে ৫ টাকায় বিক্রি করেছে। কি পরিস্থিতিতে মা তার সন্তানকে বিক্রি করতে পারে সেটা নিশ্চয়ই অনুধাবন করা যায়। এই পরিস্থিতিতে মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্পিকার বলেন, সংসদ সদস্য বলেন কারও বেতন ভাতা বৃদ্ধি করা উচিত নয় বলে আমি মনে করি। আর যদি এটা করি, তাহলে নিশ্চয়ই জনগণ আমাদের ঘৃণার চোখে দেখবেন।[৪০]

জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা দেওয়ার সময়ে যখন কুণ্ঠিত আর সেই রাষ্ট্রপতির বেতন-ভাতা বৃদ্ধির বেলায় দেখা যায় আবার খুবই উদার। আমি প্রথমেই নীতিগতভাবে আপত্তি করতে চাই যে, একজন রাষ্ট্রপতির বেতন বাড়ানোর জন্য একটি অর্ডিন্যান্স করতে হবে এবং এই অর্ডিন্যান্সকে ইফেক্ট দিতে হবে, এটাকে আর্টিকেল ৯৩-তে কি করে আমরা জাসটিফাই করতে পারি? এটা এতই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, তাঁর এখনই বেতন পেতে হবে এবং সেই বেতন বাড়িয়ে অর্ডিন্যান্স করে করতে হবে এই কথাটা বাংলাদেশের মানুষকে আমরা কি করে বোঝাব? অথচ পে-কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন করতে হয়, লড়াই করতে হয়, বুকের রক্ত দিতে হয়। এবং তার জন্য আমাদের বাহাদুর মন্ত্রীদের কত সময় নষ্ট করতে হয়। আজকে জনগণের নির্বাচিত একটা জনপ্রিয় সরকার যখন অর্ডিন্যান্স দিয়ে নিজেদের বেতন বাড়ান আর সংসদ সদস্যদের জন্য বিল আনেন, অপরদিকে সরকারি কর্মচারীরা যখন তাদের বেতন

বৃদ্ধির জন্য লড়াই করে তখন লাঠি চার্জ করেন, তাকে গ্রেফতার করেন, তার রক্ত বের করে দেন। এর মধ্যে তো কোন সম্মতি দেওয়া যায় না। আমি আশা করবো যে, আর যেন কোনো দিন অর্ডিন্যান্স পাস করে বেতন বৃদ্ধির লজ্জাটা এই পার্লামেন্টে আমাদের ভোগ করতে না হয়। কারণ সংসদীয় সরকারে বিরোধী দল "is also the part of the Government." [৪১] বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেন, দলীয়করণের উদ্দেশ্য নিয়েই আজকে তড়িঘড়ি করে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদকে বাতিল করা হয়েছে।[৪২]

এমনকি পার্লামেন্টের অধিবেশন বসার অল্পদিন পূর্বেও সরকার গুরুত্বহীন বিষয়ে অধ্যাদেশ জারি করে, যেমন The Supreme Court Judges Leave and Pension and Privileges (Amendment) Ordinance, 1993. বিলটি পার্লামেন্টে উত্থাপনের পর পরই জনাব সুধাংশু শেখর হালদার বলেন ১৫ দিন আগে প্রেসিডেন্ট সাহেব কি পেলেন যাতে এই দেশের অর্থনীতি ভেঙে শেষ হয়ে যাচ্ছিল, যার জন্য এই অধ্যাদেশ করতে হয়েছিল। পার্লামেন্ট ডাকার ২/১ দিন আগে এই অধ্যাদেশ করেন যা কখনই যুক্তিযুক্ত নয়।[৪৩]

জনাব অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী বলেন, যে মুহূর্তে আমরা সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার পথ শুরু করেছি ঠিক সেই মুহূর্তে অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীবর্গের পারিতোষিক ও ভাতা বৃদ্ধির বিল পাসের যে চেষ্টা চলছে তা মোটেও ঠিক নয়।[৪৪]

মূল্যায়ন

আমরা জানি অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করা আইনের শাসনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কারণ অধ্যাদেশের মাধ্যমে যে আইন তৈরি হয় সেগুলো যদিও পার্লামেন্টে সাধারণ বিল আকারে উত্থাপিত হয় কিন্তু তাতে অন্যান্য সাধারণ বিলের ন্যায় পর্যাপ্ত আলোচনা হয় না; দফাওয়ারি আলোচনা হয় না। এক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো হয় যে, যেহেতু অধ্যাদেশটি ইতিপূর্বে জারি করে তা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে, সুতরাং তার উপর বিস্তারিত বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। যেহেতু বিতর্ক হয় না সেহেতু অগণতান্ত্রিক বিধান থাকলে তা দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। তাছাড়া অধ্যাদেশগুলোকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংবিধানে ৩০ দিনের মধ্যে বিল পাস করানোর বাস্তব কারণ রয়েছে, এ কারণেই সরকার একই অধিবেশনে পর্যাপ্ত আলোচনা ছাড়াই দ্রুত গতিতে বিল পাস করে নেয়। এভাবে বাংলাদেশে একদিকে যেমন অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতাকে অপব্যবহার করা হচ্ছে এবং অন্যদিকে আইন প্রণয়নকারী সংস্থা হিসেবে সংসদ তার গুরুত্ব ও মর্যাদা বহুলাংশে হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আইনের শাসনের পথ উন্মুক্ত করে আইন পাস করা অতীব জরুরি। কারণ এই প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত পার্লামেন্ট পর্যাপ্ত বিতর্কের পর আইন পাস করে। একটি সাধারণ বিল সংসদে উত্থাপিত হওয়ার পর তার উপর পর্যাপ্ত বিতর্ক হয়; প্রয়োজনে কমিটি পর্যায়ে যায়, ফলে বিলটিতে কোনো অগণতান্ত্রিক বিধান থাকলে তা দূরীভূত হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে গণতান্ত্রিকভাবে বিলটি আইনে পরিণতি লাভ করে। এভাবে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত হলে সেখানে সংসদরা যেমন তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করতে পারেন অন্যদিকে জনগণও বিল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। ফলে পাসকৃত বিলগুলো নিখুঁত ও উন্নত হয় এবং এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

যখন সংসদ ভেঙে যাওয়া অবস্থায় থাকে; এবং যখন সংসদ জীবিত আছে কিন্তু অধিবেশনে নেই এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে, তাহলে তিনি যেরূপ প্রয়োজন মনে করবেন সেরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন করতে পারবেন। অর্থাৎ অধ্যাদেশ প্রণয়ন করার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং আদালত এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন তুলতে পারবে না। এই ধরনের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে প্রদান করা হয় শুধুমাত্র জরুরি কালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে অধ্যাদেশ জারি করার পূর্বে অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন আইনটি যেন অগণতান্ত্রিক না হয়। অধ্যাদেশ প্রণয়নের বিষয়টি পুরোপুরি রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর ছেড়ে না দিয়ে সংবিধানে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু বিধান রাখা অধিকতর গণতান্ত্রিক বলে গণ্য হবে। যা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার অবমাননা বা ক্ষমতাকে অর্থহীন করারও কোনো সুযোগ থাকবে না।

কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করবেন, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা সংবিধানে নেই। ফলে রাষ্ট্রপতি সংসদ অধিবেশন না থাকাকালীন সময়ে জরুরি অবস্থায় উদ্ভব হয়নি এমন পরিস্থিতিকেও জরুরি বলে স্বেচ্ছায় অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। এ কারণে দেখা যায় সংসদের প্রতি দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপতি একাধিক অধ্যাদেশ প্রণয়ন করেন, যা নির্বাহী বিভাগের দৈনন্দিন কার্যে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য কোন কোন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করবেন সংবিধানে তার সুস্পষ্ট বিধান থাকা বাঞ্ছনীয়। যাতে রাষ্ট্রপতি সংবিধান-সম্মতভাবে ক্ষমতা চর্চা করতে পারেন।

বাংলাদেশে অধ্যাদেশের মাধ্যমে যত আইন প্রণীত হয়েছে, তার অধিকাংশ আইনই হয়েছে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য নয় বরং দলীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, দলের স্বার্থকে প্রতিষ্ঠা করা অথবা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য অগণতান্ত্রিক আইনগুলো পাস করে নেয়। কিন্তু সংসদে সাধারণ পদ্ধতির মাধ্যমে এরূপ আইন পাস করতে হলে তুমুল বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং এই অবস্থা থেকে অব্যাহতির জন্য সরকার অগণতান্ত্রিক আইনগুলো অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রণয়ন করে থাকে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রণীত আইনটি গণতান্ত্রিক কি অগণতান্ত্রিক সেটা বড় কথা নয়; আসল কথা হলো সংসদকে পাশ কাটিয়ে আইন তৈরি করা। সংসদের সাধারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিকভাবে যে আইনটি তৈরি হতে পারে, সেই আইনটি গোপনে তৈরি করে তার কার্যকারিতা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সংসদকে রাবার স্ট্যাম্প কর্তৃপক্ষ বানিয়ে তার বৈধতা অনুমোদন করে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে জরুরি পরিস্থিতির নামে দলীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, দলের স্বার্থকে প্রতিষ্ঠা অথবা ক্ষমতায় টিকে থাকার হীনমনোবৃত্তি পরিত্যাগ করে জাতীয় সংসদকে সমস্ত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেই এ অবস্থা থেকে উত্তরণ সম্ভব।

জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অধ্যাদেশ প্রণয়ন করেন। অধ্যাদেশসমূহ অনুমোদনের জন্য সংসদের পরবর্তী প্রথম বৈঠকে উপস্থাপিত হয়। সংসদে উপস্থাপনের অর্থ হলো প্রথম পর্যায়ে সদস্যদেরকে অধ্যাদেশের কপি দেওয়া তথা সংসদকে অবহিত করা। দ্বিতীয় পর্যায়ে উপস্থাপনের পর সরকার যে অধ্যাদেশগুলো আইনে পরিণত করতে চায় সেগুলোর প্রতিটির ব্যাপারে বিলের নোটিশ দিতে হয় এবং নোটিশের ভিত্তিতে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সেগুলোকে বিল আকারে সংসদে উত্থাপন করেন। এর পরে অন্যান্য স্বাভাবিক বিলের ন্যায় এগুলোর উপর কখনো আলোচনা হয় আবার কখনো আলোচনা ছাড়াই আইনে পরিণত হয়। তাছাড়া অধ্যাদেশগুলো কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংবিধানে ৩০ দিনের মধ্যে বিল পাস করানোর বাস্তব কারণ রয়েছে; অন্যথায় ৩০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এর কার্যকারিতা লোপ পাবে। তার অর্থ এই নয় যে, ৩০ দিনের মধ্যে অধ্যাদেশের অনুরূপ বিল সংসদে পাস হতেই হবে; বরং উক্ত সময়ের মধ্যে উত্থাপিত হলেই চলবে। ৩০ দিন পরে অধ্যাদেশ বলে কিছু থাকবে না। অধ্যাদেশ থেকে উত্থাপিত বিলটি শুধুমাত্র একটি বিল আকারে অনিষ্পন্ন থেকে যেতে পারে এবং পরবর্তীতে যে কোনো অধিবেশনে তা পাস হতে পারে। ৩০ দিন পরে যেহেতু অধ্যাদেশের কোনো কার্যকারিতা থাকে না, এই অজুহাতে সরকার তড়িঘড়ি করে বিতর্কের সুযোগ না দিয়ে উত্থাপিত বিলগুলো চলতি অধিবেশনে পাস করে নেয়। যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এক্ষেত্রে উত্থাপিত বিলগুলোর উপর সংসদে পর্যাপ্ত আলাপ আলোচনার বিধান থাকা বাঞ্ছনীয়।

আইন পরিষদ অধিবেশনে নেই অথবা আইন পরিষদকে বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে এরূপ ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে যে, আইন প্রণয়ন একান্ত জরুরি এক্ষেত্রে আইন পরিষদের অনুমোদন ব্যতীত প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন যাতে করা যায়, সেজন্য সংবিধানে অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতার বিধান রাখা অগণতান্ত্রিক কিছু নয়। এবং রাষ্ট্রের এরূপ জরুরি পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য যে কোনো দেশের সংবিধানে এই বিধান রাখা যেতে পারে। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তা অধিকতর গণতান্ত্রিক করার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. যেহেতু সুপ্রিম কোর্টকে সংবিধানের অভিভাবক বলা হয় এবং পার্লামেন্ট কর্তৃক যে কোনো আইন প্রণয়ন এবং সংশোধনের বৈধতা যাচাইয়ের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টের রয়েছে, সেহেতু রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জারিকৃত যে কোনো অধ্যাদেশের বৈধতা যাচাই করার ক্ষমতা সর্বোচ্চ আদালতে থাকবে।

২. পার্লামেন্ট জীবিত আছে কিন্তু অধিবেশনে নেই এমনতাবস্থায় অধ্যাদেশ জারি করা অগণতান্ত্রিকতারই সামিল। কারণ এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে প্রেসিডেন্ট যে কোনো সময়ে পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় কোনো বিল আইনে পরিণত করতে পারেন।

৩. সংবিধানের ৭২(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদের এক অধিবেশনের সর্বশেষ বৈঠক ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ৬০ দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকবে না বলে যে বিধান উল্লেখ রয়েছে জাতীয় স্বার্থে তা কমিয়ে অনধিক ৩০ দিন রাখা হলে অধ্যাদেশ প্রণয়নজনিত সমস্যা থেকে অনেকটা অব্যাহতি পাওয়া যেতে পারে। কারণ ৬০ দিনের এই দীর্ঘ বিরতির সুযোগে অনেক সময়ে অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এক্ষেত্রে কোনো অধ্যাদেশ প্রণীত হবার পর তা আইনে পরিণত করার জন্য ১৫ দিনের মধ্যে পার্লামেন্টে উত্থাপন করতে হবে।

৪. সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী হয়ে থাকে। যেহেতু অধ্যাদেশ জাতীয় স্বার্থে জরুরি প্রয়োজনে করা হয় সেহেতু দেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হিসেবে শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির ভিত্তিতে অথবা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল অথবা অনুরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরামর্শক্রমে তা প্রণীত হতে পারে।

উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সংবিধানের যে সমস্ত অনুচ্ছেদ সংশোধন করা প্রয়োজন তা ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংশোধন করে তা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশ সংবিধানে জরুরি অবস্থার নামে অধ্যাদেশ প্রণয়নের যে বিধান রাখা হয়েছে তাতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অনেকটা সীমিত করা হয়েছে। সুতরাং এরূপ অগণতান্ত্রিক বিধান পরিবর্তন করতে না পারলে প্রতিটি সরকারই গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিনষ্ট করবে; বিরোধী দলের অধিকার খর্ব করবে ও ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তা প্রয়োগ করবে; আর মৌলিক অধিকারগুলো সরকারের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হবে।

তথ্যনির্দেশ

১ মোঃ রুহুল আমিন, "বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ : এর কার্যকারিতা (১৯৮৬-১৯৯৫)," অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ২০০১, পৃ. ১।

২ মোঃ আব্দুল হালিম, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ—বৃটিশ শাসন ব্যবস্থা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ* (ঢাকা: রিকো প্রিন্টার্স, ১৯৯৭), পৃ. ২২৮।

৩ Md. Abdul Halim, Constitution, Constitutional Law and Politics: Bangladesh Perspective- A Comparative Study of Problems of Constitutionalism in Bangladesh (Dhaka: Rico Printers, 1998), p. 229.

৪ মোঃ আব্দুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮।

৫ *The Constitution of the People's Republic of Bangladesh*, Dhaka, 1996, Article 93(1) (2) (3) (4), pp. 75-76.

৬ Md. Abdul Halim, *op.cit.*, p. 232; মোঃ আব্দুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৯।

৭ Md. Abdul Halim, *Ibid.*

৮. Aminur Rahman, "Bangladesh Parliament: Its Working 1973-1982," Unpublished Ph.D.

Thesis, Rajshahi University, Rajshahi 1996, p.143.
৯ Aminur Rahman, *op. cit.*, p.144.
১০. *Ibid.*, p. 145.
১১. *Ibid.*, p. 182.
১২. *Ibid.*, p. 145.
১৩ *Ibid.*
১৪. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বিতর্ক, খণ্ড ৩, সংখ্যা ১, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, পৃ. ২৪-২৬।
১৫. Aminur Rahman, *op.cit.*, p.192; বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ (খণ্ড ৮)।
১৬ Aminur Rahman, *op cit.*, p.194.
১৭ *Ibid.*
১৮. *Ibid.*
১৯. *Ibid.*, pp. 194-195.
২০. *Ibid*.
২১. Government of the People's Republic of Bangladesh, Election Commission, Report: Jatiya Sangsad Elections, 1996 (Dhaka, 1988).
২২. Khaleda Habib, *Bangladesh Elections, Parliament and the Cabinet 1970-91*, Dhaka, 1991, p. 84.
২৩ *Ibid.;* বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ তৃতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম (জুলাই, ১৯৮৬), দ্বিতীয় (নভেম্বর, ১৯৮৬), তৃতীয় (১৯৮৭) ও চতুর্থ (বাজেট, ১৯৮৭) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।
২৪. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ তৃতীয় জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের (নভেম্বর, ১৯৮৬) কার্যবাহের সারাংশ।
২৫. *তদেব।*
২৬ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ তৃতীয় জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের (১৯৮৭ সালের প্রথম) কার্যবাহের সারাংশ।
২৭. বিতর্ক, খণ্ড ৩, সংখ্যা ১, ২৪ জানুয়ারি, ১৯৮৭, পৃ. ৯।
২৮. *তদেব।*
২৯. বিতর্ক, খণ্ড ৪, সংখ্যা ২, ১৪ জুন, ১৯৮৭, পৃ. ১৬৪।
৩০. Government of the People's Republic of Bangladesh, Election Commission, Report: Jatiya Sangsad Elections, 1988 (Dhaka, 1991).
৩১. Khaleda Habib, *op.cit.*, p.99; Ahmad Ullah, *Fifth National Assembly Members Documentary Compilation*, Dhaka, 1992, pp. 30-31.
৩২. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ চতুর্থ জাতীয় সংসদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম (১৯৮৮-১৯৯০) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।
৩৩ মোঃ রুহুল আমিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫-২০৬।
৩৪. বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা ৬, ৫ মে, ১৯৮৮, পৃ. ২৬৭-২৬৮।
৩৫. বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা ৮, ৯ মে, ১৯৮৮, পৃ. ৪৫৪-৪৫৮।
৩৬ মোঃ রুহুল আমিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬।
৩৭ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম-বাইশতম (৫ এপ্রিল ১৯৯১ থেকে ১৮ নভেম্বর ১৯৯৫) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।
৩৮. মোঃ রুহুল আমিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৭।
৩৯. *তদেব।*
৪০. বিতর্ক, খণ্ড ৩, সংখ্যা ২, ১৩ অক্টোবর ১৯৯১, পৃ. ৬৩-৬৪।
৪১. তদেব, পৃ. ৬৭।
৪২. বিতর্ক, খণ্ড ৪, সংখ্যা ১১, ২৬ জানুয়ারি ১৯৯২, পৃ. ১৫১-১৫৬।
৪৩ বিতর্ক, খণ্ড ১১, সংখ্যা ১, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩, পৃ. ৪৮।
৪৪. বিতর্ক, খণ্ড ৩, সংখ্যা ১, ১২ অক্টোবর ১৯৯১, পৃ. ১৭-১৮।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ৯ম সংখ্যা ১৪০৮

বরেন্দ্র এলাকায় কৃষি আধুনিকীকরণ ও পরিবেশের উপর এর প্রভাব

মোঃ মাসুদ পারভেজ রানা
সৈয়দ রফিকুল আলম রুমী*

Abstract: Agriculture plays a vital role for the development of socio-economic conditions of Bangladesh. At present, agriculture has been improved a lot and gradually moving towards modernization. Since, almost all the people of this country depend on the supply of agricultural crops, it is inevitable to improve agriculture system and practice. It has been observed that agricultural development and environment are closely related. In this study the modernization of agriculture and its impact on environment of Barind Region has been analyzed. For the purpose both field level and secondary data have been used.

ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ। যার প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় এক হাজার লোক বসবাস করে। জনসংখ্যার এই ঘনত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মাথাপিছু জমির পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে আসছে। শিল্পে অনুন্নত এই দেশটির খাদ্য চাহিদা পূরণে একমাত্র কৃষির উপরই নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছে। প্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশের কৃষকরা প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে কৃষি কাজ করে আসছে। বিশ শতকের ষাটের দশকের পর থেকে জনসংখ্যার চাপ ও বিশ্বব্যাপী সবুজ বিপ্লবের ঢেউ এ দেশের কৃষি ব্যবস্থায় লাগতে থাকে। ফলে অধিক ফসল ফলাও স্লোগানের আওতায় এ দেশের কৃষি ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ হতে থাকে। কৃষি আধুনিকীকরণ ও উচ্চ ফলন কেবলমাত্র একটি প্রক্রিয়া দ্বারা সম্পন্ন হয় না, বরং কতকগুলি প্রক্রিয়া একত্রে একটির সাথে আর একটির সম্পর্কের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যেমন, কৃষি আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে যন্ত্রের ব্যবহার, আধুনিক সেচ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক এবং উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বীজ ব্যবহার ইত্যাদি।

আমরা জানি সকল মানবীয় কর্মকাণ্ড পরিবেশের কম-বেশি পরিবর্তন সাধন করে। শিল্প বিপ্লবের পর কল-কারখানা নানাভাবে রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণের মাধ্যমে পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তদ্রূপ কৃষির উন্নয়নের জন্যও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। এর জন্য কৃষির আধুনিকীকরণকে বিশেষভাবে দায়ী করা যায়। কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে মৃত্তিকার ক্ষয়কার্য সংঘটিত হয়, যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। এছাড়া বায়ু ও পানি দূষণ উল্লেখযোগ্য। অধিকহারে সেচ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলেও পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে পানি দূষণ ও মৃত্তিকা দূষণ হয়ে থাকে। ভূ-গর্ভস্থ পানির সাথে উঠে আসা আয়রন ও অন্যান্য ক্ষতিকারক পদার্থ মৃত্তিকার গুণাগুণকে মারাত্মকভাবে নষ্ট করে এবং উৎপাদন হ্রাস পায়। অন্যদিকে ভূ-গর্ভস্থ পানির অধিক ব্যবহার

* মোঃ মাসুদ পারভেজ রানা, এমফিল গবেষক,, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়;
ড. সৈয়দ রফিকুল আলম রুমী , প্রফেসর, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নামার জন্য দায়ী।

উৎপাদনশীলতার স্বাভাবিক মাত্রা বজায় রাখার জন্য কৃষকদেরকে রাসায়নিক উপকরণ, যেমন উর্বরতার জন্য সার এবং কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষার জন্য কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু রাসায়নিক উপকরণের পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনা না করেই ক্রমবর্ধমানহারে সেগুলোর যথেচ্ছ ব্যবহার করা হচ্ছে। এজন্য বাংলাদেশে সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যার মধ্যে কৃষিতে রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার অন্যতম। কিন্তু এই সমস্যা মোকাবেলার কোনো উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি এদেশে এখন পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে পরিবেশ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, সমন্বয় সাধন ও পরিকল্পনা প্রণয়নের কোনো ব্যবস্থা নেই। কৃষিকার্যে ব্যবহৃত জমির গুণাগুণ রক্ষার জন্য মৃত্তিকা জরিপ, গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণ পরামর্শ প্রয়োজন। কেননা, অতিমাত্রায় সার প্রয়োগ, একই ফসল বার বার চাষ ইত্যাদির কারণে মৃত্তিকার উর্বরা শক্তি হ্রাস পায়। এছাড়া শস্য বহুমুখীকরণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কীটনাশকের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। তাই এভাবে কৃষিতে রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকলে পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। সবুজ বিপ্লবের অংশ হিসাবে অধিক ফলনশীল বীজ উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই বীজের জন্য প্রয়োজন হয় রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও সেচ সুবিধা। কারণ, সংকর জাতের বীজের ফসলে পোকার আক্রমণ বেশি হয়। সংকর জাতের অধিক ফলনশীল বীজের ফসলে বেশি উৎপাদন পাওয়া গেলেও সে ফসলকে বাঁচাতে গেলে প্রয়োজন হয় প্রচুর কীটনাশক ও জলসেচ (ডেভিড উইয়ার ও মার্ক সাপিরো, ১৯৮৭)।

গবেষণার উদ্দেশ্য

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে: কৃষি আধুনিকীকরণের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত বিপর্যয় সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা। এই বিষয়কে সামনে রেখে নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ বিশ্লেষণের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে:

(১) কৃষি আধুনিকীকরণের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় রোধকল্পে কৃষকের প্রত্যক্ষণ পর্যালোচনা ও সচেতনতা সৃষ্টি ;
(২) গবেষণা এলাকার কৃষি আধুনিকীকরণ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা; এবং
(৩) কৃষি আধুনিকীকরণের ফলে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ করা।

গবেষণা এলাকা ও পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাপত্রটি সম্পন্ন করতে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে রাজশাহী জেলার মোহনপুর থানার তিনটি গ্রাম, গঙ্গাপাড়া, মোল্লাডাঙ্গী ও নন্দনহাট, নির্বাচন করা হয়েছে। গঙ্গাপাড়া, মোল্লাডাঙ্গী ও নন্দনহাট গ্রামের যথাক্রমে ৬০, ১২০ ও ৬০ জন কৃষকের নিকট থেকে ১৯৯৯-২০০১ সালের বিভিন্ন সময়ে পর্যবেক্ষণ ও প্রশ্নপত্র জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণাপত্রটিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্যাবলিও ব্যবহার করা হয়েছে যেমন, সরকারি প্রকাশনা, গবেষণা পত্র, পুস্তক, জার্নাল ইত্যাদি । সংগৃহীত তথ্যাবলি সম্পাদনা ও পরিমার্জনের পর সারণিবদ্ধ করে সাধারণ গাণিতিক ও পরিসাংখ্যিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

কৃষি আধুনিকীকরণ

কৃষি আধুনিকীকরণ বলতে আধুনিক বা বিজ্ঞানসম্মত কৃষি ব্যবস্থাকে বুঝায়। বিজ্ঞানসম্মত কৃষি ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, কৃষিক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে উৎপাদিত উফশী বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার। কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সর্বোপরি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সনাতন চাষ ব্যবস্থার বদলে আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। ঐতিহাসিকভাবে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন। সাম্প্রতিক ইতিহাসে কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের সবচেয়ে চমকপ্রদ পরিণতি হচ্ছে 'সবুজ বিপ্লব', যা মেক্সিকো এবং ফিলিপাইনের আন্তর্জাতিক কৃষি কেন্দ্রসমূহে জাতীয় কৃষি কর্মসূচির সহযোগিতায় উফশী এবং ভিন্ন ভিন্নভাবে উন্নত বিভিন্ন জাতের গম ও চাউল উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে (ইয়াসমীন, ১৯৯৫)। বিজ্ঞানের এইরূপ

আশীর্বাদ বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে না পৌঁছালেও দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বরেন্দ্র এলাকায় উল্লেখযোগ্যভাবে কৃষির আধুনিকীকরণ লক্ষ করা যায়। গবেষণা এলাকায় ফসল চাষাবাদের জন্য কৃষি উপকরণ হিসাবে ট্রাক্টরের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে কৃষকেরা সনাতন পদ্ধতি ছেড়ে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু করেছে। এছাড়া, আধুনিক সেচ, রাসায়নিক উপকরণ ও উফশী বীজ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্চে।

আধুনিক সেচ পদ্ধতি

কৃষি ক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সত্তর দশকের শুরু থেকে এ দেশে এল. এল. পি. (Low Lift Pump), অগভীর নলকূপ (Shallow Tubewell) এবং গভীর নলকূপ (Deep Tubewell) ইত্যাদির ব্যবহার শুরু হয় (Rahman, 1997)। গবেষণা এলাকায় কৃষকদের মাঝে সেচ ব্যবস্থা হিসাবে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার ব্যাপক। ১৯৯৬-'৯৭ এবং ১৯৯৭-'৯৮ অর্থবৎসরে মোহনপুর থানায় মোট আবাদি জমির সেচকৃত জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৩.৭৫% এবং ৮৭.৪৬%। সারণি ১-এ মোহনপুর থানায় ব্যবহৃত বিভিন্ন সেচ পদ্ধতি এবং তাদের সংখ্যা, আওতায় জমির পরিমাণ এবং সেচকৃত মোট জমির শতকরা হার দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৬-'৯৭ এবং ১৯৯৭-'৯৮ অর্থবৎসরে বোরো ধান, গম, আলু ও ভুট্টার আবাদকৃত জমির সবটুকুই ছিল আধুনিক সেচ পদ্ধতির আওতায় (থানা কৃষি অফিস, মোহনপুর)।

সারণি ১
মোহনপুর থানায় আধুনিক সেচ পদ্ধতি

সেচ পদ্ধতি	১৯৯৬-'৯৭			১৯৯৭-'৯৮		
	সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একর)	সেচকৃত জমির শতকরা হার	সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একর)	সেচকৃত জমির শতকরা হার
গভীর নলকূপ	২৪৫	৫৩৬৪	৫২.৪২	২৪৯	৩৬০০	৩২.৮২
অগভীর নলকূপ	৪৬৬	১৬৯৫	১৬.৫৬	২৭২	২৬১৫	২৩.৮৪
এল.এল.পি.	৭১৫	২৮৬০	২৭.৯৫	৬৮৫	৪৪৭২	৪০.৭৮
অন্যান্য	৩৩৫	৩১৩	৩.০৭	৪৩০	২৮০	২.৫৬
মোট	১৭৬১	১০২৩২	১০০	১৬৭৬	১০৯৬৭	১০০

উৎস: থানা কৃষি পরিসংখ্যান অফিস, মোহনপুর।

রাসায়নিক উপকরণ

কৃষি আধুনিকীকরণের সাথে সাথে রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ শতকের ষাটের দশক থেকে রাসায়নিক উপকরণের (সার, কীটনাশক ইত্যাদি) ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার কৃষিকর্মে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে বিবেচিত। সেই সঙ্গে গোবর সার ও সনাতন পদ্ধতিতে তৈরি অন্যান্য দেশজ সারের (কচুরিপানা, আবর্জনা ও পাতা পঁচা ইত্যাদি) ব্যবহার অনেক হ্রাস পেয়েছে (হোসেন ও ইমাম, ১৯৯৬)।

কৃষিকার্যে রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহৃত হয় মূলত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হিসাবে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অতিরিক্ত খাদ্য চাহিদা পূরণার্থে ভূমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। এ পর্যায়ে বাংলাদেশে কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি অকল্পনীয়। বরং আবাসস্থান বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষি জমির পরিমাণই অনেক হ্রাস পাচ্ছে। তাই ভূমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও প্রগাঢ় চাষ ব্যতিরেকে খাদ্য চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে না। আর এজন্যই কৃষিতে রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে কৃষির আধুনিকায়ন ও প্রকৌশলগত উন্নয়ন এবং রাসায়নিক উপকরণের সহজলভ্যতার ফলে সারের ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে দেশে গবাদি পশুর সংখ্যা কমে যাওয়ায় এবং ঝরে পড়া পাতা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় জৈব সারের প্রবল ঘাটতি দেখা দিয়েছে, ফলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বাড়ছে (ইসলাম, ১৯৯২)। কৃষি জমির প্রগাঢ় ব্যবহার ও একই শস্য বারবার চাষের কারণে ভূমির উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। এ কারণে কৃষক

রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। এছাড়া কীটপতঙ্গের মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ফসল রক্ষার জন্য কৃষক রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার করে। চাষাবাদের ধরন পরিবর্তনের কারণে রাসায়নিক উপকরণ

সারণি ২

কীটনাশকের প্রকারভেদ এবং স্থায়িত্বকাল

প্রকারভেদ	উদাহরণ	স্থায়িত্বকাল
নাইট্রোজেন যৌগিক	ড্রিমেটান, ডিলান,আইসোলান	কয়েক দিন
সালফার যৌগিক	থাইয়োসিয়ানেট, কার্বন ডাই সালফাইড, ইথাইলিন ডাইব্রোমাইড	কয়েক দিন
প্রাকৃতিক জৈব	রোটেনন রোটেনন পাইরিথ্রাম	২ ঘন্টা ১০০°c তাপে ৩০ ঘন্টা ৪০°c তাপে কয়েক দিন
অরগানোফসফরাস	ফসড্রিন প্যারাথিয়ন মেরাথিয়ন, এজাড্রিন, ডায়াজিনন	২৪ ঘন্টা ৩০ দিন ১-১২ বৎসর
কৃত্রিম জৈব অরগানোক্লোরিন	ডিডিটি, ডিডিডি, এলড্রিন, ডায়ালড্রিন, হেপ্টাক্লোর প্রভৃতি	২-১৫ বৎসর

উৎস: মালেক, ১৯৯৫

সারণি ৩

বাংলাদেশে রাসায়নিক সারের ব্যবহার

ব্যবহারের সময়	পরিমাণ (টন)	বাৎসরিক বৃদ্ধি হার*
১৯৭১-৭২	২৪৩৮৪২	--
১৯৭৪-৭৫	২৭৯৫৬৯	৪.৮৮ %
১৯৭৯-৮০	৮৪১৯৮৬	৪০.২৩ %
১৯৮৪-৮৫	১২৬০২২১	৯.৯৩ %
১৯৮৯-৯০	২০৪৩১৭৬	১২.৪২ %
১৯৯৪-৯৫	২৬৪০৬২০	৫.৮৪ %
১৯৯৮-১৯৯৯ (জুলাই '৯৮-মে '৯৯)	২৭০৪১৭১	০.৬০ %

উৎস: (১) *Yearbook of Agricultural Statistics of Bangladesh (1997 & 1998)*, BBS.
(২) Bangladesh Agricultural Development Corporation.

- শতকরা বৃদ্ধি হার ১৯৭১-৭২ সাল হতে হিসাব করা হয়েছে।

ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলার দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্চফলনশীল ধান চাষের ব্যবহার এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে তা অন্য ফসলের ক্রমসংকোচনকে ত্বরান্বিত করেছে (হোসেন ও ইমাম, ১৯৯৬)।

বাংলাদেশে প্রধানত তিন ধরনের রাসায়নিক সার উৎপাদিত হয়, যথা: ইউরিয়া, টি এস পি (ট্রিপল সুপার ফসফেট) এবং এমোনিয়াম সালফেট। বর্তমানে জিপসাম, গুটি ইউরিয়া প্রভৃতি নামে উন্নত মানের সার পাওয়া যায়। এছাড়া নানাপ্রকার কীটনাশকের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। সারণি ২-এ কীটনাশকের প্রকারভেদ এবং স্থায়িত্বকাল দেখানো হলো।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে রাসায়নিক সারের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণি ৩) । বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে ১৯৭১-৭২ সালে রাসায়নিক সারের মোট ব্যবহার ছিল ২৪৩৮৪২ টন, যা বাৎসরিক ৪.৮৮ % হারে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭৪-৭৫ সালে হয় ২৭৯৫৬৯ টন। এর পরবর্তী পাঁচ বৎসরে রাসায়নিক সারের ব্যবহার ব্যাপক হারে (৪০.২৩ %) বৃদ্ধি পায় (সারণি ৩)। ১৯৭৫ সালের পরবর্তী সময়ে কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন দেশের সাহায্য এবং তৎকালীন খাল খনন কর্মসূচি কৃষকদের মাঝে রাসায়নিক সার ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি করে দেয়। ১৯৮০ সালের পর থেকে রাসায়নিক সার ব্যবহারের বৃদ্ধি হার হ্রাস পেলেও স্থিতিশীল অবস্থা লক্ষ করা যায়।

সারণি ৪

বাংলাদেশে কীটনাশক ব্যবহার

ব্যবহারের সময়	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	শতকরা বৃদ্ধি হার*
১৯৯৪	৭৮৫৮	-
১৯৯৫	৯১৪০	১৬.৩১
১৯৯৬	৯০৪১	১৬.৩১
১৯৯৭	১১৩৬৬	৪৪.৬৪
১৯৯৮	১১৬১০	৪৭.৭৫

উৎস: (১) *Yearbook of Agricultural Statistics of Bangladesh* (1997 & 1998), BBS.

* শতকরা বৃদ্ধি হার ১৯৯৪ সাল হতে হিসাব করা হয়েছে।

বাংলাদেশে কীটনাশকের ব্যবহার পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয় ১৯৫৭ সালে Plant Protection Department কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য তিন টন DDT এবং BHC আমদানির মাধ্যমে। ১৯৭৩ সালে এর পরিমাণ ১১ হাজার টনে উন্নীত হয়, কিন্তু ১৯৭৪ সালে তা ২ হাজারে নেমে আসে মূলত বিনামূল্যে বিতরণ নিষিদ্ধ করে ৫০ শতাংশ বিক্রয়মূল্য ধার্য করার কারণে। ১৯৭৯ সাল হতে কীটনাশক নিয়মিত মূল্যে বিক্রয় হচ্ছে (রহমান, ২০০০)। এর পর থেকে কীটনাশকের ব্যবহার উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯৪ সালে কীটনাশক ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৭৮৫৮ মেট্রিক টন। এবং ১৯৯৫ সালে এর ব্যবহারের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯১৪০ মেট্রিক টনে। পরবর্তী বৎসরগুলোতে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে কীটনাশক ব্যবহারের পরিমাণ ১১৬১০ মেট্রিক টন-এ পৌছায়। অর্থাৎ ১৯৯৪ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত কীটনাশক ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় শতকরা ৪৭.৭৫ ভাগ (সারণি ৪)।

পরিবেশে রাসায়নিক উপকরণের বিচরণ

পরিবেশের বিভিন্ন মাধ্যমে রাসায়নিক উপকরণসমূহ বিচরণ করে থাকে। কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক উপকরণসমূহ খাদ্যচক্রের মাধ্যমে প্রাণিজগৎ বিশেষত মানুষকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। রাসায়নিক উপকরণ জমির উপরিভাগে ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে তার অংশবিশেষ ভূ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ভূ-অভ্যন্তরস্থ পানি দূষিত করে। খাবার পানি হিসাবে এই পানি গ্রহণ করা হলে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় এবং রোগের সৃষ্টি করে। এছাড়া কৃষিভূমিতে কীটনাশক স্প্রে করার ফলে বায়ু ও পানি দূষিত হয়। বৃষ্টির পানির মাধ্যমে কীটনাশকের উপাদানসমূহ পুকুর, নদ-নদী ও অন্যান্য জলাভূমির পানিতে মিশে মাছ ও অন্যান্য প্রাণীর ক্ষতিসাধন করে। চিত্র ১-এ পরিবেশে রাসায়নিক উপকরণের বিচরণ দেখানো হয়েছে।

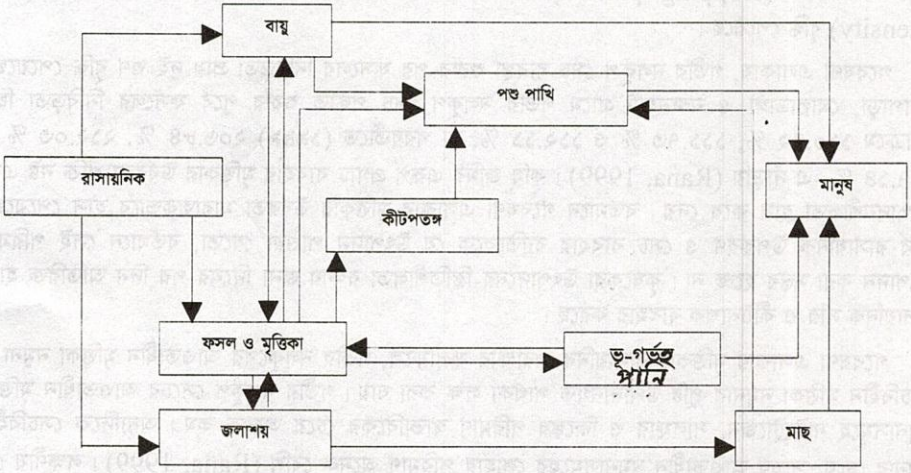

চিত্র ১ : পরিবেশে রাসায়নিক উপকরণের বিচরণ

উফশী বীজ

১৯৬৫-৬৬ সালে এশিয়ায় প্রথম উচ্চফলনশীল গম ও ধানের প্রচলন হয়। ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (IRRI) IR-8 ধানের ৫০ টন উফশী বীজ ফিলিপিন্স সরকারকে প্রদান করে এবং তা মূলত ভারত, পাকিস্তান ও ফিলিপিন্সে চাষ করা হয়। ১৯৭৫-৭৬ মৌসুমে ভারত ও মেক্সিকো থেকে চার হাজার টন উফশী বীজ আমদানি করা হয় (রহমান, ২০০০)। বর্তমানে বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BRRI) এদেশের উপযোগী উফশী বীজ উদ্ভাবনে যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

আধুনিক সেচ, রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার এবং উফশী বীজ অধিক উৎপাদন প্রাপ্তির জন্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল। কৃষি আধুনিকীকরণের পরিচায়ক হিসাবে উফশী বীজ অন্যতম। গবেষণা এলাকায় আধুনিক সেচ ও রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের সাথে সাথে উফশী বীজ ব্যবহারের পরিমাণ এবং গ্রহণযোগ্যতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে ধান উৎপাদনের জন্য উফশী বীজ ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। আবহাওয়া উপযোগী এবং অধিক ফলনশীল বলে এই সমস্ত বীজ কৃষকদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে এবং তারা সারা বৎসর এই সমস্ত বীজ ব্যবহার করছে।

কৃষি আধুনিকীকরণ ও পরিবেশ

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কৃষি আধুনিকীকরণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু গভীর উদ্বেগের বিষয় হলো, কৃষিতে আধুনিক উপকরণ ব্যবহার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথেষ্ট অবদান রাখলেও নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে (রহমান, ২০০০)। এদের মধ্যে কৃষি ভূমির অবনমন, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা, শুষ্ক মৌসুমে পানির দুষ্প্রাপ্যতা, জীব বৈচিত্র্য হ্রাস, স্বাস্থ্যগত সমস্যা ইত্যাদি অন্যতম।

আধুনিক সেচ ও পরিবেশ

আধুনিক সেচ ব্যবস্থা শুরুর পূর্বে গবেষণা এলাকায় আবাদযোগ্য জমির সবটাই ছিল একফসলি জমির অধীনে। আমন ধান ঘরে তোলার পর অধিকাংশ কৃষি জমিই পতিত থাকতো এবং পরবর্তী বর্ষা মৌসুমের জন্য অপেক্ষা করতে হতো। কিন্তু, বর্তমানে আবাদযোগ্য কোনো জমিই পতিত থাকে না। তাছাড়া ভূমি ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে ফসলের বিন্যাস (cropping pattern) পরিবর্তিত হয়েছে এবং ফসলের নিবিড়তাও (cropping intensity) বৃদ্ধি পেয়েছে।

গবেষণা এলাকায়, গভীর নলকূপ সেচ ব্যবস্থা শুরুর পর ফসলের নিবিড়তা প্রায় দুই গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গঙ্গাপাড়া, মোল্লাডাঙ্গী ও নন্দনহাট গ্রামে গভীর নলকূপ সেচ পদ্ধতি শুরুর পূর্বে ফসলের নিবিড়তা ছিল যথাক্রমে ১১০.৪২ %, ১১১.৭৩ % ও ১১২.১১ %, যা পরবর্তীতে (১৯৯৯) ২০৬.৮৪ %, ২১২.০৩ % ও ২১৭.১৪ % -এ দাঁড়ায় (Rana, 1999)। কৃষি জমির এরূপ প্রগাঢ় ব্যবহার মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি নষ্ট এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস করে দেয়। বর্তমানে গবেষণা এলাকার মৃত্তিকার উর্বরতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। পূর্বে রাসায়নিক উপকরণ ও সেচ ব্যবহার ব্যতিরেকে যে উৎপাদন পাওয়া যেতো, বর্তমানে সেই পরিমাণ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। কৃষকেরা উৎপাদনের স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য দিনের পর দিন অতিরিক্ত হারে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করছে।

গবেষণা এলাকার মৃত্তিকার রাসায়নিক পরীক্ষার ফলাফলে, গভীর নলকূপের আওতাধীন মৃত্তিকা নমুনা ও সেচবিহীন মৃত্তিকা নমুনার পুষ্টি উপাদানগত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। গভীর নলকূপ সেচের আওতাধীন মৃত্তিকা নমুনাসমূহে নাইট্রোজেন, সালফার ও জিঙ্কের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম। অন্যদিকে সেচবিহীন নমুনার চেয়ে সেচের আওতাধীন নমুনাসমূহের লোহার পরিমাণ অনেক বেশি (Rana, 1999)। লক্ষণীয় যে, সেচকৃত জমিগুলোতে মৃত্তিকার পুষ্টিমান অবনমিত হয়েছে। এরূপ অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে জমির উৎপাদনশীলতা মারাত্মকভাবে কমে যাবে।

আধুনিক সেচ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে গবেষণা এলাকার একটি অন্যতম পরিবেশগত সমস্যা হলো ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া। ভূগর্ভস্থ পানির অত্যধিক উত্তোলনের ফলে শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর অনেক নীচে নেমে যায়। এই সময়ে ভূগর্ভস্থ পানি, হাত নলকূপ ও অগভীর নলকূপের পানির দুষ্প্রাপ্যতা দেখা যায়। গবেষণা এলাকায়, ১৯৮৯ সালে গড় ভূগর্ভস্থ পানির গভীরতা ছিল ১৫.৭৬ ফুট, যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৮ সালে ২৩.৩৭ ফুট হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৮ সালের বন্যার কারণে ভূগর্ভস্থ পানির গভীরতা অপেক্ষাকৃতভাবে হ্রাস পায়। ক্রমাগত এরূপ বৃদ্ধি এক সময় ভূগর্ভস্থ পানির উত্তোলনযোগ্যতা হ্রাস করবে এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে দেবে।

রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার ও পরিবেশ

কৃষিতে রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের গুরত্বপূর্ণ ভূমিকার পাশাপাশি এর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাবও রয়েছে। এদের মধ্যে কৃষিতে রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের ফলে ভূমির অবনমন, স্বাস্থ্যগত সমস্যা, জীব বৈচিত্র্যের উপর প্রভাব উল্লেখযোগ্য। কৃষিতে রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের ফলে ভূমির প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কৃষি ভূমির পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে অন্তর্ভূমিতে অব্যাহতভাবে অক্সিজেনের অনুপস্থিতি, বিষাক্ত যৌগিক পদার্থ গঠনের মাধ্যমে মাটির উপাদানের রাসায়নিক পরিবর্তন, অব্যাহত পরিস্রাবণে ভূমির পুষ্টি উপাদান এবং জৈব পদার্থসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস পায়। ফলে কৃষি জমি ক্রমাগত উর্বরা শক্তি হারায় এবং কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায় (রহমান, ২০০০)। এছাড়া রাসায়নিক উপকরণের প্রভাবে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক অনুজীব ও অন্যান্য প্রাণীর জীবনহানি ঘটে।

প্রত্যাশিত কৃষি উৎপাদনের জন্য সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার বলতে মূলত ১: ১: ০.৫ (ইউরিয়া: ফসফেট: পটাশ) অনুপাতকে বুঝায়। কিন্তু বাংলাদেশে এ অনুপাতে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয় না। উল্লিখিত তিন প্রকার সারের প্রচলিত ব্যবহার মাত্রার ভিত্তিতে এ অনুপাতটি হল ১: ০.২৫: ০.১২, অর্থাৎ এদেশের কৃষক বেশি মাত্রায় ইউরিয়া সার ব্যবহার করছে (রহমান, ২০০০)। সমীক্ষিত এলাকায় প্রায় সকল কৃষকই কৃষিকাজে রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার করে। কিন্তু তাদের সিংহভাগেরই রাসায়নিক সার ব্যবহারের আদর্শ পরিমাণ সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই (সারণি ৫)। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে তারা রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের ফলে ভূমির অবনমন বা গুণগত পরিবর্তন হয় তা উপলব্ধি করা শুরু করেছে। তবে তারা এর পরেও রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের বিকল্প কিছু ভাবছে না। কারণ তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো অধিক উৎপাদনশীলতা রক্ষা করা। সারণি ৫-এ দেখা যাচ্ছে যে, গঙ্গাপাড়া, মোল্লাডাঙ্গী ও নন্দনহাট গ্রামে মোট উত্তরদাতার যথাক্রমে ৮৫%, ৬৬.৬৬% ও ৮০% কৃষকই মনে করেন রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, এবং যথাক্রমে ৭৫%, ৬৫%, ৭০% উত্তরদাতা মনে করেন রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের ফলে ভূমির দূষণ হয় এবং ভূমির উর্বরতা হ্রাস পায়। উত্তরদাতাদের মধ্যে অতি সামান্য অংশ রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার ও ভূমির অবনমন সংক্রান্ত প্রশ্নে 'না' বলেছে অথবা উত্তর দানে বিরত ছিল।

রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের ফলে নানা রকম স্বাস্থ্যগত সমস্যার সৃষ্টি হয়। শুধু ব্যবহারকারীই নয়, চাষাবাদে ব্যবহৃত গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণীর উপর এসব উপকরণের মারাত্মক প্রভাব রয়েছে। আমাদের খাদ্য আর পানিতে বিষ প্রবেশের এক সহজ উপায় হলো কীটনাশক ওষুধ (মুতী, ১৯৮৫)। কীটনাশকের অতি ক্ষুদ্রকণা পানিতে ভেসে অথবা বাতাসে উড়ে এক স্থান থেকে দূরবর্তী স্থানে যেতে সক্ষম। শুধু মানুষ নয় প্রাণীকুলও প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক গ্রহণ করে থাকে। প্রথমত, ছোট ছোট মাছ কীটনাশকের কণা খাদ্য হিসাবে নেয়। ঐ মাছকে যখন অন্য বড় মাছ খায় তখন কীটনাশকের কণা সেই বড় মাছের কোষে জমা হয়। আর মানুষ যখন সেই বড় মাছ খায় তখন অবশ্যই কীটনাশকের মারাত্মক অবশেষ তার শরীরে জমা হয় (ইসলাম, ১৯৯৮)। রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের নিয়মাবলি সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে স্বাস্থ্যগত সমস্যার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামীণ কৃষকদের নিরক্ষরতা এবং অবহেলার কারণে রাসায়নিক উপকরণের যথোপযুক্ত ব্যবহার দেখা যায় না।

সারণি ৫

রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার ও ভূমির অবনমন সংক্রান্ত মতামত

প্রশ্নের বিষয়	উত্তরের ধরন	গঙ্গাপাড়া	মোল্লাডাঙ্গী	নন্দনহাট
আপনি কি মনে করেন রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর?	হ্যাঁ	৫১ (৮৫%)	৮০ (৬৬.৬৬%)	৪৮ (৮০%)
	না	২ (৩.৩৩%)	১২ (১০%)	১ (১.৬৬%)
	উত্তর দেননি	৭ (১১.৬৭%)	২৮ (২৩.৩৪%)	১১ (১৮.৩৪%)
রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের ফলে ভূমির দূষণ হয় কিনা?	হ্যাঁ	৪৫ (৭৫%)	৭৮ (৬৫%)	৪২ (৭০%)
	না	৫ (৮.৩৩%)	১৫ (১২.৫০%)	৬ (১০%)
	উত্তর দেননি	১০ (১৬.৬৭%)	২৭ (২২.৫০%)	১২ (২০%)
আপনার কি রাসায়নিক সার ব্যবহারের আদর্শ পরিমাণ জানা আছে?	হ্যাঁ	৫ (৮.৩৩%)	১১ (৯.১৬%)	১২ (২০%)
	না	৪২ (৭০%)	৭২ (৬০%)	৩৫ (৫৮.৩৩%)
	উত্তর দেননি	১৩ (২১.৬৭%)	৩৭ (৩০.৮৪%)	১৩ (২১.৬৭%)
রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের ফলে ভূমির উর্বরতা হ্রাস পায় কিনা?	হ্যাঁ	৪৫ (৭৫%)	৭৮ (৬৫%)	৪২ (৭০%)
	না	৫ (৮.৩৩%)	১৫ (১২.৫০%)	৬ (১০%)
	উত্তর দেননি	১০ (১৬.৬৭%)	২৭ (২২.৫০%)	১২ (২০%)

উৎস: প্রশ্নপত্র জরিপ, ২০০০

রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদির প্যাকেটের গায়ে ব্যবহারবিধি লেখা থাকলেও এগুলোকে তদনুযায়ী ব্যবহার করা হয় না। রাসায়নিক উপকরণ স্প্রে করার সময়ে উপযুক্ত পোশাক, গ্লোভস ও মুখোশ ব্যবহার না করার কারণে ব্যবহারকারীর বিভন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গের মাধ্যমে শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ কে স্বাস্থ্যগত সমস্যা যেমন, হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা, চর্মরোগ ইত্যাদি সৃষ্টি করে। সারণি ৬ এ রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা সংক্রান্ত কৃষকের মতামত উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৬ হতে দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ কৃষকই রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। গঙ্গাপাড়া, মোল্লাডাঙ্গী ও নন্দনহাট গ্রামের নব্বই শতাংশেরও বেশি কৃষক নাক-মুখ, হাত-পা ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রতঙ্গ ভালভাবে না ঢেকে রাসায়নিক উপকরণ জমিতে সরবরাহ করে। রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের ফলে কোনো স্বাস্থ্যগত সমস্যা হয় কিনা প্রশ্ন করা হলে উক্ত গ্রামগুলির যথাক্রমে ৯৬.৬৭%, ৯৪.১৬% ও ৯৩.৩৩% কৃষক হ্যাঁ বোধক উত্তর দেয়। রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের পর হাত-পায়ে ঘা হয় । এছাড়া শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা হয় বলেও তারা মনে করে।

সারণি-৬

রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার ও স্বাস্থ্যগত সমস্যা সংক্রান্ত মতামত

প্রশ্নের বিষয়	উত্তরের ধরন	গঙ্গাপাড়া	মোল্লাডাঙ্গী	নন্দনহাট
রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের সময় হাত-পা, নাক-মুখ ঢাকেন কিনা?	হ্যাঁ	০ (০%)	২ (১.৬৬%)	২ (৩.৩৩%)
	না	৫৭ (৯৫%)	১১৩ (৯৪.১৬%)	৫৬ (৯৩.৩৩%)
	উত্তর দেইনি	৩ (৫%)	৫ (৪.১৮%)	২ (৩.৩৪%)
এ পর্যন্ত কোন স্বাস্থ্যগত সমস্যা হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	৫৮ (৯৬.৬৭%)	১১৩ (৯৪.১৬%)	৫৬ (৯৩.৩৩%)
	না	০ (০%)	২ (১.৬৬%)	২ (৩.৩৩%)
	উত্তর দেইনি	২ (৩.৩৩%)	৫ (৪.১৮%)	২ (৩.৩৩%)
রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের ফলে মৎস্য সম্পদ হ্রাস পেয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	৫২ (৮৬.৬৬%)	৯০ (৭৫%)	৪৯ (৮১.৬৬%)
	না	৩ (৫%)	১৮ (১৫%)	৪ (৬.৬৬%)
	উত্তর দেইনি	৫ (৮.৩৪%)	১২ (১০%)	৭ (১১.৬৮%)
রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের প্রভাব জীববৈচিত্র্যের উপর আছে কিনা?	হ্যাঁ	৩৯ (৬৫%)	৭৪ (৬১.৬৬%)	৩৫ (৫৮.৩৩%)
	না	৪ (৬.৬৭%)	১১ (৯.১৭%)	৩ (৫%)
	উত্তর দেইনি	১৭ (২৮.৩৩%)	৩৫ (২৯.১৭%)	২২ (৩৬.৬৭%)

উৎস : প্রশ্নপত্র জরিপ, ২০০০

রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের ফলে পানি দূষণ এবং মৎস্য সম্পদ হ্রাস উল্লেখযোগ্য সমস্যা বলে চিহ্নিত হয়েছে। জমিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদি অনেক সময়ে বৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদির মাধ্যমে জলাশয়, পুকুর, ডোবা, নদী প্রভৃতিতে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের অনিষ্ট সাধন করে (হোসেন ও ইমাম,১৯৯৬)। নদীর পানিতে এনড্রিনের ১.৪ পিপিবি মাত্রা তিন দিনের মধ্যে অর্ধেক পরিমাণ মাছের মৃত্যু হতে পারে। অধিকাংশ প্রজাতির মাছ কীটনাশকের ১ থেকে ১০ পিপিবি'র বেশি মাত্রায় বেঁচে থাকতে পারে না (ইসলাম, ১৯৯২)। কীটনাশকের প্রভাবে মাছের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়, ডিম ফোটানো এবং মাছের দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস পায়। বাংলাদেশে কীটনাশকের সিংহভাগই ব্যবহৃত হয় ধান ক্ষেতে। ধানের জমিতে পানি থাকার কারণে অনেক ছোট ছোট মাছ বিশেষত পুটি, শিং, কৈ, মাগুর, টাকি প্রভৃতি মাছ সেখানে ডিম ছাড়ে কিন্তু ইদানীং কীটনাশকের প্রভাবে মাছের বংশবৃদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে (সরকার, ১৯৯৪)। একসময়ে মোল্লাডাঙ্গী গ্রামের অধিবাসীরা বর্ষাকালে জলাভূমি ও বিল থেকে মাছ শিকার করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতো। কিন্তু বর্তমানে ঐ সমস্ত স্থানে মাছ পাওয়া যায় না বললেই চলে। এর ফলে আর্থিকভাবে তারা মারাত্মক ক্ষতির শিকার হয়েছে। সমীক্ষিত এলাকায় গঙ্গাপাড়া, মোল্লাডাঙ্গী ও নন্দনহাট গ্রামে যথাক্রমে ৮৬.৬৬%, ৭৫% ও ৮১.৬৬% কৃষক মনে করে মৎস্য সম্পদ হ্রাসের সাথে রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের সম্পর্ক রয়েছে (সারণি ৬)। মৎস্য সম্পদ হ্রাসের সাথে আর্থিক ক্ষতি যেমন সম্পর্কিত তেমনি আমিষ জাতীয় খাদ্য হিসাবে মাছের অভাবও উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ছোট জাতের মাছ পাওয়া দুষ্কর, যেগুলো স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী ।

প্রকৃতিতে জীব ও জড় পদার্থ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বেঁচে থাকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা প্রতিনিয়ত জীববৈচিত্র্যের নানারকম ক্ষতিসাধন করছি। কৃষিতে রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি সাধিত হয়। রাসায়নিক বিষক্রিয়ার ফলে মৃত্তিকা, বায়ু ও পানিতে বসবাসরত বিভিন্ন প্রাণী, অণুজীব ইত্যাদির অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। ফলে জীববৈচিত্র্যে মারাত্মক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে যা টেকসই পরিবেশের জন্য মোটেও কাম্য নয়। কীটনাশক ফসল ধ্বংসকারী পোকামাকড় বিনষ্ট করার সাথে সাথে উপকারী কীটপতঙ্গও বিনষ্ট করে থাকে। মৃত্তিকাস্থিত কেঁচো ও অন্যান্য অণুজীব উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক কীটনাশক কিন্তু এসব জীবেরও ক্ষতিসাধন করে। পানিতে কীটনাশকের পরিমাণ প্রথম অবস্থায় কম মনে হলেও খাদ্যচক্রের মাধ্যমে প্রাণিদেহে ক্রমে ক্রমে তা বিপজ্জনক মাত্রায় ঘনীভূত হতে থাকে। লক্ষণীয় যে, পাখির সংখ্যা যদি হ্রাস পায় তাহলে কীটপতঙ্গের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়; কারণ পাখিরা কীটপতঙ্গ খেয়ে বেঁচে থাকে। এছাড়া কীটনাশক ব্যবহারের সাথে সাথে অনেক কীটপতঙ্গের শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায়; ফলে অতি তীব্র মাত্রার কীটনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয়। সারণি ৬ এ উপস্থাপিত মতামত অনুসারে দেখা যায় যে, গঙ্গাপাড়া, মোল্লাডাঙ্গি ও নন্দনহাট গ্রামে যথাক্রমে ৬৫%, ৬১.৬৬% ও ৫৮.৩৩% উত্তরদাতা মনে করে রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহারের ফলে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হয়। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য পরিবেশগত প্রভাবের তুলনায় জীববৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধনের পক্ষে উত্তরদাতাদের মতামত অনেক কম, উত্তর দেননি এমন লোকের সংখ্যা অনেক। কারণ, জীববৈচিত্র্য সম্বন্ধে অধিকাংশ উত্তরদাতার ধারণা নেই ।

উফশী বীজ এবং পরিবেশ

কৃষিতে উচ্চফলনশীল বীজের প্রয়োগ আধুনিক যুগে খাদ্যের মতো মৌলিক সমস্যা সমাধানে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন। বর্তমানে বিভিন্ন জাতের উফশী বীজসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং কৃষকদের নিকট গ্রহণযোগ্যতাও সর্বোচ্চ। কিন্তু, উফশী বীজ ব্যবহারের কিছু নেতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব রয়েছে যা আমাদের জন্য হুমকিস্বরূপ। পরিবেশগত প্রভাবগুলোর মধ্যে উদ্ভিদ বৈচিত্র্য বিনষ্টি অন্যতম। এছাড়া উফশী বীজ প্রাপ্তির ফলে কৃষকদের মাঝে বারবার একই ফসল একই জমিতে (monoculture) চাষ করার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। বর্তমানে গবেষণা এলাকার কৃষকেরা ব্যাপকভাবে ধান চাষ করে। একই ফসল একই জমিতে বারবার চাষ করার ফলে মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস পায়। এজন্য অধিক রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের প্রয়োজন হয়।

উল্লেখ্য যে, একই ফসল উৎপাদন করার জন্য অন্যান্য ফসল যেমন, পাট, গম, ডাল জাতীয় শস্য ইত্যাদি চাষ হ্রাস পেয়েছে; ফলে খাদ্যের পুষ্টি বৈচিত্র্যও কমে গেছে।

উপসংহার

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কৃষির আধুনিকীকরণ অপরিহার্য। আধুনিক কৃষি উপাদানগুলো খাদ্য ঘাটতি মেটাতে ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হলেও এদের দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যা আমাদের জন্য অকল্যাণ বয়ে নিয়ে আসছে। আপাত দৃষ্টিতে কৃষির উৎপাদনশীলতা লক্ষণীয় হলেও, বাস্তবে মৃত্তিকার উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেয়েছে। শুধুমাত্র আধুনিক সেচ, রাসায়নিক উপকরণ ও উফশী বীজের কারণে উৎপাদনশীলতা স্থিতিশীল রয়েছে অথবা রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু মানুষ ও পরিবেশের জন্য এরূপ অবস্থা মোটেও কল্যাণকর নয়। গবেষণা এলাকায় কৃষি আধুনিকীকরণের ফলে ভূমির অবনমন, জীববৈচিত্র্য নষ্ট, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা, স্বাস্থ্যগত সমস্যা ইত্যাদি লক্ষণীয়। আধুনিক উপকরণ ব্যবহারের যথার্থ নিয়মকানুন সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এজন্য সরকারিভাবে অথবা বেসরকারিভাবে আধুনিক উপকরণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে 'প্রচার পত্র' ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য যোগাযোগ পদ্ধতির মাধ্যমে স্বাস্থ্যগত সমস্যা সম্বন্ধে জ্ঞানদান অত্যন্ত জরুরি। এজন্য যে, কোনো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ অপরিহার্য। তাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং সর্বোপরি মানব কল্যাণ নিশ্চিত করতে আমাদের আরও সচেতন হতে হবে।

তথ্যনির্দেশ

ইসলাম, মোঃ আনুয়ারুল (১৯৯২) "*পরিবেশ প্রসঙ্গ ও বাংলাদেশের পরিবেশ*"(ঢাকা: বাংলা একাডেমী)।

ইসলাম, এম আমিনুল (১৯৯৮) *"সম্পদ ব্যবস্থাপনা"* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী)।

ইয়াসমীন, নাজমা. (১৯৯৫)(অনুবাদ) "সবুজ বিপ্লপ থেকে জিন বিপ্লব" *বিজ্ঞান পত্রিকা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী)।

উইয়ার, ডেভিড ও মার্ক সাপিরো (১৯৮৭) "*বিষচক্র: কীটনাশক ও ক্ষুধার্ত পৃথিবী'র মানুষ*" (ঢাকা:গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার)।

মুতী, আবদুল্লাহ আল (১৯৮৫) *"বিপন্ন পরিবেশ"*(ঢাকা: বাংলা একাডেমী),।

মালেক, ডঃ মোঃ আব্দুল (১৯৯৫) "কীটনাশকের ক্রমবিবর্তন" *পুরোগামী বিজ্ঞান*, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা (১৪০২ বাংলা সাল), বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ঢাকা।

রহমান, এম. ফয়জার (২০০০) "কৃষিতে আধুনিক উপকরণ ব্যবহারের পরিবেশগত সমস্যা" কাজী তোবারক হোসেন ও মুহাম্মদ হাসান ইমাম সম্পাদিত *'বাংলাদেশের গ্রাম'* সামাজিক বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র, ঢাকা।

সরকার, মোহাম্মদ তারেক (১৯৯৪) "কৃষি বালাইনাশক এবং পরিবেশ" *পুরোগামী বিজ্ঞান*, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, (১৪০১ বাংলা সাল) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ঢাকা।

হোসেন, কাজী তোবারক ও ইমাম, মুহাম্মদ হাসান (১৯৯৬) "কৃষি ও পরিবেশ" *সমাজ নিরীক্ষণ*, সংখ্যা ৫৯, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Rana, Md. Masud Parves (1999) "Human Intervention in Natural System: A Study on Environmental Change through Deep Tubewell Irrigation" Unpublished M. Sc. Dissertation, Department of Geography & Environmental Studies, University of Rajshahi, Rajshahi.

Rahman, Md. Faizar (1997) "Impact of Modern Irrigation on Environment and Society: A Study of A Selected Area in Bangladesh" Unpublished Doctoral Dissertation, Institute of Bangladesh Studies (IBS), University of Rajshahi, Rajshahi.

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল, ৯ম সংখ্যা ১৪০৮

বিশ্বায়ন ও নয়া তথ্য প্রযুক্তির অতিকথন ও বাস্তবতা : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

তানভীর আহমদ
আকতার জাহান*

Abstract: New technologies of communication like computer, tele communications and satellite broadcasting has brought every part of the world to the easy proximity of the rest. These technologies become the foundation of the new global information-based economy and initiate the process called globalization, which is based on socio-politico-economic interrelationship. Advanced communication technologies increasingly permeate every economic sector and give birth to the notion that countries without access to those will be at a considerable loss. Myths have been created about the importance of participating in globalization process and global information based economy. Due to difficulties in paying for new communication technologies developing countries like Bangladesh have been forced to reallocate their limited resources, deprive other essential sectors to save money and invest those to purchase information technology. Will it really help to achieve the economic benefits developing countries are longing for? Countries with limited resources like Bangladesh need the answer.

ভূমিকা

বর্তমান যুগকে চিহ্নিত করা হচ্ছে মানব ইতিহাসের চতুর্থ যোগাযোগ বিপ্লবের কাল হিসেবে। মানুষ যখন ভাষার ব্যবহার শুরু করল, প্রথম বিপ্লবটি ঘটেছিল তখন। লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন সূচনা করেছিল দ্বিতীয় বিপ্লবের। তৃতীয় বিপ্লবটি ঘটেছিল স্থানান্তরযোগ্য মুদ্রাক্ষরভিত্তিক মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রযুক্তির উদ্ভাবনের মাধ্যমে। আর চতুর্থটি হচ্ছে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান বিপ্লব।[১] উপগ্রহ সম্প্রচার প্রযুক্তি, আধুনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও কম্পিউটার এ তিনের সমন্বয়ে বিশ্বজুড়ে গড়ে উঠেছে তথ্যের মহাসরণি নামে দ্রুত গতির এক বিস্তৃত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তথ্য এক দেশ থেকে আরেক দেশে এতটা অনায়াসে প্রবাহিত হচ্ছে যেন ভৌগোলিক সীমানার কোনো অস্তিত্বই নেই। তথ্য প্রযুক্তিগত এই উন্নতি বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে সুযোগ এনে দিয়েছে 'বিশ্বায়ন' নামক প্রক্রিয়াটি সূচনার। বিশ্বের প্রতিটি অংশের সাথে অন্যান্য অংশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্তঃসম্পর্ক পরস্পরনির্ভরতা হচ্ছে বিশ্বায়নের মূল কথা। তথ্য প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা উন্নত দেশগুলো দুর্বল তথ্য অবকাঠামোর স্বল্পোন্নত দেশগুলোর চেয়ে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে অনেক বেশি পরিমাণে লাভবান হচ্ছে। অনেকেই আশঙ্কা

● তানভীর আহমদ, সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
আকতার জাহান, প্রভাষক, গণযোগাযোগ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যলয়।

করছেন এই প্রাথমিক বৈষম্য নিরসনে এখনই কোনো ব্যবস্থা নেওয়া না হলে ভবিষ্যতে এর মাত্রা আরো তীব্র হবে। খোদ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো নিয়েও ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার যেসব অর্থকরী সেবা উৎপাদন করছে এবং বিশ্বায়ন সারা বিশ্বে তা বাজারজাত করার যে সুযোগ এনে দিয়েছে তাতে দেশগুলো আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পর্যায় নির্বিশেষে উপকৃত হবে। এছাড়া, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমাজের ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ, উচ্চ নিচ কাঠামোগত ক্ষমতা বিন্যাসের অবক্ষয়, গণশিক্ষার সুযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে নয়া তথ্যপ্রযুক্তি অনেক সামাজিক সমস্যারও সমাধান করবে। অন্যদিকে, এই প্রযুক্তি ও প্রক্রিয়া সাংস্কৃতিক অবনয়ন, ব্যক্তির নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা লঙ্ঘন, সমাজের পরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ধ্বংস ও সর্বোপরি সামাজিক ক্ষমতার ভারসাম্য ও অর্থনৈতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ বিনষ্ট করবে বলে অনেকের ধারণা। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মতো বিকাশশীল বিশ্বের একটি দেশ তথ্যপ্রযুক্তি ও বিশ্বায়ন বিষয়ে কোন অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কারণ বর্তমান পরস্পরনির্ভরশীল পৃথিবীতে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ব্যাপারটি আর কোন দেশের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, বাধ্যতামূলক। নয়া তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সম্বন্ধে বাংলাদেশের জন্য একটি লাগসই ও টেকসই নীতিমালা প্রণয়ন করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন এই ধারণা দুটো সম্বন্ধে যেসব মিথ বা অতিকথন গড়ে উঠেছে, সেগুলোকে নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে বিশ্লেষণ করে প্রকৃত পরিস্থিতি তুলে ধরা। এই নিবন্ধে বিশ্বায়ন ধারণার প্রকৃতি, উৎপত্তি ও বিকাশ, এর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রা, নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তির সাথে এর আন্তঃসম্পর্ক, নয়া তথ্যপ্রযুক্তি ও বিশ্বায়ন সম্বন্ধে প্রচলিত অতিকথনগুলোর যৌক্তিক বিশ্লেষণ ও বাংলাদেশের জন্য এর তাৎপর্য আলোচনা করা, হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি ও বিশ্বায়ন বিষয়ে বাংলাদেশের নিজস্ব অবস্থান তৈরিতে এ মুহূর্তে এ ধরনের যৌক্তিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। "এখন আমাদের যে কেনো নীতি বা কার্যক্রমের পরিণতি আগে থেকেই জানতে হবে, কারণ এর ফলাফল আমরা পেয়ে যাবো অবিলম্বে। তড়িৎগতির কারণে আমাদের আর অপেক্ষা করে দেখার উপায় নেই।"[২]

বিশ্বায়নের ধারণা

বিশ্বায়নের ধারণা নির্মাণ সহজ নয়। কারণ বহুল উচ্চারিত হওয়া সত্ত্বেও এটি সম্বন্ধে বোধগম্যতার পরিমাণ খুবই কম। একে অভিহিত করা হয়েছে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে, যা রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের পুরনো কাঠামো ও সীমানাকে অবলুপ্ত করছে। বিশ্বায়নকে বলা হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ক্রমবর্ধমান পরাজাতীয়করণ (Trans-nationalization), যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক বিশ্বসীমানা, এক বিশ্বসম্প্রদায়।[৩] বিশ্বায়ন এমন একটি সর্বব্যাপী অভিজ্ঞতা যে আমাদের জীবনের অধিকাংশ দিকই এর আওতাভুক্ত হয়ে পড়েছে। আমরা যে পোশাক পরছি, যে গান শুনছি, যে খাবার খাচ্ছি- এগুলোর সবকিছুই আমাদের সামনে ক্রমবিশ্বায়িত এক পৃথিবীর উদাহরণ তুলে ধরে। অনেকে বিশ্বায়নকে 'বিআঞ্চলিকীকরণ (De- localization)' প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এর মানে হলো আমরা আর পুরোপুরি 'স্থানীয়ভাবে' আমাদের জীবন যাপন করতে পারছি না। ভৌগোলিক ও সামাজিক সীমানার কোনো গণ্ডীতে আমরা আর আবদ্ধ নই। গিডেন্স (Giddens) ব্যাপারটিকে বর্ণণা করেছেন এভাবে: "স্থানিক অভিজ্ঞতার মূল সূত্রটিই বদলে গেছে, নৈকট্য ও দূরত্ব পরস্পরের সাথে এমনভাবে একত্রিত হয়েছে যার তুলনা অতীত থেকে মেলা ভার।"[৪] রবিন্স (Robins) বিশ্বায়নকে একই সাথে জটিল, বৈপরীত্যপূর্ণ, অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৫] ফারগুসন (Ferguson) বিশ্বায়ন ধারণার দুর্বোধ্যতা তুলে ধরে মন্তব্য করেছেনঃ "প্রকৃতপক্ষে কি মাত্রায় বিশ্বায়ন (যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন) ঘটছে (এবং কোনো ক্ষেত্রে) যে ইতিবাচক উপকারিতা ও নেতিবাচক মূল্যের কথা দাবি করা হচ্ছে এগুলো নির্ধারণ করা কঠিন।"[৬] কাজেই বিশ্বায়ন ধারণার তাৎপর্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে এটিকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করতে হবে।

বিশ্বায়নের অর্থনীতি

আসলে বিশ্বায়ন হচ্ছে উচ্চতর পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন।[৭] বিশ্বায়ন ধারণাটি অনেকাংশেই ক্রমপ্রসারমাণ পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা ও বাজার থেকে উদ্ভূত এবং এর সহায়ক শক্তি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে বিশ্বায়ন হচ্ছে গোটা বিশ্বকে একক বাজার হিসেবে ধরে নিয়ে অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া। এর শুর আজকে নয় অন্তত ষোড়শ শতাব্দীতে, তৎকালীন বৃহৎ শক্তিগুলোর উপনিবেশ স্থাপন ও উপনিবেশগুলোতে অর্থনৈতিক উৎপাদন ও শোষণ প্রক্রিয়া সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে। গত শতাব্দীর গুরুত্ব দিকে ঔপনিবেশিক পুঁজিসঞ্চয়ের ধারাটির বিপরীতে সম্পদের সুষম বণ্টনের প্রত্যয় নিয়ে গড়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। পরবর্তীকালে উগ্র জাতীয়তাবাদ কেন্দ্রিক ফ্যাসিবাদী নাৎসিবাদী শক্তির অভ্যুদয় ঘটে। এই তিন মতের লড়াইয়ে পুঁজিবাদী শক্তি জয় লাভ করে এর অভ্যন্তরীণ নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও। কারণ ঔপনিবেশিক শোষণলব্ধ সম্পদে পরিপুষ্ট পুঁজিবাদ অন্যদের তুলনায় অধিক সংগঠিত ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা লাভের প্রক্রিয়া, আশির দশকের শেষ দিকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের বিপর্যয়, পুঁজিবাদী অর্থনীতির অতি উৎপাদন সমস্যা, নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তি বিস্তারের ফলে জাতি-রাষ্ট্রের শক্তি ক্ষয়-এসব কিছুই গত অর্ধশতাব্দীতে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উপর এমন চাপ সৃষ্টি করেছে যে বিশ্বজুড়ে একটি অবাধ বাজার গড়ে তোলা এ ব্যবস্থার প্রাধান্য টিকিয়ে রাখার অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পুঁজিবাদী দেশগুলোর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষর এবং বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার আত্মপ্রকাশ আসলে এই চাপেরই ফলশ্রুতি। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মূল কাজ হলো পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় সদস্য দেশগুলো যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করছে কিনা তা তদারক করা এবং সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

তবে অর্থনীতির এই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া খুব নির্বিঘ্নে চলছে এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন বিষয়ে এর বিরদ্ধে অসন্তোষ দাঁনা বেধে উঠেছে। দ্বন্দ্বের একটি মাত্রা উত্তর-দক্ষিণ হলেও খোদ উত্তরের দেশগুলোর মধ্যে মতদ্বৈততার পরিমাণও কম তীব্র নয়। দক্ষিণের গরিব দেশগুলোর একটি প্রধান যুক্তি হলো বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা চালুর ফলে প্রতিবছর ২৭০ বিলিয়ন ডলার বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে বলে যে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে তার সিংহভাগই নিয়ন্ত্রণ করবে বর্তমানে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা উন্নত দেশগুলো। "ব্রাউন এবং কলিগস ১৯৯৬ সালে একটি প্রাক্কলিত হিসাবের মাধ্যমে দেখিয়েছেন গ্যাট চুক্তির ফলে প্রতি বছর ১৩৬ বিলিয়ন ডলার সেবা খাতের অতিরিক্ত বাণিজ্য হবে, যা মোট বাণিজ্যের প্রায় ৫০ শতাংশ। ব্রাউন ও কলিগসের হিসাব অনুযায়ী যার মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ৩৯ বিলিয়ন ডলার, যুক্তরাষ্ট্র ৩৭ বিলিয়ন ডলার, জাপান ২৪ বিলিয়ন ডলার, কানাডা ৯ বিলিয়ন ডলার, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ৫ বিলিয়ন ডলার এবং মাত্র ২৫ বিলিয়ন বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্যভুক্ত অন্যান্য দেশে সেবাখাতে বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে।" [৮] কারণ অবাধ বাজার সৃষ্টির নামে উত্তর-দক্ষিণ দেশগুলোকে এক অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বায়নের সংস্কৃতি

তথ্যের অর্থকরী পণ্যে পরিণত হওয়া এবং অর্থনৈতিক তৎপরতা তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়ার প্রবণতা বিশ্বসংস্কৃতির উপর বিশ্বায়নের প্রভাবকে সাম্প্রতিক অ্যাকাডেমিক আলোচনার বিষয়ে পরিণত করেছে। জ্যান নেভারভীন (Jan Nederveen) মনে করেন বিশ্বায়ন স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটিয়ে একটি সংকর সংস্কৃতি সৃষ্টি করবে। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'তৃতীয় সংস্কৃতি'।[৯] অনেকেই আবার স্থানীয় সংস্কৃতির মান অবনয়ন ও অস্তিত্বের সংকট নিয়ে উদ্বিগ্ন। এই উদ্বেগ অযৌক্তিক নয়। জয়বীর (Jayaweera) এর মতে "[নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তি থেকে] যে সামাজিক সম্পর্ক উদ্ভূত হয় তা গোটা বিশ্বকে ক্রমান্বয়ে একটি একক প্রধান অর্থনীতি, একক সরকার ব্যবস্থা এবং একক সংস্কৃতিতে সংহত করে।" [১০] এই একক সংস্কৃতি স্থানীয় সংস্কৃতির পৃথক বৈশিষ্ট্য ও জনগণের নিজস্ব সাংস্কৃতিক চাহিদার প্রতি অসংবেদনশীল, কৃত্রিম ও অগভীর। কারণ সংস্কৃতির মৌলিক যে বৈশিষ্ট্য অর্থ্যাৎ জনগণের আচার-আচরণ জীবনধারার প্রতিফলন ঘটানো তা এই সংস্কৃতিতে অনুপস্থিত। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় বিনোদন ও যৌনতা নির্ভর এই সংস্কৃতিরই পৃষ্ঠপোষকতা আমরা লক্ষ করি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে সংস্কৃতির এই ধারা প্রায় সর্বাশেই উন্নত থেকে স্বল্পোন্নত দেশের দিকে

ধাবিত। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউ এন ডি পি) ১৯৯৯ সালের মানব উন্নয়ন রিপোর্টে বলা হয়েছে: "যুক্তরাষ্ট্রের একক বৃহত্তম রফতানি শিল্প বিমান, কম্পিউটার, গাড়ি নয়; তা হচ্ছে বিনোদন-সিনেমা এবং টিভির অনুষ্ঠান। হলিউডের ফিল্ম ৩ হাজার কোটি ডলার আয় করেছে। কেবল টাইটানিক ছবিটি ব্যবসা করে ১শ ৮০ কোটি ডলার"।[১১] যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী পত্রিকা ফর্বস জানিয়েছে পর্নোগ্রাফি এখন ৫৬ বিলিয়ন ডলারের বিশ্ব বাণিজ্য।[১২] তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ম্যাগাজিন, ভিডিও, সিডি, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সহজলভ্যতা অপসংস্কৃতির বিস্তারকে আশঙ্কাজনকভাবে শক্তিশালী করে তুলেছে। বিশেষত, এশীয় দেশগুলোর সুদীর্ঘ ঔপনিবেশিক ইতিহাস এ অঞ্চলকে পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক পণ্য বিস্তারের উর্বর ভূমিতে পরিণত করেছে। সিনেমার পাশাপাশি পশ্চিমা সঙ্গীতও এশিয়ায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। পশ্চিমা পপদলগুলোর বিশ্বসফর কর্মসূচিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারত ক্রমবর্ধমানহারে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। স্থানীয় সংস্কৃতির উপর এগুলোর প্রভাব অনায়াসে লক্ষনীয়। সিনেমাগুলোতে সহিংসতা ও যৌনতার পরিমাণ বৃদ্ধি এবং সঙ্গীত রচনায় পশ্চিমা ঢং অনুকরণ এ অঞ্চলের দেশগুলোর অভিন্ন প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। উপগ্রহ সম্প্রচার ব্যবস্থার বিস্তার এই প্রক্রিয়াকে আরো বেগবান করেছে। উপগ্রহের মাধ্যমে প্রচারিত অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তুর সাথে স্থানীয় মূল্যবোধের প্রত্যক্ষ সংঘাত অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। ১৯৯৫ সালে স্টার টিভির এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মহাত্মা গান্ধীকে 'বেনিয়া জারজ' বলে অভিহিত করে। এ ঘটনা ভারতে ক্রুদ্ধ বিক্ষোভের কারণ ঘটায়। বাংলাদেশে টিভি সিক্স, টিভি ফোর, ফ্যাশন টিভি, এম সি এম প্রভৃতি চ্যানেলগুলোতে প্রচারিত অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু নিয়ে পত্রপত্রিকায় ব্যাপক নেতিবাচক লেখালেখির পর এগুলোর প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়।

বিশ্বায়নের প্রভু : বহুজাতিক ও পরাজাতিক সংস্থা

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সবাই সমান শক্তিশালী নয়। কিছু ব্যক্তি বা সংস্থা বিশ্বায়নের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করছে। উচ্চমূল্যের তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় পুঁজি ও প্রযুক্তি উভয়ের নিয়ন্ত্রণকারী বহুজাতিক ও পরাজাতিক (Transnational) কর্পোরেশনগুলো স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। বিশ্বের প্রথম একশ'টি অর্থনৈতিক এককের (বিশ্বের সবদেশকে অর্থনৈতিক একক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে) একান্নটিই হলো বৃহৎ কর্পোরেশন। আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণ করে এই বিশাল বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো। মউলানা (Mowlana) এসব কর্পোরেশনকে "আর্ন্তজাতিক যোগাযোগ প্রবাহের অন্যতম প্রধান সংগঠক ও উৎপাদক"[১৪] বলে চিহ্নিত করেছেন। "বিশ্বে কম্পিউটার উৎপাদনের ৭০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে মাত্র ১০টি সংস্থা। টেলি-কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে শতকরা ৮৬ ভাগ নিয়ন্ত্রণ মাত্র ১০টি সংস্থার হাতে"।[১৫] কর্পোরেশনগুলোর অধিকাংশই মার্কিন মালিকানাধীন। মার্কিন সাময়িকী ফরচুন প্রনিত বিশ্বসেরা পাঁচশ কোম্পানির তালিকায় ১২৭টিই মার্কিন কোম্পানি। ২৫টি শিল্প ক্যাটাগরির ১৪টিতেই মার্কিনিরা শীর্ষ অবস্থানে।[১৬] "মে ১৯৯৭ থেকে মে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ৩৫৬ টি কোম্পানি বা কর্পোরেশনের কেবলমাত্র মোট নিট মুনাফারই পরিমাণ ছিল ৩৩৭ মিলিয়ন ডলার যা তিরানব্বই কোটি লোকের দেশ ভারতের ১৯৯৫ সালের মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে প্রায় ১৩ বিলিয়ন ডলার বেশি "।[১৭]

বিশ্ব তথ্যপ্রবাহের উপর পরাজাতিক কর্পোরেশনগুলোর আধিপত্যের বিষয়টি তুলে ধরতে গিয়ে বাগডিকিয়ান (Bagdikian) এগুলোকে 'বিশ্বগ্রামের প্রভু' বলে আখ্যা দিয়েছেন।[১৮] তাঁর মতে এগুলো" চিন্তা, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের উপর সাদৃশ্যকরণ ক্ষমতা বিস্তার করে, যা ইতিহাসের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি পরিমাণে জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করে। কাকে ভোট দেবে থেকে শুরু করে কি খাবে পর্যন্ত সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এত অধিক সংখ্যক লোকের ব্যবহার্য তথ্যকে নিজেদের মতো করে সাজানোর এতটা ক্ষমতা এমনকি সিজার বা হিটলার, ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট বা পোপেরও ছিল না"।[১৯] এই প্রভাবশালী কর্পোরেশনগুলোর ভৌগোলিক উৎস নিশ্চিতভাবেই উত্তর-পশ্চিম পক্ষপাতকে স্পষ্ট করে তোলে। পরাজাতিক এসব মিডিয়া কর্পোরেশন উত্তর-পশ্চিম ক্ষমতাকেন্দ্রের স্বার্থ রক্ষাকল্পে জনমত তৈরি ও জনগণের ভাবাদর্শ ছকবদ্ধ করার কাজটি করে থাকে। এ কাজ করতে গিয়ে কর্পোরেশন গুলো গোটা বিশ্বকে একটি একীভূত বাজার হিসেবে

বিবেচনা করে ওয়াকম্যান, কোকাকোলা, লিভাইস জিনস,ম্যাকডোনাল্ড হ্যামবার্গার, বেনেটনের পোশাকের মত একক 'বিশ্বপণ্য' উৎপাদনে উদ্যোগী হয়েছে। এসব হার্ডওয়্যার পণ্যের পাশাপাশি টাইটানিক, বেওয়াচ, মাইকেল জ্যাকসন-ম্যাডোনার সঙ্গীতের মতো সফটওয়্যার পণ্যও এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকায় সমান জনপ্রিয়। এর ফলে দেশজ সংস্কৃতি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হওয়ার হুমকি দেখা দিয়েছে। এর কারণ স্রেফ অর্থনৈতিক। নয়া প্রযুক্তি উচ্চমানের যোগাযোগ পণ্য উৎপাদনের কাজটিকে অতি ব্যয়বহুল করে তুলেছে, অথচ এর সম্পাদনা ব্যয় তুলনামূলক ভাবে কম আর পুনরুৎপাদন ব্যয় অতি নগণ্য। ফলে একই পণ্য যত বিস্তৃত বাজারে চালানো সম্ভব হবে মুনাফার পরিমাণ বাড়বে তত বেশি। ঠিক একই কারণে যোগাযোগ পণ্য উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমশ বেশি মাত্রায় জোটবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা দেখাচ্ছে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে পুঁজির কেন্দ্রীভবন ও পুঞ্জীভবন অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বায়ন পরাজাতিক কর্পোরেশনগুলোর সামনে সুযোগ এনে দিয়েছে পরস্পরের সহযোগিতায় সম্মিলিতভাবে মুনাফার পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করার। তথ্যপণ্য ভিত্তিক কর্পোরেশনগুলোর ক্ষেত্রে এ প্রবণতা আরো প্রকট। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সনির কলম্বিয়া পিকচার্স কেনা, ভায়াকমের প্যারামাউন্ট, ডিজনীর ক্যাপিটাল সিটিস/ এ বি সি, টাইম ওয়ার্নারের সাথে টার্নার ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের একীভূত হওয়া তারই প্রমাণ। ২০০০ সালের জানুয়ারীতে মার্কিন কর্পোরেট ইতিহাসের সবচেয়ে বড় একীভূতীকরণের ঘটনায় গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান টাইম-ওয়ার্নার ইন্টারনেট প্রতিষ্ঠান আমেরিকা অন লাইনের (এ ও এল) সাথে সম্মিলিত হয়েছে। যৌথভাবে ৩৫০ বিলিয়ন ডলার সম্পদের অধিকারী এই দৈত্যাকার কর্পোরেশনটির তথ্য পণ্য উৎপাদন ক্ষমতা অকল্পনীয়। এই কর্পোরেশনের সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ফিল্ম স্টুডিও ওয়ার্নার ব্রাদার্স পিকচার্স; টেলিভিশন চ্যানেল ওয়ার্নার ব্রাদার্স টেলিভিশন, দ্যা ডব্লিউ বি, এইচ বি ও, টি এন টি, টি বি এস, সি এন এন ও কার্টুন নেটওয়ার্ক ; আটল্যান্টিক গ্রুপ, ইলেকট্রা এন্টারটেইনমেন্ট এবং ওয়ার্নার ব্রাদার্স রেকর্ডসের সমন্বয়ে ওয়ার্নার মিউজিক গ্রুপ; ৩৩টি ম্যাগাজিন যার মধ্যে রয়েছে টাইম, পিপল, লাইফ ফরচুনের মতো বিশ্বখ্যাত প্রকাশনা; টাইম-ওয়ার্নার ক্যাবল: এ ও এল অন লাইন সার্ভিস, নেটস্কেপ, কম্পুসার্ভ, মুভি-ফোন, ইনস্ট্যান্ট মেসেঞ্জারের মতো ইন্টারনেট ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। এই কর্পোরেশনের ম্যাগাজিনগুলোর সম্মিলিত পাঠক সংখ্যা ৯৯ মিলিয়ন। এ ও এল এর ২০ মিলিয়ন সদস্য ব্যস্ত দিনগুলোতে ৯৭ মিলিয়ন ই-মেইল এবং ৫৬২ মিলিয়ন তাৎক্ষণিক বার্তা পাঠায়, প্রতি ৩.৫ সেকেন্ডে এ ও এলে একজন নতুন ব্যবহারকারী যোগ দেয়। এর ফিল্ম স্টুডিও থেকে দ্য গ্রিন মাইল, দ্য মেট্রিক্স, এনালাইজ দিস, এবং ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড ওয়েস্টের মরতা ব্যবসাসফল সিনেমা তৈরি হয়েছে যেগুলোর প্রতিটি অভ্যন্তরীণ বক্স অফিসে ১০০ মিলিয়নেরও বেশি ডলার আয় করেছে। এর ক্যাবল সার্ভিসের গ্রাহক সংখ্যা ১৩ মিলিয়ন। ওয়ার্নার ব্রাদার্স টেলিভিশনের ই আর সিরিজটি ১৭ মিলিয়ন বাড়িতে দেখা হয়।[২০] মার্কিন বিনোদন কর্পোরেশন ডিজনিও একটি প্রধান সংস্কৃতি পণ্য উৎপাদক সংস্থায় পরিণত হয়েছে। চলচ্চিত্র, ভিডিও, টেলিভিশন অনুষ্ঠান, কম্পিউটার সফটওয়ার, মিউজিক, ম্যাগাজিন, থিমপার্ক এবং নানা রকম ভোগ্য পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ এর তৎপরতার আওতাভুক্ত।

উক্ত একীভূতীকরণ প্রবণতার মূল কারণটি হল মুনাফার পরিমাণ যতটা সম্ভব বৃদ্ধি করা। কোনো একটি যোগাযোগ পণ্য বাজারে ছাড়ার আগে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় যাতে কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত প্রতিটি সেক্টর কোনো না কোনো ভাবে ঐ পণ্য থেকে ব্যবসা করতে পারে। বাগডিকিয়ান (Bagdikian) একটি কল্পিত উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরেছেন: "জায়ান্ট কর্পোরেশন ইনকর্পোরেটেডের প্রতিটি মাধ্যমেই সাবসিডিয়ারি রয়েছে। এর একটি ম্যাগাজিন এমন একটি নিবন্ধ কেনে (বা লেখায়) যা বই আকারে প্রকাশ করা যেতে পারে, কোম্পানির ম্যাগাজিনগুলোতে এবং ব্রডকাস্ট স্টেশনে যার লেখকের সাক্ষাৎকার ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়। কোম্পানির সিনেমা স্টুডিওগুলিতে বইটিকে চলচ্চিত্রায়িত করা হয়, যে চলচ্চিত্র কোম্পানির সিনেমাহলগুলোতে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কোম্পানির রেকর্ড লেবেলের মাধ্যমে সিনেমাটির একটি সাউন্ডট্র্যাক বাজারে ছাড়া হয়। কোম্পানির ম্যাগাজিনগুলোতে প্রচ্ছদ কাহিনী ও টিভি স্টেশনগুলোতে সাক্ষাৎকার প্রচারের মাধ্যমে গায়ককে তাৎক্ষণিক তারকায় পরিণত করা হয়। কোম্পানির টপ ফর্টি রেডিও স্টেশনগুলোতে রেকর্ডটি বাজানো হয়। পরবর্তীকালে কোম্পানির ভিডিও ক্যাসেট ডিভিশন সিনেমাটির (ভিডিও সংস্করণ) প্রকাশ করে যা কোম্পানির টেলিভিশন স্টেশনগুলোর মাধ্যমে দুনিয়া জুড়ে প্রদর্শিত হয়। এবং এর

সবকিছুই শুর হয়েছিল কোম্পানি ম্যাগাজিনের একটি নিবন্ধ থেকে যার সম্পাদক এটি বাছাই করেছিলেন কারণ কোম্পানির মধ্যে এটার অন্যান্য ব্যবহার যোগ্যতার বিষয়টি তিনি চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন।" [২১] বাস্তব অবস্থার সাথে এ কল্পনার দুরত্ব শূন্য।

তথ্যের পণ্যায়ন ও বিশ্বায়ন

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে যে অর্থনৈতিক দর্শনটি তার বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযোগ হলো এটি ভোগবাদী ধ্যান-ধারণার বিস্তার ঘটাচ্ছে। পরাজাতিক পুঁজিবাদ পণ্যায়িত পশ্চিমা সংস্কৃতিকে আমাদের জীবন যাপনের একমাত্র মডেল হিসেবে চাপিয়ে দিচ্ছে। ফলে তৈরি হচ্ছে "প্যাকেট বন্দী দর্শক-শ্রোতা যাদের আনুগত্য ব্র্যান্ডনেম পণ্যে আবদ্ধ আর সামাজিক বাস্তবতাকে যারা উপলব্ধি করে পণ্য পরিতৃপ্তির মাপকাঠির মধ্য দিয়ে"।[২২] সৃষ্টি হয়েছে এমন এক ভোক্তা সংস্কৃতি যে সংস্কৃতিতে প্রথাগত উৎপাদনমুখী কাজের নীতির চেয়ে ভোগের নীতিকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

বিশ্বায়ন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই ভোক্তা সংস্কৃতির বিকাশকে উৎসাহিত করছে। কারণ স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে এর সর্বজনীন চেহারা দেশজ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে ঢেকে দিয়ে ছকবদ্ধ একটি ক্রেতা শ্রেণী সৃষ্টিতে সহায়ক। সর্বাধিক মুনাফা নিশ্চিত করতে বিশ্বজুড়ে ব্যবসা পেতে ব্যবসা পরাজাতিক ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর ভূমিকা এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক। "ভোক্তা সংস্কৃতি সৃষ্টির পিছনের শক্তিটি হচ্ছে বহুজাতিক কর্পোরেশন নামে পরিচিত বাহনটি ব্যবহার করে মার্কিন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশ্বব্যাপী বিস্তার।"[২৩]

ভোক্তা সংস্কৃতির বিস্তার তথ্যকে বিক্রয়যোগ্য, লাভজনক একটি পণ্যে পরিণত করেছে। প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সমাজের সদস্যদের কাছে ক্রমেই বেশি করে নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করা হচ্ছে। যাদের কেনার সামর্থ্য আছে কেবল তারাই প্রবেশাধিকার পাচ্ছে তথ্য প্রবাহে। আর এভাবে সামাজিক স্তর-বিন্যাস ও সম্পদ বণ্টনে অসাম্য তীব্রতর হচ্ছে। সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে 'তথ্য-ধনী'ও 'তথ্য-দরিদ্র' শ্রেণীর।

তথ্যকে পণ্যে পরিণত করা ও যত বেশি সম্ভব গ্রাহকের কাছে একে আকর্ষণীয় করে তোলার তাড়না থেকে দেখা দিয়েছে তথ্য মাধ্যমের বাণিজ্যিকীকরণ প্রবণতা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত স্যাটেলাইট প্রযুক্তি বিস্তারের ফলে আমরা বিপুল পরিমাণ বাণিজ্যিক চ্যানেল গড়ে উঠতে দেখছি। জনগণের জানার প্রয়োজন রয়েছে এমন তথ্য নয়, বরং বেশি সংখ্যক লোকের কাছে লোভনীয় মনে হবে ঐ ধরনের তথ্যগুলো এসব চ্যানেলে প্রচারের জন্য অগ্রাধিকার পাচ্ছে। এসব বেসরকারি বাণিজ্যিক চ্যানেল সরকারী মালিকানাধীন তথ্য মাধ্যমগুলোকে চাপের সম্মুখীন করছে। বিভিন্ন দেশে সরকারি প্রচার মাধ্যমগুলো বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে অথবা টিকে থাকার জন্য বেসরকারি মাধ্যমগুলোর বাজারমুখী নীতি অনুসরণে বাধ্য হচ্ছে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় তথ্য সেক্টরের বেসরকারিকরণকে উৎসাহিত করায় তৃতীয় বিশ্বের ক্রয়ক্ষমতাহীন এক বিশাল জনগোষ্ঠী তথ্য ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কার মুখে পড়েছে। "পরাজাতিক সাংস্কৃতিক কর্পোরেশনগুলো, মূলত মার্কিন মার্কেটিং কৌশল ব্যবহার করে বিশ্বকে ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন লোকদের জন্য একটি শপিং মলে পরিণত করছে। বিশ্বের অবশিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বন্দী হয়ে পড়েছে তাদের দারিদ্র্যের কারাগারে"।[২৪]

বিশ্বায়ন ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের পুনর্জাগরণ

ফ্রিডম্যান (Friedman) সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদকে বলেছেন "সাম্রাজ্যবাদের উচ্চ-নিচ কাঠামোগত প্রকৃতির একটি দিক, অর্থাৎ নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান আধিপত্য, মার্কিন মূল্যবোধ, ভোগ্যপণ্য ও জীবনযাত্রার ধরনের বিস্তার"।[২৫] বিংশ শতাব্দীর ষাট দশকের শেষ ও সত্তর দশকের শুরতে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের ধারণাটি অ্যাকাডেমিক মহলে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হলেও এর গড়ে ওঠার ইতিহাসটি পুরনো। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর বিস্তার উপনিবেশাধীন দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবকাঠামোকে ব্যাহত করেছিল। হাজার বছরের ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠা পরীক্ষিত ও লাগসই দেশজ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও শোষণের প্রতিবন্ধক বিবেচনায় ধবংস করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল ইউরোপীয়

সংস্কৃতির বিকৃত ও অক্ষম অনুকরণে গড়ে ওঠা এক ব্যবস্থা। অন্য দিকে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ও পরবর্তী সময়ে ইউরোপীয় দেশগুলোতে প্রবল মার্কিন সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপস্থিতি ঐসব দেশে মার্কিন বিরোধী সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের ধারণাকে পুষ্ট করে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠনে মার্কিন পুঁজির উপর ব্যাপক নির্ভরতা ঐ দেশগুলোতে মার্কিন সাংস্কৃতিক পণ্যকে সহজলভ্য করে তুলেছিল।

সাংস্কৃতিক আধিপত্যের ব্যাপারে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে নেতিবাচক মনোভাব গড়ে ওঠার প্রতিফলন আমরা দেখি বিংশ শতাব্দীর সত্তর ও আশির দশকে ইউনেস্কোর বিভিন্ন সম্মেলন ও সমীক্ষা রিপোর্টে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সম্মিলিতভাবে সাংস্কৃতিক সমতা ভিত্তিক 'নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা' গড়ে তোলার প্রয়াস চালায়। মার্কিন সরকার ও তার মিত্রদের সক্রিয় বিরোধিতায় এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। নব্বইয়ের দশকের শুরতে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের বিপর্যয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের একচ্ছত্র অভিভাবকে পরিণত করে। বিশ্বায়ন মার্কিন সামরিক আধিপত্যের এই অবস্থানটিকে বিস্তৃত করছে অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। একই সাথে লাভবান হচ্ছে মার্কিন মিত্র পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিও। বিশেষ করে, নয়া তথ্য প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য গতির বিস্তার উন্নয়নশীল দেশগুলোকে মার্কিন তথা পশ্চিমা ভাবধারার অব্যাহত প্রচারের সামনে অসহায় করে তুলছে। শিলার (Schiller) পশ্চিমা গণমাধ্যম ও 'সংস্কৃতি ইন্ডাস্ট্রি'কে বিশ্ব পুঁজিবাদের "আদর্শগতভাবে সমর্থণকারী তথ্য অবকাঠামো" [২৬] আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে "আসলে যা বিশ্বায়িত হচ্ছে তা হল পুঁজিবাদ- অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় ব্যবস্থা হিসেবেই"।[২৭] এটিকে আমরা মার্কসের ভাষায় 'মৌল কাঠামো' এবং 'উপরিকাঠামো' বলতে পারি। সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক অভিযোগটি কেবল উন্নত বিশ্বের বির দ্ধে উন্নয়নশীল বিশ্বের নয়, যুক্তরাষ্ট্রের বির দ্ধে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিরও। মার্কিন অডিও ভিসুয়াল ব্যবস্থা অনুন্নত বিশ্বে সম্প্রচার ব্যবস্থা গড়ে তোলার আদর্শ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রযুক্তি ও পুঁজির জন্য মার্কিন নির্ভরতা প্রকারান্তরে মার্কিন বিনোদন পণ্যের উপর তৃতীয় বিশ্বের নির্ভরশীলতাকেই বৃদ্ধি করছে। সমাজতন্ত্রী শিবিরের বিপর্যয়ের পর সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলো পরিণত হয়েছে মার্কিন বিনোদন পণ্যের এক বিশাল ও আগ্রহী বাজারে। পুঁজিবাদ ও ভোগবাদের আদর্শ এসব দেশে বিনা বাধায় স্থান করে নিচ্ছে। ভোগবাদ এখন আর কেবল মার্কিন প্রবণতা নয়, ইউরোপ, জাপান ও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও এটি প্রসার লাভ করেছে।

নয়া তথ্য প্রযুক্তির অতিকথন

বিশ্বায়ন আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যকে প্রতিটি জাতীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশেই পরিণত করেনি, জাতীয় অর্থনীতিকে বিশ্ব অর্থনীতির এককে পরিণত করেছে; যে অর্থনীতিতে পুঁজিপ্রবাহ, শ্রম বাজার, পণ্যবাজার, কাঁচামাল, ব্যবস্থাপনা সবকিছুই বিশ্বব্যাপী পরস্পর-নির্ভরশীল। আর এটি সম্ভব হয়েছে টেলিযোগাযোগ, উপগ্রহ সম্প্রচার ও কম্পিউটার প্রযুক্তির সম্মিলনে গড়ে ওঠা নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তির বিশাল নেটওয়ার্কের কারণে। নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশ্বের অর্থনৈতিক এককগুলোকে সুযোগ করে দিচ্ছে স্থান ও কালের ব্যবধানকে অতিক্রম করে পারস্পরিক লেনদেনের। একই সাথে বিশ্বায়নের পুঁজিবাদী আদর্শটিকেও ছড়িয়ে দিচ্ছে বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে। এ কারণে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় নয়া তথ্যপ্রযুক্তির এক বিশেষ ভূমিকা লক্ষ করা যাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে জ্ঞান ও তথ্য পরিণত হয়েছে লাভজনক অর্থনৈতিক পণ্যে। উন্নত পুঁজিবাদী সমাজগুলোতে ইতিমধ্যেই তথ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণনের বাণিজ্য বস্তুগত পণ্য উৎপাদনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বলা হচ্ছে কৃষি ও শিল্প যুগ অতিক্রম করে বিশ্ব এখন 'তথ্য যুগে' অবস্থান করছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উন্নয়ন-সমস্যার সমাধানে নয়া তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে, যার ফলে ঐ সব দেশ 'উল্লম্ফনের' মাধ্যমে উন্নয়নের উন্নত স্তরে পৌঁছাবে। এসব উচ্চাভিলাষী প্রত্যাশা তথ্য প্রযুক্তির সামর্থ্য সম্বন্ধে নানা রকম অতিকথনের জন্ম দিয়েছে যার বিপরীতে প্রাপ্তির সম্ভাবনাটুকু খতিয়ে দেখা অত্যন্ত জরুরি।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় নয়া তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের উপর অতি গুরুত্বারোপের প্রবণতার অন্তর্নিহিত আর্থ-রাজনৈতিক পটভূমিটির বিশ্লেষণ এ ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। ষাটের দশকের শেষ ভাগ ও সত্তর দশকের শুরতে মার্কিন বহুজাতিক সংস্থাগুলো বিশ্ববাজারে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সৃষ্ট একচেটিয়া বাণিজ্য সুবিধা বঞ্চিত হতে

থাকে। জাপান, জার্মানি ও 'এশীয় বাঘ' নামে পরিচিত দেশগুলো উন্নত ও আধুনিক রপ্তানিপণ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারের অনেকটাই যুক্তরাষ্ট্রের হাত থেকে দখল করে নেয়। একই সময়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দাভাব পরিলক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, কানাডা, নেদারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াসহ বেশ কিছু শিল্পায়িত দেশে মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব দেখা দেয়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র কিছু আর্থিক ও প্রাযুক্তিক কৌশল গ্রহণ করে। আর্থিক কৌশলটি ছিল সংস্থাগুলির মধ্যে গাঁটছাড়া বাধার ব্যবস্থা করা এবং সিকিউরিটি ও জাংকবন্ড ইস্যু করে এগুলির ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা নেওয়া। অর্থনীতিতে যতদিন কিছু মাত্রায় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছিল ততদিন এই কৌশল অত্যন্ত লাভজনক ছিল। কিন্তু নব্বইয়ের দশকে অর্থনৈতিক স্থবিরতার কারনে কর্পোরেশনগুলো তাদের বিশাল অঙ্কের ঋণের বিপরীতে সুদ পরিশোধের ক্ষমতা হারায়। অন্যদিকে প্রাযুক্তিক কৌশল হিসেবে মার্কিন অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রকে ব্যাপকভাবে কম্পিউটারায়ন করা হয়। সরকারি সংস্থা, শিল্প কারখানা, পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র এবং বাড়ি ঘরে বিপুল পরিমান কম্পিউটার স্থাপন করা হয়। শিলার (Schiller) কম্পিউটার নির্ভরতার এই প্রবনতাকে সুদূরপ্রসারী মার্কিন পরিকল্পনার অংশ বলে উল্লেখ করেছেন।[২৮] তাঁর মতে "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে গৃহীত মার্শাল পরিকল্পনা যেমন ইউরোপীয়দের নিজস্ব উদ্যোগে ইউরোপীয় অর্থনীতির কাঠামোগত ব্যাপক রদবদল রোধে মার্কিন নেতৃত্বের একটি অতি কৌশলী পদক্ষেপ ছিল, কম্পিউটার ও উপগ্রহ (টেলিযোগাযোগ) প্রযুক্তির বিস্তারও তেমনি মার্কিন শিল্পদ্রব্যের বিশ্বজনীন আধিপত্য বজায় রাখতে সমান দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একটি ব্যবস্থা"।[২৯]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে পরবর্তী অর্ধশতাব্দী মার্কিন সামরিক বাহিনী এর বিশাল গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল থেকে নয়া তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটারায়ন খাতে অর্থ ব্যয় করেছে। পেন্টাগনের মূল উদ্দেশ্য ছিল উপাত্ত ও তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যা বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন সামরিক স্থাপনাগুলোর সাথে তাৎক্ষণিক ও অব্যাহত যোগাযোগ রক্ষা ও শত্রু মিত্র সবার সামরিক যোগাযোগের উপর নজরদারি করার সামর্থ মার্কিন সামরিক বাহিনীকে দেবে। এই অর্থের অনেকটাই গেছে বিভিন্ন সংস্থা, সরকারি ও বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরিগুলোতে ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স গবেষণায়। এসব গবেষণালব্ধ জ্ঞানই নয়া তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান আধিপত্যকারী অবস্থানটি জন্ম দিয়েছে। একারণেই আমরা দেখতে পাই যে, ইলেকট্রনিক ভোগ্যপণ্যের অধিকাংশই এশিয়াতে উৎপাদিত হলেও বিশ্ব অর্থনীতিতে অধিক প্রভাব বিস্তারকারী নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তিগুলোর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এখনো যুক্তরাষ্ট্রের হাতে।

নয়া তথ্যপ্রযুক্তি সম্বন্ধে একটি প্রধান অতিকথন হচ্ছে এটি মূল্যবোধ নিরপেক্ষ নিরেট যন্ত্র বিশেষ। এর প্রভাব নির্ধারিত হবে ব্যবহারকারীর উদ্দেশ্য ও চাহিদার নিরিখে। বিষয়টি এত একমাত্রিক নয়। গ্যালটাং (Galtung) -এর মতে, "একটি সরল দৃষ্টিকোণ থেকে প্রযুক্তিকে শুধুমাত্র উপকরণ- হার্ডওয়্যার এবং দক্ষতা ও জ্ঞান-সফটওয়্যারের ব্যাপার হিসেবে দেখা হয়। এই উপাদানগুলো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, তবে হিমবাহের দৃশ্যমান উপরিভাগের মতো এগুলো প্রযুক্তির উপরিতল মাত্র।"[৩০] সবরকম প্রযুক্তিই আমাদের সামনে একটি মানসিক গঠন কাঠামো তুলে ধরে, যে কাঠামোতে কিছু বিশেষ ধরনের জ্ঞানই কেবল খাপ খায় এবং কেবল কিছু বিশেষ ধরনের জ্ঞানের উৎপাদনই সম্ভব হয়। সন্দেহ নেই, নয়া তথ্যপ্রযুক্তি সন্নিহিত এই মানসিক কাঠামোটি সর্বাংশেই পশ্চিমা।

নয়া তথ্যপ্রযুক্তির উপর মার্কিন আধিপত্যের ব্যাপারটি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো তো বটেই, এমনকি অনেক উন্নত দেশের জন্যও উদ্বেগের কারণ। দেশগুলোর আশঙ্কা তারা ক্রমেই 'প্রযুক্তিগত উপনিবেশে' পরিণত হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে "তথ্য ইন্ড্রাস্ট্রির গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর উপর অধিকতর বিদেশি নিয়ন্ত্রণ এবং কাঠামোগত পরিবর্তন আরোপিত হচ্ছে যার এজেন্ডা অন্যত্র নির্ধারিত।"[৩১] অধিকাংশ দেশই কম্পিউটারভিত্তিক প্রযুক্তির চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় যুক্তরাষ্ট্র এবং কিছু মাত্রায় জাপান ও ইউরোপের উপর নির্ভরশীল। এই প্রযুক্তিগুলো ব্যয়বহুল এবং সবার কাছে সমানভাবে সহজলভ্য না হওয়ায় আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হচ্ছে 'তথ্যধনী' ও 'তথ্য দরিদ্র' দেশের। এই ব্যবধান ক্রমবর্ধমান। প্রাযুক্তিক নির্ভরশীলতা শেষ পর্যন্ত কেবল

প্রযুক্তির ক্ষেত্রেই সীমিত থাকছে না, বিস্তৃত হচ্ছে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতেও। আমদানির প্রবণতা নিরুৎসাহিত করছে স্থানীয় উদ্যোগ ও উদ্ভাবনকে।

নয়া তথ্যপ্রযুক্তি, আরো নির্দিষ্ট করে বললে ইন্টারনেটকে অভিহিত করা হচ্ছে 'মুক্তির বাহন' হিসেবে। বলা হচ্ছে, যোগাযোগের এই নতুন মাধ্যমটি জনগণকে সুযোগ করে দিয়েছে বিশ্বের যে কারো সাথে নির্বাধায় তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করার। এ দাবির অসারতা সহজেই প্রমাণ যোগ্য। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবধানের চিত্রটি স্পষ্ট। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউ এন ডি পি) প্রণীত ১৯৯৯ সালের হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টে বলা হচ্ছে "বিশ্বের সবচাইতে ধনী ২০ শতাংশ মানুষ ৯৩.৩ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। সবচাইতে গরিব ২০ শতাংশ মানুষ .০২ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহার করে, আর মধ্যবর্তী ৬০ শতাংশ মানুষ ব্যবহার করে মাত্র সাড়ে ৬ শতাংশ ইন্টারনেট"।[৩২] যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রেও চিত্রটি আশাব্যঞ্জক নয়। ১৯৯৮ সালের হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টে বলা হয়েছে শিল্পোন্নত দেশগুলোর ১২৩ কোটি লোকের জন্য যেখানে প্রতি হাজারে কম্পিউটারের সংখ্যা ১৫৬, সেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ৪৪০ কোটি লোকের জন্য এ সংখ্যা প্রতি হাজারে ১-এর নীচে। টেলিফোন সংযোগের ক্ষেত্রে এ অনুপাত ৪১৪ঃ৩৯, মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে ৬১ঃ৪, টেলিভিশন সেট ৫২৪ঃ১৪৫, রেডিও সেট ১০০৫ঃ১৮৫ এবং নিউজপ্রিন্ট (মেট্রিক টন) ৭৮ঃ৫।[৩৩] তথ্যমাধ্যমে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে এ বিশাল বৈষম্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত করছে। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ড্যাভোস অর্থনৈতিক সম্মেলনে প্রকাশিত এক মতামত জরীপে দেখা গেছে বিশ্বের বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গুলোর শীর্ষ কর্মকর্তাদের ৫০ শতাংশই মনে করেন ইন্টারনেটের প্রসার ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে ব্যবধান আরো বৃদ্ধি করবে। ব্যবধান কমিয়ে আনবে বলে মনে করছেন এমন উত্তরদাতার সংখ্যা ৩৮ শতাংশ। প্রাইজ ওয়াটার হাউস কুপারস নামে এক সংস্থা জরিপটি পরিচালনা করে।[৩৪]

এমনকি উন্নয়নশীল বিশ্বের যে গুটিকতক মানুষ ইন্টারনেট ও অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রবাহে তাদের অংশগ্রহণও অতি সীমিত। বার্তা উৎপাদন করার ক্ষমতা তাদের থাকলেও বার্তা যে উদ্দিষ্ট শ্রোতা/দর্শকের কাছে পৌঁছাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। মউলানা (Mowlana) আন্তর্জাতিক যোগাযোগ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের চারটি উপাদানের কথা বলেছেন: বার্তা উৎপাদন, বার্তা বিতরণ, যোগাযোগ হার্ডওয়্যার, যোগাযোগ সফটওয়্যার। তাঁর মতে যোগাযোগকারী যখন এই চারটি উপাদানকেই নিয়ন্ত্রণ করে কেবলমাত্র তখনই বার্তাটি নির্দিষ্ট শ্রোতা/দর্শকের কাছে পৌঁছার সম্ভাবনা বহন করে।[৩৫]

উল্লম্ফন তত্ত্ব হচ্ছে নয়া তথ্য প্রযুক্তির সামর্থ্য সম্বন্ধে আরেকটি অতিকথনের উদাহরণ। বলা হচ্ছে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য রয়েছে সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে অতিদ্রুত। নয়া তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো উল্লম্ফনের মাধ্যমে উন্নয়নের কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করে উন্নত দেশগুলোর কাছাকাছি পৌঁছে যাবে অনেক কম সময়ে। এ তত্ত্বের দুর্বলতা অসংখ্য। বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশেই এসব প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও দক্ষতার অভাব রয়েছে। ব্যয়বহুল এসব প্রযুক্তি কেনার সামর্থ্যও অধিকাংশ দেশেরই নেই। সবচেয়ে বড় কথা হলো উল্লম্ফন তত্ত্বের বৈধতা সম্বন্ধে কোনো ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। শিল্পবিপ্লবের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি নির্দিষ্ট কিছু পূর্বশর্ত পূরণ ও নির্দিষ্ট কিছু স্তরের মধ্য দিয়ে যাওয়া ব্যতিরেকে কোনো দেশই শিল্প বিপ্লব ঘটাতে পারেনি। শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কৌশলগুলো হাতের কাছে পাওয়ার পরেও কোনো দেশের পক্ষেই উল্লম্ফন সম্ভব হয়নি। তথ্য বিপ্লবের ক্ষেত্রেও যে এ অভিজ্ঞতার ব্যতিক্রম হবে এমনটি মনে করার কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ এখনো পর্যন্ত আমাদের সামনে নেই।

নয়া তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক বাণিজ্য উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলোকে দ্রুত চাঙ্গা করে তুলতে পারবে এ দাবিটিও যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, যদিও এ মূহুর্তে বিশ্বের বৃহত্তম শেয়ার বাজারগুলোতে ইন্টারনেট কোম্পানিগুলোর ব্যবসাই সবচেয়ে ভালো চলছে। মোডি, বয়ার ও স্ট্রবার (Mody, Bauer and Straubhaar) টেলিযোগাযোগ খাতে উন্নয়নশীল বিশ্বের ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগকে "বর্তমান সময়ের গোল্ডরাশ"[৩৬] বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে অল্প বিনিয়োগে অধিক লাভের আশায় উন্মুখ দেশগুলো ভুলে গিয়েছে যে প্রাযুক্তিক দিকটি ছাড়াও

যোগাযোগ সমস্যার অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দিক রয়েছে। তাছাড়া ইন্টারনেট ভিত্তিক বাণিজ্যের বর্তমান রমরমা অবস্থা কতদিন বহাল থাকবে সে বিষয়টিও নিশ্চিত নয়। ফেবার (Faber)-এর মতে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে প্রতিটি বড় প্রাযুক্তিক উদ্ভাবন 'নয়া যুগের' প্রতিশ্রুতি দিয়ে আকৃষ্ট করেছে বহুসংখ্যক বিনিয়োগকারীকে। শেষ পর্যন্ত এগুলোর খুব অল্প সংখ্যকই প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন করেছে। কারণ প্রতিটি লাভজনক উদ্ভাবনই বহু পরিমাণে সস্তা অনুকরণকে উৎসাহিত করেছে। ফলে মূল বিনিয়োগকারীদের লাভের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া, প্রতিটি ভালো উদ্ভাবনের পরেই ঘটেছে আরো ভালো উদ্ভাবন, যা পুরনো উদ্ভাবনটিকে সেকেলে করে দিয়েছে। নয়া তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটবে এমনটি মনে করার যৌক্তিক কারণ নেই। কারণ নয়া প্রযুক্তির বাণিজ্যে "অতি বেশি পরিমাণ খননকারী অতি অল্প পরিমাণ স্বর্ণের জন্য অনুসন্ধান চালাচ্ছে।"[৩৭]

নয়া তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্বায়ন: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

নয়া তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্বায়নকে সম্ভব করেছে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার জটিল সমীকরণে সুবিধাজনক অবস্থান ধরে রাখতে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল দেশগুলোও বাধ্য হচ্ছে এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করতে। বাংলাদেশে এই প্রযুক্তি প্রবাহের পুরোটাই বিদেশ থেকে আমদানি নির্ভর। এগুলো ব্যবহারের জন্য যে উচ্চ প্রাযুক্তিক জ্ঞান প্রয়োজন তার প্রায় সবটার জোগানও আসছে দেশের বাইরে থেকেই। এই পরিস্থিতিতে নয়া তথ্যপ্রযুক্তি যদি তাৎক্ষণিক কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা সৃষ্টিও করে, দীর্ঘ মেয়াদি পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এর অসুবিধার পরিমাণও কম নয়। "জটিল প্রযুক্তির আমদানি একই সাথে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা ও চাহিদা নিয়ে আসে; প্রকৌশল ও উৎপাদন কর্মীদের প্রায়শই যে দেশ থেকে প্রযুক্তি আমদানি করা হয়েছে সে দেশে প্রশিক্ষণ দিতে হয়; কাজের ব্যবস্থা ও পদ্ধতি আবশ্যিকভাবেই আমদানিকৃত ; এবং তারপর খুচরা যন্ত্রাংশ, পরবর্তী প্রশিক্ষণ এবং একই ধরনের নয়া উদ্ভাবনের জন্য আমদানীকারক দেশকে সবসময়ই রপ্তানীকারক দেশের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়"।[৩৮] কাজেই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে গিয়ে আমাদের উচিত হবে সুবিধা-অসুবিধাগুলোর তুলনামূলক মূল্যায়নের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

বিশ্বায়নের দ্রুত গতি বিশ্বের দেশগুলোর কাছে এই ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে অর্থনৈতিক সঙ্গতি নির্বিশেষে যত দ্রুত সম্ভব তথ্য বিপ্লবে অংশগ্রহণ করা আবশ্যক। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশগুলোর কাছে এ ক্ষেত্রে দুটি বিবেচনার অত্যন্ত জরুরি। প্রথমত, "যদি আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জড়িত সকল তথ্যকর্মীর কাজের পরিধি সম্প্রসারণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে পারে এবং এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য সত্ত্বেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক কল্যাণ ও সমতা সৃষ্টিতে অবদান রাখে কেবলমাত্র তবেই তথ্য বিপ্লব অর্থপূর্ণ হবে। অন্যথায় তথ্য বিপ্লবের খুব সামান্যই সার্থকতা থাকবে। এটি কেবল অতিমাত্রায় শিল্পায়িত সমাজের জন্য যথাযথ একটি ধারণার সস্তা অনুকরণ মাত্র হবে"।[৩৯] দ্বিতীয়ত, কি পরিমাণ সম্পদ এ খাতে বিনিয়োগ করা হবে সে প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ। তথ্যপ্রযুক্তির প্রতি অতি আগ্রহ তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশকেই বাধ্য করছে আটসাঁট বাজেটের অত্যাবশ্যকীয় কোনো খাত থেকে কিছু অর্থ সরিয়ে তা তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ করতে। এর অর্থ হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো জরুরি কোনো খাতে সম্পদের বরাদ্দ কম হওয়া এ ক্ষেত্রে দেশের আর্থিক সামর্থ্য ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যের কথাও মনে রাখতে হবে, কারণ প্রযুক্তি কখনো কখনো কোনো একক প্রকল্পে লাভজনক হলেও সার্বিক বিচারে অলাভজনক বিবেচিত হতে পারে।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় অর্থনীতির প্রতিটি খাতকে উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ফলে তথ্য ব্যবস্থা ও গণ মাধ্যমে জনগণের প্রবেশাধিকার সীমিত হয়ে পড়েছে। তথ্যপ্রযুক্তির মালিক হচ্ছে তারাই যাদের প্রচুর টাকা বিনিয়োগের সামর্থ্য আছে। বিনিয়োগকৃত অর্থের বিপরীতে মুনাফা অর্জনের জন্য তারা ঐ প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধাকে সেবা হিসাবে বিক্রি করছে। উইন্সবারী (Winsbury) তথ্য খাতকে লাভজনক করার উপায় হিসেবে "ব্যবহারকারি যা কিছু দেখবে বা করবে তার উপর মূল্য আরোপ করার এবং যারা মূল্য পরিশোধ করবেনা বা গ্রাহক হবে না তাদের ব্যবহার করতে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা "[৪০] রাখতে বলেছেন। এই পরিস্থিতি বাংলাদেশের সীমিত আয় সম্পন্ন এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে তথ্য প্রবাহে অংশ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবে।

নয়া তথ্যপ্রযুক্তিকে বাণিজ্যিকীকরণের প্রবণতা গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশের স্থিতিশীলতাকে ব্যাহত করবে। ম্যাক চেসনি (Mc Chesney)র মতে সচেতন মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া কেবল নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তি দিয়ে কোনো সমাজ দারিদ্র্য, পরিবেশ দূষণ, লিঙ্গ বৈষম্য, বর্ণবাদ ও সমরবাদের মতো সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারেনা। তিনি বলেন, "গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে সংঘাত ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে এবং যোগাযোগ-যা এই দুটোর জন্যই অত্যাবশ্যক- এক সাথে দুই প্রভুর সেবা করতে পারেনা।" [৪১]

তথ্যপ্রযুক্তির মালিকানা অতি অল্প সংখ্যক লোকের হাতে চলে যাওয়ার ফলে দেশে ইতোমধ্যেই বিরাজমান সম্পদ-বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। কারণ তথ্যপ্রযুক্তি খাত থেকে অর্জিত মুনাফা ভোগ করবে গুটি কতক লোক। জন্ম নিবে একটি 'তথ্য-ধনী শ্রেণী'। অন্যদিকে, একই ধরনের অন্যান্য প্রথাগত সেবার উপার্জন অনেক হ্রাস পাবে। উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর তথ্যসেবাদানকারী কর্মীরা ছাড়া অন্যান্য সেবাখাতের কর্মীদের আয়ও কমে যাবে। বহির্বিশ্বে শ্রমশক্তি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ খাতটি বাংলাদেশের জন্য ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসবে, যদি না অতি দ্রুত বেশি পরিমাণ তথ্যপ্রযুক্তি-দক্ষ শ্রমিক তৈরি করা যায়। কারণ ইতোমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশ শ্রমিক মাইগ্রেশন শুধু তথ্যপ্রযুক্তি-দক্ষ শ্রমিকে সীমিত করে দিচ্ছে। অবশ্য এ পরিস্থিতি ব্যাপক মেধা পাচারের সুযোগ করে দিয়ে বাংলাদেশের তথ্য অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে। দেশীয় কর্মসংস্থান পরিস্থিতির উপর নয়া তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব নিয়েও চিন্তার অবকাশ রয়েছে। কারণ প্রযুক্তি প্রকৃতিগতভাবেই শ্রম হ্রাসকারী। শিল্পায়নের ফলে যে সব শ্রমিক কৃষিখাত থেকে কর্মচ্যুত হয়েছে শিল্পায়নের পক্ষে সম্ভব হয়েছে তাদের কাজের যোগান দেওয়া, কিন্তু নয়া তথ্যপ্রযুক্তি যাদের কর্মচ্যুত করবে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে কে? এ প্রশ্নের মীমাংসা অন্তত বাংলাদেশের মতো স্বল্প কর্মসংস্থানকারী দেশের জন্য অতি জরুরি।

সরকারি নীতিনির্ধারক, প্রযুক্তিবিদ, ব্যবসায়ীমহল সবাই বেশ উচ্চকণ্ঠে তথ্য প্রযুক্তি খাতকে বাংলাদেশি অর্থনীতির সবচেয়ে সম্ভাবনাময় খাতের অন্যতম বলে বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নির্ধারণ পূর্বক সতর্ক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ভারতসহ অন্য যে সব দেশের উদাহরণ দেখে বাংলাদেশ অনুপ্রাণিত হচ্ছে সে দেশগুলো মূলত তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক নিম্ন পর্যায়ের কাজ করে থাকে। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে ডাটাএন্ট্রি, মেডিক্যাল ট্রান্সক্রিপ্ট, আনসারিং সার্ভিস ইত্যাদি। এসব কাজে পারিশ্রমিকের পরিমাণ কম এবং এগুলোর ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত- আমদানীকারক উন্নত দেশগুলোর মেজাজ মর্জি ও চাহিদার উপর নির্ভরশীল। সারা বিশ্বে ডটকম অর্থনীতির সীমাহীন মুনাফার যে চিত্রটি বাংলাদেশের মতো দেশগুলোকে এখাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করছে কার্যত তার অতি সামান্য অংশই এসব দেশের ভাগ্যে জুটবে। কাজেই বাংলাদেশের পক্ষে কল্যাণকর হবে শুর থেকেই তথ্যপ্রযুক্তি সেবার উঁচু স্তরটির (সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, প্রোগ্রামিং) দিকে লক্ষ্য রেখে অবকাঠামো ও জনশক্তি সৃষ্টি করা।

দেশজ সংস্কৃতি সংরক্ষণের বিষয়টিও বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বায়ন পাশ্চাত্যের আদর্শ ভিত্তিক সর্বজনীন সংস্কৃতির যে ধারাটির পৃষ্ঠপোষকতা করছে আমাদের দেশজ মূল্যবোধ ও রীতিনীতির সাথে তার ব্যবধান বিশাল। সে সংস্কৃতি অবিমিশ্রভাবে জনপ্রিয়তা না পাওয়ায় বর্তমানে 'ফিউশন' (Fusion) সংস্কৃতি নাম এক উদ্ভট সাংস্কৃতিক ফর্ম তৈরি করা হয়েছে। দেশজ ও পশ্চিমা সংস্কৃতির কিছু বিচ্ছিন্ন উপাদানকে অসুষমভাবে মিশ্রিত করে তৈরি হয়েছে এই অগভীর সংস্কৃতি। অতিমাত্রায় পশ্চিমা স্টাইল ও বাদ্যযন্ত্র নির্ভর সঙ্গীত, অপরাধ ও যৌনতানির্ভর সোপ অপেরা ও চলচ্চিত্র, চটুল বিনোদননির্ভর হালকা পত্রপত্রিকা, পোশাক প্রসাধনে পাশ্চাত্য প্রভাব-এগুলোর সাম্প্রতিক জনপ্রিয়তা বাংলাদেশে বিশ্বায়িত ভোক্তা সংস্কৃতির ক্রম-আগ্রাসী প্রকৃতিরই পরিচায়ক। নয়া প্রযুক্তি ব্যবহার এবং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সাথে সাথে বিভিন্ন সরকারি নীতিমালা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিজস্ব সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা এবং সংরক্ষণ করার ব্যাপারটিতে জোর দেওয়া উচিত।

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্বায়ন ভারসাম্যহীন এবং উন্নয়ন উপকরণ হিসেবে নয়া তথ্যপ্রযুক্তির কার্যকারিতা এখনো অনিশ্চিত। তা সত্ত্বেও বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এগুলোকে গ্রহণ করা ছাড়া বিকাশশীল দেশগুলোর সামনে কোনো বিকল্প নেই। তাই এ সব দেশের উচিত এগুলোর সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নিজস্ব প্রয়োজনের নিরিখে একটি নির্মোহ অবস্থান তৈরি করা। এ কথা বাংলাদেশের মতো দুর্বল অর্থনৈতিক সামর্থ্যের দেশের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রযোজ্য। নয়া তথ্যপ্রযুক্তি ও বিশ্বায়নলব্ধ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল কারা ভোগ করবে সেই প্রসঙ্গটিও বাংলাদেশকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। সম্পদ পুঁজিকরণ ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বৈশ্বিক মাত্রাটির সাথে সাথে দেশের অভ্যন্তরীণ মাত্রাটির দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে দেশে ইতোমধ্যে বিদ্যমান তীব্র সম্পদ-ব্যবধানকে যেন নয়া তথ্যপ্রযুক্তি ও বিশ্বায়ন তীব্রতর না করে।

বাংলাদেশে প্রযুক্তিবিদ, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদগণ সমস্বরে নয়া তথ্যপ্রযুক্তি ও বিশ্বায়ন সম্বন্ধে অতি উচ্চাকাংখী যে সব মন্তব্য করছেন সে ব্যাপারে এ মুহূর্তে কিছুটা সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। "অন্যভাবে বলতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা যখন যোগাযোগ ও গণমাধ্যমের বিশ্বায়ন সম্বন্ধে কথা বলি, সম্প্রচার উপগ্রহ এবং বৃহদায়তন তথ্য নেটওয়ার্কের উদাহরণ দেই, তখন আমরা জনসংখ্যার সবচেয়ে সুবিধাভোগী অংশটির অবস্থা পরিবর্তনের ব্যাপারটিই তুলে ধরি। এ যুক্তি অনায়াসে দেওয়া চলে যে এসব সুবিধা সমাজের উঁচু স্তর থেকে চুঁইয়ে সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছাবে। কিন্তু আমাদের এ যাবৎ কালের অভিজ্ঞতা বলে এটি একটি মন্থর ও কষ্টকর প্রক্রিয়া"।[৪২] বিশ্বায়নকে একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং নয়া তথ্যপ্রযুক্তিকে উন্নয়ন-উপকরণ হিসেবে সত্যিকারভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেতে হলে সমস্যাটির সমাধান অতি জরুরি।

তথ্যনির্দেশ

১. Anura Goonasekara, "Asia and the Information Revolution: An Introductory Perspective", *Asian Journal of Communication*, Vol. 7 No 2 1997, P. 12-33.

২. Marshal McLuhan, *Medium is the Message*, (Middle Sex: Penguin Books, 1967, P. 63.

৩. Kevin Robins, "What in the world`s going on?" in Paul du Gay (ed.) *Production of Culture / Cultures of Production*, (London: Sage / The Open University, 1997), P. 12-47.

৪. Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity*, (Cambridge: Polity, 1990), P.140.

৫. K. Robins, *Op cit*

৬. Marjorie Ferguson, "The mythology about globalization", *European Journal of Communication*, Vol 7 No 1, 1992, P. 69-93.

৭. Scott Lash and John Urry, *Economics of Sign and Space*, (London: Sage, 1994), P. 280.

৮. মাহমুদুল ইসলাম, "বাণিজ্য বিপনন বিশ্বায়ন" *সাপ্তাহিক ২০০০*, ৭জানুয়ারী ২০০০, পৃ. ৩৩।

৯. Jan Nederveen Pieterse, "Globalization as hybridization", in M. Featherstone, S. Lash and R Robertson (eds), *Global Modernties*, (London: Sage, 1995).

১০. Neville Jayaweera, "The Political Economy of the Communication Revolution and the Third World", *Occasional Paper 20*, (Singapore: Asian Mass Communication Research and Information Centre, 1986), P. 7.

১১. বাসুদেব ভট্টাচার্য, "তথাকথিত গ্লোবালাইজেশনের উল্টোপিঠ", *সংস্কৃতি*, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ৩৬।

১২. আনু মুহাম্মদ, "পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের ধারাবাহিকতা ও বৈপরীত্য", *সংস্কৃতি*, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৩৪।

১৩. অনুপম সেন, "দ্বি-সহস্রাব্দের শেষ দশকে বাংলাদেশ কোন পথে, মুক্তির পথ কিঃ ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিলয় ও এশিয়ায় ধনতন্ত্রের বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে", *শিখা অনির্বাণ*, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, পৃ.১৮।

১৪. Hamid Mowlana, "The Multinational Corporation and the Diffusion of Technology" in A.A. Said and L.R. Simmons (Eds) *The New Sovereigns: Multinational Corporations as World Powers*, (New Jersy: Prentice Hall, 1975), P. 89-90.
১৫. আনু মুহাম্মদ, পুর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩
১৬. Herbert I Schiller, *Mass Communications and American Empire*, (Boulder: West View Press, 1992), P. 7.
১৭. অনুপম সেন, পুর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৮
১৮. Ben H. Bagdikian, "Lords of the Global Village", *Nation,* June 12, 1989, P 805-820.
১৯. Ibid, P. 807.
২০. Daniel Okrent, "Happily ever After?", *Time*, January 24, 2000, P. 29-37.
২১. Ben H Bagdikian, Op cit , P-812.
২২. Herbert I Schiller,"Transnational Media And National Development", in K.Nordenstreng and H.I.Schiller (Eds) *National Sovereignty and International Communication*, (New Jersey: Ablex, 1979), P. 23.
২৩. Ibid, P. 24.
২৪. Herbert I Schiller, *Mass Communications and American Empire*, P 42
২৫. Jonathan Friedman, *Cultural Identity and Global Process*, (London: Sage, 1994), P. 195.
২৬. Herbert I Schiller *Transnstional media and national development*, P. 21.
২৭. Ibid, P. 31.
২৮. Herbert I Schiller, *Mass Communications and American Empire*
২৯. Ibid, P. 5.
৩০. Johan Galtung, *Devlopment, Environment and Technology: Towards a Technology of Self – Reliance*, (United Nations, New York: 1979), P. 6.
৩১. Stuart Cunningham, as quoted in Ian Ward, *Politics of the Media,* (Education Australia: Macmillan 1995), P. 283.
৩২. বাসুদেব ভট্টাচার্য, পুর্বোল্লিখিত, পৃ. ৩৫
৩৩. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, "একুশ শতকের গণমাধ্যম: সমস্যা ও সম্ভাবনা" *স্মরণিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ . ৯
৩৪. *The Daily Star*, 2 February 2000
৩৫. Hamid Mowlana, *Global Information and World Communication: New Frontiers in International Relations,* (New York: Longman, 1986), P. 11.
৩৬. B. Mody, J. M. Bauer and J. D Straubhaar (Eds.) *Telecommunications Politics: Ownership and Control of the Information Highway in Developing Countries,* (New Jersey: Erlbaum: 1995), P.XV
৩৭. Marc Faber, "New eras: all too dot. common", *Time,* 7 February 2000 , P 42.
৩৮. Elihu Katz and George Wedell, *Broadcasting in the Third World: Promise and Performance,* (Cambridge: Harvard University Press, 1980), P. 67.
৩৯. Syed A Rahim and Anthony J. Penning, *Computerization and Development in Southeast Asia*, (Asian Mass Communication Research and Information Centre, 1987), P. 47.
৪০. R. Winsbury, "The Electronic Newspaper: No Longer Just A Gizmo, But Fundamental To The Survival of The Newspaper Industry?" *Inter Media* Vol 22 No 1 1994, P 8
৪১. R W Mc Cheseny, "The Communication Revolution: The Market And The Prospect For Democracy", In M. Bailey and D. Winseck (Eds.) *Democratizing Communication? Comparative Perspectives on Information and Power*, (P 57-78), (New Jersy: Hampton Press, 1997), P. 74.
৪২. Torben Krogh, "The Changing Communication Scene: Implications For Development", *Media Asia,* Vol 21 No 3, 1994 (P 123-125) P 124.

আইবিএস প্রকাশনা

পত্রিকা ও গ্রন্থ (বাংলায়)

আইবিএস জার্নাল (বাংলা), ১৪০০:১–১৪০৭:৮

ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-সাহিত্য (সেমিনার ভল্যুম ৩), সম্পাদক : এম.এস. কোরেশী (১৯৭৯)

বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা (সেমিনার ভল্যুম ৬), আমানুল্লাহ আহমদ (১৯৮৫)

বাঙালীর আত্মপরিচয় (সেমিনার ভল্যুম ৭), সম্পাদক : এস.এ. আকন্দ (১৯৯১)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা (সেমিনার ভল্যুম ৯), সম্পাদক : এম.এস. কোরেশী (১৯৯৭)

বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল), ১ম খণ্ড, আবদুল করিম (১৯৯২)

Journals and Books (in English)

The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vols. I–XXIV (1976-2001)

Reflections on Bengal Renaissance (Seminar Volume 1), edited by David Kopf & S. Joarder (1977)

Studies in Modern Bengal (Seminar Volume 2), edited by S. A. Akanda (1984)

The New Province of Eastern Bengal And Assam *(1905-1911)* by M.K.U.Mollah (1981)

Provincial Autonomy in Bengal *(1937-1943)* by Enayetur Rahim (1981)

The District of Rajshahi: Its Past and Present (Seminar Volume 4) edited by S.A. Akanda (1983)

Tribal Cultures in Bangladesh (Seminar Volume 5), edited by M.S. Qureshi (1984)

Rural Poverty and Development Strategies in Bangladesh (Seminar Volume 8) edited by S.A. Akanda & M. Aminul Islam (1991)

History of Bengal: Mughal Period, Vol. 1 & 2 by Abdul Karim (1992, 1995)

The **Institute of Bangladesh Studies: An Introduction** (2000)

The Journal of the Institute of Bangladesh Studies: An Up-to-date Index by Md. Shahjahan Rarhi (1993)

Socio-Economic Development of a Bengal District: A Study of Jessore (1883-1925) by Muhammad Muhibullah Siddiquee (1997)

Research Resources of IBS: Abstracts of PhD Theses Compiled by M. Shahjahan Rarhi (2002)

৮ম সংখ্যার সূচিপত্র

শেখ রজিকুল ইসলাম ১
রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্য' : সৃজন ও নির্মাণ

শিখা আরেফিন ১৯
অতুলপ্রসাদ সেন : জীবন ও সঙ্গীত

মোস্তফা তারিকুল আহসান ৩৯
পদ্মা নদীর মাঝি ও তিতাস একটি নদীর নাম : তুলনামূলক আলোচনা

এ.টি.এম. কামরুল ইসলাম ৪৯
আধুনিক কবিতা: পুরাণের ভূমিকা

মোবাররা সিদ্দিকা ৬১
নারীবাদী মিসেস এম. রহমান

সাখাওয়াৎ আনসারী ৬৫
বাংলা লেখ্যরূপের সংস্কার : প্রাসঙ্গিক বিবেচনা

পি.এম. শফিকুল ইসলাম ৮১
নাটোরের উপভাষা

আবু তাহের ৯১
বাংলাদেশের চিত্রকলা : পটভূমি পর্যালোচনা

নুরুল আমিন ৯৭
সৌন্দর্যতত্ত্ব : প্রসঙ্গ অবনীন্দ্রনাথ

মুহাম্মদ তৌহিদ হোসেন চৌধুরী ১০৮
আবুল হাশিমের চিন্তা-জগৎ ও অবিভক্ত বাংলার রাজনীতি

মোঃ নজরুল ইসলাম মিঞা ১১৭
রাজনীতিতে সাঁওতালদের অংশগ্রহণের প্রকৃতি : জাতীয় নির্বাচনের ওপর বিশেষ দৃষ্টিপাত

মোঃ রবিউল ইসলাম ১২৩
বাংলাদেশে মাদক দ্রব্যের আর্থ-সামাজিক প্রভাব : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মোঃ আলতাফ হোসেন; মোঃ আবু হানিফ শেখ ১৩৫
মহানন্দা নদী অববাহিকার পানিতাত্ত্বিক ও আকার পরিমাপ বিশ্লেষণ: একটি সমীক্ষা

জুবাইদা আয়েশা সিদ্দীকা ১৫৩
বাংলাদেশের গ্রামীণ দুস্থ মহিলাদের দারিদ্র্য বিমোচনে ভিজিডি কর্মসূচির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা : একটি এলাকা ভিত্তিক সমীক্ষণ

রেজা হাসান মাহমুদ ১৬৫
শ্রমজীবী মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও কার্য-সন্তুষ্টি : তামাক কলে কর্মরত মহিলাদের উপর একটি সমীক্ষা

সেলিনা বানু ১৭৩
মহিলাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টিতে মহিলা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা : রাজশাহীস্থ 'মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান' সম্পর্কিত একটি সমীক্ষা

প্রীতি কুমার মিত্র ১৮৭
নজরুলের "আনন্দময়ীর আগমনে": একটি রাজনৈতিক কবিতার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ